ছবির দেশে
কবিতার দেশে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

ছবির দেশে, কবিতার দেশে পড়ে মনে হয়েছে
আমি কবে যাব ছবির দেশে, কবিতার
দেশে ? এমন তৃষ্ণা সবার হবে তার
কোন মানে নেই, তবে বইটা ভাল লা-
-গবে নিশ্চিত।

SHÜVRA

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯১ থেকে পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৯৭ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ১৭৯০০
ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০১ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

© সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7066-963-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কিম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১০০.০০

প্রীতি ও বিকাশ সান্যাল-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

অর্জুন
অমৃতের পুত্রকন্যা
অরণ্যের দিনরাত্রি
আজও চমৎকার
আত্মপ্রকাশ
আমিই সে
একা এবং কয়েকজন
জীবন যে রকম
জোছনকুমারী
ধূলিবসন
পূর্বপশ্চিম
পূর্বপশ্চিম ২য়
প্রাণের প্রহরী (নাটক)
রাজা-রানী ও রাজসভায় মাধবী (নাটক)
রাধাকৃষ্ণ
শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী (গল্প)
শ্যামসাহেব
সপ্তম অভিযান
স্বর্গের নীচে মানুষ
সেই সময় ১ম
ঐ ২য়

ছবির দেশে, কবিতার দেশে

১

> আমি খুলে ফেলি পোশাক ও টুপি সেই মুহূর্তে
> বালির ওপর উলঙ্গ দেহে চিৎ হয়ে শুই
> বন্য রৌদ্রে শরীর পুড়িয়ে প্রতীক্ষা করি, বেরুবে কখন
> আমাদের এই চামড়ার নিচে লুকিয়ে যে আছে, সেই ভারতীয়।
>
> —জাঁ ককতো

আমি দেশের বাইরে গিয়ে জীবনে প্রথম যে-বিদেশের মাটিতে পা রাখি, সেটা ফরাসীদেশ। সে অনেককাল আগেকার কথা।

আমার তখন অল্প বয়েস, বেশ গড়া-পেটা শরীর স্বাস্থ্য, ঝুঁকিবহুল জীবন কাটাতে ভালোবাসি। হঠাৎ হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে বনে-পাহাড়ে চলে যাই, কিংবা সিমলা-হায়দ্রাবাদের মতন বড় শহর দর্শন করতে গিয়ে পয়সার অভাবে এক-আধদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিই। কিংবা মধ্যরাত্রে কলকাতা শহরে অকারণে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে মারামারি বাঁধিয়ে পুলিশের গুঁতো খাই, গারদে চোর-পকেটমারদের সঙ্গে রাত কাটাই। তবু কিছুই গায়ে লাগে না, সবই যেন মজা। স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনের মধ্যে জীবনকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখার চেষ্টা।

কিন্তু আমার বিদেশ যাবার, বিশেষত সাহেবদের দেশে যাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। সে বড় দামি, দুর্লভ ব্যাপার।

যদিও অল্প বয়েস থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল বিশ্ব ভ্রমণের। বলা যেতে পারে, কাটা মুণ্ডের দিবাস্বপ্ন। কিংবা অন্ধের অভ্র-পুষ্প চয়ন। আমি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ও অতি গরিব পরিবারের সন্তান, কলেজ জীবনের শুরু থেকেই একাধিক টিউশানি ও নানা রকম খুচখাচ পার্ট টাইম কাজ করে পড়াশুনো চালিয়েছি, তাই পড়াশুনোয় খুব মন দিতে পারিনি। তেমন একটা মেধাবী ছাত্রও ছিলাম না। তা ছাড়া সেই সময় থেকেই মাথায় কবিতা লেখার পোকা ঢোকে, লিট্‌ল ম্যাগাজিন বার করা ও কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে আড্ডা মারাটাই পরমার্থের মতন মনে হতো। খুব ভালো ছাত্র ছাড়া অন্য কারুর সে সময়ে বিদেশে যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। ধনী ব্যক্তিরা যে নিজ ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণে যেতেন আগে, তাও পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে ফরেন এক্সচেঞ্জ কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য ভারত সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মনসা মথুরা ব্রজ। বিভিন্ন লেখকের ভ্রমণ কাহিনী পড়ে এবং গ্লোব ও ম্যাপ সামনে রেখে আমি পৃথিবী পরিক্রমা করেছি বহু অলস দুপুরে। ম্যাপ দেখা ছিল আমার প্রিয় নেশা। স্নানের সময় বাথরুমের নিভৃতিতে কখনো আমি স্পেনের দলদস্যু, কখনো আলাস্কার অভিযাত্রী। কাল্পনিক তলোয়ার এতবার চালিয়েছি যে আমার ধারণা হয়েছিল

আমি ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কসের সঙ্গে লড়ে যেতে পারবো।

যাই হোক, দারিদ্র্য, বাউণ্ডুলেপনা ও কবিতা নিয়ে হৈ হৈ করে দিন-টিন বেশ ভালোই কাটছিল, এমন সময় অকস্মাৎ আমার জীবনে একটা পরিবর্তন এসে গেল।

মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন ছিল তখন কলকাতার একটি বিশিষ্ট উৎসব। বাংলার সব রকমের পল্লীগীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও মার্গ সঙ্গীতের এমন মিলিত অনুষ্ঠান এখন আর হয় না। বড় চমৎকার ছিল ব্যাপারটা। আমি এবং আমার বন্ধুরা অল্প বয়েস থেকেই গান পাগল। বড় বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের বেশি দামের টিকিট কেনার সামর্থ্য ছিল না বলে আমরা ফুটপাতে খবরের কাগজ পেতে রাতের পর রাত সেই গান শুনতে গিয়ে কাটাতাম। এই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রাঙ্গণও ছিল তরুণ কবিদের একটি আড্ডাস্থল। কয়েকবার আমরা এখানে কবিতার স্টল দিয়েছি, লোকজনদের জোর করে ধরে এনে কবিতার বই গছিয়েছি, 'যে কবিতা পড়ে না, তার বেঁচে থাকা উচিত না', এই ধরনের চিৎকারে গলা ফাটিয়েছি। একবার এক টুকটুকে ফর্সা বৃদ্ধা মহিলাকে ডেকে এনে বলেছিলাম দিদিমা, আমাদের কবিতা কিনুন। তিনি বললেন, দু'চার লাইন পড়ে শোনাও তো! আমাদের কেউ একজন খুব ভাব দিয়ে পড়তে লাগলো, কয়েক লাইন শোনার পর সেই বৃদ্ধা ফিক করে মিষ্টি হেসে বললেন, এখন আর আমি এসব বুঝতে পারবো না, দাঁত নেই!

এক সন্ধেবেলা সেই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে আমরা জটলা করে বসে আছি। কেউ ঘাস ছিঁড়ে দিচ্ছি দাঁতে, কেউ একটা সিগারেট ধরাতেই অন্য একজন চেয়ে নিচ্ছে। খুব কাছ থেকেই ভেসে আসছে গান। আমরা এক কান দিয়ে গান শুনছি, অন্য কান আড্ডায়। এমন সময় রঙ্গস্থলে একজন সাহেবের প্রবেশ।

কলকাতায় তখনও সাহেব-মেম তেমন কিছু দুর্লভ ছিল না। আমার পরাধীন আমলে জন্ম, রাস্তায়-ঘাটে সাহেব মেম দেখেছি প্রচুর। দেশ স্বাধীন হবার পরেও বেশ কিছু ইংরেজ থেকে গিয়েছিল। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিল চোখে পড়বার মতন। পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলকে বলা হতো সাহেব পাড়া। তখনো এক শ্রেণীর বাঙালী বা মাড়োয়ারির ছেলেরা এরকম সাহেব হয়নি, যুবকরা প্যান্ট পরা শুরু করলেও ধুতি বর্জন করেনি একেবারে। বিদেশ থেকেও অনেক সাহেব-মেম আসতো কলকাতায়। বেশ সুন্দর, ঝকঝকে, প্রাণ-চাঞ্চল্যময় এই শহরটিকে সেই সময়ে কেউ 'আবর্জনা নগরী' কিংবা 'মৃত-নগরী' আখ্যা দেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। ভারতের প্রথম ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একবার কলকাতাকে শুধু 'মিছিল নগরী' বলায় বাঙালীদের কাছ থেকে বেশ ভর্ৎসনা পেয়েছিলেন।

অনেক বিদেশীরা আসতেন কলকাতায়, তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু কবি-লেখক-শিল্পীরও দেখা পাওয়া যেত। ষাটের দশকের শেষার্ধে উগ্রপন্থা সারা পৃথিবীকেই কাঁপিয়ে দেয়। তারপর থেকে একটু নাম করা ব্যক্তিরা কেউ আর পৃথিবীর কোনো দেশে সহজ সাবলীলভাবে ঘোরা ফেরা করতে পারেন না। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী পালমে-হত্যা মানব-ইতিহাসের একটি অতি কলঙ্কজনক ঘটনা। আমি যখনকার কথা বলছি, ষাটের দশকের শুরু, তখনো বহু রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রদূত, রাজনৈতিক নেতারা শরীর-প্রহরী বিনাই থিয়েটার-সিনেমা দেখতে যেতেন, সন্ধেবেলা রাস্তায় ইচ্ছেমতন একলা বেড়াতে বেরুতেন। পাবলো নেরুদা কিংবা স্টিফেন স্পেন্ডার কলকাতায় ঘুরে গেছেন যথেচ্ছভাবে। আঁদ্রে মালরো যখন ফরাসীদেশের মন্ত্রী, তখনও তিনি দিল্লিতে এসে একা ঘুরে বেড়িয়েছেন।

সুতরাং হঠাৎ কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিকে দেখলে আমরা চমকে উঠতাম না। বিদেশী পর্যটকদের কাছে তখনও কলকাতা ছিল একটা অবশ্যদ্রষ্টব্য স্থান।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে সেদিন আমাদেরই কোনো প্রৌঢ়-পরিচিত যে সাহেবটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, তাঁর নাম পল এঙ্গেল, বেশ দীর্ঘকায়, সুঠাম চেহারা, বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি, তিনি একজন অধ্যাপক ও কবি। সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর দত্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, তারাপদ রায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁদের বলা হতো কৃত্তিবাসের দল, তাঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পল এঙ্গেল যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি কথা বলেন জোরে জোরে, হাসেন গলা ফাটিয়ে, বেশ একটা সারল্য ফুটে ওঠে তাঁর ব্যবহারে। তিনি আসছেন অর্ধেক পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে, ভারতে এসেও দিল্লি-বোম্বাইতে বহু কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে, কলকাতাতেও প্রবীণ-প্রখ্যাত লেখকদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর, আমাদের সঙ্গেও বেশ আড্ডা জমে গেল।

এর পরের তিন-চারদিন তিনি ঘোরাঘুরি করলেন আমাদের সঙ্গে, কলকাতার কিছু কিছু জায়গা তাঁকে দেখালাম আমরা। নিমতলা শ্মশানঘাটটি ছিল আমাদের একটি প্রিয় জায়গা, রবীন্দ্রনাথকে যেখানে পোড়ানো হয়েছিল, সেই ঘেরা স্থানটিতে দাঁড়িয়ে রাত্রির গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আঃ কী সুন্দর। তিনি তাঁর কবিতা পড়ে শোনালেন আমাদের, আমরাও আমাদের দুর্বল ইংরিজি অনুবাদে কবিতা পাঠ করলাম, সেই সঙ্গে পানাহার ও হাসি-ঠাট্টা, শক্তি-শরৎকুমার ও ভাস্কর দত্ত যেখানে উপস্থিত থাকে, সেখানে 'নেভার এ ডাল মোমেন্ট' যাকে বলে।

এরপর পল এঙ্গেল পাড়ি দিলেন ফিলিপিনস হয়ে জাপানের দিকে। আমরাও মন দিলুম যে-যার ভাবনায়। আমি কয়েকদিনের জন্য চলে গেলাম চাইবাসা-হেসাডি'র দিকে। ফিরে এসে দেখি বড় বড় স্ট্যাম্প লাগানো একটি বিদেশী খাম আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। পল এঙ্গেল চিঠি লিখেছেন জাপান থেকে। তিনি জানতে চেয়েছেন, আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে আমি যোগ দিতে রাজি আছি কি না। আমার প্লেন ভাড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচ ওঁরাই দেবেন।

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমে আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এই পল এঙ্গেল। তিনি অক্সফোর্ডে পি-এইচ ডি করেছেন এবং রোডস স্কলার, কিন্তু অধ্যাপনার চেয়েও কবিতার প্রতিই তাঁর বেশি ঝোঁক। তিনি কবিদের বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, তাঁর ধারণা পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই যে যে কবিতা লেখে, তারা সবাই সবাইকার আত্মীয়। মাঝে মাঝে তিনি আত্মীয়-সম্মিলন ঘটাতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে তিনি এই ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম খুলেছেন, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, এমনকি সেই চরম কোল্ড ওয়ারের যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ান, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি থেকেও, কবিদের আমন্ত্রণ করে আনেন। সেখানে পারস্পরিক মেলামেশা, কবিতা পাঠ, আলোচনা, অনুবাদ এই সব হয়। খরচ চালাবার জন্য তিনি আমেরিকার বড়লোক চাষা ও কিছু কিছু কম্পানির মালিকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলেন, আমেরিকার সরকারের সঙ্গে এ উদ্যোগের কোনো সংস্পর্শই নেই। পৃথিবীতে কোথাও যে কবিদের জন্য এরকম একটি কেন্দ্র আছে, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। পল এঙ্গেল খাটতে পারেন দৈত্যের মতন, তিনি একার চেষ্টায় যে এরকম একটি কেন্দ্র গড়ে

তুলেছেন, তা অনেকটা অবিশ্বাস্য লাগে, কিন্তু পৃথিবীতে এরকম কিছু কিছু ক্ষ্যাপাটে লোক আছে বলেই তো পৃথিবীটা এত বর্ণময়। পরবর্তী কালে অবশ্য এই কেন্দ্রটি অনেক বড় হয়েছে, প্রায় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, আফ্রিকার কালো দেশ, সোসালিস্ট দেশ, আরব দেশ, আমাদের মতন গরিব দেশ এবং ধনতান্ত্রিক দেশের শত শত কবি ও লেখক ঐ আয়ওয়ার মতন ছোট্ট শহরে থেকে এসেছেন পল এঙ্গেলের আমন্ত্রণে। আমার পরে ওখানে গিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কবিতা সিংহ প্রমুখ, ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকেও অনন্তমূর্তি, দিলীপ চিত্রের মতন বর্তমানে খ্যাতিমানেরা।

আমার কাছে সেই চিঠি একটা বিরাট লটারি প্রাপ্তির মতন হলেও প্রথমে বেশ কয়েক ঘন্টা আমার খুবই বিমূঢ় অবস্থায় কেটেছিল। প্রস্তাবটি এমনই অপ্রত্যাশিত যে প্রায় অলীকের পর্যায়ে পড়ে। এত কবি-লেখক থাকতে আমার মতন নগণ্য একজনকে ডাকা হলো কেন ? আমি অবশ্য নিজেকে নগণ্য মনে করতাম না, তখন সদর্পে কৃত্তিবাস নামে কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করছি, বাংলা কবিতা নিয়ে খুব একটা ভাঙচুর করার স্পর্ধা পোষণ করি মনে মনে, তবু সাংসারিক দারিদ্র্যের জন্য বাইরে একটা হীনমন্যতা বোধ কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারি না। কিছুদিন আগে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে অপরিণত বয়েসে, ভাই-বোনেরা ছোট ছোট, পারিবারিক দায়িত্ব অনেকটা আমার কাঁধে। আমার সাংঘাতিক ভ্রমণের নেশা, তবু চোদ্দ হাজার মাইল দূর থেকে হুট করে ডাক এলেই তো যাওয়া যায় না। দু'চারদিনের ব্যাপার নয়, যেতে হবে বছরখানেকের জন্য।

দোনামনা করে কাটলো বেশ কয়েকটা দিন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কয়েকজনকে জানাতে তারা অবশ্য উৎসাহ দিতে লাগলো খুব। আমাদের কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর মধ্যে তখন একমাত্র শরৎকুমারেরই বিদেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল, পড়াশুনো করার জন্য তিনি এর মধ্যেই ক'বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে এসেছেন, তিনি ভরসা দিতে লাগলেন অনবরত। এমনও জানা গেল, আমেরিকায় ওঁরা আমাকে যা হাত খরচ দেবেন, তার থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে দেশে নিজের পরিবারের জন্য পাঠানো যেতে পারে। ওখানকার এক টাকা, দেশে পাঁচ টাকা। দু-তিন মাস অন্তর দেশে একশো ডলার পাঠালেই পাঁচশো টাকা, ষাটের দশকের গোড়ায় পাঁচশো টাকা মানে যথেষ্ট টাকা, ইস্কুল মাস্টারদের মাইনে দেড়শো টাকার বেশি হতো না, পোনা মাছের কিলো ছিল সাড়ে তিন টাকা।

তখনো হিপি-আন্দোলন শুরু হয়নি, হিপি শব্দটাই ছিল অজ্ঞাত। হিপিরা এসে সারা বিশ্বে একটা পোশাক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। পুরোনো আমলের লোকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, হিপিরা আসবার আগে লন্ডনের রাস্তায় টাই না পরা পুরুষ দেখাই যেত না। প্যান্টের মধ্যে শার্ট না গুঁজে কেউ বাইরে বেরুলে অন্য লোকরা ভুরু কুঁচকে বলতো, বাথরুমের পোশাক পরে রাস্তায় এসেছো কেন ? বহু হোটেল রেস্তোরাঁয় পোশাকের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছিল। দিনের বেলা নেমন্তন্নে একরকম সাজ, রাত্তিরের নেমন্তন্নে আর এক রকম। মোজার সঙ্গে টাইয়ের রঙের সামঞ্জস্য থাকা চাই। হিপিরা এই সব নিয়ম কানুন ভেঙে দেয়। নীল রঙের জিন্‌স যা ছিল কুলি-মজুরদের পরিধেয়, তা জাতে ওঠে। এখন জিন্‌স আর গেঞ্জি পরে পৃথিবীর সর্বত্র ঘোরা যায়। কিন্তু তখনও সেই স্বর্ণযুগ আসেনি। কবি অ্যালেন গীন্‌সবার্গ কলকাতার রাস্তায় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঘুরতেন, কিন্তু দেশে ফেরার সময় তাঁকে ঐ পোশাকে প্লেনে উঠতে দেওয়া হয়নি, তাঁকেও প্যান্ট-কোট-টাই কিনতে হয়েছিল।

সুতরাং আমারও একটা ঐ রকম পোশাক চাই। আমি তখন ওয়াছেল মোল্লার দোকান

থেকে কেনা রেডিমেড প্যান্ট পরি, চৌরঙ্গির ফুটপাত থেকে শার্ট কিনি আর পায়ে বাটা কম্পানির সাত টাকা নিরানব্বই পয়সা দামের চটি। একরঙা প্যান্ট-কোট, যাকে সুট বলে, তা আমাদের বংশে কেউ কখনো গায় দেয়নি। ওরকম এক প্রস্থ তো কিনতে হবেই। সাহেবদের দেশে যে-হেতু বরফ পড়ে, তাই আমাদের ধারণা ছিল, ওসব দেশে সারাবছরই খুব শীত। তখন অগাস্ট মাস, তবু বানানো হলো একটা আধা উলের সুট, তার খরচ পড়লো পাঁচশো টাকা, শরৎকুমার এবং ভাস্কর দত্ত দু'জনে ভাগাভাগি করে সেই টাকাটা দিয়েছিলেন।

এরপর পাসপোর্ট। ওঃ, সে কথা ভাবলে গায়ে এখনো জ্বালা ধরে। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে যে-কোনো নাগরিকেরই পাসপোর্ট পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তখন পাসপোর্টের জন্য কী হয়রানিই না ছিল ! দিনের পর দিন পাসপোর্ট অফিসে ঘোরাঘুরি করি, ধমক খেয়ে ফিরে আসি। এদিকে পয়লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছাতে না পারলে আমন্ত্রণটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল তারকা নই, নামকরা কোনো পরিবারের সন্তান নই, নিতান্তই এক হেঁজিপেজি এবং নিছক বাংলা কবিতা লিখি, তবু আমাকে বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয় প্লেন ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাবে, এক বছর থাকতে-খেতে দেবে, এটা যেন পাসপোর্ট অফিসারের কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। প্রত্যেকবার হাজার রকম জেরা এবং প্রত্যাখ্যান। রাগের চোটে এক এক সময় মনে হতো ঘুষি মেরে লোকটার দাঁত ভেঙে দিই ! রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে হোম সেক্রেটারি-চীফ সেক্রেটারিকে ধরাধরি করেছি, কোনো কাজ হয়নি, এমনকি দিলীপ দত্ত নামে এক বন্ধুর আত্মীয়তা সূত্রে গিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। এখন যেমন পশ্চিম বাংলার প্রতি কেন্দ্রের অবিচারের কথা খুব শোনা যায়, কংগ্রেস আমলেও এই সুরই ছিল। 'রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ', এই বাক্যবন্ধটি খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যেত। আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন আমার পাসপোর্টের জন্য টেলিফোন করলেন, তবু কেন্দ্রীয় সরকারের এক অফিসার তা অগ্রাহ্য করলেন। সেই অফিসারটি আমায় বলেছিলেন, আমি কি প্রফুল্ল সেনের কাছ থেকে মাইনে পাই ? এরপর একটা ম্যাজিকের মতন ব্যাপার হলো। তারাপদ রায়ের মেসোমশাই দেবী রায় এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার, তখন লালবাজারের ডি সি ডি ডি। তারাপদ রায় আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেসোর কাছে, মেসো মুচকি হেসে বললেন, হয়ে যাবে। তখন আর মাত্র একটা দিন বাকি।

কলকাতা বিমানবন্দরটি সেই সময়ে এমন রুগ্‌ণ হয়ে যায় নি, বহু বিদেশী বিমান এখানে ওঠা-নামা করতো। আমার টিকিট ছিল প্যান অ্যামের, রাত দুটোয় যাত্রা। আগের দিন পর্যন্ত ধারণা হয়েছিল যাওয়াই হবে না, শেষ মুহূর্তে পাসপোর্ট সংগ্রহ, ভিসা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদির জন্য ছোটাছুটি করতে গিয়ে ক্লান্তিতে আমি কুকুরের মতন জিভ বার করে হাঁপাচ্ছিলাম। তবু সব ক্লান্তি মুছে গিয়েছিল বন্ধু-বান্ধবদের ভালোবাসায়, আমাদের দমদমের বাড়িতে প্রচুর বন্ধু এসেছিল আমাকে বিদায় জানাবার জন্য, বেহালা থেকে এসেছিলেন অরবিন্দ গুহ, সে রাতে আর তিনি বাড়ি ফিরতেই পারেননি। অবশ্য সব বন্ধুই যে খুশি হয়েছিল তা নয়, দু'একজন খুবই ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার মুখ দেখা বন্ধ করেছিলেন। যেন আমাকে নির্বাচন করা আমারই অপরাধ। এ জন্য আমার মনে অবশ্য খানিকটা লজ্জার ভাবও ছিল।

অগাস্ট মাসের গরমে, গরম স্যুট পরে, শু-মোজা পায়ে, গলায় মেরুন টাই বেঁধে, নব কার্তিকের মতন চেহারায় ঘামতে ঘামতে উঠলাম বিমানে। আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে

ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিমানটি প্রথম থেমেছিল করাচিতে। অস্পষ্ট উষালোকে করাচি বিমানবন্দরের বাংলা অক্ষরে নাম লেখা দেখে রোমাঞ্চ হয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই সেই বাংলা নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিরতি রোমে, তখন আমি ঘুমন্ত। তারপর প্যারিসে পৌঁছে আমাদের বিমান থেকে নামিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ট্রানজিট লাউঞ্জে। সারা রাত ঘুমিয়ে সব অবসাদ দূর হয়ে গেছে, ঠোঁট থেকে মুছে গেছে আগের দিনের হয়রানির বিরক্তি, শরীর বেশ টাটকা, ঝরঝরে। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে হঠাৎ আমার রোমাঞ্চ হলো। গতকাল সকালেও ভেবেছিলাম পাসপোর্ট পাবো না, এখন আমি সত্যি বিদেশে এসে গেছি। প্যারিস, এই সেই প্যারিস ?

আমাদের চোখে তখন ফ্রান্স ছিল স্বর্গের সমতুল্য। অগণন শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের লীলাভূমি। কে যেন বলেছিলেন, প্রত্যেক শিল্পীরই দুটি মাতৃভূমি, একটি, যেখানে সে জন্মেছে, অন্যটি হলো ফ্রান্স ! এখানেই ছিলেন দেগা, মোনে, মানে, গগ্যাঁ, মাতিস্, রুয়ো-র মতন মহান শিল্পীরা, এখনও এখানে ছবি আঁকছেন পিকাসো। র‍্যাবো-ভের্লেন-বদলেয়ার, মালার্মে-ভালেরি-আঁরি মিসোর মতন কবিদের এই দেশে আমি সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে আছি ?

সেই সময় আমি আমেরিকার সাহিত্য বিশেষ কিছু পড়িনি। তখনো টি ভি আসেনি, মিডিয়ার এমন ব্যাপক প্রসার ছিল না, আমেরিকা ছিল ভূপৃষ্ঠের অন্যদিকের বহুদূরের দেশ। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আমেরিকার যতটা পরিচিতি ছিল, সেই তুলনায় ওখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জানা ছিল না, হলিউডের ফিল্ম ছাড়া। তখন আমরা অনেকেই ফরাসী সংস্কৃতি ও কাব্যে বিভোর। এলেইন মার্কস সম্পাদিত 'ফ্রেঞ্চ পোয়েট্রি ফ্রম বদলেয়ার টু দা প্রেজেন্ট' নামে বইখানি ছিল আমার প্রতিদিনের সঙ্গী, সে যাত্রাতেও স্যুটকেসে নিয়েছি।

শার্ল দ্যগলের নামে এয়ারপোর্ট তখনও তৈরি হয়নি, দ্যগল সে সময়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। ওর্লি বিমানবন্দরের কাচের দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে আমি প্যারিস নামক অমরাবতীকে দেখার চেষ্টা করছি, আর মনে মনে আবৃত্তি করছি ভাঙা ভাঙা কবিতার লাইন। জাঁ ককতোর একটি কবিতাই বেশি করে মনে পড়ছিল, কারণ সেই কবিতায় একজন ভারতীয়'র উল্লেখ আছে :

'.....বন্য রৌদ্রে শরীর পুড়িয়ে প্রতীক্ষা করি, বেরুবে কখন
আমাদের এই চামড়ার নীচে লুকিয়ে যে আছে, সেই ভারতীয়....'

আমিই সেই ভারতীয়; আমার গায়ের চামড়া জলপাই রঙের, আমি এসেছি জাঁ ককতো'র শহরে।

এক সময় বলা হতো, প্যারিস শহরের প্রধান দুটি দ্রষ্টব্য হলো, ইফেল টাওয়ার আর জাঁ ককতো। তিনিই এখানকার এক নম্বর নাগরিক। একাধারে তিনি কবি ও ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। নিজে ফিল্ম ও নাটক পরিচালনা করেছেন, নিজে তাতে অভিনয়ও করেছেন। সাহিত্য-শিল্পের যে-কোনো শাখায় তিনি স্মরণীয়। বিদগ্ধ নাগরিকতার উজ্জ্বল প্রতিভূ। প্যারিসের অদূরে তাঁর জন্ম, এখানেই তাঁর মৃত্যু। কী অসাধারণ সেই মৃত্যুদৃশ্য। বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা এদিথ্ পীয়াফ ছিলেন ককতোর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দু'জনের জীবনে কী প্রচন্ড অমিল, আবার কী দারুণ মিল। ককতো ধনী পরিবারের সন্তান, আর এদিথ্ পীয়াফ ছিলেন পথের ভিখারিনী। চোর-গুণ্ডা-খুনে ও বেশ্যাদের মধ্যে প্রতিপালিত এই গায়িকাটি নিজের প্রতিভার জোরে উঠে এসেছিলেন সমাজের শীর্ষে। এক সময় ককতো আর পীয়াফ

দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, দু'জনেই মৃত্যু শয্যাশায়ী, ককতো প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় লোক পাঠাচ্ছেন পীয়াফ কেমন আছে জেনে আসতে। তারপর এক সময় প্রায় একই সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন দু'জনে। অমরলোক বলে যদি কিছু থাকে, তবে সেখানে ঐ দু'জনের নিশ্চয়ই আবার দেখা হয়েছে।

আমি কবিতা নিয়ে মগ্ন হয়ে আছি, কত সময় কেটে গেছে জানি না, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কীরকম যেন একটা উদ্ভট শব্দ শুনতে পেলাম। গ্যাঁগো প্যাডিই-ই-ই.....ছুনিল গ্যাঁগো প্যাডি-ই.....। আরে এটা আমার নাম নাকি ! আমি ছুটে কাউন্টারে যেতেই একজন উত্তেজিত ভাবে ফরাসীতে কী যেন বলতে লাগলো, আমি যত বলি যে জ্য ন পার্ল পা ফ্রাঁসে, আমি ফরাসী ভাষা জানি না, তবু সে থামে না। শেষ পর্যন্ত একজন ইংরিজি জানা লোক এসে বললো, তুমি এতক্ষণ কী করছিলে ? ঐ দ্যাখো তোমার প্লেন ছেড়ে যাচ্ছে।

আমি সেদিকে দৌড় লাগাতে যেতেই সে আমার হাত চেপে ধরে বললো, সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে দেখছো না ? তোমার আর ঐ প্লেনে যাওয়া হবে না !

আমি আঁতকে উঠলাম। বলে কী ? ঐ বিমানে আমার স্যুটকেস রয়েছে। আমার পকেটে মাত্র আট ডলার। আমি এখানে কারুকে চিনি না, এখন কোথায় যাবো ?

২

"কুসুমের মাস রূপান্তরের মাস
মে মেঘহীন জুনের পৃষ্ঠে ছুরি
ভুলবো না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিঃশ্বাস
বসন্তে আরও লুকানো যে মঞ্জরী····

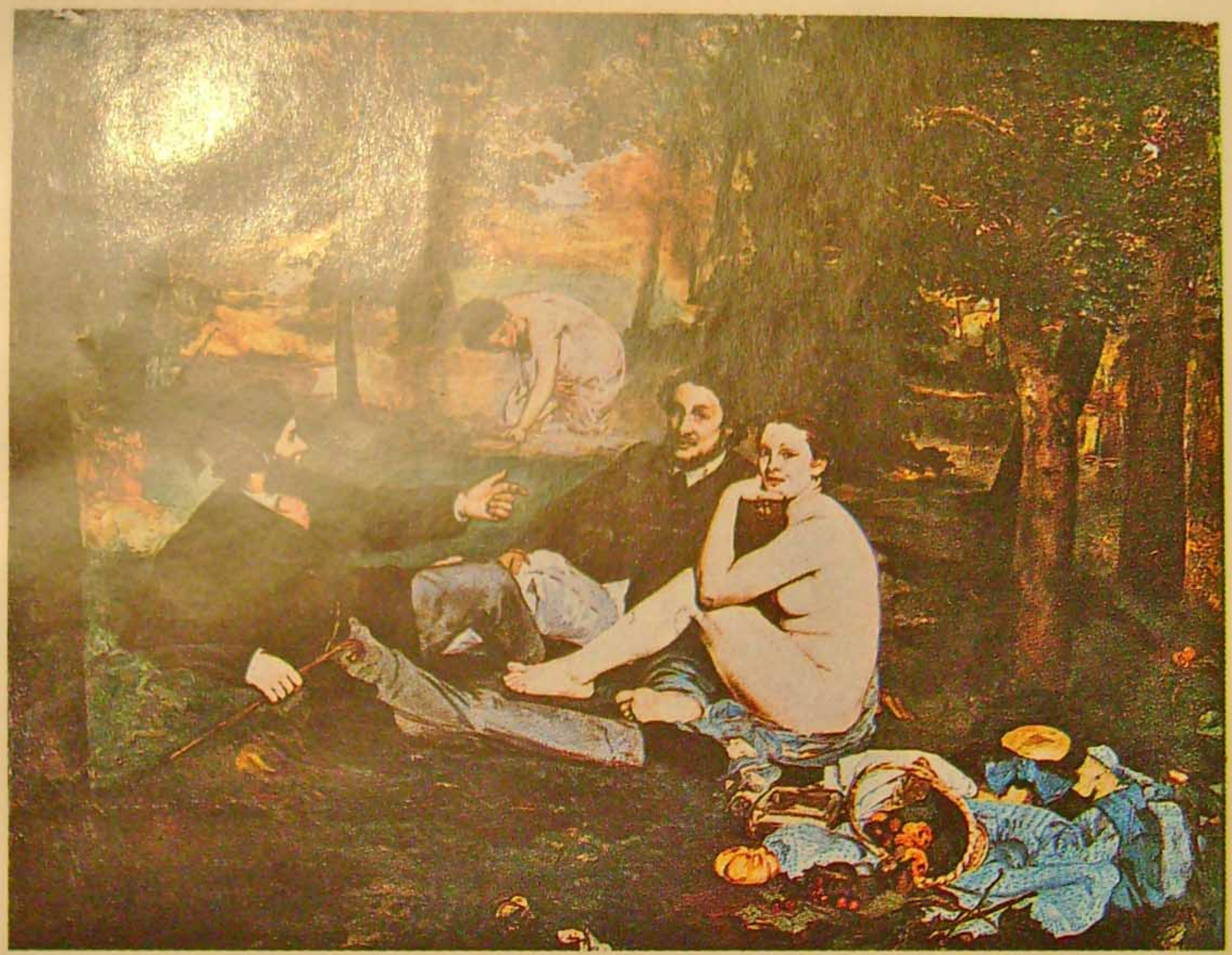
—লুই আরাগঁ"

আমি যখন প্রথম বিদেশে যাই, তখনও জাহাজের যুগ পুরোপুরি শেষ হয়নি, বিমানের যুগ শুরু হয়ে গেছে। আগেকার দিনে আমরা কত ভ্রমণকাহিনীতে জাহাজযাত্রার বর্ণনা পড়েছি। সমুদ্রপৃষ্ঠে তৈরি হয়েছে কত রোমান্স, গল্প-উপন্যাস। স্বদেশ ছেড়ে বিদেশযাত্রার সময় জাহাজের আন্তর্জাতিক পরিবেশ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিনের মেলামেশায় মনকে অনেকটা প্রস্তুত করে তোলে, হঠাৎ একটা কালচার শক হয় না। সেই তুলনায় বিমানভ্রমণের কয়েকটি ঘণ্টা নিতান্তই বর্ণহীন।

সেই সময় আমারপরিচিত নামকরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই, যেমন অমর্ত্য সেন, নবনীতা দেব সেন, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ, সমুদ্রপথেই প্রবাসে গিয়েছিলেন। আমারও বাল্যকাল থেকেই জাহাজভ্রমণের স্বপ্ন ছিল। বাচ্চা বয়েসে যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও, আমি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিতাম, নাবিক ! অথচ প্রাপ্ত বয়েসে আমাকে প্রথম সমুদ্র ডিঙোতে হলো, হনুমানের মতন, আকাশপথে।

এখন অনেক বাচ্চা ছেলেও জানে, ট্রানজিট লাউঞ্জ কাকে বলে, কিংবা নির্দিষ্ট দিনে বিমানে না চাপলেও আন্তর্জাতিক টিকিট নষ্ট হয় না। কিন্তু সেই সময়ে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কারুরই বিদেশে বিমানযাত্রার অভিজ্ঞতা ছিল না। কেউ আমাকে কিছু বলে দেয়নি, টিকিটটি একেবারে শেষ মুহূর্তে পেয়েছিলাম বলে বিমান কম্পানির লোকেরাও কোনো পরামর্শ দেয়নি আমাকে। সেইজন্যই, প্যারিসে আমার নির্দিষ্ট ফ্লাইট ধরতে না পেরে আমি যৎপরোনাস্তি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমার আর আমেরিকায় যাওয়া হবে না, এখান থেকেই বা দেশে ফিরবো কী করে। প্যারিসে আমায় পড়ে থাকতে হবে, এখানে একজনকেও চিনি না, পকেটে মাত্র আটটি ডলার। ক্লোশার নামে এক ধরনের ভিখিরির কথা পড়েছি ফরাসী উপন্যাসে, আমাকেও সেন্ নদীর ব্রীজের তলায় সেই রকম ভিখিরিজীবন কাটাতে হবে।

আমার ছটফটানি ও ব্যাকুলতা দেখে তিন-চারজন বিমানকর্মী ঘিরে ধরলো আমাকে, হাত-পা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে ভয় নেই, ঘণ্টাচারেক বাদে অন্য এয়ার লাইনসের এক বিমানে আমাকে তুলে দেওয়া হবে, আমার সুটকেস নিউ ইয়র্কে অপেক্ষা করবে আমার



এদুয়ার মানে'র এই বিখ্যাত ছবি দুটি ইমপ্রেশানিজম্ আন্দোলনের গোড়ার দিকে প্রবল নিন্দা মন্দের ঝড় তোলে। ওপরে : ঘাসের ওপরে মধ্যাহ্ন ভোজ। নীচে : ওলিমপিয়া





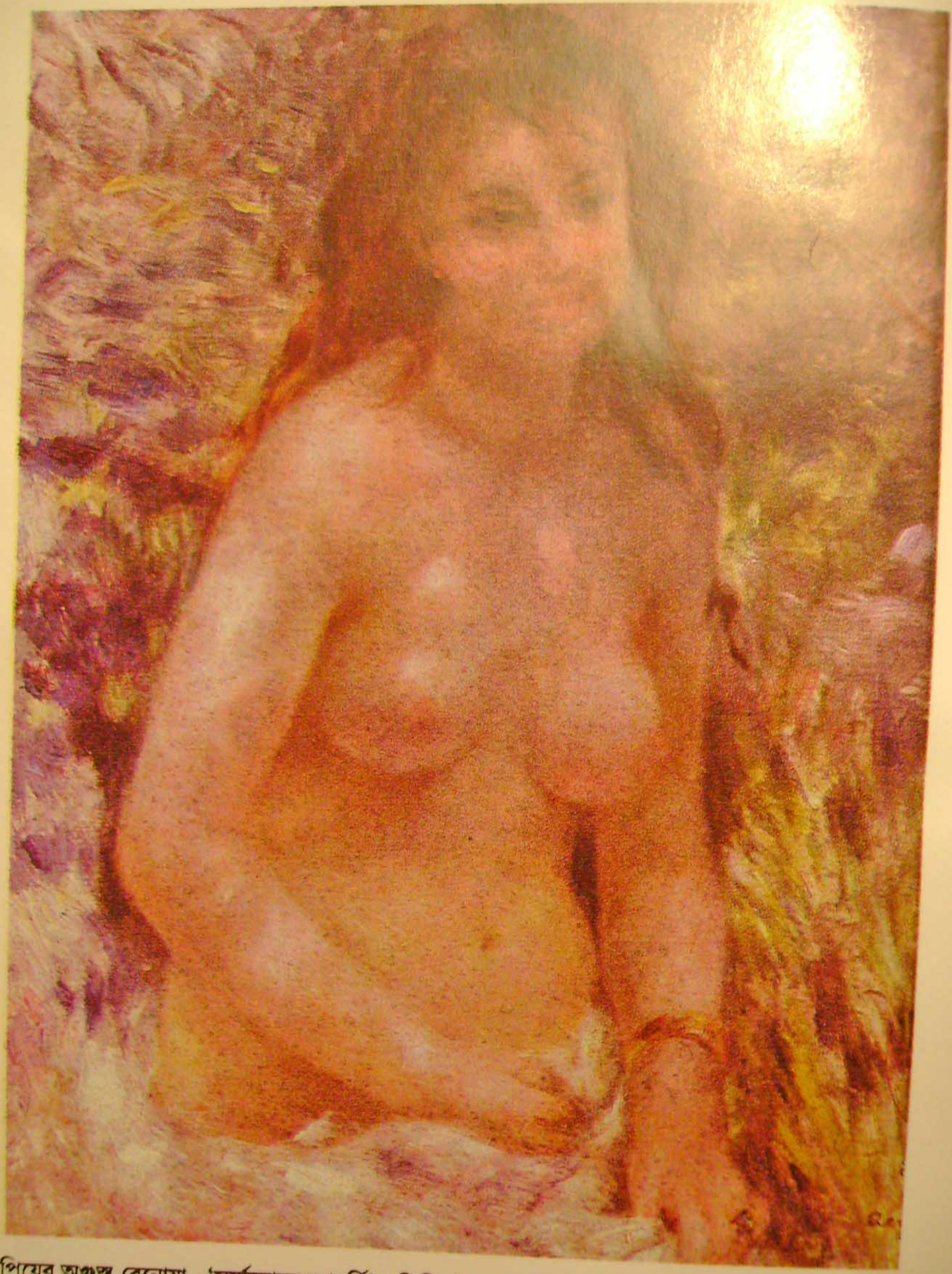
ক্লদ মোনে অঙ্কিত ইমপ্রেশন : সান রাইজ। ইমপ্রেশনিজম আন্দোলনের নামটি এই ছবির প্রসঙ্গেই প্রচলিত হয়ে যায়।



ক্লদ মোনে বাগানে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছেন, সেই ছবি এঁকেছেন রেনোয়া।



পিয়ের অগুস্ত রেনোয়া : 'কিশোরী মেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে'। এই মেয়েটিকে রেনোয়া বারবার এঁকেছেন।



পিয়ের অগুস্ত রেনোয়া : 'সূর্যালোকে নগ্নমূর্তি' । দ্বিতীয় ইমপ্রেশানিস্ট প্রদর্শনীতে দেখাবার সময় সমালোচকরা এই ছবি সহ্য করতে পারেনি ।



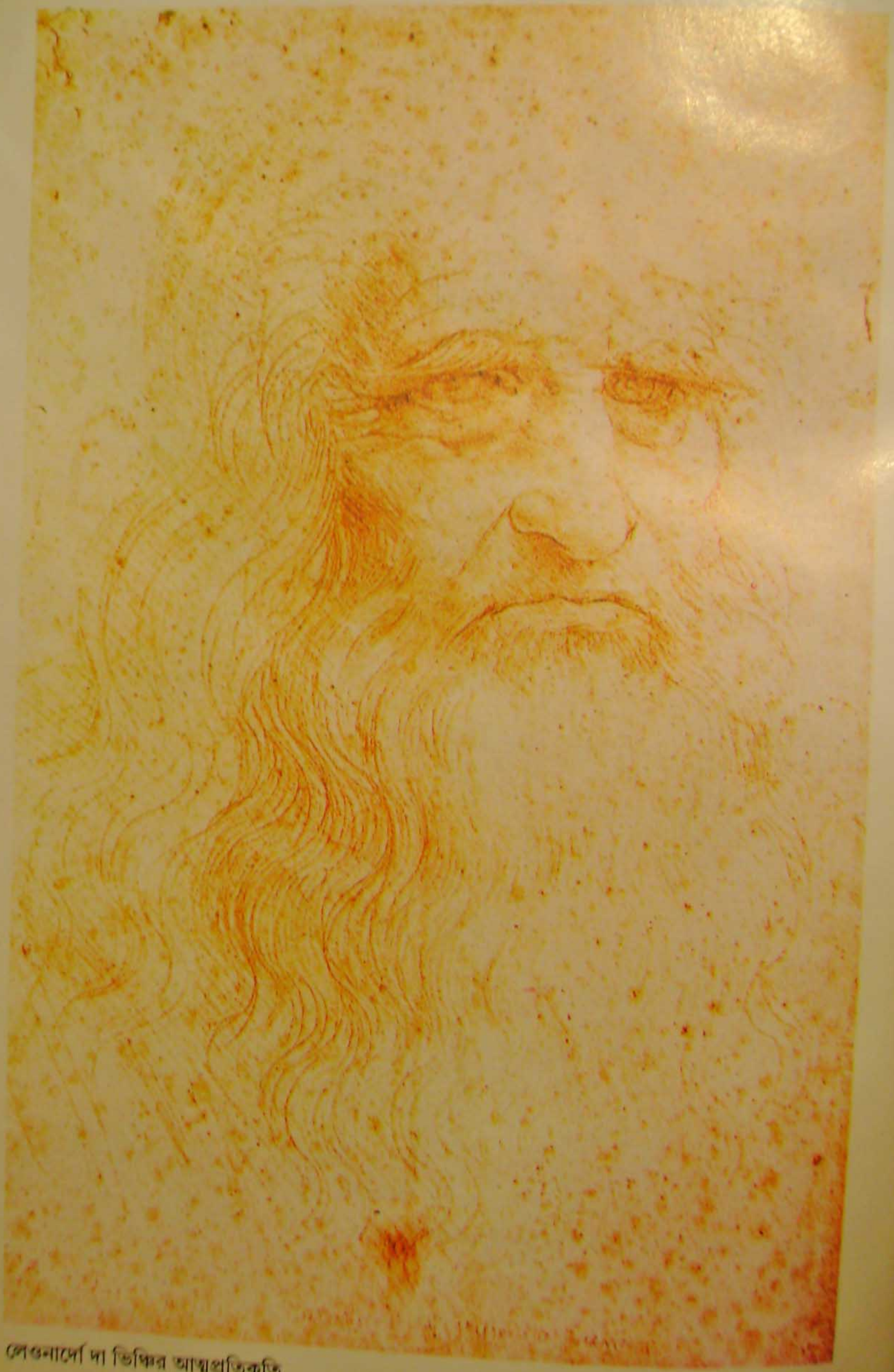
এদগার দেগা : 'নাচের ক্লাশ' । ১৮৭৪ সালে প্রথম ইমপ্রেশানিস্ট প্রদর্শনীতে দেখানো হয় ।



এদগার দেগা : 'ফার্নান্দো সার্কাসে মিস লালা' ।



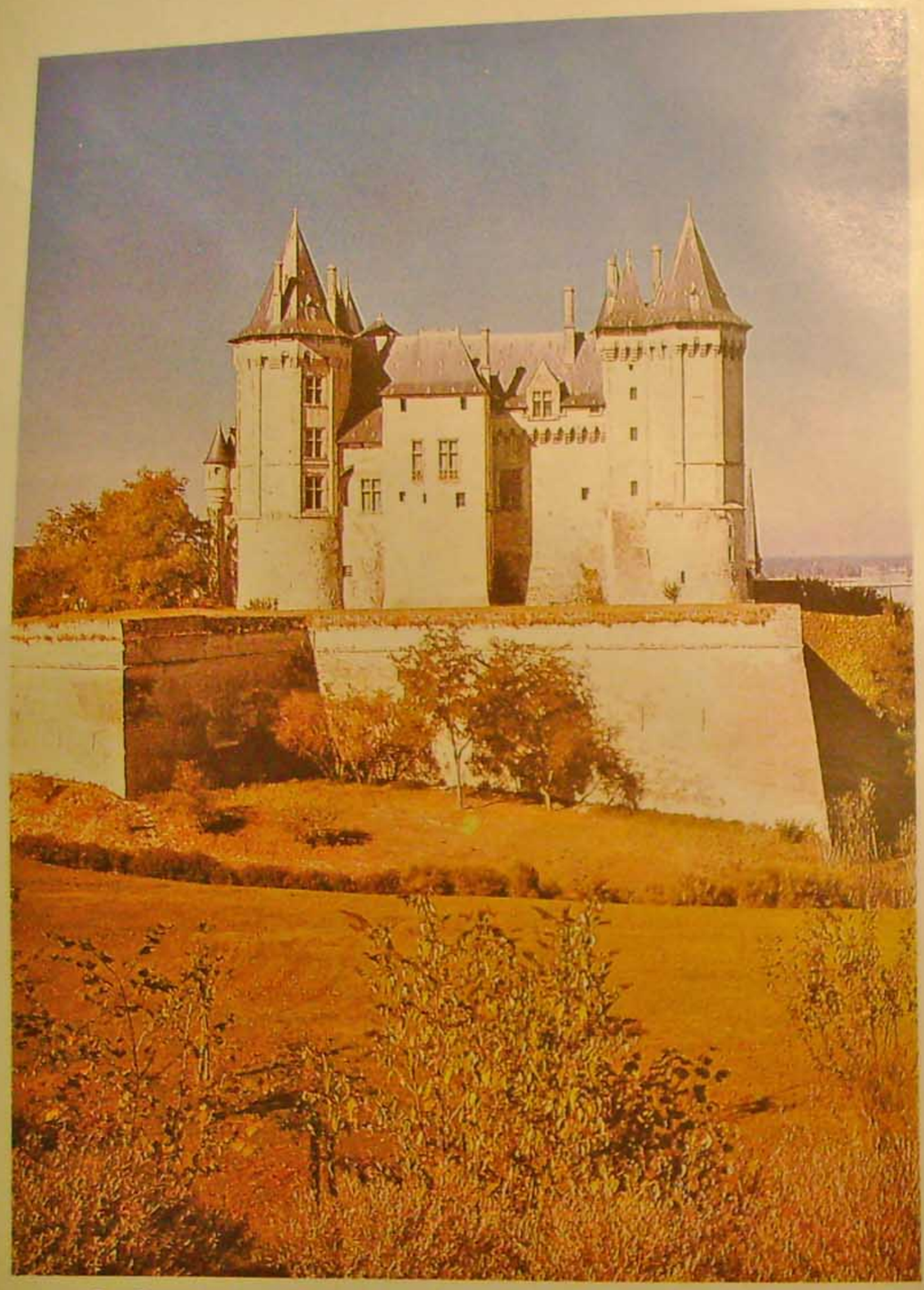
লেদা নাম্নী রমণীর চুলের স্টাডি করেছেন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি



লেওনার্দো দা ভিঞ্চির আত্মপ্রতিকৃতি



শননসো প্রাসাদ, তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী



লোয়ার নদীর তীরে সমুর প্রাসাদ



শামবর প্রাসাদ ও সংলগ্ন বাগান



পীয়ের অগুস্ত রেনোয়া : ১৮৭২ সালে প্যারিসের দৃশ্য



শামবর প্রাসাদে রাজকীয় শয্যা



নর্মান্ডি উপকূলে বাদল বসু, কুমকুম, স্বাতী ও অসীম রায়

জন্য। তাতেও খুব একটা ভরসা পেলাম না। নিউ ইয়র্কের বিশাল এয়ারপোর্টে কীভাবে একটা সুটকেস খুঁজে বার করতে হয়, তাই বা কে জানে!

সেই অপেক্ষার সময়টা নানারকম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটছিল, হঠাৎ একসময় মনে হলো, দূর ছাই! যা হবার তা হবে! আমি বসে আছি প্যারিসের বুকে, আর শুধু শুধু সুটকেস, টিকিট, টাকা-পয়সার মতন বাজে ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করছি! এই চার ঘণ্টায় শহরটা খানিকটা ঘুরে দেখা যেতে পারতো, কিন্তু এখান থেকে বেরুতে দেবে না, আমি বিমানবন্দরেরই চতুর্দিকে টহল মারতে লাগলাম, যদি কোনো দিকের কাচের দেয়াল দিয়ে এই কবি-শিল্পীদের স্বর্গস্থানটি দেখা যায়। যা দেখা যায়, তা যৎসামান্য, আশ মেটে না। সোফাগুলিতে গা এলিয়ে যে-সব যাত্রী-যাত্রিণীরা বসে আছে, তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ ফরাসী দেশের বড় শিল্পী কিংবা খ্যাতিমান কবি। একজন দাড়িওয়ালা মধ্যবয়স্ক সাহেব নোটবই খুলে কী যেন লিখছেন। বার্নার্ড শ চলন্ত বাসে নোট বইতে নাটকের সংলাপ লিখে রাখতেন। এখানেও বোধহয় কোনো কবি মহাকাব্য রচনা করছেন। লোভ হয় পাশে গিয়ে উঁকি মারতে, আবার দুর্মর সঙ্কোচে যেতেও পারি না।

পরে আমার এই ধরনের চিন্তার কথা শুনে মার্গারিট হেসে কুটিকুটি হয়েছিল। সে বলেছিল, দূর বোকা, ট্রানজিট লাউঞ্জে ফরাসী কবি-শিল্পীরা বসে থাকতে যাবে কেন? ওখানে তো আটকে থাকে শুধু বিদেশীরা। যে-লোকটা খাতা খুলে কিছু লিখছিল, সে নিশ্চয়ই ব্যবসার হিসেবপত্র টুকে রাখছিল!

সেই চার ঘণ্টা কোনো একজন ব্যক্তির সঙ্গেও আমার আলাপ হয়নি। ফরাসী বলতে হবে এই ভয়ে মুখ খুলিনি।

আমি ফরাসী ভাষা জানি না। কিন্তু এই চমৎকার ভাষাটি শেখার একাধিক সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিয়েছি।

তখন কলকাতায় আমার পরিচিতদের মধ্যে দু'জন ছিলেন ফরাসী ভাষাবিদ। প্রখ্যাত লেখক কমলকুমার মজুমদার এবং তৎকালীন বাংলা প্রকাশনা জগতের সবচেয়ে সাড়া জাগানো প্রতিষ্ঠান সিগনেট প্রেসের অন্যতম অংশীদার সুনন্দ গুহঠাকুরতা। বুঢ়া এই ডাকনামেই যে পরিচিত ছিল, সে আমাদের সমবয়েসী বন্ধু। বুঢ়া পরবর্তী কালে হয়েছিল বহুভাষাবিদ, অন্তত পনেরো-ষোলোটি ভাষা, গ্রীকসমেত, সে লিখতে ও বলতে পারে। তার মতন স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানুষ আমি দ্বিতীয় দেখিনি। এ দেশের দুর্ভাগ্য যে এরকম সুরসিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিটি বহুকাল দেশছাড়া।

কমলকুমার আমাদের প্রথম যৌবনের অ্যারিস্টটল। তিনি বহু বিষয়ে আমাদের দীক্ষাগুরু। অ্যারিস্টটলের মতনই কমলকুমারকে আমরা বসে থাকতে দেখেছি কদাচিৎ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা চলন্ত অবস্থায় তিনি কথা বলতেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন পেরিপাটেটিক দার্শনিক। কলেজ স্ট্রিট কিংবা ওয়েলিংটনের মোড়ই ছিল আমাদের আথেন্সের লাইসিয়াম।

কমলকুমারের গল্প-উপন্যাসের ভাষা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হলেও তাঁর মুখের ভাষা ছিল খাঁটি কলকাতার চলতি ভাষা, কলকাতার ককনিও বলা যেতে পারে। তার সঙ্গে মিশে থাকতো ফরাসী শব্দ। ওয়েলিংটনের মোড়ে ভেজাল তেলে ভাজা হাঁসের ডিমের ওমলেট খেতে খেতে তিনি বলতেন, বঁ, সে বঁ! বেড়ে কাঁচালঙ্কার ঝালটি দিয়েছে, কী বলো? কিংবা, কোনো তরুণ কবিকে সস্নেহ ভর্ৎসনা করার সময় তিনি বলতেন, কষ্ট না

করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না, বুঝলে ! পভ্‌র পোয়েত্‌ ত্রাভাইয়ো ! কোনো রেস্তোরাঁ বা পানশালায় দাম দেবার সময় তিনি টাকা বার করতেন কোনো বইয়ের পাতার ভাঁজ থেকে। সব সময়েই তাঁর হাতে থাকতো এক একখানা ফরাসী বই, পুরোনো ক্লাসিক, ট্রামে-বাসে পড়তেন, আবার সেই বই-ই তাঁর মানিব্যাগ। সাদা ধপধপে পাঞ্জাবি ও ধুতি পরিহিত এই বলিষ্ঠকায় মানুষটি একদিকে অত্যন্ত ভারতীয় আর্য, আবার ফরাসী সংস্কৃতিতে খুব বেশি আপ্লুত। ইংরেজদের তিনি পছন্দ করতেন না, এদেশের ইংরেজ-মনস্ক বাঙালীরা ছিল তাঁর উপহাসের পাত্র। এমনও তিনি বলেছিলেন যে, বঙ্কিমের আমল থেকেই বাংলা গদ্য লেখা হচ্ছে ইংরিজি সিনট্যাক্স-এ, এর বদলে ফরাসী গদ্যকে আদর্শ হিসেবে ধরলে আমাদের গদ্য অনেক উন্নত হতো। সম্ভবত তিনি ফরাসী সিনট্যাক্স-এ বাংলা গদ্য লেখার চেষ্টাও করেছেন। ফরাসী ভাষায় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে, যেমন লাল গোলাপের বদলে গোলাপ লাল, এরকম নিদর্শন আছে তাঁর রচনায়।

দেশের বাইরে কখনো পা দেননি কমলকুমার, এককালে সে সুযোগ তাঁর যথেষ্টই ছিল, তাঁর ছোটভাই শিল্পী নীরোদ মজুমদার বহুকাল কাটিয়ে এসেছেন ফরাসীদেশে, কিন্তু কমলকুমার ইচ্ছে করেই যাননি ! কোনো বিলেতফেরত ব্যক্তিকে অতি সাহেবিপনা করতে দেখলে তিনি হেসে বলতেন, আমার বাবার বাবার বাবার বাবা হাফ্‌ পেন্টুল পরে বিলেত গেস্‌লো, বুঝলে ! ফরাসীদেশ থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী, লেখক-শিল্প সমালোচক কলকাতায় এলে কমলকুমারের খোঁজ করতেন, কমলকুমার তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেন খালাসীটোলায় দিশি মদের দোকানে। চতুর্দিকে নোংরা ছড়ানো সেই আধো অন্ধকার স্থানটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন হাল্‌কা সুরে।

কলকাতার অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি কমলকুমারের কাছে ফরাসী ভাষার ছাত্র ছিলেন। আমরাও একসময় বায়না ধরেছিলাম, কমলদা, আমাদের ফরাসী শেখান ! তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি, তবে দুটি শর্তে। বিনা পয়সায় শেখা চলবে না, তাঁকে মাইনে দিতে হবে মাসে এক টাকা। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, তাঁর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আমরা প্রকাশ্যে অন্যদের কাছে একটাও ফরাসী বাক্য উচ্চারণ করতে পারবো না। শুনেছি, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র নির্দেশ ছিল, টানা সাত বছর স-র-গ-ম না সাধলে তাঁর শিষ্যরা এক লাইনও গান গাইতে পারতো না।

উত্তর কলকাতায় গ্রে স্ট্রিটে আমার বন্ধু আশুতোষ ঘোষের বাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন ধরে দুপুরে তিনি পড়াতে আসতেন আমাদের। ওঃ কী ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতা ! এমন সুরসিক, আড্ডাবাজ কমলকুমার শিক্ষক হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, কোনোরকম হাস্য-পরিহাস নয়, আমাদের শুধু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফরাসী শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হবে। আজকালকার ডাইরেক্ট মেথডে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, বাক্য গঠন দিয়ে শিক্ষা শুরুর মজা আমরা পেলাম না, শুধু নীরস ব্যাকরণ ! এ যেন তেঁতুলগাছ তলায় বুনো রামনাথের টোলে মাথায় টিকিওয়ালা ছাত্রদের মতন দুলে দুলে এত্‌র, আভোয়ার-এর নানা রূপ আউড়ে যাওয়া। দু'মাসের মধ্যেই আমাদের ধৈর্য চলে গেল ! আমাদের সময়ে স্কুলে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল, শব্দরূপ-ধাতুরূপ মুখস্থ করার ভীতিতে সে ভাষাও ভালো করে শিখিনি, ফরাসী ভাষায় বিদ্বান হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের অচিরেই বিলীন হয়ে গেল।

মূল ভাষায় ফরাসী কবিতা পাঠ করার বাসনা আমার একেবারে যায়নি। এর পরে, বন্ধুদের না জানিয়ে, গোপনে আমি আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজেও ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছিলাম একবার। সেখানেও বেশিদিন লেগে থাকতে পারিনি নিজেরই দোষে। সেই সময়ে অন্তত,

উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই প্রধানত পড়তে যেত আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে, চমৎকার তাদের চেহারা, আর জামা-কাপড়ের কত বাহার। এক একজন জনপ্রিয় ক্লাসের মধ্যে দামি চকোলেট বিলি করে, একগাদা সহপাঠী-সহপাঠিনীদের নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কোনো বড় রেস্তোরাঁয় খেতে যায়। সেই তুলনায় আমার চেহারা ও পোশাক অতি মলিন, পকেটে হাত দিয়ে প্রায় সময়ই খুচরো পয়সা গুনি। কারুর সঙ্গে মিশতে পারতাম না, পেছনের দিকে চুপ করে বসে থাকতাম। জানি, এটা বোকামির পর্যায়ে পড়ে, অন্যদের চলিয়াতি তুচ্ছ করাই উচিত। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে থাকলে আমি বাঘ, একা হয়ে পড়লেই মুষড়োনো। এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারতাম না কিছুতেই। তাছাড়া বন্ধুবান্ধবদের কাছেও ধরা পড়ে গেলাম অবিলম্বে। ফরাসী কনসুলেটে যাতায়াত করছি শুনে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজের আড্ডাধারীরা অনেকে বলতে লাগলো, খুব আঁতেল হতে চাস বুঝি ! আঁতেল শব্দটি গালাগালের পর্যায়ে পড়ে। আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে পড়াবার ধরন খুবই আকর্ষণীয় ছিল, সুন্দরী তরুণী মেমরা পড়াতো, কিন্তু তা আমার ভাগ্যে সইলো না।

পরবর্তী কালে, অনেক বছর পরে, ঐ আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর সামনের রাস্তায় আমি এক একদিন বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকতাম অন্য কারণে। ওখানকার এক ছাত্রীকে মাঝপথে ধরে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে ময়দানে টো টো করে ঘুরে বেড়াবার কুপ্রস্তাব দিতাম। এইভাবে আমি আমার পূর্বতন ব্যর্থতার শোধ নিয়েছি বলা যেতে পারে।

ফরাসী ভাষা শেখা হয়নি বটে, কিন্তু ফরাসী বাক্য মুখস্থ করেছিলাম বেশ কিছু। আমার বন্ধু বুঢ্‌ঢা শিখিয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ভুলে ভু কুশে আভেক্‌ মোয়া ? এর অর্থ আমি বলে দেবো না। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, ভুলেও যেন কক্ষনো এই বাক্যটি কোনো সদ্য-পরিচিত বিদেশিনীর সামনে উচ্চারণ করবেন না !

প্যারিসের প্রথম দিন সেই চার ঘণ্টার অপেক্ষায় আমি কিছুই দেখিনি। পৃথিবীর সব বড় বড় শহরের বিমানবন্দরই একরকম, চরিত্রহীন। জাহাজ কিংবা ট্রেনযাত্রা নিয়ে কত অসংখ্য কাহিনী রচিত হয়েছে, সেই তুলনায় বিমানযাত্রা নিয়ে কিছুই না।

নিউ ইয়র্ক পৌঁছে আমার সুটকেসটা খুঁজে পেয়েছিলাম ঠিকই। নিউ ইয়র্কে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি, চিনতামই না কারুকে। বস্তুত, সারা আমেরিকায় আলেন গীন্‌সবার্গ ও পল এঙ্গেল ব্যতীত আমার পরিচিত কেউ ছিলই না। তখনো, সেই তেষট্টি সালে, এত রাশি রাশি বাঙালী ছেলেমেয়ে মার্কিনদেশে গিয়ে থিতু হয়নি।

নিউ ইয়র্ক থেকে একটু পরেই বিমান বদলে শিকাগো, সেখানে এক হোটেলে রাত্রিবাস। সে-ও এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। এখন কলকাতা থেকে কেউ বিদেশে গেলে আর পাঁচজন তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু তখন আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি। মাঝপথে কোথাও রাত কাটাতে হলে তার জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করা যে বিমান কম্পানিরই দায়িত্ব, তা কি জানতাম তখন ! শেষ দিন হাতে টিকিট পেয়েছি, তার মধ্যে হোটেল ভাউচার নেই।

এর মধ্যে দুটি পিকচার পোস্টকার্ড কিনে পঞ্চাশ সেন্ট খরচ করে ফেলেছি, আমার আর সম্বল মাত্র সাড়ে সাত ডলার। সে আমলেও শিকাগোতে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোনো হোটেলের ঘর দশ ডলারের কমে পাওয়া যেত না। শুধু থাকা, খাওয়া নয়। একটা হোটেলে পৌঁছে অতি দীনভাবে আমাকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে আমার কাছে পয়সা কম আছে। কাউন্টারের তরুণ ম্যানেজারটি দয়া করেছিল আমাকে।

এই সব প্রসঙ্গ আমি আগে অন্যত্র লিখেছি। প্রথম দিকে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি মার্জনীয়।

পরের দিন ভোরবেলা আমি যখন আয়ওয়ার উদ্দেশে ছোট্ট একটি প্লেনে চাপলাম, তখন আমি কপর্দকশূন্য। সম্পূর্ণ অচেনা এক জায়গায় আমি পৌঁছোবো নিঃস্ব অবস্থায়। কোনো কারণে যদি পল এঙ্গেল খবর না পেয়ে থাকেন, কিংবা এয়ারপোর্টে কারুকে পাঠাতে ভুলে যান, তা হলে আমি কী করবো জানি না।

বাগডোগরা কিংবা তেজপুরের মতন ছোট্ট এয়ারপোর্ট আয়ওয়া সিটির। রানওয়ের ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন পল এঙ্গেল। আমি নামতেই তিনি দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই উষ্ণতায় বুক ভরে গিয়েছিল।

তারপর ম্যাজিকের মতন ব্যাপার ঘটতে লাগলো। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই পল এঙ্গেল কী করে যেন বুঝে গেলেন যে আমি খুবই ক্ষুধার্ত, প্রথমেই তিনি আমাকে এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। আমার জন্য তিনি আগেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে রেখেছিলেন, সেখানে যাবার আগে ইউনিভার্সিটিতে নাম রেজিস্ট্রেশান, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা, টেলিফোন ও গ্যাসের কানেকশান নেওয়া ইত্যাদি সারা হলো ঘন্টাখানেকের মধ্যে। তারপর তিনি একটি নির্জন রাস্তায় এক দোতলা বাড়ির সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে আমায় পৌঁছে দিয়ে বললেন, এবার তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, আমি আবার সন্ধেবেলা আসবো।

মাত্র একদিন আগেও আমি ছিলাম কলকাতার এক কনিষ্ঠ কেরানি, দমদমে এক রিফিউজি পল্লীর কাছাকাছি ফ্ল্যাটবাড়ির দু'খানা ঘরে সবাই মিলে গাদাগাদি করে থাকতাম, মাসের মাঝখান থেকেই ধারের চিন্তা করতে হতো, পুরো এক প্যাকেট সিগারেটের বদলে কিনতাম দুটো দুটো করে, সেই আমারই এখন একটা নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট, টেবিলের ওপর টেলিফোন, রান্নাঘরে গ্যাস স্টোভ আর ফ্রিজ, বাথরুমে বাথটাব ! কলকাতায় আমার নিজস্ব কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই ছিল না। ফ্রিজ-টেলিফোন-বাথটাব এসব তো স্বপ্নের জিনিসপত্র। এখানকার ব্যাঙ্কে আমার নামে জমা পড়েছে চারশো ডলার, ঘ্যাঁচ করে যখন ইচ্ছে চেক কেটে ফেলতে পারি। হঠাৎ এতখানি পরিবর্তন ঠিক স্পর্শসহ মনে হয় না, কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন লাগে।

এ পর্যায়ে আমি আমেরিকা-প্রবাস বিষয়ে কিছু লিখবো না। শুধু পটভূমিকা বোঝাবার জন্য এতখানি অবতরণিকা।

মাস দু'একের মধ্যেই টেলিফোন-ফ্রিজ-বাথটাব ইত্যাদি আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না। ও দেশের জীবনযাত্রায় ওসব সাধারণতম সামগ্রী। এমনকি টি ভি, যা কলকাতায় তখন তো ছিলই না, ভারতের কোথাও এসেছে কিনা সন্দেহ, ওদেশে গিয়েই প্রথম দেখি, তারও আকর্ষণ কিছুদিনের মধ্যেই চলে যায়। আমার সর্বক্ষণ কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, অথচ ওদেশে থেকে যাওয়ার পক্ষে যুক্তি অনেক।

আমার মতন ছেলের পক্ষে সেই সময়ে কলকাতায় একটা ভদ্রগোছের চাকরি জোগাড় করা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে, আমেরিকায় আমার অবস্থা বেশ সচ্ছল। বাড়িতে প্রতি মাসে মা-ভাই বোনদের জন্য টাকা পাঠাতেও কোনো অসুবিধে নেই। বিয়ে করিনি, পিছুটানও নেই অন্য কোনো। পল এঙ্গেলের দেওয়া স্কলারশিপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও অন্য কোনো চাকরি পাওয়ার অনেক সুযোগ আছে। ওর মধ্যেই আমাকে একটি লাইব্রেরি অ্যাসিস্টেন্টের চাকরির প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। আমার ভিসা ছিল পাঁচ বছরের, টানা পাঁচ বছর থাকার কোনো অসুবিধেই নেই। তখন অনেক ভারতীয় এইরকম পাঁচ বছরের ভিসা নিয়ে আমেরিকা পৌঁছে কিছু না কিছু চাকরি জুটিয়ে নিত, তারপর ভিসার মেয়াদ শেষ

হলে চলে যেত পাশের ক্যানাডায়, সেখানে ভিসা লাগে না, সেখানে কোনোক্রমে মাস ছয়েক কাটিয়ে আবার আমেরিকায় ঢুকলেই আবার পাঁচ বছরের ভিসা। তার মধ্যেই পাওয়া যায় স্থায়ী পারমিট। কয়েকজন ভারতীয় এই পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিল আমাকে।

যদি তা মেনে নিতাম, তা হলে এতদিনে আমেরিকায় আমার নিজস্ব একটা বাড়ি হতো, গোটা দু'এক অন্তত গাড়ি, মেম বউ, কিংবা একফাঁকে টুক করে দেশে এসে বিয়ে করে নিয়ে যেতাম কনভেন্টে-পড়া কোনো রূপসীকে, আমার ছেলেমেয়েরা বাংলা না শিখে শুধু ইংরিজি বলতো, আমার আবলুস কাঠের মতন গায়ের রংটাও বোধহয় ফর্সা হয়ে যেত ! দু'তিন বছর অন্তর দেশে ফিরতাম একগাদা অল্পদামের ক্যামেরা, ঘড়ি, টেপ রেকর্ডার, পারফিউম, গেঞ্জি-সোয়েটার নিয়ে, উদারভাবে সেগুলো বিলোতাম আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে। আর নাক সিঁটকে বলতাম, কলকাতা শহরটা এত নোংরা কেন, রাস্তাগুলোর কেন এমন বদখত অবস্থা। এদেশের মানুষ কোনো কাজকম্ম করে না, দিল্লি-বম্বে যাওয়ার প্লেনগুলো সময়ের ঠিক রাখে না, ছি ছি ছি !

আমি তো গেছি গরিব দেশ থেকে, পোলান্ড, রুমানিয়া, এমনকি ইংল্যান্ড থেকেও যে-সব কবি-লেখকরা গিয়েছিলেন, তাঁদেরও আমেরিকার এমন সুলভ জিনিসপত্র এবং চাকরি পাওয়ার সুবিধে দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বেশ কয়েকজন এখানে পাকাপাকি থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন, দু'চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ডিগ্রি বাড়াবার চেষ্টায় মাতলেন, একজন বিয়ে করে ফেললেন দুম করে, যাতে আর ফেরার প্রশ্নই না ওঠে। কিন্তু দু'তিন মাসের মধ্যেই আমার মনের মধ্যে যাই যাই রব। কিছুই ভালো লাগে না। যেন আমি বন্দী, যদিও আমেরিকার মতন সর্বত্র ঘোরাফেরার স্বাধীনতা পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। কয়েকজন নবলব্ধ ভারতীয় বন্ধু আমার ছটফটানি দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, কোনো রকমে একটা বছর কাটিয়ে দাও। প্রথম এক বছরই খুব হোম সিকনেস থাকে, তারপর একদম কেটে যায়। আমি তা শুনে শিউরে উঠে ভাবতাম, তবে তো কোনোক্রমেই এক বছর পার হতে দেওয়া চলবে না।

কলকাতায় সব সময় বন্ধু-বান্ধব কিংবা ছুটোছুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, ফাঁকা সময় প্রায় ছিলই না। আয়ওয়াতে গিয়েই পুরোপুরি নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছি অনেক সময়। এমনও দিন গেছে, চব্বিশ ঘণ্টা নিজের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পা দিইনি, নিজের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলিনি। সেই নির্জন ঘরে, আয়নার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আমি নানারকম প্রশ্ন করতাম। এখানে থেকে যাওয়া কিংবা ফিরে যাওয়া, এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলো সাজাতাম বারবার। জাগতিক নিয়মে ওদেশে থেকে যাওয়ার পক্ষেই যুক্তি প্রচুর, তবু একটা প্রশ্ন থাকে, এ জগতের কাছে আমি কী চাই ? নিশ্চয়ই বেঁচে থাকার আনন্দ ! তা হলে কিসে আমার সর্বাধিক আনন্দ ?

এতদিন পর্যন্ত জীবনের কোনো ব্যাপারেই কোনো গুরুত্ব দিইনি। লেখালিখিও চলছিল খেলাচ্ছলে। কিছু কবিতা লেখা ও ছোট কবিতার পত্রিকা চালানো নিয়ে মেতে ছিলাম, কিন্তু তা নিয়েই সারাজীবন কাটবে কি না ভেবে দেখিনি। আয়ওয়াতে ফাঁকা ঘরে দিনের পর দিন নিজেকে প্রশ্ন করে আমার একটা উপলব্ধি হলো। টাকাপয়সা রোজগার, নিশ্চিন্ত জীবিকা, আরামের উপকরণ, ভালো ভালো খাদ্য পানীয়—এই সব কিছুর চেয়েও বেশি আনন্দ পাই যখন মাথায় ঘাম ছুটিয়ে কিছু লেখালিখি করি। তা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, আমার কাছে তার মূল্য অনেক। দু'চার লাইন কবিতা লেখার সময় যে রোমাঞ্চ হয়, নারীসঙ্গের চেয়েও তা কম রোমহর্ষক নয় !

আমার ইংরিজি ভাষায় দক্ষতা নেই, লিখি শুধু বাংলায়। আর বাংলায় লিখে যেতে হলে এই পরবাসভূমি ছেড়ে আমাকে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। জানি, দেশে ফিরলে সহজে জীবিকা জুটবে না। কবিতা লিখলে পেটের খিদে থেমে থাকবে না, তবু একটাই যখন জীবন, তখন ঝুঁকি নিয়েও তো আনন্দের সন্ধানই করা উচিত। লাইব্রেরি অ্যাসিস্টেন্টের চাকরি কিংবা একটা মাস্টারি জুটিয়ে এদেশে বাড়ি-গাড়ি বানালেও তো আমি সে আনন্দ পাবো না। আমাকে ফিরতেই হবে। একজন বড় বিজ্ঞানী কিংবা চিকিৎসক দেশে ফিরে গেলে দেশের অনেক উপকার করতে পারবেন, আমার দ্বারা সেরকম কিছুই হবে না, আমার সঙ্কল্প আমার একান্তই ব্যক্তিগত।

তবু ফেরার ব্যাপারে আমার একটা দ্বিধা এসে গেল অন্য দিক দিয়ে।

আয়ওয়া সিটি একটা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক ছোট শহর। এখানে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার জন্য বিশেষ কোনো উদ্যোগ নিতে হয় না। ইওরোপীয়দের মতন, আমেরিকানরা ফর্মাল নয়, একেবারে কেউ পাশে বসলে নিজে থেকে কথা বলতে শুরু করে। ওদের সামাজিকতার আর একটা সুন্দর দিক আছে। পথে-ঘাটে যে-কোনো লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় না, সেটা অভদ্রতা, বরং হাসি মুখে বলে, হাই! অর্থাৎ এই যে! প্রথম প্রথম হকচকিয়ে গেলেও পরে আমার এটা বেশ ভালোই লাগতো।

কলকাতার আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজ-এর উচ্চবিত্ত সহপাঠী-সহপাঠিনীরা কেউ আমার সঙ্গে যেচে কথা না বললেও, এখানকার রাইটার্স ওয়ার্কশপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজের থেকেই আলাপ করলো, এবং কয়েকজনের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। লন্ডনে যেমন পাব্, আমেরিকার ছোট শহরে তেমনি ট্যাভার্ন, সেখানে বসে প্রতি বিকেলে আড্ডা। কোনো একজনের বাড়িতে দল বেঁধে হানা দেওয়া হয় যখন তখন।

আমার বাড়িতেও একদিন চার-পাঁচজন যুবক-যুবতী আড্ডা দিতে এলো। সবাই লেখক-লেখিকা নয়, তাদের বন্ধু-বান্ধবী, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক-অধ্যাপিকাও দু'একজন। সন্ধের পর তারা চলে যাবার পর দেখি, একখানা বই কেউ ফেলে গেছে। সেখানা লাইব্রেরির বই, সুতরাং কে রেখে গেছে, তা বোঝার উপায় নেই। সেখানা মূল ফরাসীতে মলিয়ের-এর নাট্যসংগ্রহ। উল্টে-পাল্টে দেখি, দাঁত ফোটাতে পারি না।

দু'দিন বাদে সকালবেলা একটি নারীকণ্ঠের টেলিফোন। তার নামটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সে বললো, গত পরশু আমার বন্ধু ডোরি-র সঙ্গে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে কি? আমি কি তোমার বাড়িতে একটা বই ফেলে এসেছি? বইটা আমার বড্ড দরকার, এক্ষুনি তোমার বাড়ি গিয়ে বইটা নিয়ে আসতে পারি?

আমি তিনবার বললাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

ইংরিজি ভাষা ও উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় মেয়েটি আমেরিকান নয়। সেদিনের চার-পাঁচজনের মধ্যে এ মেয়েটি কোন্ জন?

একটু পরেই যে এলো, সে বেশ দীর্ঘাঙ্গিনী তরুণী, মাথাভর্তি অলোকলতার মতন এলোমেলো সোনালি চুল, গায়ে একটা ভোরের সূর্যের মতন লাল রঙের সোয়েটার, সারা মুখে সুস্বাস্থ্যের ঝলমলানি। তার হাতে একগুচ্ছ শিশিরভেজা সাদা লিলি ফুল।

এই মেয়েটি আগের দিন এক কোণে বসেছিল, বেশি কথা বলেনি, তাই এর নাম আমার মনে নেই।

আমি দরজা খোলার পর সে বললো, হাই, সুনীল! আমার নাম মার্গারিট ম্যাতিউ।

সেদিন তোমার ঘরে কোনো ফুল দেখিনি, তাই তোমার জন্য এই লিলির গুচ্ছ এনেছি। না, না, কিনিনি, আর্ট ডিপার্টমেন্টের বাগান থেকে চুরি করে এনেছি। তুমি বুঝি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলে? তোমার ঘরে সুন্দর কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বইটা দাও!

আমি বইটা এনে জিজ্ঞেস করলাম, একটু বসে যাবে না?

মার্গারিট বললো, আমাকে এক্ষুনি ক্লাসে ছুটতে হবে। এমন দারুণ রোদ উঠেছে, এরকম সকালে ক্লাস করার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর একদিন এসে ভারতীয় চা খেয়ে যাবো। মের্সি বকু।

বইটা হাতে নিয়ে সে ঝড়ের মতন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েও আবার উঠে এলো কয়েক ধাপ। সারল্যমাখা মুখখানি উঁচু করে বললো, তুমি আমাকে শকুন্তলার কথা একটু বলবে একদিন?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, শকুন্তলা? কে শকুন্তলা? আমি তো কোনো শকুন্তলাকে চিনি না!

মার্গারিট বললো, গীয়ম অ্যাপোলিনিয়ারের কবিতায় যে শকুন্তলার উল্লেখ আছে?

তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারলাম, এ নিশ্চয়ই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রসঙ্গ। অ্যাপোলিনিয়ারের সে কবিতা তো আমি পড়িনি।

মার্গারিট আবার বললো, তুমি যদি আমাকে একদিন শকুন্তলার উপাখ্যানটা বুঝিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে আমি অনেক ফরাসী কবিতা পড়ে শোনাতে পারি।

৩

শকুন্তলার পতি মহারাজ
রাজ্যজয়ের ক্লান্তি শরীরে
হর্ষ পেলেন পুনরায় দেখে
বিরহিনী বালা আছে পথ চেয়ে
কৃশ ও পাণ্ডু উদ্বেগে, প্রেমে
আদর করছে হরিণ শিশুকে....

—গীয়ম আপোলিনেয়ার

আয়ওয়া সিটি একটি ছোট জায়গা, একান্তই বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ভর, জনসংখ্যা তখন ছিল মাত্র সাতাশ হাজার। নামে শহর হলেও একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা চলে, কাছাকাছি কল-কারখানা কিছু নেই, কিন্তু রেল স্টেশন ও এয়ারপোর্ট আছে এবং অনেক রকমের দোকানপাট, যেখানে বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। একটা বইয়ের দোকান এত বড়, যে-রকম কলকাতা শহরেও একটিও নেই।

নিউ ইয়র্ক কিংবা সানফ্রান্সিসকোর মতন বড় শহরের বুদ্ধিজীবীরা আয়ওয়া-র মতন অঞ্চলের নাম শুনলে অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বলে, মিড ওয়েস্ট ? ও তো চাষাভুষোদের জায়গা, ওখানে আবার কোনোরকম সংস্কৃতি আছে নাকি ? হ্যাঁ, পল এঙ্গেল একটা সাহিত্য-কেন্দ্র খুলেছে বটে, কিন্তু ঐ ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে কে যাবে ?

শেষ দিন পর্যন্ত আমার আসা এমনই অনিশ্চিত ছিল যে আমি আমার বন্ধু অ্যালেন গীন্‌সবার্গকেও কোনো খবর দিতে পারিনি। এখান থেকে তাকে একদিন ফোন করলাম, আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেও সে বিশ্বাসই করতে চায় না, বারবার বলতে লাগলো, এ যে অতি সুখকর চমক ! সুখকর চমক ! কিন্তু সুনীল, তুমি কলকাতার ছেলে, ঐ গণ্ডগ্রামে কি টিকতে পারবে ? শিগগির চলে এসো নিউ ইয়র্কে। আমার অ্যাপার্টমেন্টে তোমার থাকার জায়গা হয়ে যাবে !

আমি তখুনি যাইনি অবশ্য।

কলকাতা থেকে ষোলো হাজার মাইল দূরে চলে এলেও মাঝখানে ইউরোপ-আমেরিকার কোনো বড় শহর দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যেন একটা ঝড় দেড়দিনের মধ্যে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলেছে আমেরিকার শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে। একদিক থেকে হয়তো সেটাই ভালো হয়েছে, অচেনা বড় শহরের হৈ-হল্লার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। সেই তুলনায় আয়ওয়ার মতন শান্ত জায়গায় স্নায়ুগুলি স্নিগ্ধ হবার অবসর পায়।

হলিউডের ছবিতে আমরা তখন আমেরিকার যে-চিত্র দেখেছি, তার সঙ্গে আয়ওয়া-র কোনো মিলই নেই। এখানে কেউ মদ খেয়ে মাতলামি করে না, কথায় কথায় ছুরি-বন্দুক বেরোয় না, একটি নারীকে নিয়ে দু'জন পুরুষের টানা-হ্যাঁচড়া চলে না। যখন তখন স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্সও হয় না, বরং কোনো ডিভোর্সের ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে রীতিমতন গুঞ্জন চলে। এখানকার মানুষ সর্বক্ষণ ছোটে না, র‍্যাট-রেস প্রত্যক্ষ করা যায় না। বরং এখানে জীবন চলে ধীর ছন্দে, রাস্তায় ঘাটে অচেনা লোকও ডেকে আলাপ করে, দোকানদাররা রসিকতা করতে ভালোবাসে।

এই শহরের আশেপাশের চাষারা বেশ বড়লোক। অনেকেরই নিজস্ব প্লেন আছে। স্থানীয় ফুটবল ম্যাচের দিনে স্টেডিয়ামের বাইরে সারি সারি প্লেন দাঁড়িয়ে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কিছুদিন আগে এসেছিলেন আয়ওয়া রাজ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো কর্ণধারের আমেরিকায় আগমন। আয়ওয়া-র এক গমের খেতের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রুশ্চেভ ভুরু তুলে বলেছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার চাষারা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। এক একর জমিতে এত ফসল সমাজতান্ত্রিক কোনো দেশেই ফলে না !

আমাদের মতন গরিব দেশের মানুষদের আমেরিকার ফসল উৎপাদনের কারবার শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। এক এক বছর গমের উৎপাদন এত বেশি হতো যে কয়েকটি জাহাজে গমের বস্তা ভরে তা ডুবিয়ে দেওয়া হতো সমুদ্রে, না হলে গমের দাম খুব কমে যাবে, চাষীরা মার খাবে। পরে অবশ্য আমেরিকা তার কৃষিনীতি বদল করে। চাষের আগেই হিসেব করা হয়, নিজের দেশে সারা বছর কতখানি গম প্রয়োজন, তা ছাড়া পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে দান-খয়রাতি করা হবে কতটা এবং আর কোন্ কোন্ দেশ কী পরিমাণ কিনতে পারবে। সেই অনুযায়ী চাষ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতি বছরই আমেরিকা থেকে গম কেনে। চাষের আগেই তাদের অর্ডার দিয়ে রাখতে হয়। অধিক ফসল যাতে না ফলে যায়, সেইজন্য সরকার কোনো কোনো চাষীকে নির্দেশ দেয়, এ বছর তুমি আর চাষ করো না, জমি এমনি ফেলে রাখো। চাষের বাবদ তোমার যা লাভ হতো, সেই টাকাটা সরকার থেকেই দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ফসল না ফলিয়েও, বাড়িতে আরাম চেয়ারে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থেকে উপার্জন।

আমেরিকায় এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষজ্ঞ, আর বেশির ভাগ মানুষই নানা বিষয়ে অজ্ঞ। আমাদের দেশের অশিক্ষিত গরিব চাষী হয়তো বাইরের পৃথিবীর বিশেষ খবর রাখে না, কিন্তু আমেরিকার মোটামুটি শিক্ষিত, প্লেন চালাতে জানা ধনী চাষীরাও যে নিজের দেশের বাইরে যে পৃথিবী, সে-সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না, তা দেখে বেশ অবাক লাগে। আমাকে একজন চাষা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি ভারতীয় না পাকিস্তানী ? আমি যখন বললাম, আমি ভারতীয়, তখন সে জানতে চাইলো পাকিস্তানটা ভারতের কোন্ দিকে ? আমি যখন জানালাম যে পাকিস্তান ভারতের দু'দিকে, পশ্চিমে আছে, পুবেও আছে, তা শুনে সে হো-হো করে হাসতে লাগলো। তার ধারণা, এটা আমার রসিকতা !

এই সরল, ভালোমানুষ চাষারা বিদেশীদের সম্পর্কে বেশ কৌতূহলী। বর্ণ বিদ্বেষের ব্যাপারটা এ অঞ্চলে একেবারেই নেই বলা যায়। চাষীরা আমাদের মতন বহিরাগত লেখক-শিল্পীদের প্রায়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে চায়। বেশ মজার অভিজ্ঞতা হয় আমাদের। গোবরের গন্ধ নেই, এ আবার কী রকম চাষীর বাড়ি ? না, গরু-মোষের সঙ্গে চাষের সম্পর্ক এসব দেশ থেকে বহুদিন উঠে গেছে। কোনো কোনো বাড়ির ছেলেমেয়েরা

একটাও জ্যান্ত গরু দেখেনি কখনো, কারণ কোনো গরুই মাঠে চরে না। বাড়িগুলি দেখে মনে হয় ছবির বই দেখে বানানো। এরা খাওয়ায়-দাওয়ায় ভালো, আর নানা রকম উদ্ভট প্রশ্ন করে। একজন জানতে চেয়েছিল তাজমহল নামে বস্তুটা জাপানে, না ইজিপ্টে ? কেউ কেউ কাঁচুমাচু মুখে বলে, আমি তোমাদের দেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না, তোমাদের ভাষাও জানি না, কিন্তু তোমরা আমাদের ভাষা জানলে কী করে ?

নতুন পরিবেশের সঙ্গে আস্তে আস্তে নিজেকে মানিয়ে নিলেও মনের মধ্যে সব সময় এই প্রশ্নটা ঘোরে, আমি এখানে থাকবো কেন ? যখন তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলকাতা, তার জন্য যে মন কেমন করে তা নয়, বরং কিছুটা অপরাধ-বোধ আমাকে কুরে কুরে খায়। কলকাতায় আমার আত্মীয়-স্বজন, অনেক বন্ধুবান্ধবের তুলনায় আমি যে এখানে আরামের জীবনযাপন করছি, সেটা কি স্বার্থপরতা নয় ? যারা এদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসে, কিংবা বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ চায় কিংবা বিশাল কোনো চাকরির উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাদের তবু থেকে যাওয়ার যুক্তি আছে, আমি বাংলা ভাষায় লেখালেখি করতে চাই, আমি কেন পড়ে থাকবো এমন একটা জায়গায়, যেখানে সারাদিনে একটিও বাংলা কথা শোনা যায় না ?

এখানে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের সংখ্যা তখন পঞ্চাশ-ষাট জন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দু' তিনজনের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁরা সকলেই বিজ্ঞানের ছাত্র, সাহিত্যের সঙ্গে অনেকেরই কোনো সম্পর্ক নেই। দু' একটি শনিবারের সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে দেখেছি, শুধু রান্না-বান্নার রেসিপি-বিনিময়েই অর্ধেক সময় কেটে যায়, এ ছাড়া কে কোন্ গাড়ি কিনেছেন বা কিনবেন, সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আমি কোনো আলোচনাতেই অংশগ্রহণ করতে পারি না।

বাঙালী মেয়ে দেখেছি মাত্র একজনকেই, তার নাম ভারতী মুখার্জি, সে ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী। ভারতী অবশ্য বাংলা-না-জানা বাঙালী। কিছুদিনের মধ্যেই ক্লার্ক ব্রেইজ নামে এক তরুণ কেনেডিয়ান লেখকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, পরবর্তী কালে ভারতী উত্তর আমেরিকায় লেখিকা হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে, তার 'টাইগার্স ডটার' নামে উপন্যাসটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ভারতী আর ক্লার্ক দু'জনে মিলেও একটি বই লিখেছিল, 'ডেইজ অ্যান্ড নাইটস্ ইন ক্যালকাটা', সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' অনুকরণে এই নামকরণ।

ক্লার্ক আর ভারতীর সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে আড্ডা দিলেও অন্য বাঙালীদের এড়িয়ে চলতাম, কারণ দেখা হলেই তাঁরা আমাকে উপদেশ দিতেন, তুমি শুধু শুধু সময় ও সুযোগ নষ্ট করছো কেন ? তোমার তো পয়সা লাগবে না, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু' একটা কোর্স করে নাও, ইংরিজি সাহিত্য, জার্নালিজম, ফটোগ্রাফি, মার্কেটিং, লাইব্রেরিয়ানশীপ, ম্যানেজমেন্ট যা খুশি। যে-কোনো একটা কোর্স করলেই চাকরি-বাকরির অনেক সুবিধে ! তাঁরা সহৃদয়, আমার উন্নতির জন্য তাঁরা বিনা স্বার্থে মাথা ঘামাতেন, কিন্তু ওসব কথা শুনলেই আমার পালাতে ইচ্ছে করতো। ফর্মাল লেখাপড়া সম্পর্কে তখন আমার গভীর উপেক্ষা জন্মে গেছে, আমি আর ছাত্র সাজতে রাজি নই। দেশে থাকতে আমি অনর্থক একটা এম এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, যদিও জানতাম, ঐ ডিগ্রি আমার কোনোদিনই কাজে লাগবে না, কারণ মাস্টারি কিংবা অধ্যাপনা করা আমার ধাতুতে নেই। আমার মা বলেছিলেন, তোর মামারা সবাই এম এ পাশ, আর আমার ছেলেরা কেউ এম এ হবে না ? কয়েক বছর পরে অবশ্য আমার অন্য ভাইবোনেরাও মাকে খুশি করেছে।

আমাদের রাইটার্স ওয়ার্কশপটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে হাজিরা দেবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নদীর ধারে ঘাসের ওপর বিভিন্ন দেশের লেখক-লেখিকারা যদি একসঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দেয়, সেটাও রাইটার্স ওয়ার্কশপ। পল এঙ্গেলের বাড়ি সন্ধেবেলা নেমন্তন্ন খেতে খেতে কেউ চেঁচিয়ে নিজের কবিতা পড়ে শোনালো, কেউ কেউ তর্ক বাধালো, সেই-ই তো যথেষ্ট। পল এঙ্গেল আমায় বলেছিলেন একজন লেখকের শ্রেষ্ঠ ওয়ার্কশপ অবশ্য তার নিজস্ব টেবিল। কোনো লেখা মাথায় আসুক বা না আসুক, সেই টেবিলে প্রত্যেকদিন কয়েক ঘন্টা বসা উচিত।

অন্য লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যাওয়া কিংবা সারাদিন সম্পূর্ণ একা কাটাবার স্বাধীনতা আমার ছিল। এক একদিন আয়ওয়া নদীর ধার দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াই। এই শহরটি সুন্দর, পাশে পাশে ছোট ছোট টিলা, প্রচুর সবুজের সমারোহ, একমাত্র অসুন্দর এই নদীটি। বাগবাজারের খাল কিংবা টালির নালার চেয়ে একটু বেশি চওড়া, জলের রঙ নোংরা-কালো। দূরের কোনো কোনো কারখানার পরিত্যক্ত গাদ বোধহয় এই নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাই এ নদীতে কেউ স্নান করতে নামে না, এখানে কেউ মাছ ধরে না। তবু এই নদীটিকে সুন্দর করার কত রকম চেষ্টা। এই তো একরত্তি শহর, তা হলেও এখানে এই নদীর ওপর অন্তত গোটা ছয়েক সেতু, প্রত্যেকটির ডিজাইন আলাদা। দুই তীরে নানা রকম ফুলের কেয়ারি।

একদিন নদীপ্রান্ত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্য পারে দেখলাম সেই ফরাসী মেয়েটিকে। একগাদা বইপত্র হাতে নিয়ে সে প্রায় দৌড়োচ্ছে। তার দৃষ্টি আর্কষণ করার আগেই সে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি আর আমার বাড়িতে এলো না তো ? আপোলিনেয়ারের কবিতায় শকুন্তলার উল্লেখ আছে, সে আমার কাছে শকুন্তলার কাহিনী শুনতে চেয়েছিল।

ওর ঠিকানা বা ফোন নাম্বার আমি রাখিনি, কিন্তু ও ফরাসী বিভাগে পড়ায়, সেখানে গেলেই ওর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিজে থেকে গিয়ে তাকে ডাকতে খুব সঙ্কোচ হয়। ডোরি ক্যাট্জ নামে আর একটি মেয়ের ও বান্ধবী, ডোরির সঙ্গেই প্রথম দিন আমার বাড়িতে এসেছিল। সেই ডোরির সঙ্গে এর মধ্যে অনেকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু তার কাছেও লজ্জায় মুখ ফুটে মাগারিটের কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

মেয়েটি নিশ্চয়ই সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে আসে। এরপর তিন চারদিন আমি লাইব্রেরিতে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে লাগলাম।

এই বিশ্ববিদ্যালয় শহরের লাইব্রেরির ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ না-হয়ে উপায় নেই। দরজা খোলে সকাল সাতটায়, বন্ধ হয় রাত দুটোয়। চাঁদা লাগে না, এখান থেকে একসঙ্গে যত খুশি বই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়। যাদের গাড়ি আছে, তারা এক একবারে পঞ্চাশ-ষাটখানা বইও নিয়ে গিয়ে বাড়িতে সাজিয়ে রাখে। সেই বই অন্য কারুর প্রয়োজন হলে লাইব্রেরি কর্মী বাড়িতে টেলিফোন করে অনুরোধ জানাবে ফেরত দিয়ে যাবার জন্য। অনেক ভাষার বই আছে এখানে, বহু দেশের সংবাদপত্র। আমাদের টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, দা স্টেট্সম্যান, এমনকি আনন্দবাজার পত্রিকার ফাইলও দেখেছি।

রাত একটায় কোনোদিন হয়তো একজন মাত্র বসে পড়াশুনো করছে, তার জন্য জেগে আছে তিন-চারজন লাইব্রেরি কর্মী !

কয়েকদিন এই লাইব্রেরিতে বসে কিছু কিছু পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে কয়েকটি বিচিত্র তথ্যের সন্ধান পাই। এই ছোট্ট শহরে রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন একবার। কবিতা পাঠ করতে এসেছিলেন ডিলান টমাস, তিনি অবশ্য এমন একটা কীর্তি রেখে গেছেন, যা

আর কেউ ভাঙতে পারবে না। ট্রেন থেকে নামার সময় ডিলান টমাস আছাড় খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান, তখন তিনি বদ্ধ মাতাল। তিনদিন পরে সেই রকম মাতাল অবস্থাতেই তাঁকে আবার ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের কবিতা পাঠ শোনার সৌভাগ্য এখানে কারুর ঘটেনি।

আমরা যে রাইটার্স ওয়ার্কশপের সদস্য, এ বছর থেকেই সেখানে বিদেশী লেখক-লেখিকাদের আমন্ত্রণ জানানো শুরু হয়েছে। এর আগে এই ওয়ার্কশপ-এ যোগ দিতেন শুধু আমেরিকান কবি-সাহিত্যিকরা। একেবারে গোড়ার দিকে এখানে এসেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার টেনেসি উইলিয়াম্‌স, একথা জেনে রোমাঞ্চ হয়। এর মধ্যে তিনি আর আসবেন না ?

একদিন সন্ধেবেলা লাইব্রেরি থেকে বেরুচ্ছি, দেখি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে মাথাভর্তি উস্কোখুস্কো সোনালি চুলওয়ালা সেই মেয়েটি। আমি বললাম, হাই ! সে-ও হাই বলে আমাকে পাশ কাটিয়ে উঠে যাচ্ছিল, আমি আবার বললাম, তুমি আমার কাছে শকুন্তলার গল্প শুনতে এলে না ?

এবার সে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরালো। তারপর হাসি ছড়িয়ে বললো, তুমি তো আমাকে ডাকোনি ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু সেদিন যে তুমি বললে তুমি ভারতীয় চা খেতে আর গল্প শুনতে আসবে ?

মার্গারিট বললো, হ্যাঁ, কিন্তু তারপর তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করবে না ? আমি নিজে থেকে তোমার বাড়িতে দু'বার গেছি, তারপরেও কি আবার সেধে সেধে যাবো ? একে আমার আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল ! তা তো ঠিকই। সে কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি। বাঙাল আর কাকে বলে !

আমি মিনমিন করে বললাম, তোমার ঠিকানা জানি না।

সে বললো, এই লাইব্রেরিই তো আমার ঠিকানা। ফ্রেঞ্চ ডিপার্টমেন্ট আমার ঠিকানা।

আমি বললাম, সত্যি ভুল হয়ে গেছে। আমি কি এখন তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি ? আজ সন্ধেবেলা যদি তোমার সময় থাকে।

মার্গারিট এবার খিলখিল করে হেসে বললো, তুমি এদেশের নিয়মকানুন কিছু শেখোনি ? এখানে কোনো মেয়ের সঙ্গে একটা সন্ধে কাটাতে চাইলে অন্তত চারদিন আগে আমন্ত্রণ জানাতে হয়। নইলে মেয়েটি অপমান বোধ করে।

এ প্রথার কথা এখানে এসে শুনেছি বটে, কিন্তু সব সময় কি মনে থাকে ? আমাদের কলকাতার আড্ডা ছিল একেবারে নারী-বর্জিত। সে সময়ে কুমারী মেয়েদের সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকা দারুণ অপরাধ বলে গণ্য হতো। প্রেম-ট্রেম হতো গোপনে। প্রেম নয়, শুধু একসঙ্গে একটি সন্ধে কাটাবার জন্য কোনো বাঙালী মেয়েকে প্রস্তাব জানানো ছিল অকল্পনীয়।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আজ তো মঙ্গলবার, তুমি এই শুক্রবার আসতে পারবে ?

মার্গারিট সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, এখানকার অন্য মেয়েদের বেলায় এ ভুল আর করো না। কিন্তু আমি এদেশের মেয়ে নই। কোনোদিন আমেরিকান হতেও চাই না। আজ সন্ধেবেলা লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করার চেয়ে তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে বেশি ইচ্ছে করছে।

বেশ শীত পড়েছে, এবার যে-কোনোদিন তুষারপাত শুরু হবে, আমার দিশি সোয়েটারে

ঠিক ঠাণ্ডা আটকানো যাচ্ছে না। মার্গারিট গায়ে দিয়ে আছে একটা পর্কা, মাথাটা আধা-ঘোমটার মতন ঢাকা। নদীর ধার দিয়ে, একটা সেতু পেরিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম বাড়ির দিকে। মার্গারিট বেশ জোরে জোরে আপোলিনেয়ারের কবিতাটা আবৃত্তি করতে লাগলো। আমি বললাম, মূল ফরাসী তো আমি বুঝবো না। ইংরিজি অনুবাদ করে শোনাও !

মার্গারিট প্রায় ধমকের সুরে বললো, গীয়ম আপোলিনেয়ারের "লা সাঁজো দু মল এইমে" একটা বিশ্ববিখ্যাত কবিতা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কয়েকটি কবিতার মধ্যে একটা, সেই কবিতার রস কি ইংরাজির মতন একটা কেজো ভাষায় পাওয়া যায় ? শব্দের বঙ্কারই তো আসল ! আমি তোমাকে একটু একটু ইংরিজি বুঝিয়ে দিচ্ছি ...

কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। এর মধ্যে বহু রকম রেফারেন্স রয়েছে। শকুন্তলার উল্লেখ আছে একটি স্তবকে মাত্র একবার। আর ফরাসী ভাষায় শকুন্তলাকে বলে 'সাকোনতাল'। আসলে স্তবকটিতে দুষ্মন্তের কথাই বলা হয়েছে, কারণ পুরো কবিতাটাই এক ভগ্নহৃদয় পুরুষের উক্তি, কিন্তু দুষ্মন্তের মতন খটোমটো শব্দ এড়িয়ে গিয়ে কবি তাকে বলেছেন শকুন্তলার স্বামী।

"লোপো রইয়্যাল দ্য সাকোনতাল
লা দ্য ভ্যাঁক্‌র স্য রেজুই
কাঁ ইল লা র‍্যাত্রুভা প্লু পাল ...

শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম, অধিকাংশ ফরাসী পাঠক কি এই 'সাকোনতাল'-এর অর্থ বুঝবে ? মার্গারিট ফরাসী সাহিত্য নিয়ে পি-এইচ ডি করছে, সে শুধু জানে এটা একটা ভারতীয় নাম, অন্তর্নিহিত বিরহ-উপখ্যানটি তারও অজানা। কবিতার সব পাঠক তো পি এইচ ডি করে না। এক সময় জার্মানির কবি-সম্রাট গ্যেটে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, সেই সুবাদে ইওরোপীয় কবিরা আশ্রম-দুহিতা শকুন্তলার কথা জেনে থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকদের অবহিত হবার কথা নয়। তবু আপোলিনেয়ার কেন এই স্তবকটি লিখেছিলেন তা বোঝা যায়। কবিরা মাঝে মাঝে পাঠকদের সঙ্গে একটা দুর্বোধ্যতার আড়াল সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন। কিন্তু সেই আড়ালটিও শিল্প হয়ে ওঠা চাই, নিরেট দেয়াল হলে সবটাই ব্যর্থ, বরং একটা রহস্যময় যবনিকা, পাঠক অনুমান করতে পারে ওপারে কিছু আছে, কিন্তু ছুঁতে পারে না। কবিরা এমনও আশা করে, ভবিষ্যতের কোনো পাঠক বা পাঠিকা ঠিক বুঝে নেবে।

সেই কবে মারা গেছেন অ্যাপোলিনেয়ার। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর মাথায় একটা গোলার টুকরো লেগেছিল। মস্ত বড় একটা ব্যান্ডেজ মাথায় বেঁধে তিনি দাপিয়ে বেড়াতেন প্যারিসের পথ। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই তিনি চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ বছর পরে বহু দূরের এক জায়গায় তাঁর ঐ কবিতা এক যুবতী পাঠ করে শোনাচ্ছে শকুন্তলার দেশের একজন মানুষকে।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেই মার্গারিট বললো, এবার শকুন্তলার কাহিনী শোনাও !

আমি বললাম, আগে চা-টা বানাই। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে !

মার্গারিট বললো, না, না, ওসব কিছু চাই না। আমি শকুন্তলার জীবনের কথা জানতে চাই !

আমি কালিদাসের নাটকের আখ্যান শুরু করলাম বটে, কিন্তু একটানা বলে যাওয়া খুব মুশকিল হয়ে পড়লো। মার্গারিট যেমন ছটফটে, তেমন কোমল। আমি যখন বললাম যে,

শকুন্তলার মা মেনকা ঐ মেয়ের জন্ম দেবার পরই তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল, একটি পাখি অর্থাৎ শকুন্ত ডানা মেলে ওর মুখের ওপর পড়া রোদ আড়াল করে, তখন মাগারিট সজল চোখে জিজ্ঞেস করে, কেন, কেন, ঐটুকু বাচ্চাকে ফেলে রেখে গেল কেন ? কোনো মা কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে ? আশ্রম ছেড়ে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যে সে ফোঁপাতে থাকে। রাজসভায় দুষ্মন্ত যখন কটু ভাষায় শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন মাগারিট চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলে, থামো, থামো, মেয়েটি এবার আত্মঘাতিনী হবে নাকি ? ওঃ, না, না !

সমস্ত কাহিনীটি শোনার পর মাগারিট কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। মাগারিট চোখের জল মুছে আমার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে বললো, এর আগে আমি কোনো ভারতীয় লেখককে দেখিনি। ভারত শব্দটা শুনলেই আমি যেন দু' তিন হাজার বছর আগেকার অতীত ইতিহাস দেখতে পাই। এখানকার দু'তিনটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ কবি নয়, সাহিত্যের ধার ধারে না। যারা কবিতা ভালোবাসে না, তাদের সঙ্গে আমার একটুও মিশতে ইচ্ছে করে না।

একটু থেমে ফিক করে লাজুক ভাবে হেসে বললো, তোমাকে এবার একটা সত্যি কথা জানাবো ? প্রথম দিন তোমার এখানে আমার বইটা আমি ইচ্ছে করে ফেলে গিয়েছিলাম, যাতে ঐ ছুতোয় তোমার এখানে আবার আসতে পারি !

আমি বললাম, তা হলে আমিও একটা সত্যি কথা বলি ? তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছো, আজ লাইব্রেরির সিঁড়িতে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছে ! আসলে, গত চার-পাঁচদিন ধরে আমি লাইব্রেরির সামনে ঘোরাঘুরি করছি, যদি তোমার দেখা পেয়ে যাই এই জন্য।

এরপর দু'জনেই হাসতে লাগলাম একসঙ্গে।

৪

> আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি এক আগন্তুক
> শুধুই তোমার সঙ্গে কথা বলি অজানা ভাষায়
> কেননা তুমিই বুঝি হতে পারো একমাত্র আমার স্বদেশ
> আমার বসন্ত, টুকরো খড়কুটোর বাসা, বৃষ্টিপাত বৃক্ষশাখে
>
> —ফিলিপ জাকোরে

ফরাসী দেশের পোয়াতিয়ে অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম লুদাঁ। সেই গ্রামের মেয়ে মাগারিট ম্যাতিউ। আমিও পূর্ব বাংলার ফরিদপুরের মাইজপাড়া গ্রামের ছেলে। আমাদের দেখা হয়ে গেল সুদূর মধ্য আমেরিকার এক ক্ষুদ্র শহরে। এ এক বিচিত্র যোগাযোগ।

লুদাঁ গ্রামের ইস্কুলে লেখাপড়া শেষ করে মাগারিট তার বান্ধবী এলেন-এর সঙ্গে চলে এলো প্যারিসে। এলেন-এর নামের বানান অবশ্য হেলেন। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ফরাসীরা কিছুতেই 'এইচ' অক্ষরটা উচ্চারণ করতে চায় না। অথচ 'আর' অক্ষরটা উচ্চারণ করার সময় তার মধ্যে খানিকটা 'হ' মিশিয়ে দেয়।

দুই বান্ধবী প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করছিল, এর মধ্যে এলেন এক গ্রীক যুবকের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেললো। আর মাগারিট পোস্ট ডক্টরেট করতে চলে এলো আমেরিকায়। ফরাসী সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য খোদ ফরাসী দেশ ছেড়ে আমেরিকায় আসাটা অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আমেরিকাতেই পড়াশুনো চালিয়ে যেতে যেতে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। নানারকম অ্যাসিস্টেন্টশিপ পাওয়া যায়। মাগারিট এখানে রিসার্চ স্কলার আর আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপিকা। আমেরিকার সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ফরাসী ও স্প্যানিশ ভাষার আলাদা বিভাগ আছে। আয়ওয়ার ফরাসী বিভাগের যিনি প্রধান, সেই মসিউ অ্যাসপেল একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, তিনিও ফরাসী দেশ ছেড়ে এখানে চাকরি নিয়ে এসেছেন, তার কারণ এখানে মাইনে অনেক বেশি।

আমি ফরাসী ভাষা জানি না, ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানও যৎসামান্য, আর মাগারিট বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথের নামটা শুধু জানে, তাঁর কোনো লেখাই পড়েনি। তবু আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

আরও অনেক ব্যাপারে আমাদের প্রচণ্ড অমিল। মাগারিট গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান, তার অন্য দু বোন মঠের সন্ন্যাসিনী হয়েছে। এমন পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে সে যে লেখাপড়ার চর্চা করছে, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার। অবশ্য তার মা-বাবা ও ধর্মের প্রতি টান রয়ে গেছে যথেষ্ট, সে প্রতি রবিবার গীর্জায় যায়, মন বেশি উতলা হলে অন্য দিনেও যায়

এবং মুসলমানদের রোজা রাখার মতন, সেও 'লেন্ত'-এর সময় সারাদিন উপোস করে থাকে। আর আমি পৈতে ছাড়া, গরু-খাওয়া বামুন, ভগবান নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি, যে কোনো ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বিধিনিষেধ আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। আমার ধর্ম আমার যুক্তি। মানুষের ধর্ম মানবতাবাদ। নিতান্ত আত্মরক্ষার কারণে ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে আঘাত করা উচিত নয়, এটাই আমার একমাত্র পালনীয় নীতি। আমি এখন অনেক সহনশীল হয়েছি, অন্যের ব্যাপারে বিশেষ মন্তব্য করি না, কিন্তু সেই বয়েসে, উগ্র নাস্তিকতায় যে-কোনো কারুর ধর্মীয় বাড়াবাড়ি দেখলে উপহাস করতে ছাড়তাম না। মাগারিটকেও বিদ্রূপ করেছি অনেকবার। মাগারিট শান্তভাবে বলতো, তুমি যত চাও নাস্তিক হতে পারো, আমার একার বিশ্বাসই দুজনের সমান। চার্চে গিয়ে আমি তোমার নামেও প্রার্থনা করবো।

ওইটুকু শহর আয়ওয়া, সেখানেও নানান ডিনোমিনেশানের বেশ কয়েকটি চার্চ। প্রতি রবিবার সকালে প্রত্যেকটিতে বেশ ভিড় হয়। তখন বলা হতো যে, আমেরিকানরা নিয়মিত গীর্জায় যায় কিন্তু আসলে ধর্মপরায়ণ নয়। আর ইংরেজরা গীর্জায় যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ধর্ম মানে। আমার বাড়ির কাছেই ছিল একটা গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ, তার সুমধুর ঘন্টাধ্বনি আমি ঘরে বসে বসে উপভোগ করি, আর মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা সেই গীর্জার উদ্যান থেকে ফুল চুরি করে আনি। ফুল চুরির ব্যাপারে মাগারিটেরও কোনো গ্লানি বোধ ছিল না! কিছুদিন পরে অবশ্য ফুল বিষয়ে আমার মত বদলে যায়। শুধু গীর্জার বাগান থেকেই নয়, যে কোনো গাছ থেকেই ফুল ছিঁড়তে আমার খারাপ লাগে। মনে হয়, ঘরের মধ্যে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার বদলে গাছের ফুল গাছেই মানায়। এ বিষয়ে বার্নার্ড শ'-এর একটি উক্তি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। শ' বলেছিলেন, আমি ছোট ছেলেমেয়েদেরও খুব ভালবাসি, তা বলে তাদের মুণ্ডু কেটে ঘরে সাজিয়ে রাখি না! চৌষট্টি সাল থেকে আর কখনো ফুল ছিঁড়িনি। এখন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির মৃতদেহে ফুলের মালার স্তূপ দেখলে বিরক্তিতে আমার গা জ্বলে যায়!

মাগারিট বার্নার্ড শ'কে মোটেই বড় লেখক মনে করতো না। সেই জন্য সে ওই উক্তিটা গ্রাহ্য করেনি, সে তবু ফুল নিয়ে আসতো মাঝে মাঝে। মাগারিট সব বিষয়েই উগ্র ফরাসী, ব্রিটিশদের কোনো কিছুই ভালো দেখতো না সে। ইংরেজরা আবার ছবি আঁকতে জানে নাকি? কনস্টেবল আর টার্নার ছাড়া ওদের আর গর্ব করার মতন কোনো পেইন্টার আছে? ওরা বেনের জাত, গান-বাজনা কিচ্ছু জানে না। একটাও বড় কোনো কমপোজার আছে ওদের দেশে? আর সাহিত্য? বিশ্বের বাজারে ওরা অনেক বই বিক্রি করে বটে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের রথী-মহারথীদের তুলনায় ওদের কে আছে? এক ওই শেক্সপীয়ারকে নিয়ে চারশো বছর ধরে মাতামাতি করছে! আমাদের রাসিনও কম বড় নাট্যকার নন, তুমি যদি পড়ো তাহলে বুঝবে। কবিতা নিয়ে কত আন্দোলন হয়েছে ফরাসী দেশে, সে তুলনায় ইংরেজরা কী করেছে?

ইংরেজ ফরাসীদের লড়াই বেশ কয়েক শতাব্দীর ঘটনা। মাগারিটের সঙ্গে আমার তর্ক করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আমি ইংরেজদের ধামাধরা নই। ইংরেজদের নিন্দে করার সময় মাগারিটের চোখমুখ জ্বলজ্বল করে, কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়, ছটফট করে, তা দেখে আমি হাসি খুব।

একদিন মাগারিট জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার আগে আর কোনো ফরাসী মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছো?

আমি ওকে কলকাতার আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর তরুণী শিক্ষয়িত্রীদের গল্প বলি। তা ছাড়া

কলকাতা তখনও একটা আন্তর্জাতিক শহর, বহু বিদেশীরা আসতো, কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস (দেওয়ালে কী সুন্দর ফ্রেস্কো ছিল তখন!) একবার তিনটি ফরাসী মেয়ে আমাদের টেবিলে বসে গল্প করে গিয়েছিল সারা সন্ধে। অনেক ছেলেবেলায় আমি একবার চন্দননগরে গিয়েছিলাম, তখনও ওই শহরটা ছিল ফরাসী-কলোনি, খাঁটি ফরাসীদের বেশ কয়েকটি দোকান ছিল, এক দিদিমার বয়েসী ফরাসী মহিলা দোকানদারনী আমার গাল টিপে দিয়েছিলেন।

চন্দননগরের নাম শুনে মাগারিট উত্তেজিত হয়ে বললো, উই, উই, স্যান্দারনাগার, স্যান্দারনাগার! সেটা বুঝি কলকাতার কাছেই? ইস, সুনীল, দুশো বছর আগে ফরাসীরা যদি বুদ্ধি করে ইণ্ডিয়াটা জিতে নিত ইংরেজদের কাছ থেকে, তা হলে তোমরা ওই বিচ্ছিরি ইংরিজি কালচারের বদলে কত উন্নত একটা কালচারের ঘনিষ্ঠ হতে!

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, অ্যাই! তোমারও বুঝি কলোনিয়াল মেন্টালিটি আছে? তুমি আমার কাছে মেমসাহেব হতে চাও!

মাগারিট একটু লজ্জা পেয়ে বললো, তা নয়, তা নয়, আমি যেকোনো জাতির ওপরেই অন্য জাতের আধিপত্য ঘেন্না করি। কিন্তু সেই সময়, দুশো বছর আগে, ইওরোপীয় লুঠেরাদের সঙ্গে লড়াই করার মতন ক্ষমতা তো ভারতবর্ষের ছিল না। কেউ না কেউ ওই দেশটা জয় করে নিতই। সেইজন্যই বলছি, ইংরেজদের বদলে ফরাসীরাও তো নিতে পারতো! চন্দননগরে আমাদের সেনাপতি দুপ্লে, তিনি বড় বীর ছিলেন, ইচ্ছে করলে ক্লাইভকে ছাতু করে দিতে পারতেন, কিন্তু তখন প্যারিসে নানারকম বিশৃঙ্খলা চলছে, মেইন ল্যাণ্ড থেকে দুপ্লেকে কোনো সাহায্যই পাঠানো হলো না! কী দুর্ভাগ্য!

আমি বললাম, নেপোলিয়ানেরও তো ভারত জয় করার খুব ইচ্ছে ছিল!

মাগারিট বললো, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! জানো, বাচ্চা বয়েসে বোনাপার্ট যখন ক্যাডেট কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল, ভারত নিয়ে পড়াশুনো করেছিলেন, তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কতরকম জাতপাতের ভেদ, তাও তিনি জানতেন।

আমি বললাম, নেপোলিয়ান যখন ইজিপ্ট অভিযানে গিয়েছিলেন, তখন তো উনি কোরানও পাঠ করেছিলেন জাহাজে বসে। সেখানকার মুসলমানদের মন জয় করবার জন্য তিনি যখন তখন কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিতেন নিজের সুবিধেমতন। ইজিপ্টে গিয়ে উনি একটা নতুন নামও নিয়েছিলেন না? সুলতান এল কেবির!

মাগারিট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এটাও জানো? কী করে জানলে?

আমি বললাম, এমিল্ লুডউইগের লেখা নেপোলিয়ানের জীবনী পড়লেই জানা যায়। সে বই কে না পড়েছে!

মাগারিট বললো, ফরাসী বিপ্লবের সময় তো চার্চের অধিকার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, বড় বড় নেতারা সবাই নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন, তোমার মতন! ফরাসী দেশে তখন কোনো ধর্ম ছিল না। নেপোলিয়ান ইজিপ্টে গিয়ে সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন, খ্রীস্টান-বিদ্বেষী মুসলমানদের কাছে গিয়ে বললেন, দ্যাখো, ইসলামের সঙ্গে আমাদের বিশেষ তফাত নেই! বাইবেলের মতন কোরানের বাণীও আমরা মেনে নিতে পারি। তবে উনি ইজিপ্টে যাবার সময়ই ঠিক করে নিয়েছিলেন, ওই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যের দিকে এগোবেন। আসলে নেপোলিয়ান তো ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ কর্সিকার লোক, সুতরাং তাঁকে হাফ ওরিয়েন্টাল বলতে পারো। ভারত ছিল ওঁর অবসেশান। উনি ঠিক করেছিলেন, ইজিপ্টে পনেরো হাজার সৈন্য রেখে, আর তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আলেকজান্দারের

মতন, পারস্যের ভেতর দিয়ে ভারতে পৌঁছোবেন। এই জন্য বুদ্ধি করে তিনি পারস্যের শাহের সঙ্গে যুদ্ধ না করে, তাঁর দেশের ওপর দিয়ে শুধু গমনাগমনের অধিকার চেয়েছিলেন। সকলেরই প্রধান শত্রু ইংরেজ, সুতরাং নেপোলিয়ান চেয়েছিলেন একটা ইংরেজ-বিরোধী সম্মিলিত শক্তি গড়ে তুলতে।

আমি বললাম, নেপোলিয়ান আমাদের টিপু সুলতানকেও চিঠি লিখেছিলেন জানি।

মার্গারিট হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, টিপু, টিপু সাহিব!

বেশ কিছুক্ষণ ধরে উচ্ছ্বসিতভাবে নেপোলিয়ান সম্পর্কে কথা বলে যাচ্ছিল মার্গারিট, আমি তাকে এক সময় খানিকটা রূঢ়ভাবেই থামিয়ে দিই। অনেক রম্য-ইতিহাসে, ফিল্মে নেপোলিয়ানকে একটি রোমান্টিক চরিত্র বানানো হয়েছে, 'মেরি ওয়ালেউস্কা' নামে একটা হলিউডের ছবিতে চার্লস বয়ার অপূর্ব অভিনয় করে নেপোলিয়ানকে এক ট্র্যাজিক স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তবু আমি কোনোকালেই নেপোলিয়ানের ভক্ত নই। ইতিহাসের এই সব বিখ্যাত চরিত্রগুলি তো আসলে বিখ্যাত খুনী। নেপোলিয়ানও এক রক্তলোলুপ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বৈরাচারী ছাড়া আর কি! হিটলারের সঙ্গে তাঁর তফাত অতি সামান্য।

আমি মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা ফরাসীরা বুঝি নেপোলিয়ানকে এখনো খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করো?

একটু থতোমতো খেয়ে মার্গারিট বললো, না। আমরা, অন্তত আমি, ভালোবাসি বোনাপার্টকে। যে বোনাপার্ট ছিলেন সেনাপতি ও কনসাল, যিনি ফরাসী দেশে প্রথম আইন-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যিনি দর্শন-কাব্য-সাহিত্য-শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি শুধু নেপোলিয়ান হলেন, সেদিন থেকে তাঁকে আর পছন্দ করতে পারি না।

আমি বললাম, অর্থাৎ যেদিন থেকে তিনি সম্রাট হলেন! পোপের সামনে নেপোলিয়ান রাজমুকুটটা নিজেই নিজের মাথায় পরে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই মুকুটটা তাঁর দিকে কে এগিয়ে দিয়েছিল? তোমরা ফরাসীরাই দাওনি? তাঁর নামে নতুন যে মুদ্রা বেরোয়, তাতে 'প্রজাতন্ত্রের সংবিধানসম্মত সম্রাট' লেখা ছিল না? সোনার পাথরবাটি! কাঁঠালের আমসত্ত্ব! প্রজাতন্ত্রের আবার সম্রাট!

মার্গারিট হাসতে হাসতে বললো, ওটা উনি নিজেই লিখিয়েছিলেন। আসলে উনি বরাবরই ছিলেন ছেলেমানুষ! জানো, করোনেশানের সময় উনি ওঁর ভাই জোসেফকে ফিসফিস করে বলেছিলেন, ইস, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন! বাবা যদি আমাকে এই মুকুটপরা অবস্থায় দেখতেন!

মার্গারিট যাই বলুক, যে নেপোলিয়ান ফরাসী জাতটাকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই মানুষটি সম্পর্কে ফরাসীদের এখনো বেশ দুর্বলতা আছে মনে হয়। হিটলারও তো এই একই স্বপ্ন দেখিয়ে জার্মান জাতটাকে চুপ করিয়ে রেখেছিলেন। দেশপ্রেম অতি অন্ধ কুসংস্কার!

মার্গারিট আমেরিকানদেরও খুব বিরোধী। যখন তখন মার্কিনীদের চুটিয়ে নিন্দে করে। ফরাসীদের তুলনায় আমেরিকানরা যেন কোনো ব্যাপারেই নোখের যোগ্যও নয়। আমরা দু' জনেই আমেরিকানদের পয়সায় খাচ্ছি-দাচ্ছি, আবার সেই দেশে থেকেই তাদের নিন্দে করছি ঘরের মধ্যে বসে। অবশ্য আমেরিকানদের নিন্দে ঘরের মধ্যে গোপনে করার দরকার হয় না, প্রকাশ্যেই যা খুশি বলা যায়, আমেরিকান ছেলেমেয়েরা সেই সব শুনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে,

ইটস্ আ ফ্রি কানট্রি!

শুধু মার্গারিট নয়, সেই ষাটের দশক পর্যন্ত অধিকাংশ ফরাসীই ছিল উগ্র আমেরিকান বিদ্বেষী। তার একটা সহজবোধ্য কারণও আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি তখনও দগদগে হয়ে আছে। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস, ফিল্ম-নাটকই যুদ্ধের পটভূমিকায়। স্বাভাবিক কারণেই হলিউডের ফিল্মগুলিতে আমেরিকানদের শৌর্য-বীর্যই বড় করে দেখানো হয়, যেমন সোভিয়েত ফিল্মগুলিতে থাকে শুধু সোভিয়েত বাহিনীর বিজয় অভিযান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শুরুতেই জার্মানির থাপ্পড় খেয়ে ফ্রান্স ধরাশায়ী হয়েছিল। বেশ কয়েকটা বছর ফ্রান্সের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছিল নাৎসী বাহিনী। এইরকম সময়ে যা হয়, কিছু ফরাসী জার্মানদের পা চেটেছে, সেনাপতি দ্য গল পালিয়ে গিয়ে ইংলন্ডে বসে গঠন করেছেন প্রবাসী সরকার আর দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক ফরাসীরা দেশের মধ্য থেকেই গোপনে গোপনে চালিয়েছে রেজিস্টান্স মুভমেন্ট বা মুক্তি যুদ্ধ। কিন্তু ফরাসী দেশ জার্মানদের কবল থেকে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হয় নর্মান্ডিতে মিত্রবাহিনী অবতরণের পর। যে মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল আমেরিকা। বিজয়ীর গরিমা নিয়ে মার্কিন সৈন্যরা প্রবেশ করে প্যারিসে। এই জয়-কাহিনী আমেরিকান গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রে ঢাকঢোল পিটিয়ে বারবার তো বলা হবেই। কিন্তু এজন্যে ফরাসীরা কি চিরকাল আমেরিকানদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে? আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা অতি দুর্লভ বস্তু। কোনো বড় দেশ কোনো ছোট দেশের উপকার করলে অচিরেই সেই ছোট দেশটি বড় দেশের শত্রু হয়ে ওঠে। সামরিক শত্রুতা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে নিন্দে-গালাগালির বন্যা বয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পোলাণ্ড-হাঙ্গেরি-চেকোশ্লোভাকিয়া-বুলগেরিয়া ইত্যাদি দেশগুলিকে মুক্ত করলেও সেখানে খুব বেশিদিন জনপ্রিয় থাকেনি। আয়ওয়াতে আমি যে বাড়িতে থাকি, সে বাড়িরই দোতলায় রয়েছে এক পোলিশ লেখক, তার নাম ক্রিস্তফ জারজেস্কি। বয়েস পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ হবে, কিন্তু মাথার চুল ধপধপে সাদা, সেইজন্যই বোধ হয় সব সময় টুপি পরে থাকে। ক্রিস্তফ অত্যন্ত বিনয়ী ও আদব-কায়দা দুরস্ত। প্রত্যেকবার দেখা হলে সে করমর্দনের জন্য আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, মার্গারিটকে দেখলে সে মাথার থেকে টুপি খুলে, শরীর একটু বেঁকিয়ে গ্রীট করে। মার্গারিট এলে আমার ঘরে সে মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে আসে। ক্রিস্তফ এমনিতে সাবধানী ধরনের মানুষ, প্রকাশ্যে একটাও বেফাঁস কথা বলে না। কিন্তু মার্গারিট যখন আমেরিকানদের নিন্দে করে, তখন সে মুচকি মুচকি হাসে, তারপর বলে, রুশ সৈন্যরা আমাদের দেশে কী করেছে শুনবে? তারপর সে এমন সব রুশ-বিরোধী রসিকতা শোনায় যা শুনলে চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম। ওদের দেশের পার্টির কর্তাব্যক্তিরা এই সব রসিকতা শুনলে নিশ্চিত ক্রিস্তফ-কে জেলে দিত। রসিকতার ফল যে কত মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ আছে প্রখ্যাত চেক লেখক মিলান কুন্দেরার 'দা জোক' নামের উপন্যাসে। প্রাগ শহরে কলেজের একটি ছাত্র ইয়ার্কি করে তার বান্ধবীকে একটি পোস্টকার্ড লিখেছিল, তার মধ্যে ছিল ট্রটস্কির নাম। সেখানে ট্রটস্কি মানে লেনিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রটস্কি নন, শরীরের একটি গোপন অঙ্গ। সেই পোস্টকার্ড ইউনিয়ানের এক কট্টর সেক্রেটারির হাতে পড়েছিল, সে কিছুতেই রসিকতাটা বুঝতে চাইলো না। সামান্য একটা পোস্টকার্ড উপলক্ষ করে ওই ছেলেটি ও তার বান্ধবী, দুজনেরই বাকি জীবন ধ্বংস হয়ে গেল।

নভেম্বরের শেষ থেকেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শোঁ-শোঁ বাতাসে রাস্তার ধারের উইলো গাছগুলো কাঁদে। এখানে ঠিক কবে থেকে তুষারপাত শুরু হবে, তা

নিয়ে টিভিতে, খবরে কাগজে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। অনেক রকম পুরস্কার থাকে। মার্গারিট প্রত্যেকবার সে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েও কিছু পায়নি। নভেম্বরেই তুষারপাত ফ্রান্সে হয়তো দুর্লভ ঘটনা, তাই সে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। এখানে প্রথম দিনটি ছিল খুবই রোদ্দুর ঝকঝকে, সুপারমার্কেট থেকে মাংস-আনাজপত্র কিনে বড় বড় ঠোঙা হাতে আমি হেঁটে ফিরছিলাম; পরিষ্কার আকাশ, হঠাৎ আলো কমে এলো, খুব ছোট ছোট পাখির পালকের মতন দুলতে দুলতে নামতে লাগলো তুষার। দৃশ্য হিসেবে সত্যি অপরূপ। আকাশে কোথায় জমে ছিল এত তুষার ? মার্গারিট আমার পাশে পাশে হাঁটছিল, তার ঠোঙাগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে সে আনন্দে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে।

আমি একবার বয়েজ স্কাউটদের সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে খিলান মার্গে তুষারপাত দেখেছি। সুতরাং এ অভিজ্ঞতা আমার কাছে একেবারে নতুন নয়। কিন্তু যেটা আমার কাছে একেবারে অভিনব, তা হলো নদী জমে যাওয়া। কালো রঙের আয়ওয়া নদী একটু একটু করে সাদা হতে শুরু করলো। তারপর এক সময় একেবারে জমাট বরফ, পুরো নদীটাই যেন একটা রাস্তা, কেউ কেউ তার ওপর ছোটাছুটি করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দেবার দায়-দায়িত্ব নেই, তাই সকালের দিকে তুষারপাত শুরু হলে আমি আর বিছানা ছেড়ে উঠিই না, চওড়া কাচের জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখি ! মার্গারিটকে খুব সকালবেলা ক্লাস নিতে যেতে হয়। ক্যাম্পাস থেকে ওর হস্টেলটা খানিকটা দূরে, বরং আমার বাড়িটাই বেশ কাছে। মাঝে দু'একটা পীরিয়ড অফ থাকলে মার্গারিট ছুটে চলে আসে আমার অ্যাপার্টমেন্টে। ওকে একটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছি। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখলে ও ছদ্ম-ঈর্ষায় বলে, ইস কী মজা তোমার ! কেল ভি ! তুমি প্রুস্তের মতন দুপুরের আগে বিছানা ছাড়ো না !

মার্গারিট আমাকে চা-কফি বানিয়ে দেয়। কোনো কোনোদিন এসে বলে, আজ ব্রেকফাস্ট খাবারও সময় পাইনি, খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে কী খাওয়াবে ?

আমি তড়াক করে উঠে পড়ে বলি, দাঁড়াও, খুব ভালো ওমলেট বানাতে শুরু করেছি। তোমাকে আজ মস্ত বড় একটা ওমলেট খাওয়াবো !

মার্গারিট চোখ বড় বড় করে বললো, মস্ত বড় ওমলেট ? পেলিক্যানের ডিমের নাকি ?

আমি বললাম, না, পেলিক্যানের ডিম কোথায় পাবো ?

মার্গারিট বললো, তুমি কবি হ্রোবেয়ার দেনোর নাম শুনেছো ? খুব ভালো কবি ছিলেন, মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে মারা যান। রেজিস্টান্স মুভমেন্টে ছিলেন, ধরা পড়ে জার্মানি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে ছিলেন। তাঁর বেশ মজার একটা কবিতা আছে। শুনবে ?

ক্যাপটেন জোনাথন আঠেরো বছর বয়সে
দূর প্রাচ্যের এক দ্বীপে ধরলেন এক পেলিক্যান

জোনাথনের সেই পেলিক্যান একদিন সকালে
ডিম পাড়লো একটা ধপধপে সাদা, এবং কী আশ্চর্য
তার থেকে বেরিয়ে এলো ঠিক আগেরটার মতন এক পেলিক্যান

এই দ্বিতীয় পেলিক্যানটাও যথাসময়ে
একটা সাদা ডিম পাড়লো, এবং তার থেকে
অবধারিত ভাবেই এলো আর একটি, এবং এইরকম চলতেই থাকলো···

এই পর্যন্ত বলার পর থেমে গিয়ে মার্গারিট জিজ্ঞেস করলো, এর পর কী বলো তো ?

আমি ভুরু তুলে রইলাম।

মার্গারিট হাসতে হাসতে বললো শেষটাই তো আসল !

এই ব্যাপারটা চলতে পারে বহুকাল ধরেই
যদি না কেউ মাঝপথে একটা ওমলেট বানিয়ে নেয় !

রান্নাঘরে গ্যাস স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট আমাকে কবিতা কিংবা ফরাসী দেশের নানান গল্প শোনায়। আমেরিকায় পৌঁছোবার দু-তিন মাসের মধ্যেও মার্কিন সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ঘটলো না। কিন্তু মার্গারিটের সুবাদে আমার অদেখা দেশ ফ্রান্স সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানার সুযোগ হল। আমাকে ফরাসী ভাষা শেখাবার জন্যও মার্গারিট বদ্ধপরিকর !

এরই মধ্যে একদিন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমার পোলিশ বন্ধু ক্রিস্তফ বললো, সুনীল, আজ ইউনিয়ন ক্যান্টিনে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। একজন বললো, সুনীল নামে ওই ইণ্ডিয়ান ছেলেটা মার্গারিট ম্যাতিউর পাল্লায় পড়েছে ? এরপর ও বুঝবে ঠ্যালা ! কেন একথা বললো বলো তো ?

শুনে আমার যতটা না বিস্ময়, তার চেয়েও বেশি রাগ হলো। মার্গারেট সম্পর্কে এরকম উক্তির মানে কী ? মার্গারিটের স্বভাব অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বার্থের লেশমাত্র নেই। অন্যদের অনেক উপকার করতেও আমি ওকে দেখেছি। ও কখনো মিথ্যে কথা বলে না, একটু পাগলী ধরনের, একটু টেম্পারামেন্টাল ঠিকই, কিন্তু কোনোরকম প্রবঞ্চনা ওর চরিত্রে থাকতেই পারে না। আমি মানুষ চিনি না ?

তখন আমার মনে পড়লো, পল এঙ্গেলের একজন সহকারী, মার্ক ডগলাস নামে এক তরুণ লেখক দু-তিন দিন আগে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, ফরাসী ডিপার্টমেন্টের মার্গারিট তোমার বান্ধবী ? এই প্রশ্নের সঙ্গে খানিকটা কৌতুক এবং অনেকটা বিস্ময় ফুটে উঠেছিল মার্কের মুখে।

এখানে ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্ব অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কেউ কোনো মন্তব্যও করে না। তবু মার্গারিট সম্পর্কে এরকম প্রশ্ন, এমন বিস্ময় কেন ?

৫

লোহার বাজারে গিয়েছি আমি
শিকল কিনেছি
কঠিন শিকল
তোমারই জন্য
হে আমার প্রেম....

—জাক প্রেভের

মার্গারিট আমার দু' বছর আগে এদেশে এসেছে, সে অনেককে চেনে, অনেকেই তাকে চেনে। কিন্তু কারুর সঙ্গেই তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই। রাস্তায় ঘাটে কিংবা ক্যান্টিনে-রেস্তোরাঁয় অনেক যুবকই তার সঙ্গে যেচে কথা বলে, তার সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখায়। মার্গারিটকে তেমন একটা রূপসী বলা যায় না, বেশ লম্বা বড়-সড় চেহারা, নাক-চোখ এমন কিছু আহামরি নয়, তবে সব মিলিয়ে একটা আলগা লাবণ্য আছে, মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে। তার মাথাভর্তি সোনালি চুল সব সময় হুড়োকুড়ো, মনে হয় জীবনে কখনো আঁচড়ায় না, সাজ-পোশাকের দিকে কোনো মনোযোগ নেই, সে কথা বলে ঝড়ের গতিতে, রাস্তা দিয়ে হাঁটার বদলে ছোটে, যে-কোনো ছোটখাটো ব্যাপারেও তার দারুণ বিস্ময় ও ভালো লাগা, সর্বক্ষণ যেন জীবনীশক্তিতে টগবগ করছে। সব মিলিয়ে সে এক আকর্ষণীয়া নারী, তা ছাড়া ফরাসিনী বলেও একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ আছে। আমেরিকান যুবকরা রাস্তা দিয়ে তার পাশাপাশি হাঁটে, ক্যান্টিন-রেস্তোরাঁয় নিজের টেবিলে ডেকে বসাতে চায়, মার্গারিট আপত্তি করে না, তাদের সঙ্গে হেসে গল্প করে, কিন্তু বেশিক্ষণ না, দশ-পনেরো মিনিট বাদে সে সরে যায়।

শুক্র-শনিবার সন্ধেবেলা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ডেটিং এখানে প্রায় একটা অবশ্য পালনীয় রীতি। অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য ডেট করা মানে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের সন্ধেবেলায় একসঙ্গে কোথাও খেতে যাওয়া, বেড়ানো, সিনেমা দেখা, গল্প করা ও বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু শুক্র-শনিবার সন্ধ্যায় কোনো মেয়ে যদি একলা বাড়িতে বসে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে, সে হয় অসুস্থ কিংবা তার মনে বা শরীরে কোনো খুঁত আছে। মার্গারিট যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী তরুণী। হাসি-ঠাট্টা-মজাতে কোনো ক্লান্তি নেই, তবু সে কারুর সঙ্গে ডেট করে না। সন্ধেগুলো লাইব্রেরিতে কাটায়।

আমি কানাঘুষো শুনলাম, গত বছর গ্রেগরি নামে আর্ট ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে মার্গারিটের প্রেমে পড়েছিল খুব। দিনের পর দিন সে মার্গারিটের সঙ্গে ছায়ার মতন লেগে থাকতো, মার্গারিটের অনেকগুলো স্কেচও করেছিল, তারপর হঠাৎ ওদের মধ্যে কী হলো তা

আর জানা যায় না, ওদের বিচ্ছেদ হলো তো বটেই, গ্রেগরি এমন মুষড়ে পড়ল যে অনেকের ধারণা হলো, তার মেলানকোলিয়া রোগ হয়েছে। কিছুদিন পরেই গ্রেগরি এই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেল।

আরও কয়েকজন যুবকের ব্যবহারে লক্ষ করেছি, মার্গারিট সম্পর্কে বেশ একটা রাগ রাগ ভাব। খুব সম্ভবত তারাও মার্গারিটের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়ে পাত্তা পায়নি।

এই সব ঘটনা জেনেও মার্গারিটকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না, আমার বাধো বাধো লাগে।

আমার সঙ্গে মার্গারিটের একটা সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যেই। আমি সকালের দিকে বেশি বেরুই না। মার্গারিটই যখন তখন আমার ঘরে চলে আসে। মার্গারিট কবিতা নিয়েই কথা বলতে ভালবাসে বেশি, তা ছাড়া সে আমাকে ইউনিভার্সিটি ক্যামপাসের নানা রকম গল্প শোনায়। সেই গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, অনেক দিন আমরা দু'জনে মিলে রান্না করি, আমার তৈরি খিচুড়ি (প্রায় জগাখিচুড়ি বলা যায়) খেয়ে মার্গারিট মুগ্ধ, এক একদিন সে বাইরে থেকেও নানা রকম খাবার কিনে আনে।

আমি লক্ষ করেছি, টাকা পয়সা সম্পর্কে মার্গারিটের বিন্দুমাত্র মোহ নেই। টাকার হিসেব কষতেও যেন জানে না। ও যা উপার্জন করে, মাসের গোড়ার দিকেই তা দু' হাতে খরচ করতে থাকে, মাসের শেষে কীভাবে চলবে, তা চিন্তাও করে না। পরোপকারের দিকে তার খুব বেশি ঝোঁক। কোনো আড্ডাতে কেউ যদি দৈবাৎ বলে ফেলে, আমি অমুক জিনিসটা খুঁজছি, কিছুতেই পাচ্ছি না, তা হলে মার্গারিট নিশ্চিত পরের দিন সারা শহরের সব কটি দোকান টুঁড়ে সেই জিনিসটা কিনে এনে দেবে, তার দাম নেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। লিন্ডা নামে আমাদের দু'জনেরই পরিচিত একটি মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে শিকাগো যাবার পথে সাঙ্ঘাতিক অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে পড়ে, লিন্ডার দুটি চোখই নষ্ট হয়ে যায়। মার্গারিট তার জন্য কেঁদে ভাসিয়েছে, লিন্ডা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর নিয়মিত তার সেবা করেছে। এখানে কালো মানুষের সংখ্যা কম, তবু রাস্তায় কখনো কোনো গরিব কালো লোক দেখলে মার্গারিট আগ বাড়িয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করবে নানারকম, এর ফলে তাকে দু'একবার বেশ বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে, কিন্তু মার্গারিটের যেন সে বোধই নেই। তার হৃদয়ে মায়া-মমতা, পরের জন্য সহানুভূতি, এই সবই যেন বেশি বেশি। সে কখনো পরনিন্দা করে না, আমি একবারও তার মুখে কোনো ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে মন্দ কথা শুনিনি।

মার্গারিট ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম কিংবা রাইটার্স ওয়ার্কশপের সঙ্গে যুক্ত নয়, সুতরাং যেসব পার্টিতে আমি আমন্ত্রিত হই, তার অনেকগুলিতেই মার্গারিটের নেমন্তন্ন থাকে না। তার জন্য মাঝে মাঝে আমি খুব অস্বস্তিতে পড়ি। আমার ঘরে বসে মার্গারিট আর আমি হয়তো কোনো কবিতা পড়ছি, মার্গারিট ফরাসী ভাষা থেকে আক্ষরিক অনুবাদ করে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় পল এঙ্গেলের টেলিফোন। পলের সব সময়েই ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। পল বললো, আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও, আমি এসে তোমাকে গাড়িতে তুলে নেব, পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া একজন লেখক এসেছেন, তাঁর সম্মানে পার্টি।

আমার দ্বিধা হয়, মার্গারিটকে কী করে একা ফেলে চলে যাই ? ও আমার জন্য পিৎসা এনে রেখেছে। দু'জনে একসঙ্গে খাওয়ার কথা। কিন্তু মার্গারিটই উৎসাহ দিয়ে বলে, তুমি যাও না, ঘুরে এসো, তোমার যাওয়া উচিত, আমি একলা এখানে বসে কিছুক্ষণ পড়াশুনো করবো। আমার কোনো অসুবিধে হবে না ! মার্গারিটের হস্টেলের ঘরটা একটি মেয়ের

সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে হয়, সে মেয়েটির বিরুদ্ধে মাগারিট কোনো কথা বলেনি, তবু বোঝা যায়, দু'জনের রুচির খুব একটা মিল নেই। তাই হস্‌টেলের ঘরটার থেকে মাগারিট আমার অ্যাপার্টমেন্ট বেশি পছন্দ করে। পার্টি থেকে ফিরে এসে আমি দেখি, টেবিলের ওপর মাগারিট একটা সুন্দর চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে।

একদিন বিকেলবেলা খুব তুষারপাত আর ঝড়ো হাওয়া চলছে, মাগারিট হঠাৎ এসে বলল, সামনের জঙ্গলটায় কী কাণ্ড হয়েছে, জানো ? চলো, চলো, শিগগির দেখবে চলো ! তার কণ্ঠস্বরে এমনই ব্যগ্রতা যে মনে হয় সেই অবশ্যদ্রষ্টব্য ব্যাপারটির কাছে না যাওয়াটাই একটা পাপ। অতি দ্রুত জুতো-মোজা পরে, একটা ওভারকোট চাপিয়ে (ওভারকোটটা স্যালভেশান আর্মির দোকান থেকে অতি সস্তায় সেকেন্ড হ্যান্ড কেনা) বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাড়ির রাস্তাটার নাম সাউথ ক্যাপিটল, ডান দিকে একটুখানি এগোলেই একটা ছোট জঙ্গলমতন জায়গা, এলোমেলো গাছপালা ও অযত্নের জলাশয়, অনেক সময় এখানে হরিণ দেখা যায়। এদেশে হরিণ মারা নিষিদ্ধ, একদিন একটা বিরাট শিংওয়ালা হরিণ বড় রাস্তায় এসে পড়ে সাঙ্ঘাতিক ট্র্যাফিক জ্যাম ঘটিয়ে দিয়েছিল, তবু কোনো একজনও হরিণটার গায়ে হাত ছোঁয়ায়নি।

সেই জঙ্গলের প্রান্তে এসে মাগারিট আমাকে একটা মরা পাখি দেখাল।

পাখিটা শীতে জমে শক্ত হয়ে গেছে। চড়ুই পাখির চেয়ে একটু বড় আকারের, মোটাসোটা ধরনের, পাখিটার নাম জানি না। এরা বোধহয় বেশি উড়তে পারে না, সেইজন্য শীতের সময় চলে যেতে পারে না গরম দেশে, আবার চড়ুই পাখির মতন মানুষের কোঠাবাড়ির আশ্রয়ের উষ্ণতাও নিতে জানে না। তাই শীতের কামড়ে অসহায়ভাবে মরে।

প্রায় এক ফুটের মতন বরফ জমে গেছে মাটির ওপর, এদিক-ওদিকে আরও কয়েকটা মৃত পাখি দেখা গেল। মাগারিট সেই বরফের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পাখিগুলো কুড়োতে লাগলো। ফিসফিস করে ফরাসীতে বলল :

ওরিওল পাখি ছুঁয়েছে ঊষার রাজধানী
তার সঙ্গীত তলোয়ার, এসে বন্ধ করেছে দুঃখ শয্যা
সব কিছু আজ চিরজীবনের শেষ···

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি, মাগারিট অঞ্জলিতে মৃত পাখি নিয়ে কবিতা পাঠ করছে। আমারই যেন অন্য একটা স্বরূপ একটু দূর থেকে দেখছে এই দৃশ্য।

এক সময় মাগারিট তার কাতর মুখখানি তুলে জিজ্ঞেস করল, পাখিগুলো এইভাবে পড়ে থাকবে ? আমরা ওদের কবর দিতে পারি না ?

মাগারিটকে সাহায্য করবার জন্য আমি ওর পাশে বসে পড়ে দু'হাত দিয়ে খুঁড়তে লাগলাম বরফ।

তখন আমার মনে হল, আমি একা গাছতলায় কোনো মৃত পাখি দেখলে হয়তো দু'এক মিনিট থমকে দাঁড়াতাম, পরে কোনো কবিতা লেখার সময় হয়তো এসে যেত এই দৃশ্যটা, কিন্তু সেই মৃত পাখিদের কবর দেবার কথা তো কখনো আমার মনে আসত না। বাস্তবের মৃত পাখিটিকে ফেলে গিয়ে আমি তাকে ব্যবহার করতাম কবিতার রূপকল্পে। মাগারিটের অনুভূতি কি আমার চেয়েও অনেক সূক্ষ্ম ? কিংবা এটা তার ছেলেমানুষি ? কিংবা সে সব সময় কাব্যের মায়াময় জগতে বিচরণ করে ?

মোট পাঁচটি পাখিকে বরফের নীচে চাপা দেওয়া হল। মাগারিট তার ওপর এঁকে দিল ক্রুশ চিহ্ন। আমি গ্লাভ্‌স পরে আসিনি, আমার আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় জমে যাবার উপক্রম।

ফ্রস্ট-বাইট না হয়ে যায়। মাগারিট স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, আমি তাকে তাড়া দিয়ে বললাম, শিগ্‌গির ঘরে চলো—

প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে, অ্যাপার্টমেন্টের উষ্ণতায় কাঁপুনি থামল। এখন শরীরটাকে চাঙ্গা করা দরকার। মাগারিট কয়েকদিন আগে আমাকে এক বোতল রেমি মারত্যাঁ উপহার দিয়েছিল, দুটি গেলাসে ঢেলে ফেললাম চটপট। মাগারিট তার গেলাসটা হাতে নিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের তুষার ধারাপাত দেখতে লাগল একমনে।

আমি পাশে এসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তখন যে কবিতাটা বললে, ওটা কার ?

মাগারিট বলল, রেনে শার-এর। তুমি চিনতে পারোনি ?

আমি বললাম, রেনে শার-এর নাম শুনেছি, ওঁর কবিতা বিশেষ কিছু পড়িনি।

মাগারিট বলল, ফরাসী ভাষার জীবিত কবিদের মধ্যে প্রধান এই রেনে শার। ফরাসীরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, কারণ তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, নিজে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছেন।

আমি বললাম, তোমাদের অনেক সাহিত্যিক-সাংবাদিকই প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন, তাই না ?

মাগারিট বলল, রেনে শার-এর ভূমিকা ছিল অনেকখানি। তিনি আমাদের জাতীয় বীর। আবার খুব বড় কবি। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো, রেনে শার তাঁর দেশপ্রেমের সঙ্গে কবিতাকে মেশাননি। তিনি লড়াই করেছেন প্রাণপণে কিন্তু কক্ষনো দেশাত্মবোধক কবিতা বা উত্তেজক কবিতা বা চ্যাঁচামেচির কবিতা লেখেননি। তিনি মনে করতেন, কবিতা অতি বিশুদ্ধ শিল্প, তার মধ্যে যুদ্ধ-টুদ্ধ মেশানো উচিত নয়। কবিতা দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না, সে চেষ্টা করতে গেলে, সেগুলো কবিতাও হয় না, অস্ত্রও হয় না।

আমি বললাম, তুমি ঐ ওরিওল পাখি বিষয়ে মূল কবিতাটা আর একবার শোনাও তো !

কবিতা পাঠের সময় মাগারিটের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে যায়, ভেতরে যেন একটা আলো জ্বলে ওঠে। এই সময়ে তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

পাঠ শেষ হলে আমি মাগারিটকে আমার দিকে আকর্ষণ করে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে একটা চুমু খাব ?

সঙ্গে সঙ্গে যেন চীনে লণ্ঠনের ভেতরের বাতিটা নিভে গেল। বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখখানা। আমার হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। কী হল ব্যাপারটা, আমি কি কোনো অন্যায় করেছি ? একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর তাকে চুমু খেতে চাওয়া তো পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। তাও তো আমি জোর করিনি। ওর কাছে অনুমতি চেয়েছি মাত্র। আমি প্রাচ্যদেশীয়, কালো লোক বলে ওর আপত্তি ? তা হতেই পারে না। এই কদিনের পরিচয়ে আমি বুঝেছি, কালো-সাদার বিভেদ নিয়ে মাগারিটের কোনো রকম সংস্কার নেই। মাগারিটের এঁটো জ্ঞানও নেই, আমার হাত থেকে ও যখন তখন জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে টানে, আমার গেলাসের পানীয়তে বিনা দ্বিধায় চুমুক দেয়, তবে একটা চুম্বনে কিসের দ্বিধা !

মাগারিট কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি জানতাম একদিন এরকম হবে, আমি ভয় পাচ্ছিলাম, ···সুনীল, তোমার কাছে আসতে, তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু আমি শারীরিক সম্পর্কে বিশ্বাস করি না; এই যে আমেরিকান ছেলেমেয়েরা,

পারস্পরিক ভালোবাসা আছে কিনা তার তোয়াক্কা করে না, ভালোবাসার কিছু বোঝেই না, তবু যখন তখন শুয়ে পড়ে, আমি এটা বিষম ঘৃণা করি। আমি কখনো কারুর সঙ্গে ...আমি ভেবেছিলাম, তোমরা ভারতীয়রা শরীরের পবিত্রতায় বিশ্বাস কর... কিন্তু তুমি কবি... আমি পারব না, সুনীল, আমায় ক্ষমা করো...

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার চাই না, এমনিই হঠাৎ বলেছি, তোমার যদি ইচ্ছে না হয়—

মার্গারিট বলল, না, তুমি একবার মুখ ফুটে বলেছ, তুমি পুরুষ, আমি বাধা দিলে তুমি অপমানিত হবে, তোমার রাগ হবে, তোমার ভেতরে ভেতরে সব সময় ইচ্ছেটা থাকবে, তুমি স্বাভাবিক হতে পারবে না, তুমি বিশ্বাস কর সুনীল, আমি শুধু তোমাকে বাধা দিচ্ছি না, আমি জীবনে এ পর্যন্ত কোনো পুরুষকেই চুম্বন করিনি।

এবার আমার স্তম্ভিত হবার মতন অবস্থা। বলে কী ? একটি সাতাশ বছরের স্বাধীনা ফরাসিনী মেয়ে, সে এ পর্যন্ত একটাও চুমু খায়নি ! অথচ আমাদের ধারণা, সব ফরাসী মেয়েদের ষোলো-সতেরো বছর বয়েসে যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যায় ! আমেরিকান মেয়েদের যে অনেকেরই হয় তা তো স্বীকৃত সত্য। গল্প-উপন্যাস পড়ে আমাদের মনে হয়, ফরাসী মেয়েরা যৌন লীলা খেলায় সর্বক্ষণ মেতে থাকে। অথচ আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এক মূর্তিমতী ব্যতিক্রমকে।

মার্গারিট যে মিথ্যে কথা বলছে না, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। মিথ্যে ব্যাপারটাই নেই ওর চরিত্রের মধ্যে। গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে, ওর দুই বোন সন্ন্যাসিনী, মার্গারিটের মনের মধ্যেও কি রয়ে গেছে কোনো ধর্মীয় সংস্কার ? ওর সারা মুখখানি এখন বেদনাময়।

আমি ওর হাত চেপে ধরে ক্ষমাপ্রার্থীর সুরে বললাম, ঠিক আছে, আমি ঐ প্রসঙ্গই আর তুলব না, প্লিজ, প্লিজ, তুমি শান্ত হও, তুমি আমাকে রেনে শার-এর আরও দু'একটা কবিতা শোনাও !

কিন্তু মার্গারিটকে কিছুতেই আর ধরে রাখা গেল না। জোর করেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি এখন আর থাকতে পারব না, সুনীল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি এখন একা একা প্রার্থনা করব, তোমার কথায় আমি একটুও রাগ করিনি, হয়তো আমারই দোষ, আমি প্রথম দিনেই তোমাকে কিছু বলিনি, আমাকে ছেড়ে দাও !

সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মার্গারিট বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ওর হসটেল প্রায় এক মাইল দূরে। জানলা দিয়ে আমি দেখলাম, মার্গারিট মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে হাঁটছে, কী জানি কাঁদছে কিনা। আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার আর কী করা উচিত ভেবে পাইনি। এক সময় মার্গারিট মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

তারপর তিন চারদিন তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

ভ্রমণকাহিনীতে একটি মেয়েকে চুম্বন করা হল কি হল না, এর উল্লেখ অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু যে-কোনো ভ্রমণকাহিনীই তো আসলে আত্মজীবনীরও একটা টুকরো বটে। আমার জীবনের এই অতি ব্যক্তিগত ব্যাপারটি আমি অকপটে বর্ণনা করছি, তার কারণ ঐ ঘটনাটি নিয়ে সেই সময়ে আমার মনে যে একটা প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, সেটা আমি প্রকাশ করতে চাই।

আমি একটি কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করেছি, নিজেও লেখালেখি করেছি কিছু, কিন্তু বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু পড়াশুনো করিনি, সুযোগও পেয়েছি কম। যদিও বিশ্বের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে একটা অসীম ক্ষুধা অনুভব করতাম। নিজেদের লেখা নিয়ে

লাফালাফি বা আত্মশ্লাঘা করতে গিয়ে এক এক সময় খটকে মনে হত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কী লেখা হয়েছে, কতখানি লেখা হয়েছে, তাও তো জানা দরকার। নিছক কূপমণ্ডূকের মতন কয়েকজন বন্ধু মিলে পরস্পর পরস্পরের পিঠ চাপড়ানি দিলেই তো হয় না, তাতে বেশিদূর এগোনো যায় না। বাংলায় অনুবাদ শাখাটি বেশ দুর্বল। অন্যান্য ভাষার যা কিছু পড়েছি, সবই ইংরিজি অনুবাদে, তাও যে-টুকু পাওয়া যায়। সাধারণত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার সাহিত্য অনুবাদে জনপ্রিয় হয়। আমরা ফ্রান্সিস কারকাকে নিয়ে এক সময় এমন মাতামাতি করেছি, যেন তিনি একজন নতুন লেখক। হাইনে কিংবা রিল্‌কে সমসাময়িক কবি ! আমরা ইংরিজির মাধ্যমে কিছু ফরাসী কবিতা সম্পর্কে জেনে পুলকিত হয়েছি, কবিতাগুলির মূল শব্দের মর্ম গ্রহণ করতে পারিনি, টের পাইনি তার ঝঙ্কার। আমরা দেগা, গগ্যাঁ, ভ্যান গঘ, মাতিসের মূল ছবি একটাও দেখিনি, দেখেছি শুধু কিছু প্রিন্ট ! সব কিছুতেই সেকেন্ড হ্যান্ড, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতন।

মার্গারিটের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয় আমার পক্ষে দারুণ সৌভাগ্যজনক হয়েছিল। সাহিত্য-শিল্প তার ধ্যানজ্ঞান। আমার সঙ্গে গল্পে, আড্ডায়, নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে, এমনকি এক সঙ্গে রান্না করতে করতেও সে ফরাসী কবি বা শিল্পীদের সম্পর্কে এমন ভাবে সব কথা বলত, যা আজও আমি কোথাও পড়িনি। মূল ফরাসী কবিতার দু'তিন লাইন বলার পর প্রতিটি শব্দ ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দিলে, আমি পেয়ে যেতাম অনেক গূঢ় অর্থ। ফরাসী দেশের ছবি আঁকার বিভিন্ন পর্ব সম্পর্কে দুটো একটা ছোট ঘটনা তার মুখ থেকে শুনে পরিষ্কার হয়ে যেত অনেক কিছু। সে আমার বান্ধবী, তবু তার কাছ থেকে আমি যা শিখছিলাম, কোনো গুরু বা শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান আমাকে তা শেখাতে পারত না। তার বন্ধুত্বের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আমার কাছে উপভোগ্য এবং মহার্ঘ।

আবার একথাও তো ঠিক, আমি তখন একটি স্বাস্থ্যবান, মুক্ত, পিছুটানহীন যুবক। একটি মেয়ের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক সঙ্গে কাটাই, অনেক সময় বন্ধ ঘরের মধ্যে (শীতের দেশে কেউ কখনো ঘরের দরজা খুলে রাখে না) দু'জনে থাকি, একই খাবার দু'জনে ভাগ করে খাই, পরস্পরের ওপর বিশ্বাসও নাস্ত করেছি, তাহলে কোনো এক সময় সেই মেয়েটিকে কি আমার আদর করতে বা চুমু খেতে ইচ্ছে করবে না ? এরকম ইচ্ছে না জাগাটাই তো অস্বাস্থ্যকর বা রুগীর লক্ষণ। আমি দেশে কোনো বাগদত্তা কিংবা প্রেমিকা রেখে আসিনি যে তার প্রতি মিথ্যাচার হবে। মার্গারিটেরও কোনো প্রেমিক নেই। তাহলে কেন সে বাধা দেবে ? তার ধর্মীয় সংস্কার যদি এত প্রবল হয়, তবে তা কি আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ?

মার্গারিট বলেছিল, ভারতীয়রা নাকি শরীরের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে। ভারতীয়দের সম্পর্কে কত রকম ভুল ধারণা যে বিদেশে চালু আছে !

মার্গারিট আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি খুব ক্রুদ্ধ বা অপমানিত না হলেও খানিকটা যে আহত হয়েছিলাম, তাও ঠিক। আমার পৌরুষে ঘা লেগেছিল। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, অনেক আমেরিকান ছেলে কেন মার্গারিটের ওপর চটা। তারা কেউ কেউ মার্গারিটের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়ে অচিরেই শারীরিকভাবে কাছাকাছি আসতে চাইবেই। তারা সকলেই যে হৃদয়হীন তাও নয়, শরীরের মধ্য দিয়েই তারা হৃদয়কে খোঁজে। এটা অনেকটা সামাজিকভাবে স্বীকৃতও বটে। অবিবাহিত ছেলে-মেয়েরা যদি বাড়ির বাইরে ভোর রাত পর্যন্ত কাটিয়ে আসে, তাতেও বাবা-মায়েরা আর প্রকাশ্যে আপত্তি জানাতে পারেন না। সুতরাং মার্গারিট যদি কোনো ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করে রূঢ় কথা

শোনায়, তা হলে সে তো চটে লাল হবেই, তার কাছে মার্গারিটের এই ব্যবহার মনে হবে ন্যাকামি !

সারা সন্ধে আমি মাথা চেপে বসে রইলাম। মনে হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ভুল করে ফেলেছি, তবু নিজেকে ঠিক অপরাধী মনে করতে পারছি না। বারবার মনে পড়ছে, মার্গারিটের দারুণ নৈরাশ্য আর বেদনামাখা মুখখানি। কী করুণভাবে হেঁটে গেল তুষারপাতের মধ্য দিয়ে ! আমি যতটা আহত হয়েছি, মার্গারিট যেন আঘাত পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা মনে করি আমরা অন্যায় করছি না, তবু আমাদের কোনো কোনো ব্যবহারে অন্য কেউ আঘাত পেতে পারে। এই সব উপলব্ধি আমার কাছে নতুন।

মার্গারিট আর আসবে না আমার কাছে ? এ কথাটা ভাবতেই বুকটা বিষম খালি খালি মনে হতে লাগল। না, কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি মার্গারিটকে হারাতে রাজি নই !

৬

> বিদায় বিষাদ
> স্বাগত বিষাদ
> তুমি আঁকা আছো দেয়ালের ঘড়িকাঁটে
> তুমি আঁকা আছো আমার ভালোবাসার চোখে
> তুমি নও সম্পূর্ণ দুঃখ
> কেননা দরিদ্রতম ওষ্ঠও তোমাকে
> ফিরিয়ে দেয়
> এক টুকরো হাসিতে...
>
> —পল এলুয়ার

মার্গারিট শুধু তার হাতব্যাগটা নিয়ে চলে গেছে, আমার ঘরে ছড়িয়ে আছে তার অনেক জিনিসপত্র। তার বই-খাতা, টাইপ রাইটার, রেন কোট, এক জোড়া মোজা, আরও কত কি টুকিটাকি। আমাকেও এর মধ্যে সে উপহার দিয়েছে অনেক কিছু। যেমন একটা ড্রেসিং গাউন। দেশে থাকতে আমি বাংলা সিনেমার নায়িকাদের বাবাদেরই শুধু ড্রেসিং গাউন পরতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ যে আলখাল্লা পরতেন, সেটাও এক ধরনের ড্রেসিং গাউন বলা যায়। ও জিনিস গায়ে জড়াবার ইচ্ছে আমার কখনো হয়নি। কিন্তু এ দেশে একটা মুশকিল এই যে, যে-কোনো পোশাকে বাইরের লোকের সামনে দরজা খোলা যায় না। আমি রাত্তিরে দিশি প্রথায় পাজামা আর গেঞ্জি পরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুই, স্লিপিং সুট-ফুট কিছু কেনা হয়নি। কিন্তু এক একদিন দেরি করে ঘুমোলে, সকালে কেউ যদি দরজায় নক করে তখনই হয় মুশকিল। আমার শয়নকক্ষ আর বসবার ঘর একই। কেউ এসে ডাকলেই আমি, ওয়ান মিনিট প্লিজ, বলে তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে, ম্যাজিশিয়ানদের মতন অতি দ্রুত পোশাক পাল্টাই, পাজামার বদলে ট্রাউজার্স, একটা শার্ট গলিয়ে ভেতরে গুঁজে বেল্ট বাঁধতে হয়, তারপর দরজা খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে হাসিমুখে বলি গুড মর্নিং ! এমনকি, কেউ না ডাকলেও, একতলা থেকে খবরের কাগজ কিংবা চিঠি আনতে হলেও ওরকম ভদ্রস্থ পোশাক পরে নিতে হয়।

প্রথম প্রথম দরজা খুলতে আমার দেরি দেখে মার্গারিট জিজ্ঞেস করতো, তুমি এতক্ষণ কী করো বলো তো ? আমি সত্যি কথাটা জানিয়ে দিলে ও হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার সঙ্গে তোমার অত ভদ্রতা করতে হবে না, তুমি যে-কোনো সাজে থাকতে পারো। তবে, অন্যদের জন্য, তুমি ড্রেসিং গাউন কিনে নাও না কেন, ওতে সাত খুন মাফ। এমনকি তুমি ভেতরে নগ্ন অবস্থাতেও একটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নিলে, সেটাও ভদ্রতাসম্মত।

আমাকে কেনার সুযোগই না দিয়ে পরের দিনই মার্গারিট একটা নীল রঙের তোয়ালের কাপড়ের ড্রেসিং গাউন নিয়ে এলো। সেটা পরেই এখন আমি বসে আছি। অথচ মার্গারিট আর আসবে না।

আমার ঘরে মার্গারিট তার টাইপ রাইটার ও এত বই কাগজপত্র ছড়িয়ে রেখে গেছে। সে কি কখনো ভেবেছিল, হঠাৎ তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে?

মার্গারিটদের হসটেলের বারান্দায় বারোয়ারি ফোন। দু'বার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া গেল না। এর মধ্যে পল এঙ্গেল ফোন করে আমাকে মার্শাল টাউন নামে একটি অদূরবর্তী শহরে নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। পল এঙ্গেল এমন জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলেন যে তাঁর কোনো প্রস্তাবেই না বলার উপায় নেই। ফ্রেঞ্চ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে মার্গারিটের জন্য একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে এলাম। তার কাছে এখন আমার ঘরের দ্বিতীয় চাবি আছে, সে যে-কোনো সময় আসতে পারে।

পল এঙ্গেলের গাড়িটা থান্ডারবার্ড। রেড ইন্ডিয়ান নাম। একটা বোতাম টিপলে জানলার কাচ আপনি ওঠে নামে। এ সব জিনিস সিনেমায় ছাড়া আগে দেখিনি। গাড়ি চলতে চলতে সামান্য ঝাঁকুনি লাগলে যে গাড়ির চালককে 'সরি' বলতে হয়, সেটাও নতুন জানা হলো। পল এঙ্গেল কাকে সরি বলছেন, রাস্তাকে, না আমাকে?

যেতে যেতে পল তাঁর এই মার্শাল টাউন অভিযানের উদ্দেশ্যটা আমাকে জানালেন। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। পল এঙ্গেল যখন তিন-চার বছরের শিশু, তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। মা সম্পর্কে তাঁর কোনোই স্মৃতি নেই। মায়ের যে দু' খানা ফটোগ্রাফ ছিল, তাও নানা গোলমালে কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং হঠাৎ তাঁর জননী সম্পর্কে একটা অনুভূতি হচ্ছে, যে-জননীর কোনো মুখ নেই, যাঁর কণ্ঠস্বর, স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও পুত্রের কোনো ধারণা নেই। পল এঙ্গেলের মায়ের এক সহপাঠিনী এতদিন ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো-তে, সদ্য এসেছেন মার্শাল টাউনে। তিনিই এক মাত্র জীবিত, যিনি পলের মাকে চিনতেন। পল যাচ্ছেন সেই সুজান কেন্ট নামে মহিলার কাছে, তাঁর মায়ের গল্প শোনবার জন্য।

পলের বয়েস তখন ষাটের কাছাকাছি সুতরাং তাঁর মায়ের বান্ধবীর বয়েস আশি-পঁচাশি হওয়াও স্বাভাবিক। সেই রকম বৃদ্ধার সন্দর্শনে যাওয়া আমার পক্ষে খুব একটা উৎফুল্ল হবার মতন কিছু নয়। পল কক্ষনো একলা গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন না, সঙ্গে সব সময় কারুকে না কারুকে চাই। এই জন্যই তিনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এই ভেবে প্রথমে আমি খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। পরে বুঝেছি, পল আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। সুজান কেন্ট নামের বৃদ্ধা এবং তাঁর বাড়ি, দুটিই অতি দর্শনীয় ব্যাপার। সুজান ও পলের সাক্ষাৎকারও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা।

সুজান কেন্ট তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। দুই স্বামীরই সম্পত্তি পেয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর প্রথম স্বামীর একমাত্র ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ায় তাঁরও বিশাল বাড়ি ও টাকাপয়সা সুজান কেন্টের নামে বর্তেছে। মার্শাল টাউনের বাড়িটিই সেই বাড়ি। আমেরিকানদের এত কম ছেলেমেয়ে হয় যে, অনেক সময় কোনো ধনী ব্যক্তি মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী খুঁজতে উকিলরা নাজেহাল হয়ে যায়।

আমরা পৌঁছোলাম বিকেলের দিকে। শোনা গেল, ডিনারের পর, ঠিক আটটা বেজে পনেরো মিনিটে সুজান কেন্ট আমাদের দর্শন দেবেন। আমাদের দেওয়া হলো দুটি গেস্ট রুম। বাড়ি তো নয় প্রাসাদ, প্রধান গেট থেকে মূল বাড়িতে পৌঁছোবার যে ড্রাইভওয়ে,

সেটা প্রায় সিকি মাইল, দু' পাশে অজস্র ফুলের বাগান ও কয়েকটি মর্মরমূর্তি। অতিথি কক্ষটি রাজা-মহারাজাদের থাকার যোগ্য। বাথরুমে অটি-দশ রকমের পারফিউমের শিশি, সবই নতুন। জলের কলগুলি এমনই চোখ ধাঁধানো ঝকঝকে হলুদ যে মনে হয় খাঁটি সোনার তৈরি। অবশ্য সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। আমি আসল সোনা আর নকল সোনার পার্থক্য বুঝবোই বা কী করে! বাথরুমটি অনেক বেডরুমের চেয়ে বড়, তার এক পাশে আছে বইয়ের র‍্যাক, তাতে নানা রকমের বই, কবিতা-প্রবন্ধ, ডিটেকটিভ উপন্যাস।

এ দেশে দাস-দাসীর প্রথা উঠে গেছে, কিন্তু ধনীদের বাড়িতে হেলপিং হ্যান্ড থাকে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো পয়সার বিনিময়ে বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া, রান্নার কাজ করে দিয়ে যায়। সে রকম তিন-চারজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম, তাছাড়া একজন বাটলারও আছে মনে হলো। ডিনার টেবিলে শুধু পল আর আমি, সেসব খাবার-দাবারের আর বর্ণনা দিয়ে কাজ নেই, তবে দু' ফুট লম্বা সেই চিংড়ি মাছটির কথা জীবনে ভুলবো না। ও রকম লবস্টার কক্ষনো চর্মচক্ষে দেখিনি। সেই ব্যাঘ্র-চিংড়িটিকে আস্ত অবস্থায় ওয়াইনে সেদ্ধ করা হয়েছে, সেই ভাবেই একটা রুপোর ট্রে-তে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেনি-বাটালির মতন জিনিস দিয়ে মাঝখানটা কেটে আমি ভেতরের খানিকটা চিংড়ি-মাংস খেলাম, বাকি সবটা পড়ে রইলো। এত বড় একটা চিংড়িতে দশ-বারোজনের খাওয়া হয়ে যেত। কী অপচয়, কী সাঙ্ঘাতিক অপচয়। এ দেশের এ রকম অপচয় দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। খুব দুর্লভ দামী কোনো খাবার খেতে বসে আমার দেশের স্বজন-বন্ধুদের কথা মনে পড়ে, আমি ভালো করে খেতে পারি না। তখনই দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। এখানে আসবার আগে কফি হাউসের মাট্‌ন ওমলেট কখনো পুরো একা খেতে পাইনি, দু' তিনজনে ভাগ করে নিতে হয়েছে, তবু সে-ও অনেক ভালো।

খাবার টেবিলে পল এঙ্গেল বললেন, আমার মা সাধারণ চাষী পরিবারের মেয়ে ছিলেন, পড়াশুনো করার সময় রেস্তোরাঁয় বাসন ধোওয়ার কাজ করতেন। এই সুজান কেন্টও তাঁর সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন, একই কাজ করতেন, ভাগ্যচক্রের খেলায় তিনি আজ এত ধনী হয়েছেন।

এক সময় এক দেবদূতের মতন রূপবান যুবক (সেও আসলে কাজের লোক) আমাদের জানালো যে সুজান কেন্ট আমাদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। যেন কোনো মহারানীর দরবারে ডাক পড়লো আমাদের।

এটাও বিশেষ অত্যুক্তি নয়। ফিল্‌মে ইওরোপীয় রাজা-মহারাজাদের শয়নকক্ষ এর চেয়ে বেশি তো সাজানো হয় না। প্রায় ঘরের অর্ধেক জোড়া বিশাল একটি পালঙ্ক, বিছানার রঙ, দেয়ালের রঙ, পর্দার রঙ, সবই গোলাপি, অর্থাৎ এটা পিংক রুম। ধনীদের বাড়িতে এরকম ব্লু রুম, হোয়াইট রুমও আলাদা আলাদা থাকে। সেই বিছানার প্রান্তে কয়েকটি বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন সুজান কেন্ট, বুক পর্যন্ত একটা সোনালি লেপ দিয়ে ঢাকা। প্রথম দর্শনে তাঁকে সম্পূর্ণ অলীক মনে হয়। মাথার চুল পাউডার পাফের মতন সাদা, ঠোঁটে লাল রঙ, কুঞ্চিত গালে রুজ মাখা, বয়েসের তুলনায় চোখ দুটি উজ্জ্বল, গাঢ় নীল। আমরা খাটের পাশে দাঁড়াতেই তিনি দু' হাত বাড়িয়ে অত্যন্ত সরু গলায় ব্যাকুলভাবে বললেন, পলি, পলি, কাম ক্লোজার, কাম ক্লোজার!

ষাট বছর বয়স্ক পল এঙ্গেল ওঁর বুকের কাছে মাথাটা নিয়ে গেলেন, আর সেই পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা পলের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে শিশুর মতন তাঁকে আদর করতে লাগলেন।

এর পর সুজান কেন্ট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ছেলেটি কে ?

পল বললেন, এ আমার এক ভারতীয় বন্ধু।

বৃদ্ধা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন, ইন্‌জান ?

এই রে, ইনি আমাকে রেড ইন্ডিয়ান মনে করেছেন। রেড শব্দটা এখন উঠেই গেছে, শুধু ইন্ডিয়ান শুনলে সবাই এখানে এদের আদিবাসীদের কথাই ভাবে। পল আমার বিস্তৃত পরিচয় দেবার পর সেই মহিলা আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, ক্যালকাটা ? নাইনটিন ফর্টিওয়ানে আমি গিয়েছিলাম সেখানে, বেশ ভালো শহর, ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরেছি, একটা বেশ সুন্দর নদী আছে।

একজন পরিচারক ছোট ছোট গ্লাসে লিকিওর দিয়ে গেল আমাদের। বৃদ্ধাও সেই সুগন্ধ সুরায় চুমুক দিতে লাগলেন।

এদেশের সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। পল তাঁর মায়ের বান্ধবীকে মাসি না বলে বললেন, সুজান, তুমি আমার মায়ের কথা বলো, কেমন দেখতে ছিল মাকে। সে কি বদমেজাজী ছিল, না কোমল ?

সুজান কেন্ট বললেন, তোর মা রুথ, আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই তাকে। ওঃ, কী রূপ ছিল তার, আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী, আমি তাকে হিংসে করতাম। অনেকটা লম্বা, সরল উন্নত চেহারা, কী মসৃণ চামড়া, সে কোনো জায়গা দিয়ে হেঁটে গেলে সবাই তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতো। বাচ্চাদের প্রতি তার বিশেষ স্নেহ ছিল, রাস্তাঘাটে কোনো শিশু দেখলেই আদর করতো। একবার কী হয়েছিল জানিস...

পল এঙ্গেলের মা মারা গেছেন ছাব্বিশ বছর বয়েসে। তারপর তাঁর আর বয়েস বাড়েনি। সেই ছাব্বিশ বছরের তরুণীর বর্ণনা করছেন এই পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা।

এক সময় পল বললেন, সুনীল, তুমি আর এখানে বসে থেকে কী করবে ? এসব আমাদের ব্যক্তিগত কথা তোমার শুনতে ভালো লাগবে না। তুমি বরং এই বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দ্যাখো, এখানে অনেক ছবি আছে।

সুজান কেন্টও আমাকে সেই অনুমতি দিলেন।

একটি যুবক আমাকে নিয়ে গেল বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তের দোতলার একটি হলঘরে। এ যে প্রাইভেট মিউজিয়াম। ঠিক কোনো মিউজিয়ামের ঘরের মতনই সমস্ত দেয়াল ছবিতে সাজানো, ঘরের মাঝখানে সাজিয়ে রাখা আছে কিছু ভাস্কর্য। সেই ভাস্কর্যগুলির মধ্যে একটি হেনরি মুরের। ছবিগুলির অনেক শিল্পীই আমার অচেনা, তবু তার মধ্যে আমি কামিল পিশারো, জাঁ রেনোয়াঁ এবং পাবলো পিকাশোর তিনটি ছবি আবিষ্কার করে ফেললাম। এই সব শিল্পীদের মূল ছবি। আমার সর্ব অঙ্গে শিহরন হলো। গোটা ভারতবর্ষে কোথাও পিকাসোর একটাও মৌলিক পেইন্টিং আছে বলে শুনিনি, অথচ মার্শাল টাউনের মতন এত ছোট্ট একটা শহরে রয়েছে। আমরা ছবির বইতে ছোট ছোট রিপ্রোডাকশান ছাড়া আর তো কোনো পিকাসো দেখিনি। এটা বেশ বড় মাপের ক্যানভাস, পিকাসোর ব্লু পিরিয়ডের আঁকা।

সেই ছবিগুলির সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বার বার মনে হতে লাগলো, মার্গারিট আমার পাশে থাকলে ছবিগুলো কত ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতো, এই সব শিল্পীদের সম্পর্কে কত গল্প শোনাতো।

হলঘরটির দ্বারে অটোমেটিক রাইফেলধারী একজন প্রহরী দন্ডায়মান। তা তো হবেই, এই সব ছবির দাম কোটি কোটি টাকা।



এজগার দেগার স্কেচ : এদুয়ার মানে



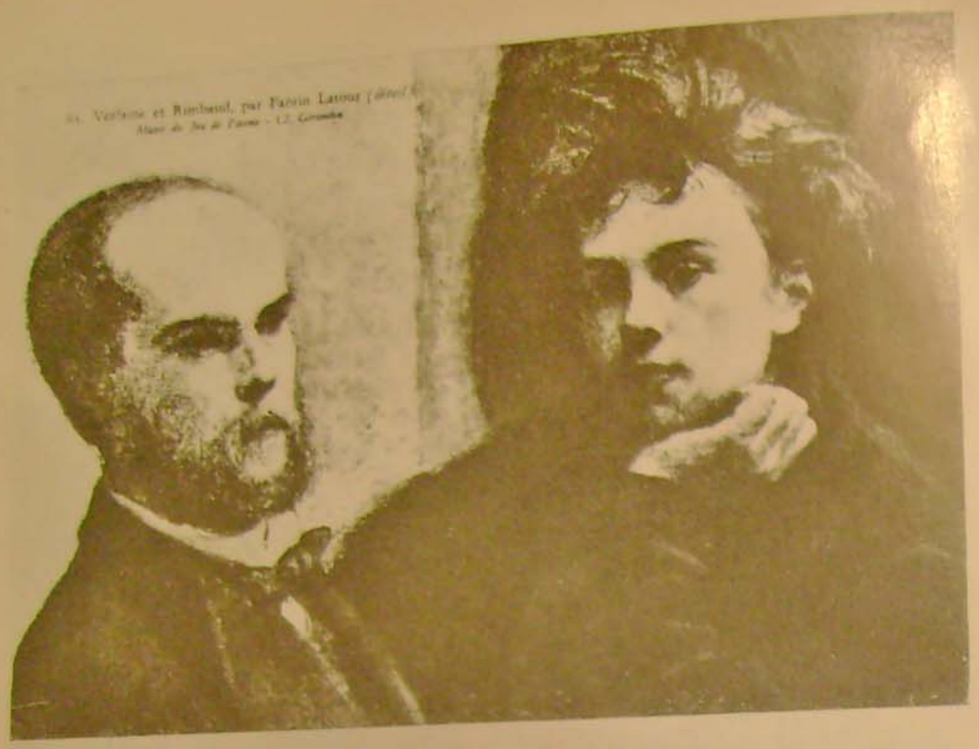
কামিল পিসারো : পল সেজান্‌-এর প্রতিকৃতি



পল সেজান্‌ : কামিল পিসারো ছবি আঁকতে বেরুচ্ছেন



ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ্‌ : আত্ম প্রতিকৃতি, কানে ব্যান্ডেজ



ওপরে : পল ভের্লেন ও আর্তুর র‍্যাঁবো



গীয়ম আপোলিনেয়ার



শার্ল বোদলেয়ার



মাগারিট ম্যাতিউ, আয়ওয়া শহরে



ভূমধ্যসাগরে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সানগ্লাস চোখে ভাস্কর দত্ত

মার্শাল টাউনের সেই বাড়িটাতে আমাকে থাকতে হলো তিন দিন। পল এঙ্গল আমাকে একা থাকার এবং ইচ্ছেমতন বই পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে পড়তো মাগারিটের কথা। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের চেয়েও অনেক বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু শারীরিক ছোঁয়াছুঁয়ি চলবে না। এ যে বড় দুঃসহ ব্যাপার।

মাগারিটের ধর্মীয় গোঁড়ামি থাকলেও সে সিগারেট খায়, সুরাপানেও আপত্তি নেই। সে হুইস্কি-রাম দু' চক্ষে দেখতে পারে না, কিন্তু ফরাসী হয়ে জন্মেছে, ওয়াইন তো খাবেই। সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে তার কোনো ছুঁৎ মার্গ নেই। ন্যুড স্টাডি ফরাসী শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবিতা উপন্যাসে কোনো বর্ণনায় কোনো শব্দকেই সে অশ্লীল মনে করে না। সেই সময় ফরাসী সাহিত্যে জাঁ জেনে-কে নিয়ে খুব হৈ চৈ চলছে। জেনে একজন জন্ম-অপরাধী, সারাজীবন চুরি ও গুন্ডামি করেছেন, মাতাল-ব্যভিচারী ও খুনীদের সঙ্গেই শুধু মিশেছেন। কোনো এক অপরাধে জেনে-র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, তখন পর্যন্ত তাঁর নামও কেউ শোনেনি। জেলখানায় বসে এই দাগী কয়েদিটি একখানা বই লিখতে শুরু করে। শ' দু-এক পাতা লেখা হলো, তারপর জেলখানার ঝাড়ুদার একদিন সেই পুরো পাণ্ডুলিপি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিল। জেনে আবার সেটাই লিখতে বসলেন, দিনের পর দিন আপন মনে লিখে চললেন। পরে কোনো এক সময় সেই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি জেলের বাইরে চলে আসে। কোনো এক প্রকাশক সেটি প্রকাশ করার পর আচম্বিতে ফরাসী সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে। সেই বই, 'আওয়ার লেডি অফ দা ফ্লাওয়ার্স'-এর স্বাদও অনাস্বাদিতপূর্ব, বহু লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী ফরাসী সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে জেনে-কে মুক্ত করেন কারাগার থেকে।

জাঁ পল সার্ত্র গোটা একটি বই লিখেছেন এই জেনে সম্পর্কে। সেই বইয়ের নাম 'সন্ত জেনে।' দাগী আসামীকে সন্ত বলেছেন তিনি বিশেষ কারণে। সার্ত্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই একজন মানুষ, যার জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, যার খ্যাতির মোহ ছিল না। বই লিখে অর্থোপার্জনেরও কোনো প্রশ্ন ছিল না, সাহিত্যকীর্তি স্থাপনের কথা যে জানতোই না, তবু সে লেখে কেন ? তবে কি এটাই দৈব প্রেরণা ! এই প্রেরণা যে পায়, সেই তো সন্ত ! একবার পুরো পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যাবার পরেও সে লিখেছিল।

জেনের এই উপন্যাসের ভাষা পাগলের মতন অসংলগ্ন, তবু সেটাই এক নতুন ভাষা। তিনি যখন-তখন খিস্তি-খেউড় ও চোর-ডাকাত-বেশ্যা-সমকামীদের ব্যবহৃত শব্দ মিশিয়ে দিয়েছেন, তবু তা এক মৌলিক সৌরভ এনে দিয়েছে। পরে অবশ্য জাঁ জেনে নাট্যকার হিসাবেও খ্যাতিমান হন।

মাগারিট সেই 'আওয়ার লেডি অফ দা ফ্লাওয়ার্স'-এর মূল ফরাসী থেকে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে পড়ে শোনাতো। কোনো শব্দেই তো তার আপত্তি হয়নি। তবু কেন সামান্য একটা চুম্বনের আবেদনে তার এত অনীহা ?

মার্শাল টাউনের সেই বাড়িতে বসে বসেই আমি ঠিক করে ফেললাম, থাক, ওসব আমার কিছু চাই না। সংযম দেখাবার মধ্যেও একটা অহংকার আছে। আমেরিকান ছেলেরা যা পারেনি, তা আমি নিশ্চয়ই পারবো। মাগারিটের সাহচর্যই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ফিরে এলাম রবিবার সকালে। দশটার সময় মাগারিট গীর্জায় যায়। সেই গীর্জার রাস্তায় ধরলাম তাকে। মাথায় একটা সিল্কের স্কার্ফ বাঁধা মাগারিট অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল, আমাকে দেখে চমকে গেল।

আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, তুমি আমার ওখানে আর আসবে না ?

মার্গারিট ফ্যাকাশে ভাবে বললো, কী জানি !

আমি ওর হাত ধরে বললাম, এই দ্যাখো, আমি তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর কক্ষনো ওরকম দাবি করবো না। তোমার বন্ধুত্ব ছাড়া কিছুই চাইবো না।

মার্গারিট বললো, প্রতিজ্ঞা করলেও তোমার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়ে যাবে। তুমি ইচ্ছেটাকে দমন করবে। সেটা তো ভালো নয়। আমি কেন তোমার কষ্টের কারণ হবো, বলো ! তাতে আমারও কষ্ট হবে !

আমি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, তা হলে তুমি আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবে না ?

ও বললো, আমি যে খুব চাই। তুমি যখন ছিলে না, আমি দু' বার গেছি তোমার ঘরে। শোনো সুনীল, আমি আজ গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার সময় অনুমতি চাইবো। যদি কোনো সাড়া পাই—

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের জন্য প্রার্থনা করবে বললে ?

মার্গারিট লাজুক ভাবে বললো, তুমি যা চেয়েছিলে।

সেই মুহূর্তে হাসি সামলানো আমার পক্ষে সত্যি খুব কষ্টকর হয়েছিল।

মার্গারিট চুমু খেতে পারবে কিনা সে সম্পর্কেও ভগবানের কাছে অনুমতি চাইতে হবে ? আমার দৃঢ় ধারণা ওর ভগবান ওকে সেই অনুমতি দেবেন না। এই সব ভগবান-টগবানেরা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর তো নিজের মুখেই সে কথা স্বীকার করেছিলেন !

৭

> "কুমারী, উত্তর দাও তুমি
> যে বাক্য অশ্রুত অন্ধকার
> আমার হৃদয় মৃদু কোঁকে
> চাপ দেয় তোমার হৃদয়ে
> যদি দেখি কখনো তোমার
> রূপান্তরে কোনো অস্থিরতা
> তবে সেই অস্থিরতা এই ;
> তোমাকে প্রেমের আগে আমি
> তোমার প্রেমকে ভালোবাসি।"
>
> —রেনে শী কাদু

বছর প্রায় ঘুরে এলো। এপ্রিলে রাস্তার পাশের বরফ ভেদ করে উঁকি মারলো একটা ছোট্ট ফুলগাছের চারা। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও এই গাছ কী করে এত কাল ঘুমিয়ে ছিল, আবার বেঁচে উঠলো, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। বরফ গলে যাবার পরেই দেখা যায় সেখানে অনেক রঙের ঘাসফুল। এত ছোট, এত সুন্দর অথচ কী তেজী এই ফুলগুলি !

কাগজে কলমে এপ্রিল মাস এখানে বসন্ত, কিন্তু তখনো শীত যায় না। মে মাসে এক একদিন দুপুরে বেশ ঝকঝকে রোদ, তার মধ্যেই এক ঝাঁক পায়রার মতন ঝটাপট করে বৃষ্টি এসে যায়। বৃষ্টির পরেই হিমেল বাতাস। কোথাও কোথাও মে মাসেও তুষারপাতের খবর শোনা যায়। তবু চেরী গাছগুলোতে থোকা থোকা ফুল এসেছে। পপ্‌লার গাছগুলি দীপ্তিময় সবুজ। নদীতে ফিরে এসেছে স্রোত, তার পাশে পাশে ঝুঁকে আছে উইলো গাছ।

পেট্রোল শব্দটি এখানে অপরিচিত, তার বদলে বলে গ্যাসোলিন বা গ্যাস। হঠাৎ জুন মাসে এখানে গ্যাসের দাম কমে গেল। আমার বাড়ির ঠিক সামনেই গ্যাস স্টেশনে (অর্থাৎ পেট্রোল পাম্পে) বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, 'টু সেন্টস্ অফ্ পার গ্যাল !' গ্যাল মানে গ্যালন। এদেশে এরা অনেক কিছুকেই ছোট ছোট করে বলে, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়কে বলে স্কুল, যুবতীকে বলে বেবি, বাঘকে বলে ক্যাট।

আমাদের দেশে কোনো জিনিসের দাম কমলে আমরা খুশি হই, এরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অকস্মাৎ গ্যাসের দাম কমলো কেন, তা হলে কি দেশের অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছে ? তখন এক গ্যালন গ্যাসের স্বাভাবিক দাম ছিল পঁচিশ সেন্ট, অর্থাৎ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, তার থেকেও দু' সেন্ট অর্থাৎ দশ পয়সা কমে যাওয়া তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। সত্যিই সেই ধাক্কায় একটা জমজমাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস ঝাঁপ ফেলে বন্ধ হয়ে গেল। গ্যাসের দাম

কমার সঙ্গে একটা জামা-কাপড়-বাসনপত্র ইত্যাদির দোকান উঠে যাবার কী সম্পর্ক তা অবশ্য আমার বোধগম্য নয়। এ যেন কপালে এসে লাগলো তীর, রক্ত পড়তে লাগলো হাঁটু দিয়ে।

পল এঙ্গেলের সহকারী মার্ক এই সময় বিশেষ উৎসাহ নিয়ে আমাকে গাড়ি চালানো শেখাতে লাগলো। মার্ক-এর গাড়িটি একটা হলুদ রঙের ফোর্ড, বাইরের চেহারাটি অটুট, চলেও বেশ ভালো। দু'তিন দিন ফাঁকা রাস্তায় ত্যাড়াব্যাঁকা ভাবে গাড়িটা চালাতে আমার বেশ মজাই লাগছিল। মার্ক আমার কাঁধ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বললো, এই তো অনেকটা হয়ে গেছে, আর কয়েকটা দিন প্র্যাকটিস করলেই তুমি ড্রাইভিং টেস্ট পাশ করে যাবে!

আমি বললাম, যাঃ, আমার গাড়িই নেই, শুধু শুধু পয়সা খরচ করে ড্রাইভিং টেস্ট দিতে যাবো কেন?

মার্ক বললো, তুমি এতদিন এদেশে আছো, তোমার গাড়ি নেই কেন? তোমার বান্ধবী রাগারাগি করে না? কিনে ফ্যালো, চটপট একটা গাড়ি কিনে ফ্যালো। কতই বা দাম পড়বে! তুমি আমার এই গাড়িটা কিনতে চাও? আমি পঞ্চাশ ডলারে দিয়ে দিতে পারি।

আমি হতবাক্। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মার্ক আমাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে। ওর স্বার্থ আছে। মার্ক নিশ্চয়ই এই গাড়িটার বদলে একটা হাল ফ্যাসনের নতুন গাড়ি কিনতে চায়। এদেশে পুরোনো গাড়ি বিক্রি করা তখন খুব শক্ত ছিল। এমনকি পুরোনো গাড়ি বাতিল করা ছিল আরও শক্ত। যেখানে সেখানে গাড়ি ফেলে রেখে গেলে পুলিশে ফাইন করবে। কেউ কেউ পাহাড়ের ওপর থেকে ইচ্ছে করে গাড়ি গড়িয়ে ফেলে দিত, তাও ধরা পড়ে গেলে মুশকিল। সেই জন্য দিকে দিকে তৈরি হয়েছিল অটোমোবিল গ্রেভ ইয়ার্ড। মানুষের কবরখানার মতনই লোকে পয়সা দিয়ে পুরোনো গাড়ি জমা করে আসতো সেখানে। একটুও ভাঙেনি, নষ্ট হয়নি, এমন শত শত গাড়ি সেখানে ধ্বংস হবার প্রতীক্ষায় পড়ে থাকতো।

মার্ক আবার বললো, কিনতে চাও তো বলো, আজই তোমায় গাড়িটা দিয়ে দিতে পারি পঞ্চাশ ডলারে। তেলের দাম কমে গেছে, এখন গাড়ি চালাতে তোমার খরচও বেশি পড়বে না!

আমার বুকটা একবার ধক করে উঠেছিল। এত সস্তায় একটা চালু গাড়ি! পঞ্চাশ ডলার মানে তখনকার হিসেবে মাত্র আড়াইশো টাকা। আমাদের দেশে এরকম একটা গাড়ির দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা তো হবেই। বেশ ধনীরাই এরকম গাড়ি চড়ে। এখানে পঞ্চাশ ডলার আমি অনায়াসে খরচ করতে পারি, তার বিনিময়ে একটা নিজস্ব গাড়ি হবে।

তারপরেই ইচ্ছে করেছিল ঠাস করে নিজের গালে একটা চড় কষাতে। গাড়ির লোভ! এর পরে ইচ্ছে করবে বাড়ি কিনতে। তারপর মেম বউ। তারপর পায়ের নীচে শেকড় গজাতে আর বাকি থাকবে কী?

মার্ককে বললাম, দুঃখিত, তুমি শুধু শুধু কয়েকটা দিন নষ্ট করলে, আমার গাড়ি কেনার কোনো বাসনাই নেই। তুমি আমাকে এটা বিনা পয়সায় দিলেও আমি নেবো না!

দেশে ফেরার জন্য একসময় যে মন উচাটন হয়েছিল, তা কি আস্তে আস্তে কমে আসছে? এখনও প্রত্যেকদিন কয়েকবার জপ করি ফিরে যাবো, ফিরে যাবো, কিন্তু সেরকম কোনো উদ্যোগ তো নেওয়া হচ্ছে না। কারণ, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারিট নাম্নী তরুণীটি। ঝট করে দেশে ফিরে গেলে মার্গারিটকে চিরতরে ছাড়তে হবে, কিন্তু সেটা যে ভাবতেই পারি না কিছুতেই!

এখন প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘন্টা মার্গারিট আর আমি একসঙ্গে কাটাই। আমার ঘরে, টেবিলের দু'দিকের দুই চেয়ারে বসে আমরা নিজস্ব পড়াশুনো বা লেখালেখি করি। আমার রান্নাঘরটাও দু'জনের। অর্ধেক বাঙালী রান্না ও বাকিটা ফরাসী খাবারে আমরা লাঞ্চ-ডিনার সারি। মার্গারিট আমাকে ফরাসী শেখায়, আমি ওকে শেখাই বাংলা। মাঝে মাঝে বাইরের লোকের সামনেও আমাদের ইংরিজি-বাংলা-ফরাসী গুলিয়ে যায়। টেলিফোনে কাকুকে ইংরিজিতে ও-কে বলার বদলে আমি ভুল করে বলে ফেলি, দাকর, দাকর! আর মার্গারিট বলে ফেলে, ঠিক আচে, ঠিক আচে! প্রয়োজনীয় কোনো কিছু খুঁজে না পেলে আমি বলি, ম্যারদ্! আর মার্গারিট বলে, দূর ছাই! এই 'দূর ছাই' ওর খুব পছন্দ। অনেক সময় কিছু কেনাকাটি করতে গিয়ে দোকানদারের মুখের ওপরেও মার্গারিট বলে ওঠে, দূর ছাই! সেই ফরাসী ওষ্ঠে দূর ছাই বড় সুমিষ্ট শোনায়।

এর মধ্যে মার্গারিটের ভগবানও আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, যদিও সবটা নয়, একটুখানি।

মাসের প্রথমে মার্গারিট যা মাইনে পায় এবং আমি যা স্কলারশিপ পাই, সব টাকা রাখা হয় একটা ড্রয়ারে। বেহিসেবী ভাবে দু'জনে ইচ্ছে মতন তার থেকে খরচ করি, প্রায়ই বন্ধু বান্ধবদের ডেকে খাওয়াই, অনেকক্ষণ আড্ডা হয়। মাসের শেষে টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেলে আমরা অন্য কারুর বাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণে ঠিক ডিনার টাইমে হাজির হই এবং গালে হাত দিয়ে নিরীহ মুখে বসে থাকি। আমাদের পোলিশ বন্ধু ক্রিস্তফ্ এর মধ্যেই বেশ টাকা জমিয়েছে, তার কাছে যখন তখন ধার পাওয়া যায়। ক্রিস্তফের কাছে এক প্যাকেট সিগারেট ও আধ ঠোঙা চিনি চাইতে গেলে ও বলে, সিগারেটটা ফেরত দিতে হবে না, কিন্তু চিনিটা ফেরত দিও! ওদের দেশে চিনির খুব অনটন!

এর মধ্যে আমি রাইটার্স ওয়ার্কশপে অনুবাদের কাজ বিশেষ কিছু না করলেও নিজস্ব লেখালেখি শুরু করেছিলাম বেশ প্রবলভাবেই। 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই সেই কয়েক মাসে লেখা। যদিও অতদূরের এক জায়গায় বসে লিখছি, কিন্তু বিদেশের কোনো প্রসঙ্গ আসেনি সেই সব কবিতায়, কেন আসেনি, তাও তো আশ্চর্য ব্যাপার। কবিতা লেখার সময় আমি মনেপ্রাণে দেশে ফিরে যাই। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা আমার আত্মার একটা টুকরোর সমান। আমি হঠাৎ বিদেশে চলে আসায় এই পত্রিকার ভার নিয়েছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তাঁকে সাহায্য করতেন প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও উৎপলকুমার বসু। কৃত্তিবাসের খবরাখবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম, তার জন্য লেখা পাঠাতাম নিয়মিত।

এই সময় আমি একটা গদ্য রচনাও শুরু করি।

মার্গারিট আর আমি পালা করে কখনো কোনো ভারতীয় কাহিনী, কখনো কোনো ফরাসী বা ইওরোপীয় কাহিনী শোনাতাম পরস্পরকে। আমি ওর কাছে বিস্তৃত ভাবে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণনা করার পর ও আমাকে শুনিয়েছিল ত্রিস্তান ও ইসল্টের প্রেম-বিরহ গাথা, এই বিশ্ব-বিখ্যাত প্রেম কাহিনীটি বাংলায় তখনও পর্যন্ত অপরিচিত ছিল। একসময় ইওরোপের দেশে দেশে ত্রুবাদুররা এই আখ্যান গেয়ে গেয়ে বেড়াতো। পশ্চিমী সাহিত্যে অসংখ্যবার এর উল্লেখ আছে। প্রেমিক, বীর যোদ্ধা, বীণাবাদক, দক্ষ নাবিক, আবার ব্যর্থ প্রেমিক ও ভিখারী ত্রিস্তানের চরিত্রের কোনো তুলনা নেই। টেনিসন, ম্যাথু অর্নল্ড, সুইনবার্ন, টমাস হার্ডি প্রমুখ লিখেছেন এই দুঃখী ত্রিস্তান ও তার প্রেমিকা সোনালি ইসল্টেকে নিয়ে, ভাগনার রচনা করেছেন অমর গীতিনাট্য।

আমার মনে হয়েছিল বাঙালী পাঠকদেরও এ কাহিনী জানা উচিত। আমি লিখতে শুরু করলাম, মার্গারিটের তাতে কি দারুণ উৎসাহ। সে অনেক বইপত্র নিয়ে আসে, নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ করে দেয়। ফরাসী ভাষায় জোসেফ বেদিয়ে ত্রিস্তান কাহিনীর সব কটি ভাষ্য মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন, মার্গারিট তার সারাংশ আমায় শোনায়। একই সঙ্গে নতুন কিছু জানা, পড়া ও লেখার সমন্বয় হলে তা বড়ই আনন্দদায়ক হয়। সারা দিনে দু'তিন পাতা লিখতে পারলেও মনে হয় দিনটা সার্থক। বেশ একটা ঘোরের মধ্যে দিনগুলো কাটতে লাগলো। কয়েক মাসের মধ্যে 'সোনালি-দুঃখ' নাম দিয়ে সেই পুরো কাহিনীটিই আমার লেখা হয়ে গেল। বলতে গেলে সেটাই আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ গদ্য রচনা।

মার্গারিটের বন্ধুত্ব প্রায় সর্বগ্রাসী। সে নিজের মুখেই স্বীকার করতো, তার খুব হিংসে; আমাকে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে একলা মিশতে দেখলেই তার রাগ হয়। সুতরাং একমাত্র পল এঙ্গেলের স্ত্রী মেরি ছাড়া আর কোনো মার্কিন মহিলাকে আমার ভালোভাবে জানার সুযোগই হয়নি। মাঝে মাঝে পল এঙ্গেলের বাড়িতে আমাকে যেতেই হতো, এছাড়া আমরা দু'জনকে নিয়েই মগ্ন ছিলাম।

অকস্মাৎ মার্গারিটের দেশ থেকে টেলিগ্রাম এলো, তার মা খুব অসুস্থ। মার্গারিট কান্নাকাটি করলো খানিকক্ষণ, তারপর ঠিক করলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে মায়ের কাছে পৌঁছোতেই হবে। তখন মাসের শেষ, আমাদের দু'জনের হাতেই টাকা নেই, তবু কোনোক্রমে ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাওয়া গেল, টিকিটও সংগ্রহ হলো, আমি মার্গারিটকে তুলে দিয়ে এলাম এয়ারপোর্টে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অনেক কাজ ফেলে যাচ্ছে, ওকে দু'সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসতেই হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, মার্গারিট চলে যাওয়ায় আমি সাময়িক ভাবে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলাম। ও আমাকে বড্ড বেশি ঘিরে রেখেছিল। যে দেশে এসেছি, সে দেশটাকে খোলা চোখে ভালো করে দেখতেও পারিনি। যে-কোনো বন্ধন, এমনকি ভালোবাসার বন্ধনও এক এক সময় অসহ্য লাগে।

এবার আমি শুরু করলাম ভ্রমণ। শিকাগো, লস এঞ্জেলিস, সান ফ্রান্সিসকো, বার্কলে, অ্যারিজোনান মরুভূমি, মেক্সিকোর প্রান্ত শহর। একা একাই ঘুরি, কোথাও কোনো বাঙালীকে চিনি না, পল এঙ্গেলের রেফারেন্সে দু' একটি বড় শহরে আমেরিকান অধ্যাপক বা লেখকদের কাছে আতিথ্য নিই। সান ফ্রান্সিসকোতে দেখা হলো অ্যালেন গীন্সবার্গের বন্ধু কবি লরেন্স ফেলিংগেটির সঙ্গে। দীর্ঘকায় সেই প্রৌঢ়টি আলাপের তৃতীয় বাক্যেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে ? অ্যালেন কলকাতায় থেকেছে, বারাণসীর গঙ্গা দেখেছে, আমি কেন পারবো না ?

মার্গারিটের ঠিক সময়ে ফেরা হলো না। সপ্তাহে সে আমাকে তিনখানা চিঠি লেখে, এর মধ্যে দু'বার লং ডিসটেন্স টেলিফোনেও কথা হয়েছে। তার মায়ের ব্যাধি বেশ কঠিন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না উঠলে মার্গারিটের ফেরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রত্যেকটি চিঠিতে এবং টেলিফোনেও মার্গারিট জিজ্ঞেস করেছিল, সুনীল, তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ?

মাসখানেক কেটে যাবার পর আমি এক অন্যরকম আলোড়ন টের পেলাম। আমার এই নবলব্ধ মুক্তিও তো আমি ঠিক উপভোগ করতে পারছি না। সব সময় একটা অস্থিরতা। মার্গারিটের সান্নিধ্য ছাড়া আর সব কিছুই আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে।

পল এঙ্গেল একদিন খাবার নেমন্তন্ন করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আগামী সেমেস্টার

থেকে আমাদের বিভাগে সহকারী হিসেবে যোগ দেবে ? মার্ক চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় তোমাকে নিতে পারি। তোমার উপার্জন খানিকটা বৃদ্ধি পাবে।

আমি দুম করে বলে ফেললাম, আমিও চলে যাবো। আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না !

পল চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, চলে যাবে ? কেন, এখানে তোমার কিসের অসুবিধে হচ্ছে ?

আমি কাঁচুমাচু ভাবে বললাম, না, এখানে কোনোই অসুবিধে নেই। প্রচুর আরামে আছি। কারুর কাছ থেকে কক্ষনো মন্দ ব্যবহার পাইনি। তবু আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পল বললেন, দেশে তো তোমার স্ত্রী নেই, তবে কার জন্য ফিরবে ? তোমার চাকরিও নেই, ফিরে গেলে খাবে কী ?

আমি বললাম, আমি বাংলায় লেখালিখি করতে চাই, আমার কি নিজের দেশের মানুষের মধ্যেই ফিরে যাওয়া উচিত নয় ?

পল বললেন, ইণ্ডিয়াতে কি শুধু লেখালেখি করে সংসার চালানো যায় ?

আমি বললাম, খুবই কষ্টকর নিশ্চয়ই। তবু তো একটা ঝুঁকি নিতেই হবে।

পল বললেন, তবু তুমি আমার একটা কথা শোনো। তুমি আর এক বছর অন্তত এখানেই থেকে যাও। এখানে বসেও লেখালেখি করার অনেক সময় পাবে। এর মধ্যে দেশে চিঠিপত্র লিখে দ্যাখো, সেখানে কোনো জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারো কি না। সেরকম যদি কিছু পাও, তারপর চলে যেও !

পল এঙ্গেলের স্ত্রী মেরি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সব সময় প্যান্ট-শার্ট পরেন, ছোট্টখাট্টো বালকের মতন তাঁর চেহারা। রান্নাঘর থেকে এসে সব শুনে মেরি জোর দিয়ে বললেন, না, না, ও কোথায় যাবে ? এই দুষ্টু ছেলেটাকে আমি কোথাও যেতে দেব না !

আমার গালে গাল ঠেকিয়ে মেরি আরও আদর করে বললেন, এ ছেলেটাকে আমি আমার পোষ্যপুত্র করে রেখে দেবো !

সেদিনকার মতন কথা ওখানেই থেমে রইলো। কিন্তু আমি আমার মন ঠিক করে ফেলেছি।

সে-বছর আমার মতন যে-এগারোজন বিদেশী লেখক-লেখিকা যোগ দিয়েছিল আয়ওয়ার ওয়ার্কশপে, তাদের মধ্যে সাতজনই আরও এক বছর অন্তত থেকে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল এর মধ্যেই। সেই ষাটের দশকের গোড়ায় আমেরিকায় চাকরির সুযোগ ছিল প্রচুর, বিদেশীদের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়িও ছিল না। সারা বিশ্ব থেকে দলে দলে ছেলেমেয়েরা ছুটে যাচ্ছে সেই দেশে। আমিই বোকার মতন উল্টো স্রোতে সাঁতার কাটতে চাইছি।

আমার সংকল্পের কথা কারুকে জানালাম না। গোপনে গোপনে ব্যবস্থা সারতে লাগলাম, মিটিয়ে দিলাম যার কাছে যা ছিল ধার। খরচ বাঁচাবার অছিলায় এই অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে ডর্মিটারিতে চলে যাবো বলে মার্গারিটের জিনিসপত্র রেখে দিলাম ক্রিস্তফের ঘরে। ক্রিস্তফ এর মধ্যে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছে যে দেশ থেকে সে আনিয়েছে তার স্ত্রীকে। সেই পোলিশ মহিলা একবর্ণ ইংরিজি জানেন না, তাঁর সঙ্গে আমরা বোবার মতন হাত পা নেড়ে কথা বলি। ওয়ারসতে ক্রিস্তফ একটা অনুবাদ সংস্থায় চাকরি করতো, সেখান থেকে আরও ছ'মাসের ছুটি আদায় করে নিয়েছিল, সুতরাং ওরা দু'জনেই এখানে থাকবে আপাতত।

পল আমার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। একদিন একটা ফর্ম দেখিয়ে

বললেন, এইখানে সই করো।

আমি কাঁচুমাচু মুখে জানালাম, আমি কালই চলে যেতে চাই!

পল চুপ করে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তিনি খানিকটা আঘাত পেয়েছিলেন ঠিকই। যে-কোনো কারণেই হোক, অন্যান্য বিদেশী লেখক-লেখিকাদের তুলনায় পল আমার প্রতি একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব করতেন। সেবারে ওই দলটির মধ্যে আমিই ছিলাম কনিষ্ঠতম, তা ছাড়া ভারত সম্পর্কে পলের খানিকটা মোহ ছিল। পল আমাদের কলকাতার আড্ডা দেখেছেন, ওখানে প্রায়ই সেই সব গল্প করতেন। অন্যান্য সদস্যরা আমাকে অনেক সময় ঠাট্টা করে বলতো, পল দেখছি তোমার কথা বলতে শুরু করলে আর থামেনই না! এড্রিয়ান মিচেল নামে একজন ব্রিটিশ লোক ঠোঁট উল্টে বলেছিল, এখানে দেখছি পলই একমাত্র আমেরিকান, যার মুখে কলকাতার প্রশংসা শুনতে পাই! তাহেরে শফরজাদে নামে একটি ইরানী মেয়ে বলেছিল, তুমি ভারতীয়, তুমি নিশ্চয়ই জাদু জানো। নইলে পল আর মেরি শুধু তোমাকেই এত ঘন ঘন নেমন্তন্ন করে কেন?

দুঃখিত হলেও পল আমাকে আর বাধা দেননি। তিনি আমার মনোভাব বুঝেছিলেন। তিনি বললেন, মানুষের একটাই তো মাত্র ছোট্ট জীবন, যার যেটা ভালো লাগে সেটাই তো করা উচিত।

আমার কাছে একটা রাউণ্ড দা ওয়ার্ল্ড বিমান-টিকিট ছিল আগে থেকেই, তাতে আমি পৃথিবীর যে-কোনো দেশে যখন খুশি নামতে পারি। তখন ভিসারও কড়াকড়ি ছিল না এমন। এক দেশ থেকে অন্য দেশের ভিসা সংগ্রহ করা যেত কয়েক মিনিটে। এমনকি অনেক দেশের এয়ারপোর্টে নেমেও ভিসা পাওয়া যেত। ক্যানাডা, পশ্চিম জার্মানি, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে, ইংলণ্ডে তো বটেই, আমাদের ভিসার প্রয়োজনই হতো না। পৃথিবীটা তখনো অনেকটা সরল ছিল।

বাড়িওয়ালাকে নোটিস দিয়ে রেখেছিলাম আগেই। কিন্তু জিনিসপত্রের কী হবে? এর মধ্যে আমার নিজস্ব অনেক জিনিসও জমে গেছে। ভালো ভালো কম্বল, বিছানার চাদর, টেবিল ল্যাম্প, অত্যাধুনিক ইস্ত্রি, কত রকম গেলাস, কাপ-সসার, রান্নাঘরের অতি সুদৃশ্য সব থালা বাসন, যা দেশে পাওয়া যায় না, আরও কত কী! এগুলো কী করে নেওয়া হবে? অনেকে এসব ছোট ছোট প্যাকেট বানিয়ে জাহাজ ডাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়, দু'তিন মাস বাদে পৌঁছোয়। এখন বসে বসে কে এত সব প্যাকেট বানাবে? আমার অস্থির অস্থির লাগছে। তারপর এক সময় মনে হলো, ধুৎ! ফিরবো দমদমের দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে, সেখানে এত সব আবর্জনা বাড়িয়ে কী হবে? থাক, সব পড়ে থাক! মার্গারিট আমার পাশে থাকলে ঠিক এই একই কথা বলতো।

আয়ওয়া থেকে যখন বিমানে চাপতে যাচ্ছি, পল এঙ্গেল আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আবার দেখা হবে! আমি তাঁর প্রতি প্রবল টান অনুভব করলেও ভরসা করে এর পুনরুক্তি করতে পারিনি!

এই মহাদেশ ত্যাগ করার আগে কয়েকটা দিন থেকে যেতে হবে নিউ ইয়র্কে। ওই অঞ্চলটা ভালো করে ঘোরা হয়নি। যদিও মার্গারিটকে দেখার জন্য ছটফট করছি, কিন্তু নিউ ইয়র্কেও রয়েছে অ্যালেন গীনস্‌বার্গ। সে এর মধ্যে অনেকবার টেলিফোনে বলেছে, চলে এসো, চলে এসো।

৮

অসংখ্য সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে
সময়ের স্রোত
এবং কেই বা বিখ্যাত হতে চায় এবং অটোগ্রাফ সই করতে চায়
সিনেমা স্টারদের মত....
....আমি জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কী হবে—

—অ্যালেন গীনসবার্গ

অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ আমাকে জানিয়েছিল যে ওর তখনো কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, গ্রিনিচ ভিলেজে একটি বিশেষ বইয়ের দোকানে ওর খোঁজ করতে। নিউ ইয়র্ক শহরে আমি তখন কোনো বাঙালীকেই চিনতাম না। আর কারুর বাড়িতে আতিথ্য নেবার প্রশ্নই নেই, ব্যাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আমি এসে উঠলাম ঐ গ্রিনিচ ভিলেজেরই একটা সস্তার হোটেলে। হোটেলটা আমাদের শিয়ালদা স্টেশানের কাছাকাছি হোটেলগুলোরই মতন, বেশ নোংরা, সরু একচিলতে ঘর, খাট-বিছানা আর ওয়ার্ডরোব ছাড়া আর কিছুই নেই, ভাড়া তখনকার হিসেবে বারো ডলার, অর্থাৎ ষাট টাকা।

সেই ঘরে জিনিসপত্র রেখে, তালা দিয়ে, বেরিয়ে পড়লাম বইয়ের দোকানটির সন্ধানে। দোকানটির নাম এইট্‌থ স্ট্রিট বুক শপ। নিউ ইয়র্কে রাস্তা খোঁজা বেশ সহজ, আমার হোটেল পাঁচ নম্বর রাস্তায়, মাত্র তিনটে ব্লক হেঁটে যাওয়া কিছুই না।

অগাস্ট মাসের দুপুর, বাতাসে শীত নেই, ঝকঝক করছে রোদ, রাস্তায় প্রচুর মানুষজন, কত বিচিত্র রকমের পোশাক। গ্রিনিচ ভিলেজে চব্বিশ ঘণ্টাই মানুষের চলাচল। আমাদের দেশের জনতার সঙ্গে তফাত এই যে, নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান সমান তো বটেই, হয়তো নারীদের সংখ্যা বেশি।

দোকানটি বেশ বড়, ভেতরে প্রচুর অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েদের ভিড়, আমি প্রথমে ঘুরে ঘুরে দেখলাম, সেখানে শুধু আধুনিক লেখকদের বই-পত্র রাখা আছে। 'ভিলেজ ভয়েস' এবং 'এভার গ্রিন রিভিউ' আধুনিকদের নাম-করা পত্রিকা, সেগুলিও রয়েছে গাদা গাদা। একসময় আমি কাউন্টারের যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, অ্যালেন গীন্‌সবার্গ এখন কোথায় আছে বলতে পারো?

যুবকটি মুখ তুলে বললো, তোমার নাম কী? তুমি কি ভারতীয়?

আমার নাম শুনে সে বললো, হ্যাঁ, অ্যালেন তোমার কথা বলে রেখেছে। তুমি এই পাশের সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে যাও!

তিন তলায় এসেই আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরন হলো। ডান দিকের একটা ঘরে একটা

গান বাজছে, সেটা শুধু যে বাংলা গান তাই-ই নয়, সেটা একটা লোকসঙ্গীত, ফান্দেতে পড়িয়া বগা কান্দে রে...।

এক বছর আমি কোনো বাংলা গান শুনিনি। এরকম একটা লোকসঙ্গীত নিউ ইয়র্কে এসে শুনবো, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

ঘরের দরজা খোলা, একটা খাটের ওপর আধ-শোওয়া হয়ে অ্যালেন পা নাচাচ্ছে, পাশের টেবিলের ওপরে রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে সেই গান।

অ্যালেন গীন্‌সবার্গের বয়েস তখন চল্লিশের কাছাকাছি, আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। তার মুখভর্তি দাড়ি, দু'একটিতে পাক ধরেছে, মাথায় বাবরি চুল। সবচেয়ে চমকপ্রদ তার পোশাক, সে একেবারে পুরোপুরি মিলিটারি সেজে আছে, সেইরকমই প্যান্টকোট, শুধু মাথায় টুপিটা নেই।

আমাকে দেখেই অ্যালেন তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরলো, ফটাফট দু'গালে চুমো দিয়ে বললো, এসেছো ? এসেছো তা হলে ? খুব ভালো করেছো ! ক'দিন থাকবে ? আবার কবে আয়ওয়া ফিরতে হবে ?

আমি বললাম, আর আয়ওয়া-তে ফিরছি না !

অ্যালেন বললো, চমৎকার ! চমৎকার ! ঐ মিড ওয়েস্টে মানুষ থাকতে পারে ? শুধু গমের খেত ! মানুষগুলো সব সেকেলে !

আমার কিন্তু আয়ওয়া-র নিন্দে পছন্দ হলো না। আয়ওয়া-র প্রকৃতি আমার ভালো লেগেছে, মানুষেরা সহৃদয়, আয়ওয়ার এক বছর আমার জীবনে একটা রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে।

অ্যালেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শক্তি, তারাপদ, জ্যোতি, শরৎকুমার, সন্দীপন, উৎপল, মতি নন্দী এই সব বন্ধুদের খবর জিজ্ঞেস করতে লাগলো। শক্তির সঙ্গে অ্যালেনের খুবই ভাব হয়েছিল, সে বললো, আই মিস্ শাক্‌টি !

কলকাতার গল্প করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ একসময় অ্যালেন বললো, এই রে, ভাত পুড়ে গেল বুঝি !

পাশের রান্না ঘরে অ্যালেন ভাত চাপিয়েছিল, বেশ ফুটে উঠেছে এর মধ্যে।

অ্যালেন বললো, আমি রান্না করছি, তুমি আমার সঙ্গে খাবে ? আমি খুব ভালো ডাল রান্না করতে শিখেছি।

রান্নার প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনা মনে পড়লো। কলকাতায় একদিন একটা কলা খেতে খেতে অ্যালেন একটা কথা খুব সুন্দর করে বলেছিল।

সেটা ছিল মর্তমান কলা, ঠিক ঠিক পাকা, হলুদ রঙের খোসাটা বড় স্নিগ্ধ। খোসা ছাড়িয়ে কলায় এক কামড় দিয়ে অ্যালেন বলেছিল, অতি চমৎকার, নিখুঁত স্বাদ, দোকানের কোনো খাবারের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। ঈশ্বর খুব ভালো রাঁধুনি। একটু থেমে অ্যালেন আবার বলেছিল, গড ইজ দা বেস্ট কুক !

খেতে বসে আবার চললো নানারকম গল্প। কিন্তু অ্যালেনের পোশাকটা আমার দৃষ্টিকটু লাগছিল। অ্যালেন ঘোরতর যুদ্ধবিরোধী আমি জানি, অথচ তার অঙ্গে সামরিক সাজ ! অ্যালেন যখন কলকাতায় ছিল, সেই সময় কিউবার সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিল, আমেরিকা কিউবার দিকে পাঠিয়েছিল গানবোট, ওদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ানও যুদ্ধজাহাজ পাঠাবার হুঁসিয়ারি দিয়েছিল, কয়েকটা দিনের জন্য আর একটা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনায় কেঁপে উঠেছিল পৃথিবী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তখন কেনেডি, অ্যালেন তাঁকে

গুণ্ডার সর্দার, মাথা মোটা প্রে-বয় ইত্যাদি যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়েছিল আমাদের সামনে। পৃথিবীর যে-কোনো যুদ্ধেরই বিরোধী অ্যালেন। এই প্রসঙ্গে সে প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক সিলিন-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল আমাদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও সিলিন ছিলেন প্যাসিফিস্ট, এ জন্য অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে তাঁকে। এক রেস্তোরাঁর মধ্যে দাঁড়িয়ে সিলিন চিৎকার করে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি একজন কাওয়ার্ড ! যুদ্ধের বিরোধিতা করা যদি কাপুরুষতা হয়, তবে আমি নির্লজ্জভাবে কাপুরুষ !

আমি অ্যালেনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এই বিদঘুটে পোশাক পরে আছো কেন ?

অ্যালেন হেসে বললো, কেন, আমাকে মানায়নি ? ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো, আমার এক বন্ধু আর্মিতে ছিল, সে মারা গেছে। তার বিধবা তার সব পোশাক-আসাক আমাকে দিয়ে দিয়েছে, আমার জামাকাপড় ছিল না, বেশ কাজে লেগে যাচ্ছে। আমার থাকার জায়গাও নেই, এক একদিন এক এক বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। তবে, এবার আমরা একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি, সেটা সারানো হচ্ছে। পিটার আসুক, সেটা আমরা দেখতে যাবো !

একটু বাদেই পিটার এসে উপস্থিত। পিটার অরলভস্কি, অ্যালেনের স্ত্রী। অ্যালেন ঘোষিত সমকামী এবং পিটারের মতন একজন লম্বা-চওড়া পুরুষকে প্রকাশ্যে নিজের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে তার কোনো দ্বিধা নেই। এই নিয়ে আমেরিকাতেও তখন হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল, আমাদের দেশে কেউ তো এ ব্যাপার সহ্যই করতে পারবে না। পরবর্তী যুগে সমকামীদের একত্র বাস অনেক দেশে বৈধ হয়েছে, কিন্তু সেই আমলে এটা ছিল অভিনব, বহু নিন্দিত ব্যাপার। কবি হিসেবে অ্যালেন গীন্‌সবার্গ তখন আমেরিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয়, লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী তার ভক্ত কিন্তু মার্কিন সরকার বা বিভিন্ন এস্টাব্লিশমেন্ট তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অ্যালেন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রীয় নীতিরও কড়া সমালোচক। তার 'আমেরিকা' নামের বিখ্যাত কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন এরকম সাঙ্ঘাতিক :

America I've given you all
and now I am nothing
America two dollars and
twenty seven cents January 17, 1956
I can't stand my own mind
America when will we end
the human war?
Go fuck yourself with your atom bomb...

পিটারের মতন এমন সরল, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। অ্যালেন বুদ্ধিজীবী, প্রচুর পড়াশুনো করেছে, সব সময় সে একটা সাহিত্য-শিল্পের ঘোরের মধ্যে থাকে। পিটার সব কিছুই নিজের অনুভূতি দিয়ে বোঝে। তার শরীরে রাগ বলে কোনো বস্তু নেই, সে ভুলেও অন্য কারুর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটবে না। অনেক সময় অ্যালেনের চেয়ে পিটারের সঙ্গে কথা বলতেই বেশি ভালো লাগে।

পিটার আমাকে দেখে কোনোরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। শান্তভাবে বললো, ও, সুনীল, সুনীল, ইয়েস, ইয়েস, খাচ্ছো, খেয়ে নাও, আমার খাওয়া হয়ে গেছে...। যেন কালই দেখা হয়েছে তার সঙ্গে।

পরের দিনই হোটেল থেকে পিটার আমার মালপত্র তুলে নিয়ে চলে এলো ওদের নতুন

বাড়িতে।

আমরা সাধারণভাবে নিউ ইয়র্ক বললেও মূল শহরটির নাম ম্যানহাট্‌ন। দ্বীপটাকে যদি একটা মাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে এর লেজের দিকটা গরিব পাড়া। বিশাল বিশাল চওড়া কয়েকটি রাজপথ চলে গেছে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, সেগুলির নাম এভিনিউ, আর এগুলিকে সমান্তরালভাবে কাটাকুটি করে গেছে বহু রাস্তা, এগুলিকে বলে স্ট্রিট। ঠিকানা শুনলেই বোঝা যায় কে কোন্ পাড়ায় থাকে। তিন নম্বর, পাঁচ নম্বর রাস্তায় বেকার, ভবঘুরেদের বাস, আর পঁয়ষট্টি কিংবা উনআশি নম্বর রাস্তার অধিবাসী মানেই রীতিমতন ধনী।

এই নিচের দিকের পাড়াগুলো, যাকে বলে লোয়ার ইস্ট সাইড কিংবা লোয়ার ওয়েস্ট সাইড, এরই কাছাকাছি গ্রিনিচ ভিলেজ। একসময়, ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে ছিল যত রাজ্যের কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের আখড়া, অনেকটা এককালের প্যারিসের মমার্ত-এর মতন। পরে অবশ্য ঐ দুই অঞ্চলই টুরিস্টদের ভিড়ে চরিত্র নষ্ট করে ফেলে।

ম্যানহাট্‌নের গরিব এলাকা নিয়ে সেই সময় একটা চমৎকার ফিল্‌ম তোলা হয়েছিল, 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'। হলিউড প্রচুর নিকৃষ্ট ফিল্‌ম উৎপাদন করে। কিন্তু কিছু কিছু মিউজিকাল্ ছবি তুলনাহীন। আমেরিকার মিউজিকাল্‌স অনেকগুলিই সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' একটি ক্লাসিক ছবি হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। অসামান্য বুদ্ধির প্রয়োগ আছে এর কাহিনী নির্মাণে। শেক্‌সপীয়ারের রোমিও-জুলিয়েট-এর গল্পটিকেই যেন হুবহু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এক আধুনিক পটভূমিকায়। রোমিও-জুলিয়েটে দুই প্রতিবেশী বনেদী পরিবারের ঝগড়া, এক পরিবারের ছেলের সঙ্গে অন্য পরিবারের মেয়ের প্রেম, প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকার ভাইকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, সবই অবিকল রয়েছে এখানে। তবে বনেদী পরিবারের বদলে গরিব পোর্টুরিকান আর সেইরকমই গরিব আর বেকার শ্বেতাঙ্গদের দু'টি পাড়ার বিবাদ রয়েছে কাহিনীর কেন্দ্রে। ঘটনাগুলি সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়, কিন্তু ছবিটির আরও বড় আকর্ষণ, এর সংলাপ সবই গানের সুরে বাঁধা, প্রত্যেকটি চরিত্রের পদক্ষেপে আছে নাচের ছন্দ।

ফিল্‌মটা আমি আগেই দেখেছি দু'বার, তাই অ্যালেনদের নতুন বাড়ির তিন নম্বর লোয়ার ওয়েস্ট সাইড পাড়াটা আমার খুব চেনা লাগে। পোর্টুরিকান, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ঘুরছে, এখানে সেখানে ভাঙা বোতল, রকে বসে এক একটা দঙ্গল বীয়ার পান করছে কিংবা গাঁজা টানছে, হঠাৎ হঠাৎ মারামারিও লেগে যাচ্ছে দুই দলে, তারপরই শেয়ালের ডাকের মতন শব্দ তুলে ছুটে আসছে পুলিশের গাড়ি।

অ্যালেনদের অ্যাপার্টমেন্টটা পাঁচতলায়। লিফ্‌ট নেই। ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি, দেয়ালে কাঠ কয়লা দিয়ে কত যে খারাপ কথা লেখা, তার আর ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশেও এরকম বাড়ি দেখলে আমার বেশ আরাম লাগে।

অ্যাপার্টমেন্টটাও বড় বিচিত্র। একখানাই মাত্র ঘর, সেটা টানা, লম্বা, প্রায় চারখানা ঘরের সমান, তার একদিকে রান্নার জায়গা, তারপর বসার জায়গা, তারপর শোওয়ার জায়গা, মাঝখানে দেওয়ালের কোনো বালাই নেই। এই ঘরখানিতেও খানিকটা জীর্ণ ভাব আছে, ওয়াল পেপার স্থানে স্থানে ছেঁড়া, রান্নার জায়গায় সিংক্‌টা ফুটো, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে, সেটার তলায় একটা গামলা রাখতে হয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি অ্যালেনের সংসারে বেশ একাত্ম হয়ে গেলাম। সংসার তো নয়, হট্টমেলা। কত লোক যে আসছে-যাচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই, যার যখন খুশি রান্না

করে নিয়ে খাচ্ছে, রাত্তিরেও শুয়ে পড়ছে দশ বারোজন।

ফ্লাওয়ার চিলড্রেন কিংবা হিপি-দেরও আগের সময়কার কথা। তখন বীট জেনারেশনের আন্দোলন চলছে, লোকে এদের বলতো বীটনিক। এটা ছিল মূলত লেখক-শিল্পী-সঙ্গীতকারদেরই আন্দোলন, তখন এর প্রধান দুই নেতা ছিল জ্যাক কেরুয়াক এবং অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ।

অ্যালেনের তত্ত্ব ছিল এই যে, শিল্প-সাধনা একটা চব্বিশ ঘন্টার কাজ, লেখক-শিল্পীদের কোনো চাকরি-বাকরি করা উচিত নয়। সরকার কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেও তারা কোনোরকম সাহায্য গ্রহণ করবে না। নিজেদের সাহিত্য-শিল্প সামগ্রীর বিনিময়ে পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের কাছ থেকে যা পাবে, তা দিয়েই গ্রাসাচ্ছাদন করতে হবে। সেজন্যই জীবনযাত্রার মানও হবে অতি সরল, পেট ভরাতে হবে অতি সাধারণ খাবারে, যে-কোনোরকম পোশাকে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এমনকি দাড়ি কামাবার পয়সাও বাঁচানো যেতে পারে। আমেরিকার সমাজে সেই প্রথম ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক পরা শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের আবির্ভাব। অ্যালেন গীন্‌সবার্গ যথেষ্ট শিক্ষিত, সে একসময় 'নিউজ উইক' পত্রিকায় চাকরি করেছে, ইচ্ছে করলেই সে দামি গাড়ি হাঁকিয়ে, সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে থেকে, উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করতে পারতো, কিন্তু সে ইচ্ছে করেই এরকম ত্যাগের জীবন বেছে নিয়েছিল।

অ্যালেনের কাছে অনেকেই আশ্রয় নিতে লাগলো, তার কারণ অন্যদের তুলনায় অ্যালেনেরই কিছু রোজগার ছিল। তরুণ কবি-লেখকদের বই বিশেষ বিক্রি হয় না, গায়ক-শিল্পীরা আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যালেন গীন্‌সবার্গ তখন অসম্ভব জনপ্রিয়। সে কবিতা ছাড়া আর কিছু লেখে না, তার কবিতার বই 'হাউল' তখনই এক লক্ষ কপির বেশি বিক্রি হয়ে গেছে। সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কাডিস্'ও বিক্রি হচ্ছে হুহু করে। এর থেকে প্রাপ্য সব অর্থই অ্যালেন খরচ করে অন্যদের জন্য।

অ্যালেনের বন্ধু এবং বীটনিকদের অপর গুরু জ্যাক কেরুয়াক-ও তখন গদ্য লেখক হিসেবে খুব সার্থক। কেরুয়াক তখন বছরে তিন-চারখানা করে উপন্যাস লিখছে। তার উপন্যাসে প্লট খোঁজার কোনো ঝামেলা নেই, অধিকাংশই তার নিজের ও বন্ধু-বান্ধবের জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা। কিন্তু সেই সময় জ্যাক কেরুয়াক খানিকটা রেক্‌লুজ বা একা-চোরা ধরনের হয়ে পড়েছিল, অ্যালেনের মতন সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে চলার সে পক্ষপাতী ছিল না। সে একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতো লং আয়ল্যান্ডে। তার এরকম ব্যবহারে বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই কিছুটা ক্ষুব্ধ, তার সম-সাময়িক অপর বিখ্যাত কবি গ্রেগরি করসো একদিন খুব রাগারাগি করলো। ঈষৎ মত্ত অবস্থায় গ্রেগরি ফোন করে বললো, এই জ্যাক, তুই আমাদের নিয়ে উপন্যাস লিখছিস, আমাদের চরিত্র বানাচ্ছিস, তা হলে তুই তোর রয়ালটির ভাগ আমাদের দিবি না কেন রে? দে, টাকা দে!

টেলিফোনের ওপাশ থেকে জ্যাক কেরুয়াক কী উত্তর দিয়েছিল, তা আমার শোনা হয়নি।

অ্যালেনের এই অ্যাপার্টমেন্টে সর্বক্ষণ হৈ-চৈ। দলে দলে ছেলেমেয়ে এসে, কেউ ওখানেই ছবি আঁকতে বসে যাচ্ছে, কেউ গীটার বা ভায়োলিন বাজিয়ে গান জুড়ে দিচ্ছে, কেউ জোর করে কবিতা শোনাবেই। অ্যালেন নিজেও তখন গানের চর্চা শুরু করেছে। এর আগে সে উইলিয়াম ব্লেকের কিছু কবিতায় সুর দিয়ে গান গাইতো, এই সময় সে শুরু করলো হরে কৃষ্ণ নাম গান। কলকাতা থেকে অ্যালেন একটা ছোট হারমোনিয়াম কিনে নিয়ে

গিয়েছিল, ঐ বস্তুটি আমেরিকায় কেউ কখনো দেখেনি। সেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে গাইতে গাইতে অ্যালেন জিজ্ঞেস করতো, সুনীল দ্যাখো তো, সুরটা ঠিক হচ্ছে কিনা !

এই গান আমরা ছেলেবেলায় অনেক শুনেছি, গ্রামের অনেক মানুষ সকালে এই গান গাইতো, ভিখিরিরাও এই গান গেয়ে ভিক্ষে করতে আসতো। কিন্তু আমার জানা সুরের সঙ্গে অ্যালেনের ঠিক মেলে না। অ্যালেন এই গান শিখেছিল বেনারস থেকে, সুতরাং হিন্দী আর অ্যামেরিকান উচ্চারণ মিলে মিশে সে এক অন্যরূপ ধরেছিল। অ্যালেনের মুখে গানটা এইরকম শোনাতো : হ্যা-রে কৃ-ষ-ষ-না, হ্যা-রে কৃ-ষ-ষ-না, হ্যারে রা-ম্-মাঃ, হ্যারে রাম্-মাঃ...ইত্যাদি। আমি খুব হাসতাম বলে অ্যালেন জোর করে আমাকে গেয়ে শোনাতে বলতো, তারপর সবাই মিলে এক সঙ্গে গলা মেলাতো। ম্যানহাট্নের সেই অ্যাপার্টমেন্টে বসে যেত এক সঙ্কীর্তনের আসর।

শুধু গান-বাজনা আর কবিতাই নয়, এখানে মাদক সেবন এবং সহবাসও চলতো অবাধে। গাঁজা-চরস ওদেশে সাঙ্ঘাতিকভাবে নিষিদ্ধ, ধরা পড়লেই পাঁচ বছর জেল, তবু ছেলেমেয়েরা জোগাড় করে আনতো যে-কোনো উপায়ে। অল্প বয়েসীদের এই মাদক সেবনের অভ্যেস ছাড়াবার নানারকম চেষ্টা চলছে, স্যালেভশান আর্মি গ্রিনিচ ভিলেজে কফি পার্লার খুলেছে, যাতে ছেলেমেয়েরা কফি খেয়ে অন্য বদ অভ্যেস ছাড়ে। অনেকেই সেই বিনা পয়সার কফি দু'তিন কাপ খেয়ে নিয়ে তারপর যেত গাঁজা টানতে। সেই সঙ্গে এল্ এস ডি !

কলকাতাতেই শক্তি ও আমি একদিন এল এস ডি খেয়ে দেখেছি। তারাপদ রায়ের বাড়িতে শক্তি ও আমি সেই এল এস ডি খেয়ে চার ঘণ্টা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, অপূর্ব সেই অভিজ্ঞতা, শেষের দিকে শক্তির মৃত্যুভয় এসে গিয়েছিল, তবু সে হাসছিল হা-হা করে, আমি বারবার দেখতে পাচ্ছিলাম একটি সাত-আট বছরের রক্তমাংসের বালককে, যার মুখ ঠিক আমার বাল্যের ঐ বয়েসের। আমেরিকায় গিয়ে কিন্তু আমি আর এল এস ডি খাইনি। যে-কোনো নতুন জিনিসই একবার চেখে দেখতে কিংবা পরীক্ষা করতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কোনো কিছুরই দাস হওয়া আমার স্বভাবে নেই। অ্যালেনের ঘরে নব্য লেখক-লেখিকারা আমাকে মাদক গ্রহণের জন্য বারবার পেড়াপিড়ি করলেও আমি রাজি হইনি কিছুতেই।

নেশার ঘোরে যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে প্রবলভাবে জড়াজড়ি শুরু করতো একসময়। যে-হেতু লম্বা ঘরের মধ্যে কোনো আব্রু নেই, তাই এক দিকের আলো নিভিয়ে দেওয়া হতো, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে গল্প করতো আর একটি দল। অনেক মেয়েরই খুব পছন্দ ছিল পিটারকে। পিটার একদিকে যেন অ্যালেনের স্ত্রী, আবার অন্য দিকে মেয়েদের প্রেমিক। কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই, সে এমনই নিরাসক্ত। অ্যালেনের কি ঈর্ষা হতো না এ জন্য ? পিটার কোনো মেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে অ্যালেন আপত্তি করতো না বটে, কিন্তু আমি লক্ষ করতাম, সেই সময় অ্যালেনের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হঠাৎ অন্যদের বকাবকি শুরু করে দেয়। এ যেন, 'আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া....'।

পিটারের একটি বান্ধবী ছিল প্রকৃতই অসাধারণ। তার নাম রোজ মেরি। সে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপিকা, কাব্য-সাহিত্যেও প্রচুর উৎসাহ, অন্য অনেক বিষয়েই প্রভূত জ্ঞান। কিন্তু এ হেন বিদুষী রোজ মেরির দুর্ভাগ্য তার চেহারা নিয়ে। সে ছ'ফিট

দু'ইঞ্চি লম্বা, শুধু টিং-টিঙে লম্বাই নয়, সেই অনুপাতে চওড়া, অর্থাৎ সে একটি নারী-দৈত্য, আমি গোপনে তার নাম দিয়েছিলাম হিড়িম্বা। এত লম্বা-চওড়া বলেই রোজ মেরির কোনো পুরুষ বন্ধু জোটেনি, তার বিবাহের কোনো আশাই নেই। তবে, এই দর্শনের অধ্যাপিকারিও রক্ত-মাংসের ক্ষুধা ছিল, সে জন্য সে বেছে নিয়েছিল পিটারকে। দু'জনের মনের মিলের কোনো প্রশ্নই নেই, শুধু শারীরিক ভালোবাসা। ওদের দেশে লাভ আর লাভ মেকিং-এর মধ্যে অনেক তফাত। এই রোজ মেরির রান্নার হাত ছিল চমৎকার, আড্ডা মারতে মারতে উঠে গিয়ে একসময় সে আমাদের জন্য রান্না করে দিত। রাঁধতে গিয়ে তার পোশাকটা যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য সে খুলে রাখতো তার গাউনটা, সম্পূর্ণ নগ্ন। তখন তার দিকে এক পলক তাকালেই মাথা ঘুরে যাবার মতন অবস্থা, যেন ববডিংনাগদের দেশ থেকে কোনো রমণী সেখানে দৈবাৎ এসে পড়েছে। তখনই হয়তো অ্যালেন সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে আমাকে উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়াম-এর কবিতা বোঝাচ্ছে, কিন্তু আমার পক্ষে মনঃসংযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়তো খুবই।

রোজ মেরি নাম্নী এক বিশাল রমণী-শরীর দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, যার গায়ে একটা সুতোও নেই, তার দিকে বারবার আমার চোখ চলে যাবে না ?

কয়েক দিনের মধ্যেই অ্যালেন এই সব হৈ-হল্লায় তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলো। সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যে হট্টগোল, সে নিজের লেখাপড়ারও সময় পায় না। তখন অ্যালেন নিয়ম করে দিল, সকাল বারোটার আগে কেউ আসতে পারবে না। তাতেও লাভ হলো না বিশেষ, প্রত্যেক রাতেই আড্ডা চলে প্রায় ভোর তিনটে-চারটে পর্যন্ত, তার ফলে ঘুমোতে হয় বেলা বারোটা পর্যন্ত। সবাই অ্যালেনের পয়সায় খাচ্ছে-দাচ্ছে, তাই অ্যালেন হুকুম দিল সবাইকেই কিছু না কিছু কাজ করতে হবে, পালা করে কেউ বাজার করবে, কেউ বাসন মাজবে, কেউ কাপড় কাচবে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল ব্রেকফাস্ট বানানোর, হট ডগ সেদ্ধ করা, ডিম ভাজা আর পাঁউরুটি সেঁকা আমার পক্ষে অতি সহজ কাজ।

এখানে স্থায়ী বাসিন্দা আমরা চারজন, তার মধ্যে গ্রেগরি করসো-কে দিয়ে কোনো কাজই করানো যায় না। তাকে ঘর ঝাঁট দেবার ভার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঝাঁটা হাতে নিয়েও গ্রেগরি একটা লম্বা গল্প শুরু করে, তারপর নিজের গল্পে নিজেই হেসে লুটোপুটি খায়। একসময় অ্যালেন তার হাত থেকে ঝাঁটাখানা নিয়ে নিজেই শুরু করতো ঝাঁট দিতে। এইরকম প্রতিদিন।

গ্রেগরি করসো অতিশয় বিশুদ্ধ ধরনের কবি, এবং একেবারেই পাগলাটে ধরনের মানুষ। তার ইটালিয়ান অরিজিন চেহারায় স্পষ্ট, খুবই রূপবান, কিন্তু সকাল থেকেই নেশা শুরু করে, গাঁজা-ভাঙ ছাড়াও তার মদেও যথেষ্ট আসক্তি, দাড়ি কামায় না, স্নান করে না, দাঁতও মাজে না। নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই সে হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অ্যালেনের কাছে এক একটা শব্দের বানান জিজ্ঞেস করে। মনে আছে, একদিন সে জিজ্ঞেস করেছিল, অ্যালেন, পোয়েট্রির প্লুরাল কি পোয়েট্রিজ হয় ? অ্যালেন বলেছিল, না, পোয়েম্স লেখো। তারপরই অ্যালেন আবার বলেছিল, হ্যাঁ, কেন হবে না, গ্রেগরি করসো লিখলে পোয়েট্রিজ-ও বিশুদ্ধ !

গ্রেগরি এক একদিন স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, সিল্কের জামা পরে বেরিয়ে যেত। সবাই হাসতে হাসতে বলতো, ও বিয়ে করতে যাচ্ছে ! বড়লোকের মেয়েদের ঠকানো ছিল গ্রেগরির একটা পেশা। তার সুন্দর চেহারা ও খ্যাতির জন্য আকৃষ্ট হতো অনেক মেয়ে, গ্রেগরি তাদের বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিত, দু'একজনকে সত্যি বিয়ে করে তাদের পয়সায় জুয়া

খেলতে যেত, কিন্তু কোথাও সাত দিনের বেশি টিকতে পারেনি। সে একেবারে জন্ম-বাউণ্ডুলে।

অ্যালেন আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, গ্রেগরি টাকা ধার চাইলে খবরদার দেবে না। ও কক্ষনো ফেরত দেয় না। গ্রেগরিকেও ধমকে দিয়েছিল, তুমি খবরদার সুনীলের কাছে টাকা চাইবে না, ওর টাকা নেই। গ্রেগরি বলতো, না, না, তুমি থাকতে আমি এ গরিব ইন্ডিয়ানের টাকা মারবো, তাও কি হয়!

বেশ কয়েকদিন আমি মেতেছিলাম এখানে। মাগারিটকেও ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়। আয়ওয়ায় থাকার সময় আমার মন টিকছিল না, তখন মনে হতো আয়ওয়াটাই আমেরিকা, কিন্তু এখানে পরিবেশ একেবারে অন্যরকম। এক দল ছেলেমেয়ে সবসময় উৎসাহে টগবগ করছে, সাহিত্য-শিল্প ছাড়া আর কোনো কথা নেই, জীবন-যাপনের কোনো চিন্তা নেই, এই বোহেমিয়ানিজমের আকর্ষণ এমনই তীব্র যে কাটানো প্রায় অসম্ভব। অ্যালেনও আমাকে বলেছিল, এখানে থেকে যাও, কোনো অসুবিধে নেই, তোমার কিছু লেখা-টেখা আমি অনুবাদের ব্যবস্থা করে দেবো, তাতেই তোমার হাতখরচ চলে যাবে!

একদিন রাত্তিরে অ্যালেন ও আমি লম্বা হলঘরটার এক প্রান্তে শুয়ে আছি। নানারকম গল্প করতে করতে অ্যালেন একসময় আমার গালে দু'টো হাল্কা চাপড় মেরে বললো, সুনীল, হবে নাকি?

সমকামী অ্যালেন আমাকে তার পার্টনার হতে বলছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করে আমি ভাবলাম, মন্দ কী? দেখাই যাক না, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। ক্ষতি তো কিছু নেই। আমি বললাম, ঠিক আছে, হোক। তুমি একবার, তারপর আমি একবার।

অ্যালেন আঁতকে উঠে বললো, না, না, তা হবে না। আমি অ্যাকটিভ। আমি প্যাসিভ হতে পারি না।

আমি বললাম, ওসব অ্যাকটিভ-প্যাসিভ আমি বুঝি না। আমি অভিজ্ঞতাটা পুরোপুরি চাই। তুমি যা করবে, আমিও তাই করবো।

অ্যালেন বললো, থাক, দরকার নেই। দরকার নেই।

পরদিন সকালবেলা অ্যালেন বললো, তুমি কোনো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছো না কেন? এখানে কত মেয়ে আসে, একজনকে বেছে নাও!

তখনই মাগারিটের কথা প্রবলভাবে আবার মনে পড়ে গেল আমার। এখানে অনেক যুবতীর সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, কিন্তু কারুর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হয়নি। যখন তখন কারুর সঙ্গে শুয়ে পড়া আপাতত চলতি ফ্যাশান, যেন সবরকম সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু মাগারিট আমার মন প্রাণ জুড়ে আছে।

সেই দিনই একটা কাণ্ড হলো। অ্যালেন, পিটার ও অন্যান্যরা দুপুরবেলা বেরিয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে শুধু আমি আর গ্রেগরি। গ্রেগরি স্নান-টান করে, ভালো জামা পরে বেরুবার উদ্যোগ করলো, আমাকে বললো, এক রাজকুমারীর কাছে যাচ্ছি, দু'দিন ফিরবো না। গ্রেগরিকেও এক রাজকুমারের মতনই দেখাচ্ছে। আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে, সন্দেহ হলো, একা পেয়ে টাকা ধার চাইবে। কিন্তু গ্রেগরি কিছুই বললো না। সাড়ম্বরে সাজগোজ করলো, তারপর দরজার কাছে গিয়ে বললো, বাই, সুনীল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সে, শুনতে পেলাম তার জুতোর শব্দ। একটু পরেই সে ফিরে এলো দৌড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, তোমার কাছে খুচরো পঞ্চাশ ডলার হবে, শিগগির দাও, শিগগির, আমি ট্যাক্সি ধরে দাঁড় করিয়ে এসেছি, ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে, পঞ্চাশটা ডলার, চটপট দাও।

এমনই অপূর্ব গ্রেগরির কায়দা যে আমি প্রত্যাখ্যান করার কোনো সুযোগই পেলাম না, মন্ত্র-মুগ্ধের মতন তার হাতে তুলে দিলাম পঞ্চাশ ডলার। সে আবার হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল।

গ্রেগরি চেয়েছিল খুচরো পঞ্চাশ ডলার, ঠিক যেন খুচরো পঞ্চাশ পয়সা চাইছে। আমার কাছে ছিলই মোট সত্তর ডলার। গ্রেগরি চলে যাবার পর গুম হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। অ্যালেন সাবধান করে দিয়েছিল, তবু ঠকতে হলো, দোষ আমারই। তারপর মনে হলো, যাক ভালোই হয়েছে। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এদেশে পৌঁছেছি, সেইভাবেই ফিরে যাবো। অ্যালেনের ঘর থেকে ফ্রান্সে একটা ফোন করলাম মাগারিটকে। আমি প্যারিস যাবো শুনে সে দারুণ খুশি, তার মা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। প্যারিসে আমার থাকার জায়গারও কোনো অসুবিধে হবে না। টাকা-পয়সার জন্যও চিন্তা নেই।

সেই দুপুরেই বেরিয়ে আমার প্লেনের টিকিটটা কনফার্মও করে আনলাম পরের দিনের জন্য। বিকেলে অ্যালেনকে জানালাম অভিপ্রায়। অ্যালেন বললো, প্যারিস ঘুরে আবার চলে এসো এখানে।

সে রাত্রেও আড্ডা ও গান হলো প্রায় ভোর পর্যন্ত। একেবারে শেষের দিকে ফিরে এলো গ্রেগরি। সগর্বে চেঁচিয়ে বললো, আজ জুয়া খেলায় অনেক জিতেছি, এই নাও সুনীল, তোমার পঞ্চাশ ডলার। আরও দশ ডলার দিচ্ছি, উইথ মাই কমপ্লিমেন্টস্।

সবাই একেবারে থ। গ্রেগরি করসোর জীবনে এটা নাকি রেকর্ড। সে এ পর্যন্ত কারুর ধার শোধ করেনি।

পরদিন সকাল সাতটায়, সবাই তখন ঘুমোচ্ছে, কারুকে না জাগিয়ে আমি সুটকেস নিয়ে নেমে গেলাম নীচে। এক বছর আগে নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে একা নেমেছিলাম, কেউ আমাকে নিতে আসেনি, এবারেও একাই ফিরে গেলাম সেখানে। আমার আমেরিকা-প্রবাসের এখানেই ইতি।

৯

"রক্তের মধ্যে এক তোলা ভালোবাসা
আত্মার মধ্যে এক বিন্দু সত্য
মাত্র কয়েক দানা খুদ, খুব শীতের একটি দিনে
একটি চড়াই পাখির বাঁচার জন্য যে-টুকু দরকার
তোমরা কি ভাবো, পৃথিবীর মহত্তম সন্তদের ওজন
এর চেয়ে বেশি ?"

—পীয়ের এমানুয়েল

একই সঙ্গে শূন্যতা ও পূর্ণতার বোধ মানুষের হয়। মানুষের বুকের খাঁচাটা এমনই এক রহস্যময় স্থান।

আটলান্টিক মহাসমুদ্র পেরুবার সময় আমার বুকটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। যেন অজান্তে বিষম একটা অপরাধ করে ফেলেছি। চিরকালের মতন ছেড়ে যাচ্ছি আমেরিকা, পাঁচ বছরের ভিসা থাকলেও খরচ করে ফেলেছি টিকিটটা, আর টিকিট কাটার সাধ্য আমার কখনো হবে না। আয়ওয়া নামের ছোট্ট সুন্দর শহরটির ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল, সেখানে আমার নিজস্ব একটা ঘর ছিল, ইচ্ছে মতন লেখা-পড়া করার সময় ছিল, সেখানে থেকে গেলে আমাকে হয়তো আর কখনো অর্থ চিন্তা করতে হতো না। ছেড়ে এসে কি ভুল করলাম ? কিংবা, নিউ ইয়র্কে অ্যালেন গীন্‌সবার্গের বাড়ির আড্ডা, কত কবি-শিল্পীর জমায়েত সেখানে, অ্যালেন থেকে যেতে বলেছিল, থাকলে আমার অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ হতো। ঝোঁকের মাথায় সব ছেড়ে-ছুঁড়ে এরকমভাবে চলে আসা, ভুল করেছি, না ঠিক করেছি ? কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

মেঘহীন, রবিকর উজ্জ্বল দিন। বিমানের জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি নীল জলরাশি। মাথার ওপরে ও নিচে বিশাল নীল শূন্যতা। বিমর্ষতার মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ আমার মনে লাগছে এক একটা ঢেউয়ের ঝাপটা। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্যারিস পৌঁছোবো, মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হবে। সেই সম্ভাবনার আনন্দে ভরে যাচ্ছে আমার বুক। শুধু প্যারিস দেখা নয়। মার্গারিটের সঙ্গে প্যারিস দেখা, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে ?

যাওয়ার পথে প্যারিস বিমান বন্দরে পা দেবার সময় আমার মুখ-চোখে একটা ভীতু ভীতু ভাব ছিল, এক বছরের পশ্চিমী প্রবাসে আমি অনেক সাবালক হয়েছি। দুটো চারটে ফরাসী বাক্যও জানি। কোনো কারণে মার্গারিট আমাকে রিসিভ করতে না আসতে পারে যদি, তা হলেও একেবারে হারিয়ে যাবো না।

কাস্টম্‌স বেরিয়ারের ওপাশে অনেক লোকজন প্রতীক্ষা করে। আমার প্রথমেই চোখ

পড়লো হলুদ স্কার্ট পরা, সোনালি চুলের যুবতীটির ওপর। মার্গারিট ছাড়া আর কাকেই দেখতে পেলাম না। যেন একটা শূন্য স্থানে সে একা দাঁড়িয়ে আছে।

ধরা-ছোঁয়ার দূরত্বের মধ্যে আসতেই মার্গারিট আমার দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলো। ফরাসী কায়দায় দু'গালে। তারপর হাসি-কান্না মেশানো গলায় বললো, আমি খুব দুর্বল, সুনীল। মাকে ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না, আর তোমাকে ছেড়েও এতদিন থাকতে পারছিলাম না কিছুতেই।

সেই আনন্দের মুহূর্তেও আমার মাথায় একটা নিষ্ঠুর সত্য ঝিলিক দিয়ে গিয়েছিল। মার্গারিটকে ছেড়েও আমাকে চলে যেতে হবে। আমি ফ্রান্সে অনন্তকাল থাকতে আসিনি। কিন্তু তখনই সেই কথাটা মার্গারিটকে বলা যায় না।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে মার্গারিট আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা ট্যাক্সিতে যাবো, না বাসে ?

আমি বললাম, ট্যাক্সি ? তোমার মাথা খারাপ নাকি ? অত পয়সা কোথায় ? আমি কিন্তু প্রায় সব টাকাই খরচ করে ফেলেছি !

মার্গারিট বললো, ভালোই হয়েছে। আমার কাছেও টাকা নেই। মায়ের চিকিৎসার জন্য হাতে যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে। তবে, সুখের কথা এই যে, মা কালই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেছেন। আমি এখন প্যারিসে ইচ্ছে মতন তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে পারবো।

আমি বললাম, তা হলে আমাদের চলবে কী করে ?

মার্গারিট বললো, ধার করবো। আমার বেশ কয়েকজন বান্ধবী আছে, যাদের কাছে টাকা ধার করে এক বছর পরে ফেরত দিলেও চলবে।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমরা থাকবো কোথায় ?

মার্গারিট হাসতে হাসতে বললো, এখন তো ঠাণ্ডা নেই, যে-কোনো জায়গায় শুয়ে থাকতে পারি। স্যেন নদীর ধারে ভবঘুরেদের সঙ্গে কাটানোই বা মন্দ কী ? রেড ওয়াইন আর লম্বা রুটি খাবো ! সত্যি, সুনীল, কয়েকটা দিন নদীর ধারে শুয়ে শুয়ে কাটিয়েই দেখা যাক না !

মেয়েটা সত্যি পাগলী ! নদীর ধারে ক্লোশার-রা শুয়ে থাকে আমি জানি। তাদের সম্পর্কে অনেক গল্পও শুনেছি, কিন্তু আমি তাদের সমগোত্রীয় হবো কী করে ? আমি বিদেশী, পুলিশ আমাকে দেখতে পেলেই তুলে নিয়ে যাবে ! আলজিরিয়ান কিংবা ভিয়েৎনামী হলেও না হয় কথা ছিল, ফ্রান্সের প্রাক্তন কলোনির অনেক মানুষ এখানে আশ্রয় নিয়েছে। যেমন ইংলন্ডে ভিড় করেছে বহু ভারতীয় ও পাকিস্তানী।

অবশ্য মার্গারিটের এই প্রস্তাবের উত্তরে আমার কোনো বাস্তবসম্মত উত্তর দেওয়া সাজে না। আমি বললাম, বাঃ, চমৎকার। নদীর ধারে শুয়ে থাকা তো অতি উত্তম ব্যাপার। কলকাতায় আমি গঙ্গার ধারের শ্মশানে শুয়ে থেকেছি কয়েকবার।

একটা বাসে চেপে আমরা চলে এলাম শহরের কেন্দ্রস্থলে, আবার অন্য বাসে প্লাস পিগাল-এ। আসবার পথে আমি ক্ষুধার্ত চোখে গিলছিলাম প্যারিস শহরটিকে। আমরা পরজীবনে বিশ্বাস করি না, এই তো আমাদের স্বর্গ। রাস্তার ধারে, ফুটপাথের ওপরেই অনেক রেস্তোরাঁর চেয়ার-টেবিল পাতা, সেখানে বসে বসে অনেকে অলসভাবে কফি কিংবা বিয়ার-এ চুমুক দিচ্ছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যে-সব তরুণীরা, তারা সাজগোজ করেছে ঠিকই, কিন্তু দেখলে বোঝা যায় না, প্রসাধনের পর সেটা গোপন করাই একটা আর্ট।

এক জায়গার দেয়ালে একটা পোস্টার দেখে চমকে উঠলাম। সেখানে বড় বড় অক্ষরে

আমার নাম লেখা। তারপর ক্রমশ পোস্টারের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, সবগুলিতেই সুনীল, সুনীল ! প্যারিসের দেয়ালে দেয়ালে আমার নাম, এই শহর কি আমার মতন এক অজ্ঞাত-কুলশীলকে স্বাগত জানাচ্ছে ? আমি যে আজই আসবো, তা জানলো কী করে নগরের মেয়র ?

এটা আমার স্বপ্ন নয়। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা সত্য যে সেদিন প্যারিসের দেয়ালে অসংখ্য পোস্টারে আমার নাম দেখেছি। শুধু আমার নাম, আর কিছু লেখা নেই। আসল ব্যাপারটা হলো, SUNIL নামে একটা নতুন সাবান বেরুতে যাচ্ছে,ঐসব পোস্টারে তারই বিজ্ঞাপন ! অনেক বছর পরেও আমি জার্মানির এক দোকানে ঐ SUNIL নামের গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট দেখেছিলাম। সম্প্রতি ওদেশে এক নতুন বিস্কুটের বিজ্ঞাপনও দেখা যাচ্ছে, সেই বিস্কুটের নাম মুক্তি। এখন মুক্তি নামের কোনো বঙ্গীয় নারী প্যারিসে গিয়ে সেই বিজ্ঞাপনের পোস্টারগুলি দেখলে আমারই মতন চমকিত ও পুলকিত হবেন।

মুল্যাঁ রুজ নামে রেস্তোরাঁ-নাইট ক্লাবটি বিশ্ব-বিখ্যাত। তার সামনে আমরা বাস থেকে নামলাম। মাগারিট দোকানটির দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললো, আমরা এখন ওখানে যাবো ?

আমি বিমূঢ়ভাবে ওর দিকে তাকালাম। কী ব্যাপার, মাগারিট কি লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে নাকি ?

মাগারিট রহস্যময় ওষ্ঠে হাসতে লাগলো। তারপর ঠিক মুল্যাঁ রুজ-এর মধ্যে নয়, তার পাশের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে এলো ভেতরে। সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে গেলাম তিনতলায়। বোঝা গেল সেটা একটা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি, লম্বা টানা বারান্দা। এক তলায় নানান দোকান ও অফিস, ওপরের দিকে অ্যাপার্টমেন্ট। একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাবি লাগাতে লাগাতে মাগারিট বললো, এটা এখন আমাদের !

ভেতরটা বেশ সুসজ্জিত, তিনটি শয়ন কক্ষ, বসবার ঘরটাতে বইপত্রের স্তূপ। তা হলে নদীর ধারে, আকাশের নিচে শুতে হবে না ? এটা কার অ্যাপার্টমেন্ট, মাগারিট কী করে জোগাড় করলো, সে রহস্য সে সহজে ভাঙতে চায় না, খালি উল্টোপাল্টা কথা বলে। শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, তা বেশ মজার।

মাগারিটের এক কলেজের বান্ধবীর নাম মোনিক। সেই মোনিক তার অন্য দু'জন বান্ধবীর সঙ্গে এই অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছিল, তিনজনেই চাকরি করে। এর মধ্যে একজন বিয়ে করে নতুন অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাচ্ছে, দ্বিতীয়জন গেছে এ মাসের শুরুতেই। আগে তিনজন ভাগাভাগি করে ভাড়া দিত, এখন মোনিক একা এত বড় অ্যাপার্টমেন্ট রাখতে পারবে না, সে-ও চলে যাবে অন্য জায়গায়। এই মাসটার ভাড়া দেওয়া আছে, তাই থাকতে বাধা নেই, খালি দু'খানা ঘর সে মাগারিটকে ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ বিনা পয়সায় আমাদের এই বিলাসের বাসস্থান !

মোনিকের সঙ্গে আলাপ হলো বিকেলবেলা। মাগারিটের সহপাঠিনী হলেও মোনিককে একটু বড় দেখায়, তার মুখে মাগারিটের মতন সারল্য ও কৌতুক নেই, বরং বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। ছিপছিপে তরুণী, কলার তোলা কালো রঙের একটা পোশাক পরা। তার কাটালো মুখখানা যে-কোনো ভাস্করকে আকৃষ্ট করবে। আমাকে স্বাগত জানালেও একটু পরেই বোঝা গেল, সে কথা কম বলে। একটিও ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে না সে, আমি তার সব কথা বুঝে উঠতে পারি না। বারবার পারদোঁ পারদোঁ বললে, সে একটা মোটকা ডিকশনারি এনে আমার সামনে রাখলো, সেটার নাম পেতি লারুস !

পরে আমি জেনে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম যে, এই মোনিক একটি পাবলিশিং হাউজে চাকরি করে, সেখানে তার কাজ শেক্সপীয়ার অনুবাদ। কতখানি ইংরিজি জ্ঞান থাকলে একজন শেক্সপীয়ার অনুবাদ করতে পারে তা অনুমেয়, তবু সে মুখে কিছুতেই ইংরিজি বলবে না ! এমনই ছিল ফরাসীদের ভাষা-অভিমান ! এখন এই গোঁড়ামি অনেকটা কমেছে।

মোনিক সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে অফিসে চলে যায়, আমি আর মাগারিটও নগর সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়ি। তখনকার ফ্রান্স কী গৌরবোজ্জ্বল, মহীরুহ সদৃশ লেখক-শিল্পীরা সেখানে বিচরণ করছেন। জাঁ পল সার্ত্র তখনো বেঁচে, তিনি এক রেস্তোরাঁয় প্রতিদিন সকালে কফি পান করতে যান, জীবিত আছেন আরি মিশো, রেনে শার-এর মতন কবিরা। ছবি আঁকছেন পিকাসো, রাস্তায় হঠাৎ দেখা যায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কিংবা চার্লি চ্যাপলিনকে। পশ্চিমী জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিরা জনতাকে এড়িয়ে চলেন না। লোকেও তাঁদের বিশেষ বিরক্ত করে না। হৈ হৈ হয় পপ্ স্টার কিংবা পপ্ সিংগারদের নিয়ে। সেই সময় বিট্‌লস্‌দের অভ্যুত্থান ঘটছে। সেই চারটি ব্রিটিশ ছোকরা গায়কদের নিয়ে তরুণ-তরুণীদের কী মাতামাতি ! একবার আমি পল এঙ্গেলের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের প্লাজা হোটেলে দিন দু'এক কাটিয়েছিলাম, সেই হোটেলেই উঠেছিল বিট্‌লসরা, তাদের জন্য সর্বক্ষণ হোটেলের সামনে ট্রাফিক জ্যাম। অথচ ওখানেই ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা অ্যালেক গীনেস, তিনি লবিতে বসে কাগজ পড়তে পড়তে চায়ে চুমুক দিতেন, কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে কোনো ভিড় নেই !

প্যারিসে তখন এসেছিলেন রিচার্ড বার্টন এবং এলিজাবেথ টেলর, কোনো শুটিং উপলক্ষে নয়, এমনিই বেড়াতে, তাঁদের প্রেমকাহিনী নিয়ে প্রমোদ-জগৎ উত্তাল, সমস্ত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁদের ছবি। উন্নাসিক ফরাসীরাও ঐ যুগল চিত্রতারকাকে দেখার জন্য ক্ষ্যাপামি করছে শুনে মাগারিটের কী রাগ !

আমি তখন তাকে একটা গল্প শোনালাম। একদিন নিউ ইয়র্কের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সেই রাস্তারই অন্য ফুটপাথে ছিলেন এককালের হলিউডের নায়িকা লানা টার্নার, যাঁর অভিনয়ের চেয়ে বক্ষদেশের প্রসিদ্ধিই ছিল বেশি। লানা টার্নারকে দেখামাত্রই রাস্তায় ভিড় জমে গেল। তখন আইনস্টাইনের এক সঙ্গী আপসোস করে বললেন, স্যার, দেখুন, দেখুন, এ যুগের সভ্যতার কী ট্র্যাজেডি ! আপনি, আপনি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এখানে রয়েছেন, তবু আপনাকে কেউ চিনতে পারছে না, আর সবাই হ্যাংলার মতন ঐ মেয়েছেলেটির দিকে ছুটছে !

আইনস্টাইন হেসে বললেন, এটাকে ট্র্যাজেডি বলছো কেন ? লোকে তো দেখবেই, ঐ মেয়েটির অনেক কিছু দেখাবার আছে, আমার তো আর তা নেই !

আমরা যাকে বলি আইফেল টাওয়ার, ফরাসীরা বলে তুর দেফেল, তার পাশ দিয়ে আমরা দু'জনে হেঁটে যাচ্ছি, কিন্তু মাগারিট আমাকে কিছুতেই ওর ওপরে চড়তে দেবে না। টুরিস্টরা প্যারিসে এসেই আইফেল টাওয়ারের দিকে ছুটে যায়, টুরিস্টরা যা যা করে কিংবা দেখে, তার কোনোটাই আমার চলবে না। মাগারিটের নির্দেশ, প্রথম দিন যতখানি সম্ভব পায়ে হেঁটে প্যারিস শহরটা দেখতে হবে। শুধু এর রাস্তা। নদীর ওপর সেতুগুলি, বিচিত্র সব হর্ম্যসারি এবং গাছপালার দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম না করলে এখানকার সংস্কৃতিও বোঝা যাবে না।

কোনো নতুন জায়গা দেখতে হলে পায়ে হেঁটে ঘোরাই যে প্রকৃষ্টতম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্লান্ত হলে যে-কোনো জায়গায় বসে পড়া যায়। এ তো আর কলকাতা শহর

নয় যে বসার জায়গা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্যারিস শহরে রয়েছে প্রচুর উদ্যান, নদীর দুধার আগাগোড়া বাঁধানো, যে-কোনো জায়গায় বসে পড়া যায়। এত টুরিস্টদের ভিড়, তবু অনেক বেঞ্চ খালি পড়ে আছে। এরা সব কিছুই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রাখে।

প্যারিস শহরটার সৌভাগ্য এই যে কখনো এখানে বোমা পড়ে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লন্ডন শহর জার্মান বোমা বর্ষণে ছাতু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্যারিস রয়েছে অক্ষত। শত্রুরাও এই শহরটিকে ভালোবাসে। ফরাসীরা বোধহয় তাদের অতি গর্বের এই নগরীটিকে বাঁচাবার জন্য আগেই হিটলারের কাছে হার স্বীকার করে বসেছিল। পরে আমেরিকানরাও শত্রু অধিকৃত এই সুন্দরীকে আহত করতে চায়নি। জার্মানিতেও ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটাকে মিত্রবাহিনী বোমা মেরে মেরে একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু অদূরের হাইডেলবার্গ শহর তারা ধ্বংস করতে যায়নি। হাইডেলবার্গও এতই সুন্দর ও ঐতিহ্যসম্পন্ন যে তাকে নষ্ট করতে শত্রুরও হাত কেঁপেছিল।

প্যারিস বোমার ঘা খায়নি বটে, তবু বোমা-ভীতি ছিল নিশ্চয়ই। সেই জন্যই যুদ্ধ লাগার সময় প্যারিসের বিখ্যাত ভবনগুলি ধূসর রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ওপর থেকে ঠিক চিনতে পারা না যায়। যুদ্ধের পর ফ্রান্সের অর্থনীতি এমনই দুর্বল হয়ে যায় যে, সেই ধূসর রঙ তুলে শহরের রূপ ফিরিয়ে আনাও সাধ্যে কুলোয়নি। যুদ্ধ থামার প্রায় কুড়ি বছর পর সেই কাজ শুরু হয়েছে, আমরা হাঁটতে হাঁটতে দেখতাম, লুভ্‌র প্রাসাদ, নত্‌রদাম গীর্জার গায়ে ভারা বেঁধে মিস্তিরিরা ঘষাঘষির কাজ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঁচ আমরা ভারতে তেমন টের পাইনি, কিন্তু ইওরোপে তার চিহ্ন অত বছর বাদেও সর্বত্র। সেই সময়কার অধিকাংশ ফিল্‌ম ও থিয়েটার যুদ্ধ-কেন্দ্রিক।

হাঁটতে হাঁটতে কখনো রাস্তার ধারের কোনো রেস্তোরাঁয় বসা যায়। বুলেভার-এর ওপরেই চেয়ার-টেবিল পাতা। এক ফ্রাঁ দিলেই কফি পাওয়া যায়, তখন এক ফ্রাঁ আমাদের এক টাকার সমান। কফিতে চুমুক দিতে দিতে দেখা যায় পথের চলমান দৃশ্য। প্যারিসের সব কিছুই যেন আলগা ধরনের লাবণ্যময়।

এক কাপ কফি নিয়েও বসে থাকা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যত কম পয়সার খদ্দেরই হোক, কোনো খদ্দেরকেই উঠে যেতে বলার নিয়ম নেই এ-শহরে। এমনকি পরিচারকরা আশেপাশে এসে ঘুরঘুরও করবে না। আরও একটা চমৎকার নিয়ম আছে এখানে। প্রত্যেক রেস্তোরাঁয় বাথরুম রাখতেই হবে। অনেকে বাথরুম ব্যবহার করার জন্য আলাদা পয়সা নেয়, অনেকে নেয় না। কিন্তু বাথরুম ছাড়া কোনো দোকান খোলাই যাবে না। এই জন্যই তো শহর এমন পরিষ্কার থাকে।

দ্রষ্টব্য হিসেবে মার্গারিট আমাকে প্রথম নিয়ে গেল একটা কবরখানায়!

পের লাসেজ নামে সেই কবরখানা দেখে আমি চমকে উঠলাম। এখানে বহু বহু বিখ্যাত লেখক-শিল্পী সমাহিত, সেই জন্যই মার্গারিট আমাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কী অদ্ভুত যোগাযোগ, এই কবরখানা যে আমার খুব চেনা!

অন্যান্য সমাধিফলকের দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে এসে এক জায়গায় থেমে মার্গারিট বললো, এই দ্যাখো, এখানে গীয়ম আপোলীনেয়ার শুয়ে আছেন!

গীয়ম আপোলীনেয়ারের কবিতায় শকুন্তলার উল্লেখ আছে, সেই উপলক্ষে মার্গারিটের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই কবি আমাদের দু'জনের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছেন। মার্গারিট ফুলের তোড়া এনেছে সেই কবির জন্য।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এখানকার নাড়ি-নক্ষত্র আমি জানি!

মার্গারিট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী করে জানলে?

আমি বললাম, আমার বন্ধু অ্যালেন গীন্‌সবার্গেরও প্রিয় কবি এই আপোলীনেয়ার। সে পের লাসেজ-এ এই সমাধিস্থানটা নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছে। এখানে আসবার কয়েক দিন আগেই আমি নিউ ইয়র্কে অ্যালেনের সাহায্য নিয়ে সেই কবিতাটা অনুবাদ করেছি বাংলায়। কবিতাটার মধ্যে অনেক রেফারেন্স আছে, সব তো আমি জানি না। অ্যালেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তাতে আমার অনুবাদ করতে অনেক সুবিধে হয়েছে।

চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে আমি আবার বললাম, আপোলীনেয়ারের কবিতা, অ্যালেন গীন্‌সবার্গের কবিতা, আর তোমার আমার বন্ধুত্ব, সব যেন মিশেছে এখানে।

মার্গারিট বললো, তুমি পুরো কবিতাটা অনুবাদ করেছো? শোনাও, শোনাও, আমাকে বুঝিয়ে দাও?

আমি উচ্চারণ করলাম কয়েকটি লাইন :

...ফিরে এসে একটা কবরের ওপর বসে তোমার
স্মৃতি-ফলকের দিকে তাকিয়ে আছি
অসমাপ্ত লিঙ্গের মত একখণ্ড পাতলা গ্রানাইট
পাথরে একটি ক্রুশ মিলিয়ে যাচ্ছে, পাথরে দুটি কবিতা
একটি ওল্টানো হৃদয়
অপরটি প্রস্তুত হও আমার মত অলৌকিক
উচ্চারণ করেছি আমি কসত্রোউইত্‌স্কির গীয়ম আপোলীনেয়ার
কে যেন ডেইজি ফুল ভর্তি একটি আচারের বোতল
রেখে গেছে, এবং একটি
৫ বা ১০ সেন্টের সুররিয়ালিস্ট ধরনের কাচের গোলাপ
ফুল এবং ওল্টানো হৃদয়ে ছোট্ট সুখী সমাধি
এবং একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে যার সাপের মতন
গুঁড়ির কাছে আমি বসেছি
গ্রীষ্মের বাহার এবং পাতাগুলো সমাধির ওপর ছাতা
এবং কেউ এখানে নেই
কোন্ অশুভকণ্ঠ কাঁদে গীয়ম কোথায় তুমি এলে
তার নিকটতম প্রতিবেশী একটি গাছ
সেখানে নিচে হাড়ের স্তূপ এবং হলুদ খুলি হয়তো
এবং ছাপানো কাব্য আলকুল্‌স আমার পকেটে
তার কণ্ঠস্বর মিউজিয়ামে...

১০

রাত্রি বেলায়
রাত্রি বেলায়
আমি নিজেকে যুক্ত করি রাত্রির সঙ্গে
সীমানাহীন রাত্রি
আমার, সুন্দর, আমার
রাত্রি, জন্মের রাত্রি
যা আমার কান্নায় আমাকে ভরে দেয়...

—আঁরি মিশো

প্যারিস বা পারি একটি রাত-জাগা শহর। এখানে অনেক রেস্তোরাঁই খোলা থাকে রাত দুটো পর্যন্ত, কোনো-কোনোটার ঝাঁপ বন্ধ হয় ভোর চারটের সময়। আমরা তো আর সে-সব জায়গায় যাই না, আমাদের পয়সা কোথায় ? আমরা বাস ভাড়া, ট্রেন ভাড়া খরচ করি টিপে টিপে, দুপুরবেলায় রুটি আর খানিকটা চিজ আর স্যালামি কিনে নিয়ে কোনো পার্কে বসে খিদে মিটিয়ে নিই, বড় জোর এক কাপ কফি খাবার জন্য কোনো রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ বসি। ফরাসীদেশের কুলি-মজুররাও রাস্তার ধারে বসে লাঞ্চ খাবার সময় এক বোতল রেড ওয়াইন খায়। ওয়াইন নানা রকম দামের হয়, হাজার টাকা বোতলও আছে, আবার দু' টাকাতেও পাওয়া যায় এক বোতল। সস্তার ওয়াইন মাগারিট একেবারে সহ্য করতে পারে না, তাই আমরা ওয়াইন কিনি না। মাগারিটের বাড়ির তৈরি কয়েক বোতল ওয়াইন সে এনে রেখেছে, নৈশভোজের সময় বাড়িতে বসে তা পান করা হয়। আমাদের দেশে আগে অনেক বাড়িতেই কাসুন্দি তৈরি হতো, ফরাসীদেশে অনেক পারিবারিক ওয়াইনই সেরকম।

আমাদের নৈশভোজও অতি সংক্ষিপ্ত। সন্ধের সময় বাড়ি ফেরার পথে একখানা রুটি, বেশ শক্ত এবং প্রায় দু'হাত লম্বা রুটি, কিনে আনি। এই রুটির নাম বাগেত্, লাঠির মতন একখানা বাগেত্ হাতে নিয়ে অনেক লোক বাড়ি ফিরছে, এটা সন্ধেবেলার একটা পরিচিত দৃশ্য। একখানা রুটিতেই দু'তিনজনের খাওয়া হয়ে যায়। সঙ্গে কিছু স্যালাড, মাখন আর চিজ, কিছু একটা মাংসের টুকরো, তারপর আইসক্রিম।

এক একদিন ভাত খাবার জন্য আমার মন খুব আনচান করে। দিনের পর দিন স্যান্ডুইচ চিবোতে চিবোতে মনে হয় বাংলাভাষাই বুঝি ভুলে গেছি, আমার হাসির আওয়াজটাও সাহেবদের মতন হয়ে যাচ্ছে। মাগারিট আর মোনিক ভাত অপছন্দ করে না, কিন্তু ফ্যান গালতে জানে না বলে রাঁধতে হয় আমাকেই। আমেরিকায় তখন ইনস্ট্যান্ট রাইস বেরিয়ে

গেছে, মাপ মতন জল দিয়ে পাঁচ মিনিট ফোটালেই ধপধপে সাদা ভাত হয়ে যায়, ফ্যান-টান থাকে না, কিন্তু ফ্রান্সে সেই ইনস্ট্যান্ট রাইস খুঁজে পাইনি। ভাত তো আর স্যালামি কিংবা চিজ দিয়ে খাওয়া যায় না, তার জন্য ডাল-তরকারি-মাছ-মাংসের ঝোল লাগে। সুতরাং, ভাত খাওয়ার দিন পুরো রান্নার ভারই আমার ওপর। সকালবেলা আমি একটা থলে হাতে নিয়ে বাজার করতে যাই। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, কুর্জেৎ নামে এক ধরনের কুমড়ো আর আলু পেঁয়াজ কিনি। টাটকা মাছ সে পাড়ায় পাওয়া যেত না, ফ্রোজেন মাছ আর ওসব দেশের মুর্গী আমার বিস্বাদ লাগে। গরুর মাংসের বেশ দাম, আমাদের পক্ষে বিলাসিতা, এক মাত্র কখনো কেউ নেমন্তন্ন করলে বীফ খাওয়ার সুযোগ ঘটতো। সে সময় ঘোড়ার মাংস বিক্রি হতো খুব, সেটাই সস্তা, তারপরই খরগোশের মাংস। আমি ঘোড়া কিংবা খরগোশের মাংসই কিনে এনে ঝোল বানাতাম। স্কুলে পড়ার সময় আমি বয়েজ স্কাউট ছিলাম, তখন রান্না শিখে কুকিং ব্যাজ পেয়েছি, আমার রান্নার কেউ নিন্দে করতে পারবে না!

সারাদিন আমরা ঘোরাঘুরি করতাম বলে দুপুরের খাওয়াটা যেন তেন ভাবে সেরে নিতে হতো, ভাত খাওয়ার আড়ম্বর রাত্তিরে। মোনিক প্রায়ই দেরি করে ফেরে, সে তার স্টেডি বয়-ফ্রেন্ডের সঙ্গে দামী দামী রেস্তোরাঁয় খেতে যায়। কিন্তু যেদিন আমি ভাত রান্নার কথা ঘোষণা করি, সেদিন মোনিক ইন্ডিয়ান ফুড আস্বাদ করার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। মোনিকের ভাষায় সেটা 'হিন্দু খাদ্য'।

রান্না ঘরটি বেশ বড়। আমি আদা-জিরে-পেঁয়াজবাটা মেখে যখন মাংস কষি, তখন দুই যুবতী দু'পাশে দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে দেখে। কখনো আমি গরম ডেকচিতে ভুল করে হাত দিয়ে ছ্যাঁকা খেলে ওরা হেসে হেসে একে অন্যের কাঁধে ঢলে পড়ে ; ভাজবার জন্য গরম তেলে ফুলকুপি ছাড়তেই সেই শব্দ শুনে ওরা কৃত্রিম ভয়ে দৌড় মারে। আবার কখনো মাংস প্রায় সেদ্ধ হতেই ওদের একজন হাতায় করে খানিকটা ঝোল তুলে চুমুক দিয়ে সেই হাতাটা আবার ডুবিয়ে দেয়। ফরাসীদের এঁটো জ্ঞান তো বিন্দুমাত্র নেই বটেই, ফরাসী বা ইংরিজি ভাষাতেও এঁটো শব্দটাই নেই।

খাওয়ার টেবিলে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হয়। আমার রান্না ভাত-তরকারি মাংসের সঙ্গে মাগারিটের মায়ের বানানো রেড ওয়াইন আর মোনিকের পিসির পাঠানো কালভাডোজ (আপেলের সুরা)। মাগারিটের অধিকাংশ গল্পই কাব্য-সাহিত্য ও লেখক-শিল্পীদের সম্পর্কে। মোনিক কথা কম বলে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুক টুক করে বেশ মজ করতে পারে! হঠাৎ কোনো প্রশ্ন করে আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে পারলেও সে বেশ আনন্দ পায়।

একদিন সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী রকম ফরাসী শিখেছো, দেখি! এই কবিতার মানে বলো তো! সে গড়গড় করে বলে যেতে লাগলো :

পারসিয়েন্ পারসিয়েন্ পারসিয়েন্
পারসিয়েন্ পারসিয়েন্ পারসিয়েন্
পারসিয়েন্ পারসিয়েন্ পারসিয়েন্ পারসিয়েন্
পারসিয়েন্ পারসিয়েন্ পারসিয়েন্ পারসিয়েন্
পারসিয়েন্ পারসিয়েন্
পারসিয়েন্ পারসিয়েন্ পারসিয়েন্
পারসিয়েন্ ?

আমি চোখ গোল গোল করে বললাম, এ আবার কী কবিতা ? এ তো মোটে একটাই শব্দ।

মোনিক বললো, এটা একটা বিখ্যাত কবিতা।

আমি বললাম, যাঃ, হতেই পারে না, এটা একটা ধাঁধা!

মোনিক বললো, তুমি বিখ্যাত কবি লুই আরাগোঁ-র নাম শোনোনি? এটা তাঁর লেখা! লুই আরাগোঁর নাম শুনে আমার মাথা আরও ঘুলিয়ে যায়। তাঁর নাম কে না শুনেছে? শুধু কবিতা নয়, আমি অনুবাদে আরাগোঁর লেখা উপন্যাসও পড়েছি। কিন্তু এটার মানে কী?

আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখ ও অসহায় অবস্থা দেখে দুই সখী হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। ঝরনার কলস্বরের মতন তাদের হাসির ঝংকারে মুখরিত হলো মধ্যরাত।

শেষ পর্যন্ত ওরা মানেটা বুঝিয়ে দিল।

ফরাসী ভাষায় 'পারসিয়েন্' শব্দটির দুটি মানে হয়। একটা হলো ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডস্ বা আমরা যাকে বলি জানলার খড়খড়ি। আর একটা হলো পারস্য দেশের রমণী। জানলার খড়খড়ি দিয়ে সামান্য আলো আসে, তার সঙ্গে মুখে ওড়না ঢাকা পারস্যরমণীর মিল খুঁজে পেয়ে আরাগোঁ কৌতুক করেছেন।

কবিতাটি নিছক ধাঁধা নয়, পরে অনেক কাব্য সংকলনে আমি এই কবিতাটি দেখেছি। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, কবিতা কী? কবিতা অনেক রকম! সেই উক্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই রচনাটি।

রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত আড্ডা মেরে আমরা শুতে যাই। তিনজনের তিনটি ঘর। বিছানায় এসেও কিছুক্ষণ আমার ঘুম আসে না। সেপ্টেম্বর মাস, শীত একেবারেই নেই, একটা জানলা খোলা, বাইরে নানারকম শব্দ শুনে বোঝা যায়, নগরী এখনো জেগে আছে। প্লাস-পিগাল একটা প্রমোদ পাড়া, সারা রাত আলোয় ঝলমল করে। নানা রকমের নাইট ক্লাব রয়েছে এখানে, ছেলে-ধরা রমণীরা এখানে ঘুরে বেড়ায়। এখানে আনন্দ-ফুর্তি-মজার হুল্লোড় যেমন হয়, তেমন আবার গুণ্ডাদের উপদ্রবও আছে শুনেছি, আবার সকালবেলা অনেক নিরীহ বুড়ো বুড়ি কিংবা অফিসযাত্রীদের ছোটাছুটি করতেও তো দেখেছি।

অল্প বয়েসে আমার ছেলেমানুষী ধারণা ছিল, প্যারিস বুঝি শুধু শিল্পী আর কবিদের শহর। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ এখানে এখনো জ্বলজ্বল করে। আসলে তো আর তা নয়, এই সুন্দর শহরটিতে চোর-জোচ্চোর-বদমাশদের সংখ্যাও কম নয়, বহু ধরনের ব্যবসায়ীদেরও এটা আড্ডাস্থল, বিশ্বের বহু দেশের ধনীরা এখানে আসে প্রমোদ সন্ধানে, তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হালকা করার জন্য বহু রকমের ছলা-কলা বিস্তার করে রয়েছে অনেক নারী-পুরুষ, এদের তুলনায় কবি-শিল্পী আর ক'জন? কবি-শিল্পীরা সব দেশেই অতি মাইনরিটি। তবু বিশ্বের অন্য বিখ্যাত শহরগুলির তুলনায় প্যারিস শহরের ইতিহাসে সাহিত্যিক-শিল্পীরা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ রাত্তিরের পথের দৃশ্য দেখি। কোথা থেকে যেন একটা ক্ল্যারিওনেটের মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে। একটি উজ্জ্বল লাল রঙের স্কার্ট পরা তরুণী দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, একটু বাদেই সে আবার হাতে এক গোছা সাদা ফুল নিয়ে ফিরে এলো। এত রাতেও কি কোথাও ফুল বিক্রি হয়? মনে হয় যেন একটা স্বপ্নের দৃশ্য।

আমার মুশকিল এই যে, আমি বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে পারি না। অনেককে দেখেছি, বেলা দশটা-এগারোটা পর্যন্ত দিব্যি ঘুমোতে পারে। কিন্তু আমি যত রাতেই শুতে যাই, সূর্যের আলো ফোটার পর আর বেশিক্ষণ বিছানায় থাকতে পারি না। সাতটা-সওয়া সাতটার মধ্যেই প্রবল চা-তৃষ্ণা পায়।

মাগারিট আর মোনিক জাগে না, আমি প্যান্ট, জুতো-মোজা পরে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে আসি। এক একদিন ব্রেক ফাস্টের খাবারপত্র কিনে আনি। সন্ধেবেলা যেমন বাগেত্ রুটি, সকালবেলা তেমনি ক্রোয়াঁস। ফরাসীরা পাঁউরুটি টোস্টের বদলে ক্রোয়াঁস বেশি পছন্দ করে। অনেকটা বুমেরাং-এর মতন, গাঢ় বাদামি রঙের এই মুচমুচে খাদ্যটিকে ঠিক রুটি বলা যায় না, বরং ঢাকাই বাখরখানির সঙ্গে যেন খানিকটা মিল আছে। ইংরেজ-আমেরিকানরা সকালবেলা অনেক কিছু খায়, সেই তুলনায় ফরাসীদের ব্রেকফাস্ট অতি সংক্ষিপ্ত। একখানা ক্রোয়াঁস, একটুখানি জেলি বা মার্মালেড, আর খানিকটা চীজ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এরা কতরকম চীজ যে খায়, তার ইয়ত্তা নেই। ওয়াইন এবং চীজ নিয়ে আলাদা কালচার আছে। ফরাসীরা বলে, আমাদের ওয়াইন এবং চীজ ঠিক মতন উপভোগ করতে না শিখলে কেউ ফরাসী শিল্প-সংস্কৃতিও ঠিক মতন বুঝতে পারবে না।

আমাদের মতন এদের বিছানায় শুয়ে কিংবা চায়ের টেবিলে কাগজ পড়ার অভ্যেস নেই। রবিবার ছাড়া, অন্যান্য দিনে অনেকেই বাড়িতে খবরের কাগজ রাখে না। কাগজ পড়ার সময় কোথায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস যাবার পথে এরা কাগজ কিনে নেয়, ট্রেনে কিংবা বাসে যেতে যেতে পড়ে, তারপর কাগজটা ফেলে দিয়ে যায়।

প্রথম জাগে মোনিক। একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে ছুটে এসে সে রান্নাঘরের স্টোভে গরম জলের কেটলি বসিয়ে দেয়। ততক্ষণে আমার একবার চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে বঁ ঝুর বলেই সে টেবিলে বসে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে। তার চোখে তখনও ঘুম, ঠোঁটের রেখায় বিরক্তি। ঘড়িতে আটটা পঁয়তিরিশ, তাকে নটার মধ্যে বেরুতেই হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, আজ অফিস না গেলে হয় না?

মোনিক কাঁধ শ্রাগ্ করে। তারপর আপসোসের সুরে বলে, কেল্ ভি! তোমরা আজ কোথায় বেড়াতে যাবে?

আমি বলি, ভার্সাই যাবো ভাবছি!

মোনিক বলে, তোমাদের কী মজা, এই চমৎকার আবহাওয়া পেয়েছো, রোজ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছো, আর আমার এই সারা সাপ্তাহ দারুণ কাজ!

বিনা প্রসাধনে, বিনা বিশেষ সাজে, সদ্য ঘুম ভাঙা অবস্থাতেই মোনিককে সবচেয়ে ভালো দেখায়। মোনিক চা খায় না, কফিতে তার আসক্তি। পর পর দু'কাপ কফি খেয়ে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপর বাথরুম ও ব্রেকফাস্ট টেবলে হুড়োহুড়ি করে সে সত্যি নটার মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। এরই মধ্যে চুলের কায়দা করেছে, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, ভুরু আঁকা, চোখে কালো চশমা, খাঁটি প্যারিস-নাগরিকা সেজে, সে হাতে অফিসের ফাইল নিয়ে, আমার দিকে আরভোয়া ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

পশ্চিমী দেশে মেয়েদের এই স্বাধীন রূপটি দেখে আমি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছি। মেমসাহেব বলে তো আর আলাদা কিছু নয়, কয়েকদিন একটু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এদের অনেক মিলও আছে। এদেরও রয়েছে সেন্টিমেন্ট, এক ধরনের নীতিবোধ, কর্তব্যজ্ঞান, মা-বাবার সম্পর্কে টান-ভালোবাসা। তবে একটা ব্যাপারকে এরা সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয়, সেটা হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা। মোনিকের বাবা নেই কিন্তু তার মা এবং তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী থাকেন অরলিয়ঁ-তে, সেখানে মোনিক মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। নিয়মিত চিঠি লেখে, বাড়ি থেকে নানাকম উপহার আসে। মাগারিটেরও বাবা-মা দু'জনেই বেঁচে আছেন। কিন্তু এই

সব মেয়েরা লেখাপড়া শেখার জন্য বাড়ির বাইরে চলে আসে, নেহাত দরকার না পড়লে বাড়ি থেকে টাকা নেয় না, নিজেদের পড়ার খরচ নিজেরাই উপার্জন করে, নিজেরাই থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। তারপর যখন চাকরি শুরু করে, তখন তারা কোথায় থাকবে, কার সঙ্গে মিশবে, বিয়ে করবে কি করবে না, এসব ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজের জীবনটা কীভাবে চালাবে, সে সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়। এই স্বনির্ভরতার জন্য পৃথিবীর সব বিষয়েই এদের একটা নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যে-কোনো আলোচনাতেই এরা অংশ নিতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির মতন এদেরও শাড়ি-গয়না (ড্রেস মেটেরিয়াল, কস্ট্যুম-জুয়েলারি, জুতো) সম্পর্কে দুর্বলতা আছে, নিজেদের মধ্যে এক এক সময় সে আলোচনাতেও মেতে ওঠে, কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই যে পৃথিবীতে এদের অধিকার কিছু কম, তা এরা কক্ষনো মনে করে না।

মার্গারিট প্রত্যেক দিনই দেরি করে ওঠে এবং দারুণ লজ্জিত হয়। আয়ওয়াতে ওকে ভোরবেলা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে যেতে হতো, এখানে সে দায় নেই বলেই ও যেন বেশি ঘুমিয়ে শোধ তুলছে। এক একদিন আমি কফির কাপ নিয়ে ওর দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলি, কাফে ও লে, মাদমোয়াজেল ! বঁ ঝুর, বঁ ঝুর ! পেতি দেজুনে (প্রাতরাশ) তৈরি আছে, দশটা যে বাজতে চললো !

সেজেগুজে আমরা শহর-অভিযানে বেরিয়ে পড়ি সাড়ে দশটার মধ্যে। এই অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি আরও অনেকগুলি অ্যাপার্টমেন্টে বেশ কিছু পরিবার থাকে। তাদের কয়েক জনের সঙ্গে আলাপও হয়ে গেছে। দেখা হলেই তাঁরা বঁ ঝুর বলেন ও একটু গল্প করতে আসেন। তাঁদের ব্যবহার দেখে বুঝতে পারি, আমি কালো রঙের মানুষ বলে তাদের চোখে-মুখে উপেক্ষার সামান্য চিহ্নও নেই। বুড়ো-বুড়িদের ব্যবহারও বেশ সহৃদয়। আগে শুনেছিলাম, ফরাসীরা বিদেশীদের সঙ্গে মিশতেই চায় না, কিন্তু এখানে দেখছি, অনেকেই নিজে থেকে কথা বলতে আসে। আমার মতন একজন পুরুষ যে একটি অ্যাপার্টমেন্টে আর দুটি নারীর সঙ্গে বাস করছে, এ ব্যাপারেও যেন কারুর আপত্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেউ কোনো কৌতূহলও প্রকাশ করে না।

পয়সার অভাবে আমি ফলি বার্জার কিংবা বিখ্যাত কোনো শো দেখিনি, কোনো নাইট ক্লাবেও ঢুকিনি, কিন্তু রাত্রির প্যারিস দেখেছি। পায়ে হেঁটে। এক শনিবার রাতে মোনিক আর মার্গারিটের সঙ্গে আমি ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছিলাম।

সারা বছর প্যারিসের রাত নিশ্চয়ই এরকম উৎসব-মুখর থাকে না। বেশি শীতে তো বেরুবার প্রশ্নই ওঠে না, তা ছাড়া বছরের অনেক সময়ই বৃষ্টি পড়ে। কিন্তু অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণত আকাশ থাকে পরিষ্কার, দিনের বেলা এমন ঝকঝকে রোদ ইংরেজরা কদাচিৎ দেখতে পায়, সুইডেন-নরওয়েতে রোদ্দুর খুবই দুর্লভ। আমাদের চোখে সব সাহেব-মেমই ফর্সা, কিন্তু ওখানে গিয়ে জেনেছি, ফরাসী বা ইতালিয়ানদের তুলনায় ইংরেজ বা সুইডিশরা বেশি ফর্সা, কারণ ওদের গায়ে কম রোদ লাগে। এরকম আবহাওয়ার জন্যই প্যারিসে এই দু'মাস টুরিস্টদের সাঙ্ঘাতিক ভিড় হয়। খাঁটি প্যারিসিয়ানদের আবার টুরিস্টদের সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে, তারা অনেকে এই সময় ছুটি নিয়ে প্যারিস থেকে পালায় !

নিউ ইয়র্কও রাত-জাগা শহর, অ্যালেন গীন্‌সবার্গদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, কিন্তু প্যারিসের মাদকতার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। প্যারিসের সব রাস্তার মধ্যমণি সাঁজেলিজে-তে রাত দুটোর সময় এসে হঠাৎ মনে হয়, রাত আর দিনের ব্যাপারটা

কি হঠাৎ উল্টে গেল নাকি ? অত চওড়া রাস্তাতেও এত নারী-পুরুষ যে গাড়ি চলার কোনো উপায়ই নেই। হাঁটার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে লোকের গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। সমস্ত দোকানপাট খোলা, চতুর্দিকে আলো, এরই মধ্যে কোথাও আলজিরিয়ানদের একটা ছোট দল ম্যাজিক দেখাচ্ছে, কিছু আফ্রিকান কালো মানুষ বিক্রি করছে নানা খেলনা, এক একটা দল যাচ্ছে চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে। একটি ঈষৎ নেশাগ্রস্ত রমণী জিপসীদের কায়দায় নাচতে শুরু করলো, অমনি প্রচুর লোক তাকে ঘিরে হাততালি দিয়ে তাল দিতে লাগলো। চতুর্দিকেই মজা।

এক সময় আমরা ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে চলে এলাম নদীর ধারে। এখানেও নারী-পুরুষ কম নয়। কপোত-কপোতীর মতন অনেকেই ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে আছে। শুনেছি, অনেকে প্রকাশ্যে চুম্বনে বেশি আনন্দ পায়।

আমরা একটা বাগানের ধারে, নিরিবিলি জায়গা দেখে বসলাম। এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে উৎসবের ধ্বনি। প্যারিসের সঙ্গে বীরভূমের কেঁদুলি জায়গাটার চেহারার কোনো মিলই নেই বটে, কিন্তু এর আগে আমি শুধু কেঁদুলির বাউলমেলাতেই সারা রাত জেগে উৎসব দেখেছি। আমার সেই মেলার কথা মনে পড়তে লাগলো।

হঠাৎ কানে এলো একটা বেহালার সুর। আমাদের কাছাকাছি একটা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে একজন লোক বেহালা বাজাচ্ছে। তাকে ঘিরে আর কোনো মানুষজন নেই। সে একা। সে বাজিয়ে যাচ্ছে আপন মনে। কথা বন্ধ করে আমরা শুনতে লাগলাম সেই বেহালার করুণ মধুর সুর।

একসময় মার্গারিট বললো, সামনের ঐ লোকটাকে দ্যাখো। জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে।

সত্যিই আগে দেখিনি, অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক নদীর একেবারে ধারে গিয়ে বসেছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জলের দিকে, একটুও নড়ছে না।

মার্গারিট বললো, তুমি বলছিলে না, এটা কবি আর শিল্পীদের শহর। অন্তত একজন শিল্পী আর কবিকে দেখা গেল। ঐ যে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছে আপন মনে, সে নিশ্চয়ই শিল্পী। আর জলের ধারে ঐ লোকটিকে কবি বলে মনে হচ্ছে না ? ও যেন জলের সঙ্গে কথা বলছে !

মার্গারিটের মতন মোনিক মোটেই রোমান্টিক নয়। সে বিদ্রূপের হাসি দিয়ে বললো, ধ্যাত, কী যে বলিস তুই মার্গারিট ! ও লোকটা কবি মোটেই নয়। কবিরা মোটেই রাত জাগে না, তারা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। ফরাসী কবি-সাহিত্যিকরা সবাই সকালবেলা লেখে। আর জলের সঙ্গে যে কথা বলে, সে কবি হতে যাবে কেন, সে নির্ঘাত পাগল কিংবা মাতাল ! কবিরা এই সব জিনিস চমৎকারভাবে বানায়, নিজেরা কিছু করে না। আর ঐ যে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছে, ও নিশ্চয়ই ভিখিরি। মেট্রো রেল স্টেশানে বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করে। এখন কোনো নতুন সুর তুলছে ! মোটেই ভালো বাজাচ্ছে না !

মোনিকের সিনিসিজ্‌ম এমনই জোরালো যে প্রতিবাদ করা গেল না।

একটু বাদে মোনিক জিজ্ঞেস করলো, সুনীল, তুমি মার্গারিট নামটার মানে জানো ?

আমি বললাম, না তো ! তোমাদেরও নামের মানে থাকে বুঝি ? আমি মোনিক মানেও জানি না।

মোনিক উঠে গিয়ে বাগান থেকে একটা সাদা রঙের ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এলো। সেটা আমার সামনে ধরে বললো, এই ফুলের নাম মার্গারিট। নাও, তোমাকে দিলাম !

১১

নাইটিঙ্গেল পাখিটি একটা উঁচু ডালে বসে
নীচের দিকে তাকিয়ে ভাবছে
সে যেন পড়ে গেছে নদীতে
সে বসে আছে একটা ওক গাছের শীর্ষে
তবু তার ভয় ডুবে যাবার :

—সিরানো দা বারজেরাক

মাগারিট আমাকে ইফেল টাওয়ারে উঠতে দেবে না, তা বলে কি আমি লুভ্‌র মিউজিয়ামও দেখবো না ? সেখানেও অজস্র টুরিস্ট ভিড় করে ঠিকই, কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত ছবিগুলিও তো সেখানে না গেলে দেখা হবে না !

মোনিক একদিন আমাদের ধমক দিয়ে পাঠালো। সেই সকালটায় রোদ নেই, টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। মাগারিটের হাতে একটা লাল রঙের ছাতা, মোনিক আমাকে একটা ম্যাকিনটস ধার দিয়েছে। এটা তার অন্য এক বান্ধবীর বয় ফ্রেন্ডের, একদিন ফেলে গেছে ও বাড়িতে। রেনকোট, ম্যাকিনটস, ওভারকোট, পার্কা এসব এদেশে অনেকেই একজনেরটা অন্যজন ব্যবহার করে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাগারিট বললো, লুভ্‌র মিউজিয়াম একদিনে পুরোটা দেখা যায় না, অনেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সবটা সেরে নিতে চায়, আসলে কিন্তু তারা কিছুই দেখে না। এক একদিনে এক একটা অংশ ভালো করে দেখতে হয়। তুমি কাদের ছবি দেখতে চাও ? তুমি কি সেই আগেকার ছবি, যাতে বাইবেলের গল্প, উড়ন্ত পরী, দেবশিশু আর 'চর্বির গোলা' নারীদের ছবিও দেখবে ?

আমি বললাম, না, না, প্রি-র‍্যাফেলাইট ছবিতে আমার আগ্রহ নেই। আমার বেশি দেখার ইচ্ছে পল সেজান, এডুয়ার মানে, দেগা, ক্লদ মোনে, কামিল পিসারো, রেনোয়া, পল গগ্যাঁ এঁদের ছবি।

মাগারিট বললো, তুমি যাদের নাম করলে, তারা সবাই ইমপ্রেশানিস্ট দলের। তুমি বুঝি এই গ্রুপটাকেই বেশি ভালোবাসো !

আমি বললাম, এঁদের ছবিই আমার বেশি পছন্দ। দেশে থাকতে এই সব শিল্পীদের মূল ছবি তো কিছুই দেখার সুযোগ হয় না, শুধু প্রিন্ট দেখেছি। বাংলায় একে বলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো, কিংবা মধুর অভাবে গুড় খাও !

ঘোল এবং গুড় এই দুটো যে কী বস্তু, তা মাগারিটকে অনেক কষ্টে বোঝাতে হলো।

মাগারিট বললো, তুমি নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামগুলো দেখোনি ?

আমি বললাম, তা দেখবো না কেন ? নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে এই গোষ্ঠীর শিল্পীদের চমৎকার কালেকশান আছে। তা ছাড়া শিকাগোতেও দেখেছি। আর পল এঙ্গেলের সঙ্গে মার্শাল টাউনে এক বুড়ির বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানেও এঁদের কয়েকটা মূল ছবি আছে। সেই সব দেখে আরও তৃষ্ণা বেড়ে গেছে।

মাগারিট ফস করে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা সুনীল, বলো তো, ইমপ্রেশানিজম কথাটা কী করে তৈরি হলো ?

আমি থমকে দাঁড়ালাম। তারপর চোখ গরম করে কৃত্রিম রাগে বললাম, আই, তুমি আমাকে পরীক্ষা করছো ? আমার ওপর মাস্টারি ফলাচ্ছো বুঝি ?

মাগারিট সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায়, মরমে মরে গিয়ে বললো, না, না, এমনিই হঠাৎ বলে ফেলেছি, ছি ছি ছি, কিছুদিন মাস্টারি করে আমার এই অবস্থা হয়েছে, তুমি আমার থেকে অনেক বিষয়ে বেশি জানো···

লজ্জায় মাগারিটের শরীরটা যেন কুঁকড়ে গেছে, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। ওর লজ্জা দেখে আমারও খুব লজ্জা করতে লাগলো, কিছুতেই ওর মুখ থেকে হাত সরানো যায় না।

আমি বললাম, আমি সত্যিই জানি না ইমপ্রেশানিস্টদের নামটা কী করে এলো। তুমি বলে দাও !

মাগারিট প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগলো।

সত্যিই তো এই সব বিষয়ে আমার জ্ঞান খুবই ভাসা ভাসা। আমি তো শিল্পী নই, কিছু ছবি দেখেছি, দু'চারটে বই এলোমেলো ভাবে পড়েছি। ফরাসীদেশে অনেকবার অনেকরকম শিল্প-আন্দোলন হয়েছে, তার ইতিহাস আমি কতটুকুই বা জানি ! এই সব বিষয়ে মাগারিটই তো আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ওর সঙ্গে একটা ঠাট্টা করতে গিয়ে ফল হয়ে গেল বিপরীত। মাগারিট আর মুখ খুলতে চায় না।

অবশ্য আমার একটা উপায় জানা আছে। এটা গায়কদের ক্ষেত্রে আমি পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছি। অনেক সময় বিখ্যাত গায়ক-গায়িকারা কিছুতেই মুখ খুলতে চান না। কোনো একটা ঘরোয়া আড্ডায় কিংবা পিকনিকে তাঁদের গান গাইতে অনুরোধ করলে তাঁরা বলেন, গলা খারাপ, মুড নেই, হারমোনিয়াম নেই ইত্যাদি। এই সময় একটা কৌশল বেশ কাজে লাগে। ভালো গায়ক-গায়িকাদের সামনে বেসুরো গান শুরু করতে হয়। আমি সেরকম কোনো গায়ক বা গায়িকার কাছে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা, 'খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলো', গানটার সুর কি এই রকম ? বলেই আমি হেঁড়ে গলায় বন্দে মাতরমের সুরে সেটা গাইতে আরম্ভ করি। প্রকৃত গায়ক-গায়িকারা তাতে আঁতকে ওঠেন, আসল সুর আপনি বেরিয়ে আসে তাঁদের গলা থেকে। এইভাবে আমি সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, ঋতু গুহ'র অরাজি ভাঙিয়েছি অনেক জায়গায়।

মেট্রো ট্রেনে লুভ্‌র নামে একটা স্টেশানই আছে। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে দু'বার ট্রেন বদলাতে হবে, নতুন করে টিকিট কাটতে হয় না। তবু সেরকম ভাবে বদল না করে মাগারিট উঠে এলো ওপরে। এখনো বৃষ্টি থামেনি। গতকালও শীতের নামগন্ধও ছিল না, এখন শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তার দু' পাশের চেস্টনাট, পপ্‌লার, মেপ্‌ল গাছ থেকে খসে পড়ছে অসংখ্য পাতা। মাথার ওপর গাছের পাতা খসে পড়ার অনুভূতিটা বড় চমৎকার।

আমি মাগারিটের একটা হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বললাম, এককালে বিদ্রোহী তরুণ শিল্পীরা একটা সঙ্ঘ স্থাপন করে আলাদা প্রদর্শনী করেছিল। নিজেরাই নিজেদের নাম দিয়েছিল 'ইমপ্রেশানিস্ট স্কুল', তাই না ?

মার্গারিট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, সেই সঙ্ঘের নাম ছিল 'সোসিয়েতে আনোনিম' (নামহীন সমিতি)!

আমি বললাম, তা হলে কবি বদলেয়ার ঐ দলটার ঐ রকম নাম দিয়েছিল।

মার্গারিট বললো, বদলেয়ার ছিল ঐ শিল্পীদের বন্ধু! ইমপ্রেশানিজম আখ্যাটা প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছিল গালাগাল হিসেবে।

আস্তে আস্তে পুরো বিষয়টা জানা গেল।

মাত্র একশো বছর আগে এই সব জগৎবিখ্যাত শিল্পীরা প্যারিস এবং কাছাকাছি অঞ্চলে থাকতেন, নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে যে সব ছবি এঁকেছেন, সেই সব এক একখানা ছবির দাম এখন লক্ষ লক্ষ টাকা। এই তো কয়েকদিন আগেই কাগজে দেখেছি, পল সেজান্-এর একটা ছবি লন্ডনে আড়াই লক্ষ পাউন্ডে নিলাম হয়েছে। অথচ, সেজান-এর যৌবনকালে তাঁর ছবি কেউ কিনতো না, সমালোচকরা যাচ্ছেতাই বলেছে, ধিক্কার দিয়েছে, দারুণ ক্ষোভে সেজান্ একসময় প্যারিস ছেড়ে এক্স-এ চলে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি সারাজীবন ছবি এঁকে যাবেন, কিন্তু বিক্রি করার চেষ্টাও করবেন না, কারুকে দেখাবেনও না। আর ক্লদ মোনের দারিদ্র্য এমন চরম অবস্থায় নেমে এসেছিল যে বন্ধুদের কাছে প্রায় ভিক্ষে করতে হতো। কামিল পিসারো নিজের এক গাদা ক্যানভাস্ পিঠে করে নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন, বাড়ি ভাড়া মেটাবার জন্য তাঁকে ঘটি-বাটি বন্ধক দিতে হয়েছে অনেক সময়।

সরকারি প্রদর্শনীতে এঁদের স্থান হতো না বলে এই সব শিল্পীরা নিজেদের উদ্যোগে একটা সমবেত প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। শিল্পের ইতিহাসে এই রকম ঘটনা সেই প্রথম! সেই প্রদর্শনীটির চরম ব্যর্থতা ও অসাফল্যও ঐতিহাসিক। একজনও প্রশংসা করেনি, বরং উপহাস, ভর্ৎসনা ও গালমন্দের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কেউ বললো, বাচ্চারা যখন রং নিয়ে ছেলেখেলা করে, তাও এই সব ছবির চেয়ে ভালো। কেউ বললো, এ যেন পিস্তলের মধ্যে রং ভরে ক্যানভাসে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ বললো, এই লোকগুলো পাগল ছাড়া কিছুই না! এদের আঁকা মেয়েদের গায়ের রং স্প্যানিশ তামাকের মতন, ঘোড়াগুলোর রং হলদে, আর জঙ্গলের রং নীল! একজন যা বাঁধাকপি এঁকেছে, তা দেখে এমন ঘেন্না হলো যে জীবনে আর বাঁধাকপি খাবোই না! ওদের আঁকা নিসর্গচিত্র দেখলে মনে হয়, চশমায় ধুলো জমেছে!

সেই প্রদর্শনীতে ক্লদ মোনের একটি ছবির নাম ছিল, ইমপ্রেশান : সানরাইজ। সেইটাই হলো প্রধান ঠাট্টার বিষয়বস্তু। এক সমালোচক লিখলো, ইমপ্রেশানই বটে! ওর মধ্যে সানরাইজ নেই, ইমপ্রেশানই আছে। আমার তো মনে হলো, একটা অসমাপ্ত ওয়াল পেপার দেখলেও ওর চেয়ে ভালো সমুদ্রে সূর্যোদয়ের ইমপ্রেশান হয়!

নিন্দুকেরা ঐ সব শিল্পীদের গোষ্ঠীটিকে ইমপ্রেশানিস্ট বলে দেগে দিল। শিল্পীরা কিন্তু সেই পরিচয়টাই মেনে নিল আনন্দের সঙ্গে। সত্যিই তো, তারা বাস্তবের অনুকরণ করতে চায় না। অরণ্যের ছবি বহু আঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু এক একটা অরণ্যের যে একটা নিজস্ব ঝংকার আছে, তার অনুরণন একজন শিল্পীর মনে যে অনুভূতি জাগায়, সেটাই তো নতুন করে আঁকার বিষয়।

এর আগে শিল্পীরা বিচ্ছিন্ন ছিল, যে-যার মতন ছবি আঁকতো, এর পর থেকে শুরু হলো ইমপ্রেশানিজমের আন্দোলন।

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটছিলাম নদীর ধার দিয়ে। সেন নদীর দু'দিকের রাস্তা মার্গারিটের খুব প্রিয়, প্রতিদিন আমরা এর কাছাকাছি বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাই। নদীটাকে

এরা কী সুন্দর কাজে লাগিয়েছে, নদীর জন্য শহরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে!

মার্গারিট বাড়ির নম্বরগুলো লক্ষ করছে মনোযোগ দিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী খুঁজছো?

মার্গারিট বললো, এখানে বেশ একটা মজার বাড়ি আছে। লুভর যাবার আগে সে বাড়িটা দেখে গেলে ভালো লাগবে!

রাস্তার ধারে বড় বড় দোকানপাটই দেখছি, এর মধ্যে মার্গারিট আমাকে বিশেষ কী দেখাতে চায়?

মার্গারিট বললো, দু'বছর আগেও আমি সেই বাড়িটা দেখে গেছি। এখন গেল কোথায়? এখানে এক সময় ছিল 'আকাদেমি সুইস'। সেটা কী জানো? প্যারিসে তুমি এখনো দেখবে, অনেক সালোঁ বা স্টুডিও আছে, যেখানে ছেলে কিংবা মেয়ে মডেল থাকে, অনেক শিল্পী সেই সব মডেল স্টাডি করতে যায়। অনেক শিল্পীই তো একা একটি মডেলের খরচ জোগাড় করতে পারে না, তাই এই সব জায়গায় তারা পাঁচ-দশ ফ্র্যাংক চাঁদা দিয়ে মেম্বার, তারপর এক সঙ্গে তিরিশ-পঁয়তিরিশজন শিল্পী একটি মডেলকে দেখে দেখে আঁকে।

একশো বছর আগে সেই রকমই একটা জায়গা ছিল 'আকাদেমি সুইস'। পের ক্রেবাসোল্ নামে একজন সুইজারল্যান্ডের প্রৌঢ় এটা চালাতো, মাসে চাঁদা ছিল দশ ফ্র্যাংক, তিন সপ্তাহ সেখানে একটি পুরুষ মডেল পাওয়া যেত, আর এক সপ্তাহ একটি নারী। হবু আর্টিস্টরা এক একটা নড়বড়ে টুলে বসে নিজস্ব ইজেলে সেই পুরুষ বা নারীর ন্যুড স্টাডি করতো।

বহু ছেলে মেয়ে শিল্পী হবার উন্মাদনায় এক সময় রং-তুলি হাতে নেয়, অনেকেরই প্রতিভা থাকে না, তারা এক সময় হারিয়ে যায়, কিংবা ফ্যাশান ডিজাইনার হয় কিংবা বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকে। 'আকাদেমি সুইস' ইতিহাসে স্থান পেয়ে গেছে, তার কারণ, এক সময় একই সঙ্গে এখানে কয়েকজন তরুণ শিক্ষার্থী শিল্পী এসেছিল, যারা পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়! এদুয়ার মানে, রেনোয়া, দেগা, পিসারো, ক্লদ মোনে, সেজান! ওদের বন্ধুত্ব হয়েছিল এখানেই। কল্পনা করা যায় কি, একই কলেজের এক ক্লাসের পাঁচ-সাতজন বন্ধু প্রত্যেকেই নোবেল প্রাইজ পেল! অনেকটা সেইরকমই যেন ব্যাপার।

ঐ বাড়িটা সম্পর্কে অনেক মজার গল্পও আছে।

বাড়িটার একতলায় ছিল সাবরা নামে এক ডেন্টিস্টের চেম্বার। আর দোতলায় শিল্পীদের মডেল স্টাডির ইস্কুল। একদিন মফস্বল থেকে এক তরুণ শিল্পী এসেছে ঐ 'আকাদেমি সুইস'-এ ভর্তি হতে। ভুল করে সে ঢুকে পড়েছে এক তলায়। সেখানে একজন লোক বীভৎস আর্তনাদ করছে! দাঁতের ডাক্তার সাবরা সদ্য সেই লোকটার একটা দাঁত তুলেছে, তখনকার দিনে দাঁত তোলার প্রক্রিয়া ছিল আসুরিক ব্যাপার, অ্যানেসথেসিয়া ছিল না, দু'জন লোক রুগীকে চেপে ধরতো, আর ডাক্তার একটা সাঁড়াশি দিয়ে দন্ত উৎপাটন করতো। তরুণ শিল্পীটি ভাবলো, সুইস পরিচালক বুঝি শিল্পীরা আঁকায় ভুল করলে এই রকম শাস্তি দেয়! সে 'মঁ দিউ' বলেই পেছন ফিরে চৌ চাঁ দৌড়!

আর একবার দাঁতের ব্যথায় খুব কষ্ট পেতে পেতে একজন রুগী ভুল করে উঠে এসেছে দোতলায়। দরজা খুলেই দেখে একজন পুরুষ মডেল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে লোকটা ভাবলো, এই বুঝি দাঁতের ডাক্তারের চিকিৎসা পদ্ধতি! সেও ব্যথা-টাথা ভুলে গিয়ে পিঠটান!

আকাদেমি সুইস উঠে গেছে কবেই, মার্গারিট আমাকে দেখাতে চেয়েছিল শুধু সেই

বাড়িটা। কিন্তু পাওয়া গেল না, যে ঠিকানায় ঐ বাড়িটা থাকার কথা ছিল, সেখানে এখন একটি অসমাপ্ত প্রাসাদ, প্রচুর মিস্তিরি কাজ করছে। পুরোনো বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে মার্গারিট যেন শারীরিক কষ্ট পেল ! বারবার বললো, ছি ছি ছি, এমন একটা বাড়ি নষ্ট করে ফেললো, এটা মিউজিয়াম করে রাখা উচিত ছিল, এই শহরের মেয়রটা একটা গরু !

আমরা যে রাস্তাটা ধরে হাঁটছি, তার নাম কে দেজরফেব্‌র (Quai des Orfèvres), নামটা আমার খুব চেনা লাগলো। আমি মার্গারিটকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানেই কি কাছাকাছি কোথাও পুলিশের হেড কোয়ার্টার ?

শিল্পীদের বিষয় আলোচনা করতে করতে হঠাৎ আমি পুলিশের প্রসঙ্গ তোলায় মার্গারিট হকচকিয়ে গেল খানিকটা। তারপর বললো, হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তুমি সে কথা জানতে চাইছো কেন ?

আমি বললাম, জর্জ সিমেনোঁর লেখায় আমি অনেকবার এই রাস্তাটার নাম পড়েছি। গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টর মেইগ্রে এই রাস্তা দিয়ে কতবার তার হেড অফিসে (আমাদের লালবাজার) গেছে, কখনো এখানকার কোনো রেস্তোরাঁ কিংবা বিসত্রো-তে গিয়ে হোয়াইট ওয়াইন কিংবা বীয়ার পান করেছে।

মার্গারিট বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল।

ছেলেবেলা থেকেই আমি গোয়েন্দা গল্পের পোকা। আমাদের রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ, শশধর দত্ত আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিদেশের প্রচুর গোয়েন্দা গল্প পড়েছি। আমার মতে, এ যুগের গোয়েন্দাকাহিনীর স্রষ্টাদের মধ্যে রানীর স্থান যদি পান আগাথা ক্রিস্টি, তা হলে রাজার স্থান দিতে হবে জর্জ সিমেনোঁ-কে। সিমেনোঁর লেখাগুলি উৎকৃষ্ট ক্রাইম ও ডিটেকশান স্টোরি তো বটেই, তদুপরি তাতে আছে সাহিত্য রস। সাহিত্যের কাল্পনিক মানুষগুলির মধ্যে ইনস্‌পেক্টর মেইগ্রে আমার অন্যতম প্রিয় চরিত্র। সিমেনোঁর লেখার গুণে মেইগ্রে-কে কাল্পনিক বলে মনেই হয় না, মনে হয় যেন পুলিশের সদর দফতরে গেলে এক্ষুনি সেই ভারী ওভারকোট পরা, মুখে পাইপ, দীর্ঘদেহী মানুষটিকে দেখতে পাবো।

মার্গারিট শুধু উচ্চাঙ্গের কাব্য সাহিত্যের ভক্ত, কবিতাই তার বিশেষ প্রিয়, উপন্যাসকে সে কবিতার তুলনায় নিকৃষ্ট শিল্প বলে মনে করে। এই ধরনের সাহিত্যামোদীরা ডিটেকটিভ গল্প দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমি ভাবলাম, সিমেনোঁ সম্পর্কে আমার উচ্ছ্বাস দেখে মার্গারিট চটে যাবে। তা ছাড়া, সিমেনোঁ জাতে বেলজিয়ান, ফরাসী সাহিত্যে বিরাট স্থান জবর দখল করেছেন। ফরাসী-ভাষী বেলজিয়ানদের সম্পর্কে খাঁটি ফরাসীদের খানিকটা অবজ্ঞার ভাব আছে।

কিন্তু মার্গারিট বললো, বাঃ, তুমি সিমেনোঁ পড়েছো ? আমি তোমাকে সিমেনোঁর আরও বই দেবো। উনি খুব ভালো ফরাসী গদ্য লেখেন। আঁদ্রে জিদ ওঁর দারুণ প্রশংসা করেছিলেন জানো তো ! ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাড়াও সিমেনোঁ আরও অনেক অন্য, সিরিয়াস ধরনের উপন্যাসও লিখেছেন !

আমি অবশ্য সিমেনোঁ পড়েছি ইংরিজি অনুবাদে। ডিটেকটিভ গল্প ছাড়া ওঁর অন্যান্য উপন্যাসও পড়েছি কয়েকটা, তার মধ্যে হাসপাতাল নিয়ে একটি উপন্যাস অসাধারণ। বিভিন্ন ধরনের মানুষের চরিত্র স্টাডি করার অসম্ভব ক্ষমতা আছে এই লেখকের।

সিমেনোঁ সম্পর্কে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে বলবার মতন। প্রিয় লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন জানতেও অনেকের কৌতূহল হয়। আমরা পাঠকরাও অনেকটা জেনেছি।

সিমেনোঁর নারী-প্রীতি সাঙ্ঘাতিক, তিনি নাকি কয়েক হাজার মহিলার সঙ্গে সাময়িক প্রেম ও সহবাস করেছেন। তিনি দুর্দান্ত বড়লোক। তাঁর বইয়ের বিক্রি তো প্রচুর বটেই, তা ছাড়া তাঁর গল্প থেকে অন্তত চল্লিশটা সিনেমা হয়েছে, পৃথিবীর চারখানা দেশে তাঁর বাড়ি আছে। যেখানে যখন আবহাওয়া ভালো থাকে, তখন তিনি সেখানে থাকতে যান। কোনো একটা নতুন বই লেখার আগে তিনি আগে ডাক্তারকে দিয়ে ব্লাড প্রেসার মাপান, রক্ত পরীক্ষা করান। তারপর বাড়ির দরজা বন্ধ করেন। টেলিফোন নামিয়ে রেখে লিখতে বসেন, টানা চোদ্দ-পনেরো দিন সকাল-বিকেল লিখে শেষ করেন একটা উপন্যাস। এবার দরজা খুলে পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বেড়াতে চলে যান কোনো প্রমোদতরণীতে। তাঁর প্রত্যেকটি বই-ই হিট যাকে বলে।

এহেন একজন দারুণ সার্থক লেখকেরও মনের মধ্যে একটা অতৃপ্ত, দরিদ্র, বাউণ্ডুলে রয়ে গেছে। সিমেনোঁর অনেক উপন্যাসের নায়কই একজন ঘরছাড়া মানুষ, যে প্রেমে বঞ্চিত, যে ভালো ব্যবসা বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফুটপাতের মানুষদের পাশে শুয়ে থাকে। ধনীদের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের ভাব ফুটে ওঠে তাঁর সব লেখায়।

লুভ্‌র মিউজিয়াম আর বেশি দূরে নয়, কিন্তু খুব জোর বৃষ্টি নেমে গেল। আমরা দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম একটা কাফেতে। সামনেটা কাচে ঢাকা, ভেতরে ঠাণ্ডা নেই, কফির সৌরভে আমোদিত। নানা রঙের পোশাক পরা অনেক দেশের মানুষ সেখানে বসে আছে, কয়েকজন ভারতীয়ও চোখে পড়লো, আমরা গিয়ে বসলাম ভেতরের দিকে একটা খালি টেবিলে।

একটুক্ষণ গল্প করার পর মার্গারিট হঠাৎ চুপ করে গেল। অন্যমনস্ক, মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে, আঙুল দিয়ে টেবিলে দাগ কাটছে।

আমি তার বাহু স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো, মার্গারিট ?

মার্গারিট বললো, মনটা হঠাৎ খারাপ লাগছে।

মন খারাপের কথা শুনলে তার কারণ জানতে ভরসা হয় না। অনেক সময় মন খারাপের কারণ তো মুখে বুঝিয়ে বলাও যায় না।

মার্গারিট নিজেই আবার বললো, আমার মা হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে গেছেন, তারপর সাতদিন আমি কোনো খবরই নিইনি।

আমি অপরাধী বোধ করে বললাম, সত্যিই তো, তোমার একবার যাওয়া উচিত ছিল। তুমি যাও, ঘুরে এসো। আমি এখানে দু-একদিন একলা থাকতে পারবো অনায়াসে।

মার্গারিট বললো, আমার বাড়িতে তোমাকেও কি নিয়ে যাওয়া উচিত নয় ? বেশি দূর নয়, ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা।

আমি এবার উৎসাহের সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, আমিও যাবো। গ্রাম দেখতে আমার ভালো লাগে। তুমি কোথায় জন্মেছো, সেই জায়গাটা আমি দেখতে চাই। চলো, কাল সকালেই যাই।

মার্গারিট বললো, কিন্তু আমার বাড়িতে তুমি গেলে···আমার বাবা-মা যদি তোমাকে দেখে রেগে যান···তুমি হিন্দু—

আমি ভুরু তুলে বললাম, তোমার বাবা-মা কি এমনই গোঁড়া ক্যাথলিক যে একজন হিন্দুকে দেখলেই চটে যাবেন ? আমি হিন্দু বাড়িতে জন্মেছি বটে, কিন্তু কোনো ধর্মেরই তো চর্চা করি না।

মার্গারিট বললো, না, না, সেরকম নয়, আমার বাবা কিংবা মা হিন্দুদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না, এমনিতে কিছুই মনে করতেন না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, যদি ওঁরা

ভাবেন, যদি ওঁরা ভাবেন···

মাগারিট আমার হাত চেপে ধরে কাতর গলায় বললো, সুনীল, প্লীজ, তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেও না ! সে কথা শুনলে আমার মা-বাবা এমন দুঃখ পাবেন—

মাগারিটের সারল্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সত্যিই আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কি একটা বিয়েপাগলা বুড়ো যে হুট করে ওকে বিয়ে করতে চাইবো ? পৃথিবীর আর কোনো মেয়ে কি এমন কথা এত সহজে বলতে পারবে ?

আমি মজা করার জন্য বললাম, সে কি ! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না ? সব যে ঠিকঠাক হয়ে গেছে ?

মাগারিট আরও দুর্বল হয়ে গিয়ে বললো, না, সুনীল, তুমি চাইলে আমি না বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মা-বাবা এমন কষ্ট পাবেন, আমার মা অবুঝ, তিনি এমন আঘাত পাবেন যে সহ্য করতে পারবেন না···না, না, তা আমি পারবো না।

আমি বললাম, ওসব আমি শুনছি না। আমি তোমাকে বিয়ে করবোই। কালই।

একটু বাদে মাগারিট ইয়ার্কি বুঝতে পেরে ফিক করে হাসলো। তারপর বললো, সত্যি, তোমাকে একবার আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছে করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাবা-মা রেগে গিয়ে কী করবেন, মাগারিট ? আমায় জুতোপেটা করবেন ? পেটে ছুরি বসিয়ে দেবেন ?

মাগারিট বললো, যাঃ, সেরকম কিছু না। বাবা তো খুব লাজুক, আর মা···যদি তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলেন ? তোমার একটুও অপমান হলে তা আমার বুকে বাজবে !

আমি বললাম, ও, এই ! এর চেয়ে কত বেশি অপমান আমি সহ্য করেছি ! এসব আমি গায়ে মাখি না। চলো, তোমাদের বাড়িতে যাবো !

মাগারিট বললো, সত্যি যাবে ? আমাদের লুদাঁ গ্রামে ? তা হলে একটা ফোন করে নিয়ে আমরা কাল পরশুই যাবো !

১২

যে শিশু মানচিত্র ও প্রতিলিপি ভালোবাসে
তার কাছে এই বিশ্ব তার ক্ষুধার মতনই প্রকাণ্ড
ওহ্, প্রদীপের আলোয় কতই না বিশাল এই পৃথিবী
স্মৃতির চোখে এই পৃথিবী কতই না ছোট !

—শার্ল বোদলেয়ার

মোনিক তার অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের থাকতে দিয়েছে, খাওয়ার খরচ আমাদের নিজস্ব। এই অ্যাপার্টমেন্টটাও মোনিককে সামনের পয়লা তারিখে ছেড়ে দিতে হবে, এত বড় জায়গার ভাড়া সে একা টানতে পারবে না, সে এর মধ্যেই একটা এক কামরার স্টুডিও ঠিক করে ফেলেছে। এক তারিখের পর আমাদের প্যারিসবাস খুব অনিশ্চিত। মাগারিট আর আমার দু'জনেরই টাকার টানাটানি। আমি আমেরিকা ছেড়েছি একশো ডলারেরও কম পকেটে নিয়ে। মাগারিট তার মায়ের চিকিৎসার জন্য নিজস্ব টাকা শেষ করে ফেলেছে, এখন সে ধার করছে বন্ধুদের কাছ থেকে, মোনিকের কাছ থেকেই ধার নিয়েছে পাঁচ শো ফ্র্যাংক। এতেই চলে যাচ্ছিল বেশ, বাজার করে এনে বাড়িতে রান্না করে খেলে তেমন বেশি খরচ হয় না। কিন্তু এর মধ্যে বিপদ বাধিয়ে ফেললো মোনিকের এক বন্ধু।

মোনিকের এই বন্ধুটির নাম পীয়ের ক্লোদেল। বেশ শৌখিন ধরনের যুবা, মাথার চুলগুলো লাল, বাজপাখির ঠোঁটের মতন নাক, চওড়া কপাল, সে যতটা না লম্বা, সেই তুলনায় তার হাত দুটি বেশি লম্বা মনে হয়, আজানুলম্বিত যাকে বলে। সে ইংরিজি জানে, মোনিকের মতন সে তার ইংরিজি-জ্ঞান গোপন না করে আমার সঙ্গে খুব ইংরিজি চালায়।

প্রথম আলাপের সময় আমি তার নামটা শুনে কৌতূহলী হয়েছিলাম। আমাদের দেশের মানুষের নামের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানদের নামের একটা বেশ তফাত আছে। আমাদের দেশে একই পদবীর হাজার হাজার লোক আছে, এক চৌধুরী বা চ্যাটার্জির সঙ্গে অন্য এক চৌধুরী বা চ্যাটার্জির কোনোই সম্পর্ক নেই। পদবীর সংখ্যা সীমিত হলেও আমাদের দেশের নারী-পুরুষদের প্রথম নামটা বহু বিচিত্র ধরনের হয়। বাবা-মায়েরা অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের নতুন নাম বানিয়েও দেন। ক্রিশ্চিয়ানদের বেলায় এর ঠিক বিপরীত। ওদের প্রথম নামগুলো একেবারে ধরাবাঁধা। সব মিলিয়ে কুড়ি-পঁচিশটার বেশি হবে না, কিন্তু সারনেম বা পদবী অসংখ্য। সেইজন্য একই পদবীর দু'জন অনাত্মীয় নারী-পুরুষ ওদেশে প্রায় দেখাই যায় না।

পীয়ের ক্লোদেল নামটি শুনেই আমার মনে পড়েছিল পল ক্লোদেলের কথা। পল ক্লোদেল খ্যাতনামা নাট্যকার, কবি ও কূটনীতিবিদ। খুবই গোঁড়া ক্যাথলিক, তাঁর শেষের

দিকের রচনা ধর্ম-আরাধনায় ভর্তি, সেই কারণেই মাগারিট মাঝে মাঝে তাঁর লাইন মুখস্থ বলে।

আমি পীয়েরকে জিজ্ঞেস করলাম, পল ক্লোদেল তোমার কে হন ?

পীয়ের অবহেলার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, ঠাকুর্দার ভাই। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না, আমি ওঁর লেখা বিশেষ কিছুই পড়িনি। নট মাই কাপ অফ টি !

অনেক সময়েই দেখেছি, বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সামান্য একটু আত্মীয়তা থাকলেই অনেকে তা বেশি বেশি জাহির করার চেষ্টা করে। পীয়ের তার ঠাকুর্দার ভাইকে কোনো পাত্তাই দিল না।

যাই হোক, এই পীয়ের আমাদের এক সন্ধ্যায় এক রেস্তোরাঁয় নেমন্তন্ন করে বসলো। প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এর কাছে একটা বেশ বনেদী গোছের রেস্তোরাঁ, কেউ না খাওয়ালে এখানে আমাদের ঢোকার কোনো সাধ্যই ছিল না। এইসব দোকানে ঢুকলে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতোর জন্য একটা হীনমন্যতা বোধ হয়। প্রতিদিন জুতো পালিশ বা বুরুশ করা আমার ধাতে নেই, এক শার্টে তিন-চারদিন চালিয়ে দিই, কাঁধের কাছে একটু ময়লা হয়ে থাকে, আর গলাতেও টাই বাঁধি না !

পীয়ের অবশ্য হাসি-ঠাট্টা-গল্পে জমিয়ে রাখলো সারাক্ষণ।

খাওয়ার ব্যবস্থাও এলাহি। অর দ্যভর দিয়ে আরম্ভ। তারপর একটার পর একটা ডিশ। ফোয়া গ্রা, অর্থাৎ হাঁসের লিভার, কাভিয়ের অর্থাৎ স্টার্জন মাছের ডিম, আর একটা চিংড়ি মাছের রান্না, ছাগলের দুধের চীজ, সেই সঙ্গে এক বোতল শ্যাম্পেন ও দু' বোতল বোর্দোর হোয়াইট ওয়াইন।

হোস্ট যখন বিল মেটান তখন সেইদিকে তাকানো অতিথিদের পক্ষে ভদ্রতাসম্মত নয়। তবু আমি চোরা চোখে না তাকিয়ে পারিনি। পীয়ের একটার পর একটা একশো ফ্র্যাংকের নোট গুঁজে দিচ্ছে, অন্তত পাঁচ-ছ'খানা তো হবেই। সে আমলে ছ'শো ফ্র্যাংক অনেক টাকা। বাড়িতে খাওয়া আর রেস্তোরাঁয় খাওয়া, বিশেষত এই ধরনের কায়দার রেস্তোরাঁয়, আকাশ-পাতাল তফাত। কুড়ি-পঁচিশ ফ্র্যাংকের বাজার করে বাড়িতে রান্না করে খেলে মাগারিট আর আমার দিব্যি চলে যায় দু'বেলা। কিন্তু মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় খাওয়া এই সব দেশের জীবন যাত্রার অঙ্গ।

ওঠার একটু আগে মাগারিট বললো, পীয়ের, এ-পাড়ায় একটা হাঙ্গেরিয়ান রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে তুমি কখনো খেয়েছো ?

পীয়ের বললো, না খাইনি। চলো, কাল সন্ধেবেলা সেখানে ডিনার খাওয়া যাক ; হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ-এর খুব নাম শুনেছি !

সেটাই ঠিক হলো, পরের দিন সন্ধেবেলা আবার বাইরে খাওয়া। আমার নিশ্বাসের একটু একটু কষ্ট হতে লাগলো। রীতি অনুযায়ী পরের দিন পীয়ের আর মোনিককে আমাদেরই খাওয়ানো উচিত, কিন্তু আমাদের সে পয়সা কোথায় ? সাধের সঙ্গে যখন সাধ্য মেলানো যায় না, তখনকার গোপন কষ্টটা বোঝানোও যায় না কারুকে। ওদের কী করে বোঝাবো যে আমরা কৃপণ নই, আমরা যে ভদ্রতা-সভ্যতা জানি না তাও নয়, কিন্তু আমরা অসহায়।

ফেরার পথে মাগারিট বললো, কাল ওদের আমরা খাওয়াবো।

আমি চমকে উঠে বললাম, টাকা পাবে কোথায় ?

মাগারিট বললো, তোমার আর আমার যা আছে, সব মিলিয়ে হয়ে যাবে। শ্যাম্পেন নেবো না।

আমি বললাম, সব টাকা খরচ হয়ে গেলে—তারপর ?

মাগারিট বললো, সে পরে দেখা যাবে ! কারুর কাছ থেকে ঠিক ধার পেয়ে যাবো !

মাগারিটের সারল্য ও টাকা-পয়সা সম্পর্কে উদাসীনতার কাছে আমি বারবার হেরে যাই। টাকার চিন্তা আমি ভুলতে পারি না কেন ? নিউ ইয়র্কে প্রায় শেষ মুহূর্তে গ্রেগরি করসো আমার টাকাটা ফেরত না দিলে তো প্রায় নিঃস্ব অবস্থাতেই আমাকে আসতে হতো প্যারিসে, তাতে কী আর এমন হেরফের হতো ! আসলে আমার মধ্যে একটা পুরুষ-প্রাধান্য কাজ করে। মোনিক ও মাগারিট সঙ্গে থাকলে আমার সব সময় ইচ্ছে করে, ওরা কিছু খরচ করবে না, আমিই সব দেবো। অথচ আমার পকেট ফুটো !

আমার কাছে যা টাকাপয়সা ছিল, খুচরো-টুচরো সমেত সবই তুলে দিলাম মাগারিটের হাতে। পরের দিন হাঙ্গেরিয়ান রেস্তোরাঁয় পীয়েরের সঙ্গে আমাদের প্রায় মারামারি বেধে যাবার উপক্রম।

দু' একটা কোর্স খাওয়ার পরেই পীয়ের বললো, শোনো, আগেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নিই। আমাদের ভারতীয় বন্ধুটি যেন বিল মেটাবার কোনো চেষ্টা না করে। আজকের বিলও আমিই দেবো।

আমি বললাম, কেন, আমি কী দোষ করেছি ? বিল মেটাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবো কেন ?

পীয়ের তার লম্বা হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ ধরে বললো, তুমি আমাদের অতিথি। ইন্ডিয়াতে যখন যাবো, তখন তুমি খাওয়াবে।

মোনিক বললো, সুনীলের পয়সা দেবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ও আমাদের দেশ দেখতে এসেছে, ওর অনেক খরচ আছে। কাল পীয়ের দিয়েছে, আজ দেবো আমি।

মাগারিট বললো, তুই কেন দিবি রে ? এই হাঙ্গেরিয়ান রেস্তোরাঁয় আমি তোদের নেমন্তন্ন করেছি না ?

পীয়ের বললো, মোটেই না। তুমি রেস্তোরাঁটার নাম বলেছিলে শুধু, এখানে আসার প্রস্তাব দিয়েছি আমি। ঠিক কিনা বলো !

এইরকম তর্কাতর্কির মধ্যেই খাওয়া চলতে লাগলো। শেষের আইসক্রিম খেতে খেতে পীয়ের বললো, ওয়েটার, বিলটা আমাকে দেবে, আর কেউ চাইলেও দেবে না !

ওয়েটারটি হাসতে লাগলো। এরই মধ্যে এক ফাঁকে বাথরুমে যাবার নাম করে উঠে গিয়ে মাগারিট কাউন্টারে গিয়ে পুরো বিলের টাকা এবং বকশিশ-টকশিশ সব দিয়ে এসেছে !

এরপর মাগারিট আর আমি একেবারে ঝাড়া হাত-পা, তবু নিঃস্ব পক্ষেরই জয় হলো।

সে রাতেও বাড়ি ফিরে গল্প হলো অনেকক্ষণ ধরে। পীয়েরও এলো আমাদের সঙ্গে। মোনিক আর মাগারিট অনেক দারুণ দারুণ গল্প শোনালো, পীয়ের যদিও প্রায়ই বলে যে সাহিত্য-টাহিত্য তেমন বোঝে না, তবু সে লেখকদের সম্পর্কে অনেক ঘটনা জানে।

রাত যখন অনেক হয়েছে, গল্পের একেবারে শেষ দিকে প্রায়, এক অলৌকিক টেলিফোন এলো আমার নামে। তাতে এলো এমনই এক চমৎকার বার্তা, যাতে আমার মস্তিষ্কে বয়ে গেল কুলকুল করে এক আনন্দের নদী। যারা ভক্ত এবং ধর্মবিশ্বাসী, তাদের কাছে এটা একটা মিরাকল মনে হতে পারে। আমি ভাগ্য কিংবা দৈবে বিশ্বাসী নই, তবু আমার জীবনে মাঝে মাঝে এরকম আকস্মিক ঘটনা ঘটে। সেইজন্যই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে বলেন, আমি নাস্তিক বলেই নাকি ভগবান আমাকে খুশি করার জন্য, নিজের দিকে টানার জন্য ওভার টাইম খাটেন।

আগে মাগারিট-মোনিকের কাছে শোনা গল্পগুলো বলে নিই।

সেদিন দুপুরে মাগারিট আর আমি শেষ পর্যন্ত লুভ্‌র মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে কোন্ কোন্ ছবি ভালো লেগেছে, সেই আলোচনা করতে করতে এদুয়ার মানে-র আঁকা 'ঘাসের ওপর মধ্যাহ্ন ভোজ' (Le Dejeuner Sur L' Herbe) ছবিটার কথা ঘুরে ফিরে আসছিল। মোনিক একবার জিজ্ঞেস করলো, এই ছবিটা যখন প্রথম দেখানো হয়, তখন কী কাণ্ড হয়েছিল জানো?

আমি বললাম, না, জানি না। বলো, বলো। আমার এই সব কাহিনী শুনতে খুব ভালো লাগে।

মোনিক মাগারিটকে জিজ্ঞেস করলো, তুই সুনীলকে সালোঁ দে রেফুউজে-র ঘটনাটা বলিসনি?

মাগারিট বললো, আমি ভালো জানি না। তুই বল।

আমরা যখন বসে গল্প করছি, তার ঠিক একশো এক বছর আগেকার ঘটনা। ফরাসী দেশের সম্রাট তখন তৃতীয় নেপোলিয়ান।

গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্যারিসে হাজার হাজার শিল্পী গিসগিস করতো। যাদেরই একটু আঁকার হাত বা শখ থাকতো, তারা দূর দূর থেকে প্যারিসে এসে জমায়েত হতো ভাগ্যান্বেষণে। প্যারিসের কোনো প্রদর্শনীতে একবার স্বীকৃতি পেলে সারা পৃথিবীতে নাম ছড়াবে। শুধু ফরাসীদের জন্যই নয়, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, আমেরিকার তরুণ শিল্পীদের কাছেও প্যারিস ছিল শিল্পের স্বর্গ।

শিল্প ও সংস্কৃতির মান বজায় রাখার জন্য কয়েকটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানও চালু করা হয়েছিল সরকার থেকে। যেমন আকাদেমি ফ্রাঁসেজ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হতো লেখকদের, ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্বও এই আকাদেমির। সেই রকম, তরুণ শিল্পীদের যোগ্যতার বিচার করতো আকাদেমি দে বোজার। দু' বছর অন্তর অন্তর এই আকাদেমির উদ্যোগে হতো এক বিশাল শিল্প প্রদর্শনী। তার আগে শিল্পীদের বলা হতো মনোনয়নের জন্য ছবি জমা দিতে। হাজার হাজার তরুণ-প্রবীণ শিল্পী তাদের একাধিক ক্যানভাস জমা দিত, একটি কমিটি সেই সব ছবি দেখে দেখে বিচার করতেন। বাতিল হতো অনেক, আর যেগুলি যোগ্য বলে প্রদর্শনীতে স্থান পেত, সেগুলি রসিক ও ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো তো বটেই, ওই প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়াই ছিল শিল্পীদের স্বীকৃতি।

তবে এই যে আকাদেমির সর্বশক্তিমান বিচারক কমিটি, তার সদস্য হতো সাধারণত মাঝারি প্রতিভার বয়স্ক শিল্পীরা, তারা সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট এবং অভিজাতদের আশীর্বাদ-ধন্য। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা রক্ষণশীল। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনো এক্সপেরিমেন্ট দেখলে তারা শিউরে উঠতো, নবীন প্রতিভাবানদের সমাদর করার বদলে তারা ট্র্যাডিশনাল শিল্পীদেরই মর্যাদা দিত বেশি।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে একদল যুগান্তকারী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এদুয়ার মানে, ক্লদ মনে, এডগার দেগা, জাঁ রেনোয়া, পল সেজান্, কামিল পিসারো, সিসলে, হুইস্‌লার এবং আরও অনেকে। পরে এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয় ভ্যান গগ্, পল গগ্যাঁ, মারি কাসাট,বার্থ মরিসো প্রমুখ। সেই ষাটের দশকে এঁদের কোনো গোষ্ঠী তৈরি হয়নি বটে, তখনো এঁরা ইমপ্রেশানিস্ট নামে পরিচিত নয়, কিন্তু এক কাফেতে আড্ডা মারতেন, কোনো কোনো স্টুডিয়োতে একসঙ্গে ছবি আঁকতেন।

এই দলটিকে আকাদেমি বোজার একেবারে পাত্তাই দিত না। বছরের পর বছর এঁদের

ছবি বাতিল হয়ে ফিরে আসতো। সে-যুগের যারা শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাদেরই ভাগ্যে জুটতো সরকারি উপেক্ষা। প্রদর্শনীতে স্থান না পেয়ে বাতিল ছবি তাঁরা ঘাড়ে করে ফিরিয়ে আনতেন, পরের বার আবার নতুন ছবি জমা দিতেন, এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও তো নেই।

এক বছর একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। সেটা ১৮৬৩ সাল, সেবার এই দলের শিল্পীদের অনেকখানি আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এক নতুন শিল্পরীতি তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। এঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি জমা দিলেন। অন্যান্য বছর এই দলের দু' একজনের একটা-আধটা ছবি নির্বাচিত হয়েছে, এবার এঁদের ধারণা, সকলেই একসঙ্গে স্থান পাবেন, দর্শকরা বুঝবেন, শিল্পজগতে একটা পালাবদল এসেছে!

সে বছর সবাই বাতিল!

অন্যান্যবারের মতন তরুণ শিল্পীরা এবার আর মুখ বুজে এই অবিচার মেনে নিতে চাইলো না। তারা তাদের নির্দিষ্ট কাফেতে গিয়ে হৈ চৈ, চিৎকার শুরু করলো, গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিল। কেউ কেউ টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগলো, এবার দেখে নেবো!

শিল্পীরা অধিকাংশই খুব গরিব, সরকারের ওপরের মহলে কোনো চেনাশুনো নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন এদুয়ার মানে। তিনি ধনীর সন্তান। তাঁর বাবা তাঁর ছবি আঁকার বাতিক ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করেছেন, ছেলেকে শিল্পীর অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে দিতে চাননি। একবার মানে-কে একটা জাহাজের চাকরি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যাতে মানে-র এই রোগ কেটে যায়, কিন্তু মানে ছবি আঁকার জন্য জীবন পণ করেছিলেন।

মানে সেই কাফেতে বসে বললেন, আমার বাবা একজন ম্যাজিস্ট্রেট, আমি বাবাকে দিয়ে সম্রাটের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠাবো!

আর একজন বললো, আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর চেনা আছে, আমি তাঁকেও জানাবো যে এসব কী চলছে!

শিল্পীদের এই বিক্ষোভের কথা কিছু কিছু ছাপা হলো খবরের কাগজে, বেশ কয়েকটা চিঠি গেল সরকারের কাছে। প্রবীণ শিল্পী দেলাক্রোয়া নবীনদের প্রতি সমর্থন জানালেন। ক্রমে এই কথাটা সম্রাটের কানে গেল।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান সব সময় বিপ্লব-বিদ্রোহের জুজুর ভয় পেতেন। শিল্পীদের নেতৃত্বে একটা বিদ্রোহ শুরুর সম্ভাবনা তিনি একেবারেই পছন্দ করলেন না। তিনি খবর পাঠালেন, স্বয়ং তিনি সালোঁ-তে গিয়ে নির্বাচন পদ্ধতি দেখবেন।

স্বর্ণমণ্ডিত রথে চেপে বাদশা এলেন একদিন। তাঁর সিংহাসনটিও নিয়ে আসা হলো। তাতে বসে তৃতীয় নেপোলিয়ান দেখলেন সব বাতিল ছবি। একটার পর একটা ছবি এনে দেখানো হলো তাঁকে। তারপর তিনি আদেশ দিলেন, এবার আনো তো কোন্ ছবিগুলো মনোনীত হয়েছে!

সেগুলিও দেখার পর তিনি বললেন, মনোনীতগুলোর চেয়ে বাতিলগুলো তো কোনো অংশে খারাপ দেখছি না!

আকাদেমির পরিচালক বললেন, কিন্তু হে সম্রাট, জুরিদের বিচারেই তো ভালো ছবিগুলি নির্বাচিত হয়েছে!

সম্রাট বললেন, জুরিরা চুলোয় যাক! কুকুরের গায়ে যেমন এঁটুলি লেগে থাকে, ওরাও তেমনি সর্বাঙ্গে সংস্কারগ্রস্ত! এই সব বাতিল ছবিও এবার টাঙাতে হবে!

কিন্তু জায়গা পাওয়া যাবে কোথায় ?

জায়গা খোঁজো ! নতুন বাড়িতে টাঙাও !

সম্রাটের আদেশে সেবার দুটি প্রদর্শনী চালু হলো। একটি পূর্ব-নির্বাচিত শিল্পীদের, অন্যটি বাতিলদের। দ্বিতীয়টির নামই হলো সালোঁ দে রেফুউজে। কিন্তু এই বাতিলদের প্রদর্শনী কে দেখতে আসবে ? সম্রাট সেদিকেও চিন্তা করেছিলেন। উদ্বোধনের দিন তিনি নিজে আসবেন সদলবলে, তাহলেই আসবে অভিজাতরা, এবং এই সমাগম দেখেই উপস্থিত হবে কৌতূহলীরা। সম্রাট সেইরকম ভাবেই কিছুক্ষণের জন্য এলেন। তরুণ শিল্পীদের খুশি করার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ান চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাতেও কোনো লাভ হলো না !

কৌতূহলী দর্শকে হল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে সবাই চুপ। সম্রাট চলে যাবার পর শুরু হলো গুঞ্জন, তারপর ঠাট্টা-ইয়ার্কি, অট্টহাসি। মেয়েরা মুখে রুমাল চাপা দিল, পুরুষরা পেট চেপে ধরেও হাসি সামলাতে পারে না। শিল্পরসিক প্যারিসের দর্শকদের চোখে এই সব কোনো ছবির মধ্যেই শিল্প নেই।

সবচেয়ে বেশি ভিড় হলো এদুয়ার মানে-র 'ঘাসের ওপর মধ্যাহ্ন ভোজ' এবং হুইস্‌লারের 'শ্বেত বালিকা' ছবির সামনে। সবচেয়ে বেশি বিদ্রূপও বর্ষিত হলো এই দুটি ছবির ওপরে। মানে সম্পর্কে চেঁচিয়ে বলা হতে লাগলো, পাগল ! লোকটা বদমাস ! অশ্লীল ছবি এঁকেছে। এই ছবিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা উচিত !

সারা পৃথিবীতে যারা ছবি ভালবাসে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে মানে-র এই ছবিটি দেখেনি। ছবিটির কম্পোজিশান যে খুবই বিচিত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জঙ্গলের মধ্যে ঘাসের ওপর বসে আছে দু'জন সম্পূর্ণ সুসজ্জিত পুরুষ। তাদের পাশে একটি রমণী সম্পূর্ণ নগ্ন, একটু দূরে আর একটি পাতলা জামা পরা রমণী জলে পা ধুচ্ছে। দু'জন সম্পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত পুরুষের পাশে নগ্ন রমণীটিই যাবতীয় কৌতূহলের কারণ, যদিও ছবিটির মধ্যে অশ্লীলতার আভাসমাত্র নেই। অশ্লীলতা পোশাক দিয়ে বিচার করা যায় না, অশ্লীলতা ফুটে ওঠে ভঙ্গিতে।

বর্তমানে ছবিটি বিশ্ববন্দিত, লুভ্‌র মিউজিয়ামে টাঙানো রয়েছে, অথচ একশো বছর আগে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল দর্শকরা, শিল্পীর ভাগ্যে জুটেছিল লাঞ্ছনা !

কথায় কথায় মোনিক বললো, এদুয়ার মানে-র এই ছবিটা কিন্তু সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। লেখকরা যেমন অন্য লেখকদের কাছ থেকে ভাব ধার নেয়, এদুয়ার মানে-ও সেরকম এ ছবিটার কমপোজিশান ধার করেছেন, মারসানতানিও রাইমণ্ডির 'এনগ্রেভিং আফটার রাফায়েল'স জাজমেন্ট অফ প্যারিস' থেকে।

মার্গারিট এটা মানতে কিছুতেই রাজি নয়। দু'জনে তর্ক লেগে গেল। তর্ক থামাবার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, সেই সময় লেখক-কবিরা এই শিল্পীদের সাহায্য করেনি ? আমি তো জানতাম, বোদলেয়ার এদের পক্ষ নিয়ে লিখেছিলেন।

পীয়ের বললো, বোদলেয়ারের আর কী ক্ষমতা ছিল ? তিনি তখন নিজের জ্বালায় মরছেন। কেউ তাঁর লেখা ছাপে না, চতুর্দিকে ধার, বিধবা মায়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন নানা ছুতোয়, ওদিকে আবার জান দুভাল নামে এক রক্ষিতাকে টাকা দিতে হয়। বোদলেয়ারের মৃত্যুও তখন কাছাকাছি এসে গেছে। ওদের আর এক লেখক বন্ধু ছিলেন এমিল জোলা। এমিল জোলা ছিলেন পল সেজান-এর স্কুলের বন্ধু। দু'জনেই এসেছেন এক্স-অঁ-প্রভাঁস থেকে। তবে এমিল জোলাও তখন ঠিক মতন প্রতিষ্ঠিত নন, বিশেষ কেউ

চেনে না, তিনি খবরের কাগজে কিছু কিছু লিখছেন বন্ধুদের সম্পর্কে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর ভিক্তর হুগো ? তিনি তো তখন রীতি মতন প্রতিষ্ঠিত।

ভিক্তর হুগোর নাম শুনে পীয়ের হো হো করে হেসে উঠলো উচ্চকণ্ঠে।

ওর হাসির কারণটা জানা হলো না, এই সময় বেজে উঠলো টেলিফোন। মেনিক উঠে গিয়ে ফোনটা ধরে এক মিনিট কথা বলে, হাত উঁচু করে বললো, সুনীল, তোমার—।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। প্যারিসে আমি এদের বাইরে আর কাকেই চিনি না, আমায় কে ফোন করবে ? তাও রাত সাড়ে বারোটায় ? উঠে গিয়ে কণ্ঠস্বর শুনেও আমার বিস্ময় একটুও কমলো না।

আটলান্টিক মহাসমুদ্রের ওপার থেকে পল এঙ্গেল বললো, হাই সুনীল, কী খবর তোমার ? এখান থেকে চলে যাবার পর একটাও চিঠি লিখলে না। ফোন করলে না।

আমি লজ্জায় জিভ কাটলাম। সত্যি এটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমি বড্ডই তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছি। সেই সময় ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু, ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, প্রতিভা বসু কত ভালোবাসা ও যত্নের সঙ্গে আমাকে একবার কাছে রেখে খাইয়েছিলেন, ওদের ছেলে পাপ্পার সঙ্গে ছিল আমার খুব ভাব। ওঁদেরও কিছু জানিয়ে আসা হয়নি, একসঙ্গে এসব মনে পড়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পল, তুমি এখানে আমাকে কী করে ফোন করলে ? আমি যে এ বাড়িতে থাকবো, তা তো প্যারিসে আসবার আগে আমিও জানতাম না !

পল এঙ্গেল বললেন, এটা এমন কিছু শক্ত নয়। তুমি কোনো ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস রেখে যাওনি। আমি ভেবেছিলাম, নিউ ইয়র্ক থেকে তুমি কলকাতায় ফিরে যাবে। নিউ ইয়র্কে অ্যালেন গীন্‌সবার্গকে ফোন করে জানলাম, তুমি প্যারিসে। অ্যালেনই এই নাম্বারটা দিল।

নিউ ইয়র্ক থেকে আমি একবার মার্গারিটকে ফোন করেছিলাম বটে, নাম্বারটা লিখে রেখেছিলাম ওদের অ্যাপার্টমেন্টের দেওয়ালে, সেখানে আরও বহু নাম্বার লেখা, অ্যালেন তার মধ্য থেকে এটা ঠিক খুঁজে বার করেছে !

পল এঙ্গেল জিজ্ঞেস করলেন, প্যারিসে তুমি কোথায় আছো ? প্যারিস তো খরচের জায়গা। আমি তোমাকে আমার এক বন্ধুর কাছে রাখার ব্যবস্থা করতে পারি।

আমি বললাম, তার দরকার নেই। আমি একটা থাকার জায়গা পেয়ে গেছি।

পল এঙ্গেল বললেন, তুমি মেরির সঙ্গে দেখা করে যাওনি ! মেরি খুব রাগ করেছে। আজ সারাদিন সে তোমার কথা বলছিল।

এবার আমার লজ্জায় কথা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। পলের স্ত্রী মেরি আমায় সত্যিই খুব ভালোবাসেন। অনেকবার তিনি আমায় আদর করে বলেছেন, এই ছেলেটাকে আমি পোষ্যপুত্র হিসেবে রেখে দেবো ! মেরির কাছ থেকে বিদায় নেওয়া খুব কঠিন হতো বলেই আমি তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করিনি। এটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

আমি কোনোক্রমে বললাম, আমি ক্ষমা চাইছি, পল। একবার কি মেরির কাছে ক্ষমা চাইতে পারি ?

পল এঙ্গেল বললেন, না, পারো না। মেরির আজ আবার খুব ডিপ্রেশান হয়েছে, সারাদিন রাগারাগি করছিল, এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ঘুমোচ্ছে, তুমি তো জানো—

মেরির এই অসুস্থতার কথা আমি জানি ঠিকই। মেরির খুব রাগ তাঁর স্বামীর ওপর। মাঝে মাঝে তাঁর ডিপ্রেশান হয়। মেরির অভিযোগ একটাই, তাঁর ব্যস্ত স্বামী তাঁর জন্য সময় দিতে পারেন না। সারাদিন ও সন্ধে, কখনো দিনের পর দিন ও রাত মেরিকে একা একা

কাটাতে হয়। সেইসব দিনে সেদি ভিন্ন পন্থা অবলম্বনে শুরু করেন, জনশ সেশা বেড়ে যায়, কিন্তু ভিনিসপত্র ভাঙেন ও একসময় বুঝিয়ে পড়েন। ওদেশে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাদের ভিনের সেশা করা একটা অতি পরিচিত রোগ। পারিসে এখন মরোক্কো হতেও আমেরিকার এখন বিরেন, এরই মাঝে সেদি অজ্ঞান।

আমি অনুতপ্তভাবে বললাম, সেদিকে আমি চিঠি লিখবো ক্ষমা চেয়ে।

পল এক্সেল বললেন, শোনো, সেদি তোমাকে একটা উপহার দিতে চায়। আজ সারাদিন সেই কথাই বলছিল। তুমি কাল পারিসের যে-কোনো আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কে গিয়ে তোমার পাসপোর্ট দেখালে ওরা তোমাকে দুশো ডলার দেবে।

আমি বললাম, না, না, আমার এখানে টাকা লাগবে না। আমার এখানে বেশ চলে যাচ্ছে, কয়েকজন বন্ধু পেয়েছি।

পল এক্সেল রাগত দিয়ে বললেন, এটা সেদির উপহার। তোমার প্রয়োজন আছে কি না, তা জেনে কেউ উপহার দেয় না। তুমি না নিলে সেদি দুঃখ পাবে।

টেলিফোনটা রাখার পর আমি একটুক্ষণ হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। এ যে স্বপ্নের মতন। সেদি আমাকে এত ভালবাসে! মায়েদের যেমন একটা টেলিপ্যাথি থাকে, সেইরকমই কি সেদি ঠিক আজই আমার অবস্থাটা অনুভব করে এই উপহার পাঠালো?

দুশো ডলার বিরাট কিছু নগদ নয়, তখনকার হিসেবে এক হাজার টাকা। কিন্তু আমার সেই অবিশ্বাস্য অবস্থায় সেই টাকাটাই লটারির কার্স প্রাইজ পাবার মতন।

হঠাৎ আমার চোখ জ্বালা করে উঠলো। পল ও সেদির এই যে আমার প্রতি অকারণ ভালোবাসা, আমি ও সেশ ছেড়ে চলে এসেছি শুধু আমার জন্য উদ্বেগ, আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা, আমি কি এর কিছুর যোগ্য?

১৩

> সোনালির ওপর সবজগুলি সোনা, সবজগুলি সোনা মিলিয়ন
> চলিগুলি রয়েছে লাটু ঘড়িতের ফোকাসের কাছে
> এবং প্রত্যেকের পাথরের চক্ষের ওপর ভোর পড়েছে ক্রমে
> হে বন্ধু, এই বাদুকারের তোমার কাছে বন্দিটি আমাকে দিয়ে যাও—
>
> —শ্রী জন পর্স

এই সেই ব্যাস্টিল! কী আশ্চর্য না, আজ ১৯শ অক্টোবর। আর এক ১৯শ অক্টোবরে এই ব্যাস্টিল দুর্গ নতুন করে গড়া-ভাঙা হয়েছিল, তারপর থেকেই বদলে গেছে এ দেশের ইতিহাস বদলে গিয়েছিল।

মার্গারিট অতি উৎসাহে, কণ্ঠস্বরে আমাকে টুকরো টুকরো ইতিহাসের কাহিনী শোনাচ্ছেও আমি তেমন আগ্রহ বোধ করছিলাম না। ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ দেখতে এসে খানিক পরেই আমার ক্লান্তি এসে গেল। তার একটা কারণ ভিড়, বড্ড বেশি ভিড়, আজ ছুটির দিন বলে এখানে গিসগিস করছে মানুষ। এত বড় প্রাসাদটাও ভর্তি হয়ে গেছে কয়েক হাজার মানুষে, লাইন করে ঢুকতে হচ্ছে প্রতিটি ঘরে। কোনো কোনো দলের সঙ্গে রয়েছে গাইড, তারা জার্মান-ইটালিয়ান-ইংরিজিতে অনেক কিছু বোঝাচ্ছে। সব মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি।

এত ভিড়ের মধ্যেও মার্গারিট ও আমি পরস্পরকে নিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু কাল রাত থেকে আমার মেজাজ কিছুটা বিগড়ে আছে। মেনিক হার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়েছে, তাই কাল সন্ধেবেলা আমাদের বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে উঠে যেতে হয়েছে। মার্গারিটের আর এক বান্ধবী মারী সেমিয়ের বাড়িতে। এটা অ্যাপার্টমেন্ট নয়, একটা পুরো বাড়ি, মঁমার্ত অঞ্চলে। বেশ সুন্দর কাঠের বাড়ি, সামনে একটু বাগান। এই এলাকাটা খানিকটা উঁচু, এখান থেকে প্যারিসের অনেকখানি দেখা যায়। রাত্রের আলো-ঝলমল নগরীর রূপ জানলা দিয়েই চোখে পড়ে। তবু সে বাড়িতে ঢুকে খানিকক্ষণের মধ্যেই আমার অস্বস্তি হতে লাগলো। এখানে একেবারে পারিবারিক আবহাওয়া, মারীর স্বামী এবং দুটি ছেলেমেয়ে রয়েছে, এবং একজন বৃদ্ধা, তাঁর পরিচয়টা ঠিক বোঝা গেল না। ছেলে-মেয়ে দুটি হস্টেলে থাকে। ছুটিতে এসেছে। মেনিকের বাড়িতে আমরা ছিলাম স্বাধীনভাবে, নিজেরা রান্না করে খেতাম। যত রাত পর্যন্ত ইচ্ছে আড্ডা দিতাম, কিন্তু একটা অপরিচিত সংসারে এসে সেরকম করা যায় না। মারীর স্বামী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ভদ্রতার অভাব নেই, কিন্তু সে আমাদের এরকম উড়ে এসে জুড়ে বসা পছন্দ করেছে কি না, তা বোঝা দুষ্কর!

মার্গারিটকে আমি বললাম, এখন তো আমি কিছু টাকা পেয়েছি, সস্তার হোটেলে থাকতে

পারি। কিন্তু মাগারিট কিছুতেই রাজি নয়। শুধু মাথা গোঁজার জায়গার জন্য আমার পয়সা খরচ করা চলবে না। এই নিয়ে মাগারিটের সঙ্গে আমার সামান্য ঝগড়াও হয়ে গেল।

মেজাজটা ভালো নেই বলেই ভালো ভালো জিনিস আজ উপভোগ করতে পারছি না। ভার্সাই প্রাসাদে খানিকক্ষণ ঘোরার পর মনে হলো, দূর ছাই, এমন কি আর দেখার আছে, এখানে না এলেও চলতো! আজ আমার বারবার দেশের কথা মনে পড়ছে।

মাগারিট বললো, জানো, ১লা অকটোবর এখানে একটা বিরাট ভোজসভা হয়েছিল। প্যারিসে তখন বাস্তিল কারাগার ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। উন্মত্ত জনতা যাকে তাকে শাস্তি দিয়ে তার ছিন্নমুণ্ড বর্শায় গেঁথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুরু হয়ে গেছে ফরাসী বিপ্লব, রাজতন্ত্র টলমল করছে। ফরাসী দেশের পতাকার রং আগে ছিল সাদা, জনতার ইচ্ছেতেই তাতে তখন যুক্ত হয়েছে লাল ও নীল রং। সম্রাট ষোড়শ লুই সে সময় সপরিবারে রয়েছেন এই ভার্সাইতে, বেশ অসহায় অবস্থায়। এরই মধ্যে একটি সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী এসে উপস্থিত হলো এখানে। তাতেই বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদীরা মনে করলো, রাজতন্ত্র এবার নিরাপদ, সম্রাটের গায়ে কেউ আর হাত দিতে পারবে না। সেনাবাহিনীর অফিসারদের খাতির করার জন্য বিরাট ভোজ হলো। রাজা ও রানী দু'জনেই সেখানে উপস্থিত। সকলের কাছে বিলোনো হলো সাদা পতাকা। বিপ্লবীদের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে সবাই হাহা-হোহো করতে লাগলো।

মাগারিটকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, খুব সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে, চলো, এখান থেকে একটু বাইরে যাই।

ভিড় এড়িয়ে আমরা একটা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

মাগারিটকে ঐতিহাসিক স্মৃতি পেয়ে বসেছে। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, এই যে বাইরের বাগান দেখছো, এই সব জায়গায়, ভার্সাইয়ের সব রাস্তা-ঘাটে সেই পয়লা অকটোবরের পরের এক রাতে শুয়ে ছিল হাজার হাজার মানুষ। এই রাজবাড়ির ভোজসভার কথা রটে গিয়েছিল প্যারিসে, ওদিকে সেখানে তখন কোনো খাদ্য নেই। বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসে রুটি দাবি করেছিল। অকটোবরের পাঁচ তারিখে প্যারিসের বিক্ষুব্ধ জনতা ঠিক করলো, তারা ভার্সাইয়ে এসে রাজার কাছে বলবে, আমাদের খাদ্য দাও, নইলে তুমি নিপাত যাও!

প্যারিস থেকে হেঁটে চলে এলো সেই বিশাল ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ মানুষের মিছিল। তাদের মধ্যে নারী ছিল কয়েক হাজার। রাজা ষোড়শ লুই প্রত্যেক দিন শিকার করতে যান, সেদিনও শিকার থেকে ফিরে এসে দেখলেন ভার্সাই প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে মারমুখী জনতা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেইদিনই বুঝি রানী মারী আঁতোয়ানেৎ বলেছিলেন, ওরা রুটি খেতে পাচ্ছে না। তা হলে তার বদলে কেক খায় না কেন?

মাগারিট চোখ বড় বড় করে বললো, না, না, ও কথাটা ভুল। মারী আঁতোয়ানেৎ কোনোদিনই ও-কথা বলেননি। ও বেচারার নামে ভুল করে ঐ কথাটা চলে আসছে।

আমি বললাম, সেদিন এখানে অনেক রক্তপাত হয়েছিল!

মাগারিট বললো, খুব বেশি হতে পারতো। রাজার রক্ষীবাহিনী গুলি চালিয়েছিল, এদিকে বিদ্রোহী জনগণের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার, তাদের অনেকেই তো সশস্ত্র। কুড়ি হাজার মানুষকে কি মেরে ফেলা যায়? এর মধ্যে এসে পড়লেন জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কমাণ্ডার লাফাইয়েৎ। এই লাফাইয়েৎ জনতার চোখে হিরো। আমেরিকার স্বাধীনতার

যুদ্ধের সময় ইনি নিজে থেকেই ফ্রান্স থেকে অত দূরে চলে গিয়েছিলেন আমেরিকানদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে। লাফাইয়েৎ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন জনতাকে, রাজাও ব্যালকনিতে এসে (এমনও হতে পারে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেই) দর্শন দিয়ে রুটি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর সবাই ঘুমোতে চলে গেল। ভোররাতের দিকে আবার কয়েকশো লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো প্রাসাদের মধ্যে। অতর্কিত অসতর্ক রাজকীয় রক্ষীদের কচুকাটা করতে করতে তারা উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। ঐ দ্যাখ, ঐ যে রানীর ঘর, প্রায় ঐ পর্যন্ত এসে পড়েছিল তারা। এবারেও লাফাইয়েৎ এলেন ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। প্রায় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে দু' পক্ষকে থামালেন। কী রকম এক একটা ইতিহাসের মুহূর্ত ভেবে দ্যাখো। আর একটু দেরি হলেই হয়তো সেই লোকগুলো এই প্রাসাদেই রাজা-রানীকে শেষ করে ফেলতো।

পরদিন সকালে দাবি উঠলো, শুধু রুটির প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, রাজাকে ভার্সাই ছেড়ে এই জনতার সঙ্গেই প্যারিস যেতে হবে! রাজা-রানী একবার পালাবার কথা ভেবেও নিরস্ত হলেন। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, জল-কাদার রাস্তা দিয়ে রাজা সপরিবারে চললেন প্যারিসের দিকে। তাঁর জুড়ি গাড়ির পাশে পাশে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে এক একটা লোকের হাতের বর্শায় ডগায় কোনো রাজরক্ষীর ছিন্ন মুণ্ড। রাজা-রানী আর কোনোদিন ভার্সাইতে ফিরে আসেননি।

এরপর আমরা আরও কয়েকটি ঘর ঘুরে দেখে উদ্যানে এসে বসলাম। রাজা-রানীদের শায়নকক্ষ, খাবার ঘর, বসবার ঘরে আজকাল জনগণের অবাধ প্রবেশ অধিকার। সেই সব ঘর দেখে মনে হয় না, আগেকার রাজা-রানীরা খুব একটা আরামে থাকতেন এখনকার তুলনায়। আজকালকার টাটা-বিড়লা কিংবা ফোর্ড-রকেফেলার প্রমুখ নিশ্চয়ই সিরাজউদ্দৌলা, সাজাহান, নেপোলিয়ান, রানী ভিকটোরিয়ার তুলনায় অনেক বেশি বিলাসী জীবন কাটান। কারণ, আগেকার ওঁরা এয়ার কণ্ডিশানিং পাননি, কল খুললেই পাননি ঠাণ্ডা-গরম জল এক সঙ্গে। লিফটের বদলে কত সিঁড়িই না ভাঙতে হয়েছে সারা জীবনে।

ভার্সাইয়ের বাগান এখন অনেকের কাছে দর্শনীয়, কিন্তু আমার ভালো লাগেনি। ফরাসীদের বাগান বড় বেশি বেশি সাজানো। কোথাও একটাও স্বাভাবিক গাছ নেই। সব গাছ কেটেকুটে নানা রকম আকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফুলের বাগানগুলিকে দেওয়া হয়েছে জ্যামিতিক আকৃতি। গাছপালার ওপর এত বেশি ছুরি-কাঁচি চালানো দেখলে আমার কষ্ট হয়।

একটু পরে আমি বললাম, মাগারিট, এখানে এসে তোমার ফরাসী বিপ্লবের কথা মনে পড়ছে, সেটা স্বাভাবিক। আমার কিন্তু মনে পড়ছে অন্য বিষয়। ভার্সাই চুক্তির কথা তুমি জানো? সেটা ফরাসী বিপ্লবের ছ' বছর আগেকার কথা। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে খুব লড়াই চলছে। আমাদের দেশটাকে তখন এই দুই শক্তির মধ্যে কে কতটা ভাগাভাগি করে নেবে, তা ঠিক হয়নি। অবশ্য ইংরেজদের কূটনীতি ও রণকৌশল ছিল ফরাসীদের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। যাই হোক, ভারতের মাটিতে যাতে এই দুই পক্ষ অযথা শক্তিক্ষয় না করে, সেই জন্য ভার্সাইতে হয়েছিল একটা শান্তি চুক্তি। ইংরেজরা ফরাসীদের ছেড়ে দিল পণ্ডিচেরি, মাহে এবং সুরাটের খানিকটা অংশ। ভারতীয়রা কিছু জানলোই না যে তাদের ভাগ্য ভাগাভাগি হচ্ছে ভার্সাইয়ের প্রাসাদে।

মাগারিট বললো, ইতিহাসে পড়েছি, দক্ষিণ ভারতে হায়দার আলি নামে একজন নবাব

ছিল, সে ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজদের পুরোপুরি হটিয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু হায়দার আলি হঠাৎ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে টিপ্পু সাহিব...

আমি বললাম, এই ভার্সাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাংলা কবিতারও খানিকটা যোগ আছে। আমাদের একজন বাঙালী কবি এখানে কিছুদিন ছিলেন, এখানে বসে লিখেছেন, তাঁর নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত!

রাজা-রাজড়ার কাহিনীর চেয়ে কবিদের সম্পর্কেই মার্গারিটের উৎসাহ অনেক বেশি। সে বললো, বাঙালী কবি, তার নাম মাইকেল? নিশ্চয়ই ক্রিশ্চিয়ান, সে বাংলায় কবিতা লিখেছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি খাঁটি বাঙালীর ছেলে খ্রিস্টান হয়ে ইংরিজিতে লিখতে শুরু করেছিলেন। তারপর বাংলা ভাষায় ফিরে আসেন এবং আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভার্সাইতে এসেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের অনেক আগে, অন্তত বছর পঁচিশেক আগে।

মার্গারিট জিজ্ঞেস করলো, সে হঠাৎ ভার্সাইতে থাকতে এসেছিল কেন! একজন বিদেশীর পক্ষে প্যারিসে থাকাই তো স্বাভাবিক ছিল।

আমি বললাম, সেটা আমি ঠিক জানি না। খুব সম্ভবত প্যারিসের চেয়ে ভার্সাইতে বাড়ি ভাড়া ও জিনিসপত্রের দাম কম ছিল সেকালে। মাইকেলের দারুণ অর্থকষ্ট চলছিল তখন, সঙ্গে বউ ছেলে মেয়ে। এক একদিন তাঁরা কিছুই খেতে পাননি। ধার শোধ করতে না পারার জন্য মাইকেলের জেলে যাবারও উপক্রম হয়েছিল।

যেন মাইকেল নামে কবিটি এখনো জীবিত, যেন তার ছেলেমেয়েরা আজই খেতে পাচ্ছে না, এইরকম একটা দৃশ্য ভেবে নিয়ে মার্গারিটের চোখ-মুখ করুণ হয়ে এলো। সে বেদনাময় গলায় বললো, একজন কবিকে এত কষ্ট সহ্য করতে হবে, ছেলে-মেয়েরা উপবাসী থাকবে, ইস, পৃথিবীটা এমন খারাপ জায়গা।

আমি বললাম, না, পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা নয়। তোমারই মতন কোনো দয়াবতী ফরাসী মহিলা এই কবি পরিবারটির দুর্দশা দেখে গোপনে অনেক সাহায্য করেছিলেন, চুপি চুপি ওদের বাড়ির দরজার কাছে দুধ আর রুটি রেখে যেতেন।

এরপর মাইকেলের পুরো জীবন কাহিনীটি আমাকে শোনাতে হলো। শুধু তাই নয়, মাইকেলের কবিতাও সে শুনতে চায়, আমি মেঘনাদবধ কাব্য থেকে আবৃত্তি করলাম কয়েকটি লাইন। হঠাৎ কীরকম মুড এসে গেল। বাংলা শব্দের ঝংকার যেন মধুবর্ষণ করলো আমার কানে, অনেকদিন তো এরকম উচ্চকণ্ঠে বাংলা পড়িনি। আমি গড় গড় করে অনেকখানি বলে যেতে লাগলাম, সেই দুর্বোধ্য শব্দাবলীই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো মার্গারিট!

একটু পরে সে জিজ্ঞেস করলো, মাইকেলের পর তুমিই দ্বিতীয় বাঙালী কবি এই ভার্সাইতে এলে?

আমি বললাম, ভ্যাট! আরও কত কবি এসেছেন। বাঙালী লেখকরা অনেকেই ফরাসী দেশ ঘুরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন কতবার। প্যারিসে তাঁর ছবির প্রদর্শনীও হয়েছিল। তিনি কি আর ভার্সাইতে আসেননি? তবে, মাইকেলের পর আমিই দ্বিতীয় গরিব বাঙালী কবি এখানে এসেছি বলতে পারো! মাইকেল এখানে প্রায় কর্পদকশূন্য হয়েছিলেন একসময়, তাঁর স্ত্রী কান্নাকাটি করছিলেন, হঠাৎ কলকাতা থেকে বিদ্যাসাগর নামে একজন বিরাট মানুষের কাছ থেকে টাকা এলো মানি অর্ডারে। আমিও তিন দিন আগে একেবারে

নিঃস্ব ছিলাম, তাই না?

ভার্সাইতে মাইকেল যে বাড়িতে ছিলেন, এই কয়েক বছর আগে ফ্রান্সের বাঙালীরা সে বাড়িতে একটা নাম ফলক বসিয়ে দিয়েছেন। আমি যাবার সময় সেটা ছিল না, আমি অবশ্য মাইকেলের সে বাড়ি খোঁজার চেষ্টাও করিনি।

ভার্সাই থেকে ফিরে আমরা তুইলারি প্রাসাদের বাগানে কাটালাম কিছুক্ষণ। রাজা ষোড়শ লুইও ভার্সাই ছেড়ে এসে এখানে উঠেছিলেন। এ বাড়িটা রাজা-রানীর জন্য তৈরি ছিল না, প্রথম রাতটা তাদের ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে শুতে হয়েছিল। আমরা অবশ্য বাড়িটার মধ্যে আর গেলাম না। একদিনের মধ্যে দুটো রাজবাড়ি হজম করা যায় না।

এখান থেকে আবার মারীর বাড়িতে ফিরে যেতে হবে ভেবেই আমার মনটা খচখচ করতে লাগলো। হয়তো ওরা খুবই ভালো ব্যবহার করবে, তবু এরকম আতিথ্য আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। আমাকে শুতে দেওয়া হয়েছে বৈঠকখানায়। এ দেশের পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রায় সব বৈঠকখানাতেই একটা সোফা কাম বেড থাকে, আমেরিকায় যাকে বলে ড্যাভেনপোর্ট। দিনের বেলা সোফা, রাত্তিরে সেটা খুলে নিলেই বিছানা। কিন্তু আমাকে সক্কালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বিছানা গুটিয়ে ঘরখানা ফিটফাট করতে হবে, দিনের বেলা ইচ্ছে হলেও বিছানায় গড়ানো যাবে না। এরকম শয়ন-ব্যবস্থায় প্রাইভেসিও থাকে না।

প্যারিসে দু'দশ ঘর বাঙালী আছে নিশ্চয়ই। তাদের কারুর কাছে চাইলে কি আশ্রয় পাওয়া যেত না? কিন্তু আমি একজনকেও চিনি না!

মার্গারিট কিছুতেই আমার অস্বস্তির কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না। আমি কিছু বলতে গেলেই ও বলে, তুমি ভুল করছো, সুনীল, আমরা মারীর বাড়িতে জোর করে উঠিনি। ওর বাড়িতে থাকি না বলে ও কতবার রাগারাগি করেছে। ও নিজেই বিশেষ করে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে, মারী ভারতীয় যোগব্যায়াম সম্পর্কে খুব আগ্রহী। ও একবর্ণও ইংরিজি জানে না বলে তোমার সঙ্গে ঠিক মতন কথা বলতে পারছে না। আর দু'একদিনের মধ্যে আড়ষ্টতা কেটে যাবে, তখন দেখবে, তোমাকে যোগব্যায়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করে কান ঝালাপালা করে দেবে!

হায় রে, আমি মারীকে যোগব্যায়াম শেখাবো! ও বিষয়ে আমি কিচ্ছু জানি না!

আমি বললাম, মার্গারিট, তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কী হলো? চলো, তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দু'একদিন থেকে আসি। হোক না গ্রাম, আমার গ্রাম খুব পছন্দ। আমি নিজেও তো গ্রামের ছেলে!

মার্গারিটের মা-বাবা আমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে ও এখনো নিশ্চিন্ত নয়। তাই মার্গারিট ও ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছে না। রোজই একবার ফোন করে বাড়িতে, এর মধ্যে আমার কথা উল্লেখ করেছে কি না কে জানে?

রাত্তিরে আমার অস্বস্তি বেড়ে গেল আরও বেশি। মার্গারিটের বান্ধবী মারীই রান্না করে আমাদের খাওয়ালো নানারকম। কথায় কথায় জানা গেল, সে আবার গর্ভবতী। মার্গারিটেরই সমবয়েসী সে, অথচ এর মধ্যে দুটির পর তৃতীয় সন্তানের জননী হতে চলেছে, বোধহয় এটা যোগব্যায়ামের সুফল। এই অবস্থায় আমাদের জন্য তাকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে।

ওদের বাড়িতে নিজস্ব সেলার আছে, সেখানে নানারকম ওয়াইনের স্টক। মারীর গম্ভীর প্রকৃতির স্বামীটি ওয়াইন খেতে ও খাওয়াতে বেশ ভালোবাসে। পানাহার বেশ ভালোই

হলো বটে, কিন্তু মোনিকের বাড়িতে যে চমৎকার আড্ডা হতো, সেই মজা এখানে একেবারেই পাওয়া গেল না। মারী গল্প করতে লাগলো তার কলেজ জীবন ও চেনাশুনো লোকদের সম্পর্কে, যাদের আমি বিন্দুমাত্র চিনি না। ওদের রসিকতাগুলো প্রাইভেট জোক্‌স পর্যায়ের, ওরা যখন হাসে তখন আমি হাসতেও পারি না, আবার মুখ গম্ভীর করে বসে থাকলে বোকা বোকা লাগে। তা ছাড়া ফরাসী মেয়েরা নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলে, তখন অনেকটা বাঙালী মেয়েদের মতনই এমন ঝড়ের বেগে কলকল স্বরে সব কিছু বলে যে বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য !

সকালবেলা মাগারিট আবার ফোন করলো তার মা-বাবাকে। তারপর আমাকে বললো, আজ মায়ের কাছে খুব বকুনি খেলাম।

আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই রে, আমার কথা বলেছ বুঝি ?

মাগারিট বললো, না, সে জন্য নয়। আয়ওয়া থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। ওখানে ইউনিভার্সিটিতে নতুন সেমেস্টার শুরু হয়ে গেছে। আমি এখনো নাম রেজিস্ট্রি করিনি। ওরা জানতে চেয়েছে, আমি এই সেমেস্টারেও পড়াতে চাই কি না। দেরি করলে আমার নাম কেটে দেবে। মা তাই জানতে চেয়েছে, আমি শুধু শুধু এতদিন প্যারিসে বসে আছি কেন ?

আমি বললাম, তা হলে তো তোমাকে আমেরিকায় ফিরতেই হবে।

মাগারিট একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, ও কথা পরে চিন্তা করা যাবে। আজ আমাদের রেনোয়ার একক প্রদর্শনী দেখতে যাবার কথা। চলো, চলো, আর দেরি করো না !

আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

মাগারিটের সঙ্গে আমার সংলাপ আমি যেভাবে লিখছি, এটা সঠিক নয়। আমাদের মধ্যে ছিল তুই-তুকারির সম্পর্ক। ইংরিজিতে তুই-তুমি-আপনি'র ব্যাপার নেই। সব ইউ দিয়ে সেরে নেওয়া হয়। ফরাসীতে কিন্তু আছে তু আর ভু। এর মধ্যে তু একেবারে তুই-এরই মতন শোনায়, হিন্দিতেও তো তু মানে তুই। আমি মাগারিটের সঙ্গে যখন দু'চারটে বাংলা কথা বলতাম, তখনও তাকে তুই-ই বলতাম। সুতরাং শেষের দু'টি সংলাপ আসলে ছিল এরকম :

এই খুকি, তা হলে তো তোকে এবার আমেরিকায় ফিরতেই হবে !

সে কথা পরে ভেবে দেখবো। সুনীল, আর দেরি করিস না, চটপট তৈরি হয়ে নে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে !

১৪

কবি যা আবিষ্কার করে, তা সে জমিয়ে রাখে না ; লিখে ফেলার পর দ্রুত সেটা হারিয়ে ফেলে। সেখানেই তো তার অভিনবত্ব, তার অসীম, এবং তার দুর্যোগ।

—রেনে শার

লুভ্‌র মিউজিয়ামেরই পাশের এক অংশে চলছিল পীয়ের অগুস্ত রেনোয়া'র একক ধারাবাহিক প্রদর্শনী। একজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর এতগুলি ছবি একসঙ্গে দেখার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়।

লুভ্‌র প্রাসাদের সামনে যে চত্বর, সেখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাগারিট বললো, জানো, বাচ্চা বয়েসে রেনোয়া এখানে খেলা করতেন। রেনোয়া ছিলেন গরিবের ছেলে, ওঁর বাবা ছিলেন একজন সাধারণ দর্জি, ওঁরা এই পাড়াতেই থাকতেন। তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে একদিন ঐ ছেলেটির আঁকা ছবি লুভ্‌র মিউজিয়ামে টাঙানো হবে।

আমার একটু খট্‌কা লাগলো। ইমপ্রেশানিস্ট দলের শিল্পীদের মধ্যে রেনোয়া-ই যে সবচেয়ে গরিব ও সাধারণ পরিবার থেকে এসেছিলেন, সেটা আমার জানা ছিল। কিন্তু গরিবরা এই পাড়ায় থাকতো কী করে ? এই লুভ্‌র এককালে ছিল রাজপ্রাসাদ, সেন নদীর ধারের এই এলাকাটা প্যারিসের সবচেয়ে বনেদী অংশ, অদূরেই তুইলারির বাগানে আর একটা রাজপ্রাসাদ, এর মাঝখানের অংশে তো ধনী রাজকর্মচারিদের থাকবার কথা। ইংল্যান্ডের বাকিংহাম প্যালেসের পাশে গরিবরা থাকে, এটা কি ভাবা যায় ?

মাগারিট বললো, সেটা তুমি ঠিকই ধরেছো। এখানকার বড় বড় বাড়িগুলোতে বড়লোকরা এবং উচ্চপদস্থ অফিসাররাই থাকতেন এক সময়। তারপর ফরাসী সম্রাটরা যখন ভার্সাইতে চলে যান, তখন সেই সব লোকেরাও সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। এখানকার বিশাল হর্ম্যগুলি ক্রমশ মেরামতির অভাবে ঝুরঝুরে হয়ে পড়ে। সেগুলি সংস্কারের জন্য অনেক টাকার দরকার। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তখন সেই ভাঙাচুড়ো বাড়িগুলিতে গরিবরা আশ্রয় নিয়েছিল। যে-কোনো সময় তাদের মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়তে পারতো।

রেনোয়া দর্জির ছেলে হয়েও বাবার পেশা নেননি ?

না, অল্প বয়েসে রেনোয়া ভালো গান গাইতে পারতেন, একটা গীর্জায় বাচ্চা গায়কদের সঙ্গে গলা মেলাতেন। সেই গীর্জায় কয়ার মাস্টার ছিলেন শার্ল গুনো, তখন তাঁর নাম কেউ জানতো না, কিন্তু পরে 'ফাউস্ট'-এর সুর দিয়ে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত হন। সেই গুনো এই

ছেলেটির মিষ্টি গলার আওয়াজ শুনে তাকে গানের জগতে টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাচ্চা বয়েসে তো বটেই, চিরকালই রেনোয়া ছিলেন লাজুক প্রকৃতির, তিনি ওদিকে গেলেন না। জীবিকার জন্য তের বছর বয়েসে ইস্কুল ছেড়ে রেনোয়া একটা পোরসিলিনের কারখানায় অ্যাপ্রেনটিস হলেন। তাঁর কাজ হলো পোরসিলিনের কাপ-গেলাস পুষ্পদানীতে ছবি আঁকা।

রেনোয়া হয়তো সারা জীবন সেই কাজই করে যেতেন, তাঁর বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাঁর মনোভাব ছিল, যেমন চলছে চলুক! কাপ-ডিস-ঘটিতে ছোট ছোট ফুল-পাখি আঁকতেন, দুপুরে লুভ্‌র মিউজিয়ামে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতেন আর নিজের শখে একটু-আধটু অয়েল পেইন্টিং-এর চর্চা করতেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে সেই পোরসিলিনের কারখানাটা উঠে গেল! তখন ছাপার যুগ চলে এসেছে। প্রত্যেকটা কাপ-গেলাসে আলাদা করে ছবি হাতে আঁকার বদলে, একটা ছবিই হাজার-হাজার কাপ-গেলাসে ছাপার পদ্ধতি চালু হয়েছে। আধুনিক এই সব কারখানার সঙ্গে পুরোনো কারখানাটি প্রতিযোগিতায় টিকতে পারলো না। বেকার হবার পরেই রেনোয়ার সত্যিকারের শিল্পের দিকে ঝোঁক এলো।

ভেতরে ঢুকে আমরা রেনোয়ার একেবারে গোড়ার দিকের আঁকা ছবি দেখতে শুরু করলাম। 'ডায়না' নামের ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট বললো, দ্যাখো, এই ছবিটা যখন এঁকেছিলেন, তখন রেনোয়ার বয়েস ছাব্বিশ!

পাথরের ওপর বসে আছে একটি নগ্ন নারী, হাতে ধনুক, পায়ের কাছে একটা মৃত হরিণ। এখনকার বহু বইতে এই ছবিটা থাকে। অথচ তখনকার সরকারি সালোঁ এই ছবিটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই প্রত্যাখ্যাত শিল্পীরাই ইমপ্রেশানিস্ট গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, রেনোয়া ছিলেন তার এক উল্লেখযোগ্য সদস্য।

মার্গারিট বললো, দ্যাখো, এই যে মেয়েটির শরীর, তা একেবারে বাস্তবের কাছাকাছি, এখনকার যে-কোনো মেয়ের মতন। ওঁর আগেকার শিল্পীরা যখন দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন, তখন নগ্ন শরীরের চামড়া এত স্পষ্ট করতেন না, খানিকটা আলোছায়া মিশিয়ে দিতেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আকাশ ও গাছ, তা কিন্তু ইমপ্রেশানিস্টদের মতন স্বাভাবিক, উজ্জ্বল রঙের নয়, এ যেন স্টুডিও-তে বসে আঁকা গাছ। সুতরাং এটাকে একটা মিশ্র স্টাইলের ছবি বলা যেতে পারে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মার্গারিট, তুমি এত সব জানলে কী করে? তুমি কি ছবি-সমালোচনার কোনো কোর্স নিয়েছিলে?

মার্গারিট বললো, যাঃ! এ তো ফ্রান্সের সব ছেলে-মেয়েই জানে! ছবি চিনতে শেখা আমাদের এখানে শিক্ষার একটা অঙ্গ। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের প্রায়ই লুভ্‌র মিউজিয়াম ও আরও অনেক মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি আমার স্কুল-কলেজ জীবনে ছবি সম্পর্কে কিছুই শিখিনি। আমাদের ওসব পাটই নেই। কৃত্তিবাস পত্রিকাকে ঘিরে আমরা যখন কবিতা নিয়ে মাতামাত শুরু করি, তখন আস্তে আস্তে তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ হয়। নিখিল বিশ্বাস, যোগেন চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার, সুনীল দাস, রবীন মণ্ডল, বিজন চৌধুরী, শর্বরী রায়চৌধুরী, মাধব ভট্টাচার্য, চারু খান, ব্রজগোপাল, সনৎ কর, সদা-বিদ্রোহী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। তখন কিছু ছবি দেখেছি, সেই সুবাদে দু'চারটে বইটইও পড়েছি।

আমি বিদ্যে ফলাবার জন্য বললাম, আচ্ছা, মার্গারিট, রেনোয়ার আঁকা নারীমূর্তিগুলির মধ্যে খানিকটা রুবেন্‌স-এর প্রভাব নেই?

মার্গারিট উৎসাহের সঙ্গে বললো, ঠিক বলেছো তো! রেনোয়া বলতে গেলে সারাজীবনই টিশিয়ান আর রুবেন্‌স-এর মতন আগেকার মাস্টারদের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি। অথচ মজার ব্যাপার এই, রেনোয়া'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্লদ মোনে ওঁদের একেবারেই পছন্দ করতেন না। মোনে এঁকেছেন উজ্জ্বল আলো ও রং দিয়ে প্রকৃতির ছবি, যে-রকম আগে কেউ আঁকেনি। সেই হিসেবে রেনোয়া-কে পুরোপুরি ইমপ্রেশানিস্ট বলাও যায় না। উনি নিজেই এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এক সময়, সেটা অবশ্য স্বার্থপর কারণে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে, গলার সুর বদল করে মার্গারিট বললো, আমাকে তাড়াতাড়ি আমেরিকায় ফিরতেই হবে। না হলে পরের সেমেস্টারে পড়াবার কাজটা পাবো না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না, সুনীল?

আমি বললাম, কী করে যাবো? আমি যে টিকিট খরচ করে ফেলেছি! আবার টিকিট কাটার টাকা কোথায় পাবো?

মার্গারিট গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমি একা ফিরে যাবো? আয়ওয়া-তে আমি একা থাকবো?

আমি খানিকটা দূরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রেনোয়া-কে স্বার্থপর বললে কেন? এই ছবিটা, এই যে একটা পোর্ট্রেট, এই মহিলা কে?

মার্গারিটের মন অমনি আবার ছবির দিকে ঘুরে গেল। আমার পাশে এসে বললো, গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এই সব শিল্পীদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সে তখন রাজনৈতিক গোলযোগ চলছে, ছবি কেনার লোকও খুব কম, আর এই তরুণ শিল্পীদের তো কেউ পাত্তাই দিত না। মাঝে মাঝে এরা খেতে পেত না পর্যন্ত, তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, এদের রং-তুলি ক্যানভাস কেনার পয়সা পর্যন্ত জুটতো না। তুমি ভাবো তো, সুনীল, শিল্পের জন্য এরা আর সব কিছু ছেড়ে এসেছে, অথচ ছবিও আঁকতে পারছে না। রেনোয়া এক একদিন তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে রুটি চেয়ে নিয়ে গিয়ে তার বন্ধু ক্লদ মোনে-কে খাওয়াতো।

সাত-এর দশকে রেনোয়া অনেকটা পয়সার জন্যই পোর্ট্রেট আঁকার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সরকারি সালোঁতে ছবি টাঙালে তবু খানিকটা পরিচিতি হবে, ছবি বিক্রির সম্ভাবনা দেখা দেবে, সেই জন্য রেনোয়া তাঁর বন্ধু ইমপ্রেশানিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার সরকারি উদ্যোগে বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় ছবি জমা দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের অন্দোলনের সঙ্গে খানিকটা বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিলেন বলা যায়। রেনোয়া স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, আমি সরকারি সালোঁতে ছবি দিচ্ছি নিছক ব্যাবসাগত কারণে। সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না!

এই যে চমৎকার পোর্ট্রেটখানা দেখছো, এটা মাদাম সারপেনতিয়ে-র, কী রকম গর্বিত মুখখানা, একবার দেখো! ইনি কে জানো? তখনকার দিনের বিখ্যাত প্রকাশক জর্জ সারপানতিয়ে'র স্ত্রী। এই মহিলা ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত হস্টেস, প্যারিসের সমাজের মধ্যমনি হতে চেয়েছিলেন। তুমি এই ধরনের ফরাসী রমনীদের কথা নিশ্চয়ই শুনেছো? এঁরা এঁদের বাড়ির বৈঠকখানায় বিখ্যাত সব লেখক-শিল্পীদের নিয়মিত আপ্যায়ন করতেন। ফরাসী দেশের এটা একটা ট্র্যাডিশন। গরিব শিল্পী রেনোয়া ভিড়ে গেলেন এই উচ্চবিত্ত সমাজে, এই সব নারী-পুরুষদের মুখচ্ছবি এঁকে তাঁর অবস্থা খানিকটা ফিরলো। তিনি ফ্যাশানেব্‌ল পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেলেন, তবু অতৃপ্তি ছিল তাঁর মনে। এই

সময় তিনি ঘুরে বেড়ালেন কিছুটা, দেখলেন আলজিরিয়া, ইতালি; আলজিরিয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আঁকলেন বিরাট ক্যানভাসে 'আলজিরিয়ায় মুসলমান উৎসব' কিংবা 'আলজিরিয়ানদের সাজে ফরাসী রমণীরা'।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রেনোয়া যে এত নগ্ন নারীদের ছবি এঁকেছিলেন, সেগুলোও বিক্রি হতো না ?

মাগারিট হেসে ফেলে বললো, ফরাসীরা সবাই তো নগ্নমেয়ে আঁকে। তাতে আর আলাদা আকর্ষণ কী আছে ? ছবিটা কেমন, সেটাই বড় কথা। আসলে কী জানো, রেনোয়ার যখন চল্লিশ বছর বয়েস, তখন তিনি আলিন শারিগো নামে একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আমার মতে, সেই মেয়েটিকে নিয়ে তিনি যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেই সব নারী-প্রতিকৃতির মধ্যেই সত্যিকারের একটা আলাদা ব্যাপার আছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর পরের দিকের অনেক ছবিতেই একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি। খুব বাচ্চা নয়, সদ্য কৈশোর পেরিয়েছে। যেমন, 'বাগানে দুটি মেয়ে,' 'তরুণী স্নানার্থিনী', কিংবা 'কিশোরী মেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে'। সব তো একই মডেল মনে হয়।

মাগারিট বললো, মেয়েটি তেমন সুন্দরী নয়, নাকটা একটু বোঁচা, চোখ দুটো বেড়ালের মতন, কিন্তু মুখে কি স্বর্গীয় সারল্য, নগ্ন হলেও মনে হয়, এখনো জানে না কুমারীত্ব ভঙ্গ করা কী ব্যাপার। রেনোয়া অবশ্য পরে এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন।

আমি বললাম, মাগারিট, তোমার নাক বোঁচা নয়, চোখ দুটোও বেড়ালের মতন নয়, তবু এই মেয়েটির মুখের আভার সঙ্গে তোমার মুখের মিল আছে।

মাগারিট আমার স্তুতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললো, আমাকে যদি দু' চারদিনের মধ্যেই আমেরিকায় চলে যেতে হয়, তাহলে তোমাকে প্যারিস কিংবা ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গা কে দেখাবে ?

আমি বললাম, তুমি চলে গেলে আমার তো এখানে আর থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আমিও ফিরে যাবো।

মাগারিট তবু অবুঝের মতন প্রশ্ন করলো, কোথায় ফিরে যাবে ?

আমি বললাম, আমার ফিরে যাবার একমাত্র জায়গা আমার দেশে। তাছাড়া আর কোথায় যাবো বলো !

মাগারিট বললো, কলকাতায় ? আর আমি যাবো আয়ওয়া-তে, মাঝখানে বিশাল দূরত্ব, আমি থাকবো কী করে, সুনীল ?

এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই বলেই আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, পীয়ের অগুস্ত রেনোয়া অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, তাই না ? শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের ছবির সমাদর দেখে গিয়েছিলেন ?

মাগারিট পরে আছে একটা গোলাপি রঙের ড্রেস। বুকের কাছে ফ্রিল দেওয়া। শীত নেই বলে ও প্যান্টি হোস পরে না, নগ্ন পা। চুলগুলো যথারীতি এলোমেলো, দু' চোখে সব সময় পাখির মত বিস্ময়।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে ও একটু সময় নিল। তারপর বললো, হ্যাঁ, রেনোয়া বেঁচে ছিলেন অনেকদিন, শেষ বয়সে ভোগ করেছেন খ্যাতি, সেই দর্জির ছেলে অনেক টাকা পয়সা পেয়েছিলেন, বাড়ি কিনেছিলেন সাউথ অফ ফ্রান্সে। কিন্তু কষ্টও পেয়েছেন খুব। একবার সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, তার থেকে আর্থারাইটিস আর প্রচণ্ড বাত হয়ে

যায়। ডান হাত নাড়তে পারতেন না ভালো করে। কিন্তু ছবি আঁকার নেশা ছাড়তে পারেননি কিছুতেই। আঙুল অচল, তবু ডান হাতে একটা ব্রাস বেঁধে নিয়ে আঁকতেন ছবি, যন্ত্রণায় তাঁর মুখ কুঁকড়ে যেত, তবু থামতেন না। একবার নাকি একজন কে বলেছিলেন, যথেষ্ট তো হয়েছে, অনেক ছবি রেখে যাচ্ছেন। এখন এত কষ্ট পাচ্ছেন, আর আঁকার কী দরকার ? রেনোয়া এর উত্তরে বলেছিলেন, সব যন্ত্রণাই এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শিল্প থাকে।

দ্যাখো, তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে আঁকা স্নানার্থিনীদের আর একটা বড় ছবি। ১৯১৮ সালে, রেনোয়া তখন খুবই অসুস্থ, তাঁর ছেলে যুদ্ধে সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছে, কিন্তু এই ছবিতে কি সেই সব কষ্টের কোনো চিহ্ন আছে ?

একজন মাত্র শিল্পীর এই প্রদর্শনী আমরা দেখেছিলাম প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় ধরে। মাঝখানে একবার খাবার জন্য বেরিয়ে আবার ফিরে এসেছি। এই রকমভাবে যে প্রতিটি ছবির কাছে বারবার ফিরে আসতে হয়, তার ফলে সেই ছবি মনের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়, তা আমার আগে জানা ছিল না। একটুও ক্লান্ত বোধ করিনি, সে কি মাগারিটের সাহচর্যের জন্য ? একথা ঠিক, একা হলে এতক্ষণ ধরে ছবি দেখার ধৈর্য আমার থাকতো না।

মোট তিনদিন লুভ্‌র মিউজিয়ামে গেছি, কিন্তু আমি বিশ্ববিখ্যাত 'মোনালিসা' দেখিনি। অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য। মাগারিট আমাকে দেখতে দেয়নি। যাবতীয় টুরিস্টরা লুভ্‌র মিউজিয়ামে এসেই 'মোনালিসা' দেখার জন্য পিঁপড়ের মত সারি দিয়ে ছোটে, এটা মাগারিট সহ্য করতে পারে না। 'মোনালিসা' ছবিটার ওপর ওর কোনো রাগ নেই, কিন্তু দর্শকদের এই গ্রাম্যপনা তার দু'চক্ষের বিষ। ইতালিয়ান ছবির অন্য ঘরগুলি ভালো করে না দেখলে কি লিওনার্দোর ঐ একটি ছবির মর্ম বোঝা যায় ? দূর থেকে কয়েকবারই দেখেছি, 'মোনালিসা' ছবির সামনেই সব সময় সাঙ্ঘাতিক ভিড়।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে খানিকবাদে আমরা গেলাম 'শেক্সপীয়ার অ্যান্ড কম্পানি' নামে বইয়ের দোকানটি দেখতে। তেমন বড় কিছু দোকান নয়, কিন্তু ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এখানে এক সময় আসতেন বিখ্যাত সব লেখকরা। শিল্পীদের মতনই এক সময় দেশ-বিদেশের লেখকরাও এসে জমায়েত হতেন প্যারিসে। লিখতেন অন্য ভাষায়, কিন্তু এই মোহময়ী নগরীর পরিমণ্ডল তাঁদের প্রেরণা জোগাতো। শোনা যায়, এই দোকানে বসেই আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও তাঁর বন্ধুদের সম্পর্কে গারট্রুড স্টাইন বলেছিলেন, ইউ আর আ লস্ট জেনারেশান !

নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা নতরদাম গীর্জার চাতালে এসে বসলাম। ঘড়িতে সন্ধে সাতটা, কিন্তু আকাশ ঝকঝকে নীল, গীর্জার চূড়ায় যে বিশাল ঘন্টাটি ধরে কোয়াসিমোদো দুলেছিল, সেটার ওপর ঠিক্‌রে পড়েছে রোদ। এখানে শরৎকালে অন্ধকার বেশ দেরিতে নামে।

আমরা প্রতিদিনের আবহাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু পশ্চিম দেশের এরা নির্মল আকাশ, রোদ-ঝলমলে দিন ও শীতহীন বাতাস পেলে ছেলেমানুষের মতন উল্লসিত হয়, সেই আনন্দ সারা শরীরে উপভোগ করে।

মাগারিট বললো, এখন প্যারিসের দিনগুলো চমৎকার, এর মধ্যে আমেরিকা চলে যাবার কোনো মানে হয় ? আচ্ছা সুনীল, আমি যদি না যাই ? একটা সেমেস্টার আমার পড়াশুনো আর পড়ানো বাদ দিলে কী হয় ? তা হলে আমরা দু'জনে আরও ভালো করে প্যারিস

দেখতে পারবো, তোমাকে নিয়ে নরমান্ডি যাবো, লোয়ার নদীর উপত্যকার অনেক ভালো ভালো সাতো দেখাবো !

আমি বললাম, তুমি একটা সেমেস্টার ছেড়ে দেবে ? এই চার-পাঁচ মাস আমি ফ্রান্সে থাকবো ? টাকা পাবো কোথায় ?

মার্গারিট বললো, তোমার অত টাকার চিন্তা করার দরকার কি ? ও ঠিক জুটে যাবে ! এমন সোনালি রোদের দিনগুলো ছেড়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

আমি বললাম, আয়ওয়া-তেও এই সময় ঝকঝকে রোদ পাবে !

মার্গারিট রেগে গিয়ে বললো, আমেরিকার রোদ আর প্যারিসের রোদ কি এক ? এখানকার রোদের আলাদা রঙ, আলাদা গন্ধ, তুমি টের পাও না ?

আমি সিগারেট ধরাবার ছলে খানিকটা সময় নিয়ে বললাম, ভালো কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা মার্গারিট, সেদিন মোনিকের বাড়িতে রাত্তিরে আড্ডায় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে যুগের কবি-সাহিত্যিকরা যে-সব তরুণ শিল্পী পরীক্ষামূলক ছবি আঁকছে, স্টুডিও ছেড়ে চলে যাচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে, রঙের মধ্যে রং না মিশিয়ে উজ্জ্বলতা আনছে, তাদের সাহায্য করেছিলেন কি না। আমি ভিক্তর হুগো'র নাম করতেই পীয়ের হো-হো করে হেসে উঠলো। তুমি আর মোনিক-ও হাসছিলে। কেন ? তোমরা ভিক্তর হুগোকে বড় লেখক মনে করো না ?

মার্গারিট হেসে বললো, অবশ্যই যুগো খুব বড় লেখক। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ফরাসী সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু তুমি যে-সময়টার কথা বললে, সেই সময়টায় যুগো নানারকম পাগলামি করছিলেন। সে খুব মজার ব্যাপার।

কী ধরনের পাগলামি ?

তখন ফটোগ্রাফি চালু হয়ে গেছে। ভিক্তর যুগোর সেই সময়কার একটা ছবি পাওয়া যায়, চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বসে আছেন। তিনি নিজেই সেই ছবির তলায় ক্যাপশান লিখেছিলেন. 'ভিক্তর যুগো ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপরত'। তিনি খুব প্ল্যানচেট করতেন তা জানো ? একবার নাকি স্বয়ং মৃত্যু এসে দেখা দিয়ে যুগো-কে একটা নতুন লেখার নির্দেশ দিয়েছিল। যুগো নিজেকে যীশুর মতন একজন অবতার বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। ভয়ংকর আত্মম্ভরিতা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, নিজেই নিজের নতুন নাম দিয়েছিলেন 'ওলিমপিয়ো'।

তুমি প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করো ?

ধ্যাৎ, ওসব বাজে ব্যাপার। কোনো খাঁটি ক্যাথলিক এই সব হেরাসি মানতে পারে না। যুগোর তখন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওঁর ছেলে শার্ল হতো মিডিয়াম, সে সাহিত্য-টাহিত্যর ধার ধারতো না, কিন্তু প্ল্যানচেটের সময় সে নাকি গড় গড় করে যুগোর মতন নতুন কবিতা বলে যেত। এই প্ল্যানচেটের সময় শেকস্পীয়ার আসতেন বারবার।

তাই নাকি ? শেকস্পীয়ার কী ভাষায় কথা বলতেন হুগোর সঙ্গে ?

অবশ্যই ফরাসীতে। কারণ যুগো কিংবা শার্ল কেউই ইংরিজি জানতো না। শেকস্পীয়ার মৃত্যুর পর ফরাসী ভাষা শিখে নিয়েছিলেন ধরে নিতে হবে।

শেকস্পীয়ার সূক্ষ্মশরীরে এসে এই ফরাসী লেখককে কী বলতেন, তর কোনো রেকর্ড আছে ?

সেইটার জন্যই তো সবাই হাসে। শেকস্পীয়ার এসে দারুণ প্রশংসা করতেন যুগো'র লেখার। একদিন বলেছিলেন, যুগোর নতুন লেখা পৃথিবীতে প্রকাশিত হলেই স্বর্গে সব লেখকরা সেই রচনা সম্পর্কে দারুণ কৌতূহলী হয়ে পড়েন। শেকস্পীয়ার সেটা পাঠ করেন

জোরে জোরে, অন্যরা তাঁকে ঘিরে বসে শোনেন। একদিন দান্তে কেঁদে ফেলেছিলেন প্রেমের বর্ণনা শুনে, ইসকিলাস আবেগে কাঁপছিলেন, আর সারভানতিস আঙুল তুলে মলিয়ের-কে বলেছিলেন, এই, চুপ করো, শুনতে দাও ! বুঝে দ্যাখো কাণ্ড ! শেকস্পীয়ার নাকি জানিয়েছিলেন, পৃথিবীতে তাঁর পর ভিক্তর যুগোই সবচেয়ে বড় কবি !

বিখ্যাত লেখকদের খামখেয়ালিপনার গল্প শুনতে শুনতে আমিও হাসতে লাগলাম।

হঠাৎ মার্গারিট জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, সুনীল, তোমাদের কলকাতার এই সময় ভালো রোদ ওঠে ?

আমি বললাম, আমাদের দেশে আর যত কিছুরই অভাব থাকুক, রোদ্দুরের কোনো অভাব নেই। সারা বছরই রোদ।

আমি আমেরিকায় না গিয়ে, তোমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারি না ?

তা কী করে হবে, মার্গারিট ? তোমার পি-এইচ ডি শেষ করবে না ? তা ছাড়া কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তোমাকে রাখবো কোথায় ? আমি ফিরে যাচ্ছি বেকার অবস্থায়। এরপর কী ভাবে খরচ চালাবো তার কোনো ঠিক নেই। আমাদের বাড়িতে এমন জায়গাও নেই যে তোমার জন্য একটা ঘর দিতে পারবো। না, মার্গারিট, আমার সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমাকে বেশ একটা বিপদের মধ্যে ফেলা হবে।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল একটা ধাঁধার মতন। মার্গারিটের আমেরিকায় ফিরে যাওয়া খুবই দরকার, কিন্তু ও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়, সেটা সম্ভব নয়। মার্গারিট একটা সেমেস্টার নষ্ট করে আরও চার-পাঁচ মাস কাটাতে চায় ফ্রান্সে, কিন্তু আমি অন্যদের গলগ্রহ হয়ে থাকবো কী করে ? মার্গারিটকে কলকাতায় নিয়ে আসাও একটা অবাস্তব ব্যাপার। তা হলে ?

মার্গারিট নতমুখে নরম গলায় বললো, তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া খুব দরকার, তাই না ?

আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, আমাকে তো কিছু একটা কাজ করতে হবে ? বাংলা ভাষায় লেখালেখি ছাড়া আর কোনো কাজ যে আমার ভালো লাগে না। আর কোনো কাজ বোধহয় আমি পারবোও না। তোমাকেও পি-এইচ ডি শেষ করতেই হবে, এটা আমার আদেশ।

পরদিন আমরা প্রায় পাশাপাশি দুটি এয়ার লাইন্স অফিসে আমাদের টিকিট কনফার্মড করতে গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার,প্যান অ্যাম এবং এয়ার ফ্রান্স জানালো, দু' জায়গাতেই ঠিক পরের দিন একটা করে সীট খালি আছে,তার পরের দিন দশেকের মধ্যে মার্গারিট সীট পেলেও আমি পাবো না। সুতরাং একই দিনে,কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আমরা উড়ে যাবো সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, পৃথিবীর দুই প্রান্তে।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা দেখতে গেলাম জাক তাতি'র একটা মজার সিনেমা। ম্যাঁসিয়ো হুলোর হলিডে। দু' জনে খুব হাসলাম প্রাণ খুলে।

বিমানবন্দরে মার্গারিটের কাছ থেকে আমার বিদায় নেবার দৃশ্যটির বর্ণনা আমি এখানে আর দিতে চাই না।

১৫

ভুলবো না আমি ফ্রান্সের সেই প্রিয় উদ্যানগুলি
ওরা যেন বহু প্রাচীন কালের ভোরে প্রার্থনা গান
নৈঃশব্দের বাঁধা সন্ধ্যার যাতনা কেমনে ভুলি
ছিল আমাদের যাত্রার পথে গোলাপ যে অফুরান....

—লুই আরাগঁ

যাকে বলে জীবনযুদ্ধ কিংবা সংসার যাত্রার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা, তাতে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম কলকাতায় ফিরে এসে। বিদেশে বসে আমি বাংলা লিখে নিজস্ব খরচ চালাবার একটা মরীচিকা দেখেছিলাম, এবার টের পাওয়া গেল, সেটা বড়ই নিষ্ঠুর মরীচিকা।

ফেরার পথে লন্ডন, জেনিভা, রোম ঘুরে আমি শেষ থেমেছিলাম কায়রোতে। ইতিহাস আমার বরাবরের প্রিয়, ভেবেছিলাম আর এ জন্মে কোনোদিন বিদেশে আসার সুযোগ হবে কি না কে জানে, মিশরের পিরামিড কয়েকটা দেখে যেতেই হবে। কায়রোতে চিনি না কারুকেই, তাতে কী আসে যায়, সুটকেশ হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বার করেছিলাম একটা সস্তার হোটেল। স্ফিংক্স ও স্টেপ পিরামিড দেখার পর একদিন একলা একটা উট ভাড়া করে মরুভূমির ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম দূরের পিরামিডগুলো দেখতে।

একদিন পয়সা-কড়ি হিসেব করে দেখলাম, হোটেলের বিল মেটাবার পর আমার কাছে আর মাত্র দশ ডলার থাকবে। এর পর ভামাস্কাসে যাবার ইচ্ছে ছিল, তা আর হবে না। আমার প্লেনের টিকিটে যে-কোনো জায়গায় যাওয়া যায়, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন হবে কী দিয়ে? এবার তা হলে মুসাফির বাড়ি ফেরো।

যেদিন কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিলাম, সেদিন তিরিশ-চল্লিশ জন বন্ধু গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। ফেরার সময় কারুকে খবর দিইনি, আমার জন্য উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় কেউ নেই। প্যান অ্যাম-এর বিমানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার মনে হলো, একটা নতুন দেশে এসেছি।

ট্যাক্সি ধরার ঝামেলার দরকার কী। আমি একটা বাসে চড়ে চলে এলাম নাগের বাজার। সেখান থেকে একটা সাইকেল রিক্সায় বাড়ি।

ষাটের দশকের গোড়াতেও বিলেত-ফেরত লোকদের বেশ খাতির ছিল। তারা বাড়ির মধ্যেও প্যান্টের মধ্যে শার্ট গুঁজে পরে থাকতো, দয়া করে বাংলা বললেও তা কেনসিংটনের অ্যাকসেন্টে, কেউ কেউ কাঁটা-চামচ দিয়ে ভাত ও মাছের ঝোল খেত। দৈবাৎ কোনো বিলেত-ফেরতকে যদি দেখা যেত যে হাত দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে, তাহলে ভিড় জমিয়ে ফেলতো পাড়ার বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা। প্লেন থেকে নেমে রিক্সা চেপে বাড়ি ফেরা কোনো

বিলেত-ফেরতের পক্ষে ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। আমি মাত্র দিন পনেরো ইংল্যান্ডে ছিলাম, তবু বিলেত-ফেরত তো বটে, সেদিক দিয়ে আমি একটা রেকর্ড করেছি বলা যায়।

দুপুরবেলা মায়ের স্নেহ-মাখা মাছের ঝোল ভাত খেয়ে, ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে সন্ধেবেলা প্যান্ট-শার্ট ও চটি পরে কফি হাউজে হাজির। তখন কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউজে ছিল আমাদের নিত্য আড্ডা। এই দল থেকে চ্যুত হয়ে আমিই প্রথম আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলাম বলে অনেকেই আমাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিল। হঠাৎ পাগলা দাশুর মতন আমার প্রত্যাবর্তনে অনেকে যেন ভূত দেখেছিল। বন্ধুদের দলের মধ্যে শংকর চট্টোপাধ্যায়ই ছিল সবচেয়ে নাটকীয় ভাবে উদার ও দরাজ স্বভাবের। শংকর আজ আর নেই বলেই তার কথা বেশি মনে পড়ে। শংকরই প্রথম উঠে এসে, তুই এসেছিস, বলে বিশাল ভাবে চেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে।

রাস্তায় ঘাটে চেনাশুনো লোকেরা দেখা হলে জিজ্ঞেস করতো, কবে ফিরলে? আমি উত্তর দিতাম, গত কাল।... তিন দিন আগে...। গত সোমবার...। দিন দশেক কেটে যাবার পর কেউ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না, আমি ঝাঁকের কই, ঝাঁকে মিশে গেলাম। কিন্তু প্রথম প্রথম প্রত্যেক রাতে স্বপ্ন দেখতাম অদ্ভুত ধরনের। আমি কী যেন একটা অতি দরকারি জিনিস ফেলে এসেছি, সেটা আনার জন্য চেপেছি আবার বিমানে। কিংবা আমি কোনো একটা অচেনা শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু মাগারিটকে স্বপ্নে দেখিনি একবারও। দিনের বেলা প্রায় সর্বক্ষণ মাগারিটের কথা মনে পড়ে, অথচ তাকে স্বপ্নে দেখি না। স্বপ্নের নিয়ম বোঝা দুষ্কর।

আমি চিঠি লেখার আগেই মাগারিটের প্রথম চিঠি এসে গেল। পি-এইচ ডি শেষ করার পরই মাগারিট চলে আসবে কলকাতায়, তার আগে সে আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে একটা চাকরি নিয়ে নেবে, মাইনে যতই কম হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। পল এঙ্গেল মাগারিটকে জানিয়েছে, সুনীল ফিরে এলে তার জন্য এখনো সব বন্দোবস্ত করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মাগারিট পল এঙ্গেলকে আমার হয়ে উত্তর দিয়ে দিয়েছে যে, এমন ভাবে ফিরে আসার জন্য সুনীল জোর করে দেশে চলে যায়নি। দেশে তার অনেক কাজ আছে।

পল এঙ্গেলকে আমি যা চিঠি লিখতাম, তা আসলে মিথ্যের ফুলঝুরি। পলকে আমি জানাতাম যে দেশে ফেরা মাত্র আমি দু'তিনটে কাগজ থেকে লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি। টাকা দিচ্ছে বেশ ভালো, আমাদের কবিতার কাগজ দারুণ চলছে, তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ পাচ্ছি, তারা ভালো ফি দেয়, ইত্যাদি। আসল ব্যাপারটা হলো, কেউ পাত্তাই দেয়নি আমাকে। তখন নকশাল আন্দোলন শুরু হবার পূর্বক্ষণ, চতুর্দিকে আমেরিকা-বিরোধী হাওয়া। আমি যে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছি, তার কোনো গুরুত্ব নেই, আমি কেন আমেরিকা গিয়েছিলাম, সেই প্রশ্ন তুলে অনেকে চোখ রাঙায়। (তাদের কেউ কেউ পরে বিলেত-আমেরিকায় পলায়ন করেছে, সেখানে অহংকার ও গ্লানির মিশ্র জীবন যাপন করছে।)

দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমাকে কয়েকদিনের মধ্যেই ডেকে অন্য দেশের কবিতা অনুবাদের সিরিজ চালাতে বলেছিলেন, বলতে গেলে প্রথম বছরে সেটাই ছিল আমার একমাত্র মরূদ্যান।

আমার অনুপস্থিতিতে কৃত্তিবাস পত্রিকা চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শরৎকুমার ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু ও ভাস্কর দত্ত। ফিরে এসে আমি এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই পত্রিকা নিয়ে মেতে উঠলাম, কবিতা নিয়ে হৈ চৈ করাই ছিল আমার প্রধান

সাধ। কিন্তু নিজের মা-ভাই-বোনদের সাহায্য করতেই দিশেহারা অবস্থা, এর মধ্যে পত্রিকা চালাবার অতিরিক্ত খরচ। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে গদ্য লেখা শুরু করতে হলো। সংবাদপত্রের ফিচার। হাওড়া স্টেশনের ভিড়, পোষা বেড়াল, বাড়ির ঝিয়ের শিশু, হিটলারের ছবি আঁকার নেশা, বেনারস শহরের বুড়ি বিধবা ইত্যাদি কত বিষয়েই যে আমি লিখেছি, তার ইয়ত্তা নেই! কিছু বন্ধু-বান্ধব ও বয়স্ক লেখক-শুভার্থীরা বলতেন, ওহে, খবরের কাগজে অত ফিচার লিখলে ভাষা খারাপ হয়ে যায়, ভবিষ্যতে আর কবিতা কিংবা গল্প-উপন্যাস লিখতে পারবে না। আমি বলতাম, দাঁড়ান, আগে খেয়ে তো বাঁচি, পত্রিকাটাকে বাঁচাই, তারপর ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখা যাবে!

সন্তোষকুমার ঘোষ আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে একটা চাকরি দিয়ে দুর্গাপুরের প্রতিনিধি করে পাঠাতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। আমার মনে হয়েছিল, কলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরেই যদি যাবো, তা হলে আমেরিকায় থাকলাম না কেন? আরও দু'একটা চাকরির প্রস্তাব এসেছিল। তখনো আমার দু'চারটে বিদেশী জামা-প্যান্ট ছিল, আমার বেগুনি গালে ছিল খানিকটা লাল ছোপ, সুতরাং বিদেশী ছাপওয়ালা দু'একটা অফিসে আমার চাকরির সুযোগ ছিল কিছুটা, কিন্তু আমি দাঁতে দাঁত চেপে চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অহংকার বজায় রেখেছিলাম বেশ কয়েক বছর।

বাংলা লেখালেখির জন্য মূলত পয়সা পাওয়া যায় আনন্দবাজার থেকে। আমি তখন তিনখানা ছদ্মনাম-সমেত মোট চারটি নামে লিখতাম। আমার কিছু বিদেশ ফেরার অভিজ্ঞতা আছে বলে সন্তোষকুমার ঘোষ কিছুদিন পর আমাকে আনন্দবাজারে 'দেশে দেশে' নামে একটি সাপ্তাহিক পৃষ্ঠা চালাবার ভার দিলেন। সেজন্য ঐ অফিসে আমার জন্য একটা চেয়ার-টেবিলেরও ব্যবস্থা হলো। বাইরের লোকের ধারণা, আমি আনন্দবাজারে তখন চাকরি করি, আসলে তা নয়, দিন আনি দিন খাই-এর মতন লিখলে টাকা, না লিখলে কিছুই না। এমনও হয়েছে, আমি 'দেশে দেশে'-র পুরো পৃষ্ঠা লিখে ও পেজ মেক আপ করে বাড়ি চলে গেলাম, পরদিন দেখি সে জায়গায় বাটা কম্পানির এক পাতা বিজ্ঞাপন, আমার ভাগ্যে লবডঙ্কা! এই ভাবে টানা পাঁচ বছর চালিয়েছি।

কিন্তু এসবও তুচ্ছ মনে হতো। গায়ের জোরটাকেই মনে হতো মনের জোর। এই পথ আমি নিজে বেছে নিয়েছি, সুতরাং হার স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেউ বেশি অপমান করলে আমার উপকারই করতো আসলে, সেই রাত্রেই একটা কবিতা লিখে ফেলতাম। অপমান কিংবা অবজ্ঞা বরাবরই আমায় কবিতা লেখার প্রেরণা দিয়েছে।

মার্গারিটের দু'তিনটে চিঠি পেলে আমি উত্তর দিতাম একটা। চিঠি লেখার ব্যাপারে আমার আলস্যের কথা মার্গারিট জানতো, সে বলেই দিয়েছিল, তোমাকে বেশি লিখতে হবে না। ওর পি-এইচ ডি শেষ হলো দু' বছরে, কিন্তু তারপরেই কলকাতায় আসা সম্ভব হলো না। মাঝখানে ও একটা গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিল, তাই একটা সেমেস্টার বাদ গেছে। শেষ বছরটায় ও অ্যাসিস্টেন্টশিপ না নিয়ে শুধু পড়াশুনো করেছে, সেজন্য অনেক ধার হয়ে গেছে, চাকরি করে সেই ধার শোধ না দিলে ওর পক্ষে আমেরিকা থেকে বেরুনো সম্ভব নয়।

আমার পরে মীনাক্ষী ও জ্যোতির্ময় দত্ত গেলেন আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার পরে শঙ্খ ঘোষ। এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মার্গারিটের, আমার বন্ধুদের মার্গারিট তার বন্ধু করে নিয়েছিল।

এরপর কেটে গেল প্রায় তিন বছর। সময় ও দূরত্বে অনেক দৃঢ় বন্ধনই ক্রমশ আলগা

হতে থাকে। মার্গারিটের কলকাতায় আসা হলো না, তার জন্য বুক টন টন করে কখনো কখনো, আবার অনেক সময় তার কথা ভুলেও যাই। কলকাতার উত্তাল জীবনে আয়ওয়ার দিনগুলির স্মৃতি ক্রমশ ফিকে হতে থাকে।

এর মধ্যে ফরাসী জানা এক বাঙালী যুবতী, আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর এক ছাত্রী স্বাতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। কয়েক মাসের মধ্যেই আমার জীবন ঘুরে গেল অন্যদিকে।

আমি স্বাতীকে জানালাম মার্গারিটের সব কাহিনী। মার্গারিটকেও চিঠিতে জানালাম স্বাতীর কথা। ওরা পরস্পরকে চিঠি লেখা শুরু করলো। মার্গারিটের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল গাঢ় বন্ধুত্বের, খানিকটা বিচিত্র বন্ধুত্ব মনে হতে পারে ঠিকই, আমরা পরস্পরের খুবই কাছাকাছি গিয়েছিলাম, কিন্তু বিয়ে বা একনিষ্ঠতার প্রতিশ্রুতি কেউ কারুকে দিইনি। আমি মাঝে মাঝে ইয়ার্কির ছলে জানতে চাইতাম, ও কোনো খাঁটি ক্যাথলিক বন্ধু পেয়েছে কি না, যে ওর মা-বাবাকে খুশি করতে পারবে! মার্গারিট জানাতো যে এখন ওর অনেক বন্ধু, কিন্তু একজনও সেরকম বন্ধু নেই।

আমাদের বিবাহের সময় মার্গারিট কলকাতায় আসবেই ঠিক করেছিল, কিন্তু এই সময় ওকে আয়ওয়া ছেড়ে অন্য একটি শহরে পড়াবার চাকরি নিয়ে যেতে হলো। নতুন চাকরিতে ছুটি পাওয়া যায় না। মার্গারিটের প্রত্যেক চিঠিতে ফুটে ওঠে কলকাতার জন্য ব্যাকুলতা। এই শহর সম্পর্কে সে অনেক কিছু শুনেছে। এখানে এসে সে আমার বাড়ি দেখবে, স্বাতীর সঙ্গে ভাব করবে, কবির দলের সঙ্গে আড্ডা দেবে, কিন্তু ক্রমশই তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এক বছরের মধ্যে আমাদের পুত্র সন্তানের জন্মের খবর পেয়ে মার্গারিট আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠি দিল, খামের মধ্যে ভরে পাঠিয়ে দিল কিছু টাকা। সে টাকা আমাদের নিতেই হবে, কেননা, মার্গারিট হয়েছে ঐ ছেলের গড মাদার, গীর্জায় গিয়ে সে শিশুটির শুভ ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করেছে।

এরপর মার্গারিট হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। তিন-চার মাস কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমি চিঠি দিয়েও কোনো উত্তর পাই না। একটা ক্রিসমাস পার হয়ে গেল, তবু মার্গারিটের কাছ থেকে কোনো কার্ড এলো না দেখে আমি রীতিমতন চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মার্গারিট কাজে-কর্মে যতই ব্যস্ত হয়ে পড়ুক, কিংবা এর মধ্যে যদি কোনো যুবকের সঙ্গে তার সত্যিকারের প্রেম হয়েও থাকে, তাহলেও সে তার পুরোনো বন্ধুকে ক্রিসমাসের কার্ড পাঠাবে না, এ তো হতেই পারে না। চিঠি লিখতে ও খুব ভালোবাসে, এমনও হয়েছে যে আমি একই দিনে ওর দু'খানা খামের চিঠি পেয়েছি। শেষ চিঠিতে ও আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে বলে জানিয়েছিল, তারপর কী হলো?

মার্গারিটের খবর জানবার জন্য আমি পল এঙ্গেলকে চিঠি দিলাম। মার্গারিট কখনো পল এঙ্গেলের ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়নি, তবু পল এঙ্গেল তাকে ভালোই চিনতেন। পল এঙ্গেল উত্তরে আমাকে আয়ওয়া সম্পর্কে অনেক খবর দিলেন, কিন্তু তাতে মার্গারিটের নাম একেবারে উহ্য।

তবে কি মার্গারিট কোনো কারণে আমেরিকা ছেড়ে ফ্রান্সে ফিরে গেছে? মোনিকের নতুন বাড়ির ঠিকানা আমি হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু মার্গারিটের গ্রামের বাড়ির ঠিকানা আমার কাছে লেখা আছে। খুব বিনীত ভাবে মার্গারিটের বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম, তাঁর মেয়ে এখন কোথায় আছে সেটুকু জানতে চেয়ে। কিছুদিনের মধ্যেও উত্তর না পেয়ে মনে হলো, ওঁর বাবা-মা বোধহয় ইংরিজি বোঝেন না। তখন আমার ফরাসি ভাষাবিদ বন্ধু বুঢ়াকে দিয়ে চিঠিখানা অনুবাদ করে পাঠালাম আবার। এবারেও কোনো উত্তর নেই।

মার্গারিটের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সমস্ত সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল !

মার্গারিট আমাকে ভুলে গেছে মনে করে অভিমান হতো মাঝে মাঝে, আবার ঠিক বিশ্বাসযোগ্যও মনে হতো না। মার্গারিটের মতন মেয়ে কোনো বন্ধুকে এমন ভাবে পরিত্যাগ করতে পারে না।

ততদিনে গদ্য ফিচার লিখতে লিখতে আমাকে গল্প-উপন্যাসের জগতেও বাধ্য হয়ে প্রবেশ করতে হয়েছে। লেখালেখির ব্যস্ততা, তুমুল আড্ডা এবং যখন তখন কলকাতার বাইরে চলে যাবার মধ্যে অভিমান কিংবা মন খারাপেরই বা সময় কোথায় ? কখনো পঞ্চাশ-একশো টাকা জুটলেই চলে যাই বন-জঙ্গলে, শক্তির সঙ্গে, সন্দীপনের সঙ্গে, শরৎকুমারের সঙ্গে। একবার বেলপাহাড়ির এক কাঠ গুদামের মধ্যে রাত্তিরে খোলা আকাশের নীচে একটা খাটিয়ায় আর এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল, আমেরিকায় আমি গাড়ি চালানো শিখছিলাম, আর একটু হলেই গাড়িটা কিনে ফেলতে হতো, তারপর গাড়ির সঙ্গে বাড়ি কিনে আমি ওদেশেই যদি থেকে যেতাম, তা হলে জীবনটা কি এর চেয়ে ভালো কাটতো ? নাঃ, কিচ্ছু আসে যায় না, বেশ আছি !

ফরাসী ভাষা যেটুকু শিখেছিলাম, তাও ভুলে যেতে লাগলাম আস্তে আস্তে। মার্গারিট আমাকে একটা ছোট তেরঙা ফরাসী পতাকা দিয়েছিল, সেটা শুধু অনেকদিন রেখে দিয়েছিলাম আমার পড়ার টেবিলে। পশ্চিমী জগতে আর কোনোদিনও আমার যাবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন বিদেশ বলতে আমার দৌড় নেপাল ও বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ যুদ্ধের বছরে অ্যালেন গীন্‌সবার্গ একবার কলকাতা ঘুরে গেল। আগে থেকে চিঠিপত্র না লিখে সে হঠাৎ আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে হাজির। বাড়িতে তখন আর কেউ নেই, শুধু আমাদের রাঁধুনী গোপালের মা ছাড়া। অ্যালেন তাকেই আমার মা ভেবে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় গোপালের মা সারাদিন ধরে হেসে-কেঁদে অস্থির। একমুখ দাড়ি ভর্তি সেই গৌরবর্ণ পুরুষটিকে গোপালের মা মনে করেছিল কোনো দেবতা।

অ্যালেনকে আমি নিয়ে গেলাম সীমান্তের শরণার্থীদের দুর্দশা দেখাতে। সে বছর বন্যা হয়েছিল এমন যে যশোর রোডও ডুবে গিয়েছিল অনেকটা। গাড়ি ছেড়ে আমরা নৌকো করে গিয়েছিলাম বনগাঁ পেরিয়ে। তারপরেই অ্যালেন লেখে তার বিখ্যাত কবিতা, 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। তার কয়েকটা লাইন এরকম :

Millions of souls nineteen seventy one
Homeless on Jessore Road under gray sun
A million are dead, the millions who can
Walk toward Calcutta from East Pakistan...

Wet Processions families walk
Stunted boys big heads don't talk
Look bony skulls & silent round eyes
starving black angels in human disguise...

অ্যালেন এই দীর্ঘ কবিতাটিতে সুর দিয়ে গান করেছিল ফিরে গিয়ে। তার বন্ধু বব ডিলান ও অন্যান্য বিখ্যাত গায়করা অনেক টাকা চাঁদা তুলেছিল এই শরণার্থীদের জন্য।

কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় অ্যালেন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি আর নিউ ইয়র্ক আসবে না ?

আমি বলেছিলাম, পাগল নাকি ! পয়সা কোথায় পাবো ? তোমার বাড়িতে থাকার

জায়গা দিলেও প্লেন ভাড়ার অত টাকা আমায় কে দেবে ? আমার এখন নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মতন অবস্থা।

তখন আর ইওরোপ-আমেরিকা ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছেও আমার হয়নি।

অ্যালেন চিনতো না মার্গারিটকে, সুতরাং তার কাছে ও প্রসঙ্গও তুলিনি।

আরও কয়েক বছর পর পল এঙ্গেল আবার এলেন কলকাতায়। সস্ত্রীক, কিন্তু এ স্ত্রী অন্য। মেরির সঙ্গে ইতিমধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে, দুঃখে, অভিমানে মেরি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সে কথা শুনেই আমার মধ্যে অপরাধ-বোধ জাগলো। মেরি আমাকে মাতৃবৎ স্নেহ করতেন, দুঃসময়ে আমাকে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন, সেই টাকা না পেলে আমার রোম-ইজিপ্ট দেখাই হতো না, তবু মেরির সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখিনি, একখানার বেশি চিঠি লিখিনি !

পল এঙ্গেলের দ্বিতীয়া স্ত্রী বেশ সুন্দরী, মধ্যবয়স্কা এক চীনা রমণী। হুয়া লিং একজন বিশিষ্ট লেখিকাও বটে, আধুনিক চীনা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ স্থান আছে। হুয়া লিং আগে ছিলেন তাইওয়ানের মেয়ে, পরে মেইন ল্যান্ড চায়নার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তখন কিসিংগার-নিকশনের তৎপরতায় এবং চৌ এন লাইয়ের ব্যগ্রতায় আমেরিকার সঙ্গে চীনের বেশ দহরম মহরম শুরু হয়ে গেছে, চলছে ব্যবসা-বাণিজ্য, টুরিস্ট ও সাংস্কৃতিক বিনিময়। পল এঙ্গেল কলকাতায় এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু তাঁর আসল গন্তব্য বেইজিং-এর দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ি।

পল এঙ্গেলের বয়েস তখন সত্তর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বয়েস তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর চোখ-মুখ নব বিবাহিত যুবকের মতন উদ্ভাসিত, আর হুয়া লিং-এর আগের পক্ষের দুটি বড় বড় সন্তান থাকলেও তাঁকে তরুণী বলে মনে হয়।

দমদম এয়ারপোর্টে জ্যোতির্ময় দত্ত অনেক বাজি পুড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন এই দম্পতিকে। পল মহা উৎসাহে তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে লাগলেন, কলকাতা কত গ্রেট সিটি, এখানেই জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, নিমতলা ঘাটে রবীন্দ্রনাথের সেই 'সমাধি-স্থানটিতে' গতবার গিয়েছিলাম, মনে আছে, গঙ্গা নদীর কী অপূর্ব রূপ। হুয়া লিংকে এই সব দেখাতে হবে ! হুয়া লিং চীনে হলেও জীবনে এই প্রথম রিক্সা দেখবে !

নানান গল্পের ফাঁকে প্রথম একটু সুযোগ পেয়েই আমি ওঁকে নিভৃতে জিজ্ঞেস করলাম, পল, তুমি কি মার্গারিট ম্যাথিউ নামে মেয়েটির কোনো খবর জানো ? ওকে তোমার মনে আছে ?

চিঠিতে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলেন পল এঙ্গেল, কিন্তু আমার সামনাসামনি মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না। আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীর ভাবে বললেন, হ্যাঁ, জানি !

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে তার ? আমার চিঠির উত্তর দেয় না, সে এখন কোথায় আছে ?

পল আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, সামথিং টেরিব্‌ল হ্যাজ হ্যাপ্‌নড ! সে ঘটনা তোমার না শোনাই ভালো, সুনীল, তুমি সহ্য করতে পারবে না। আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে কিছু জানাইনি।

১৬

"হে বন্ধু, তোমাকে ফিরতে হবে
আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো—কেইসড্রাট গাছের নিচে
জলপোতের অধিপতির কাছে আমি এই গোপন কথা বলেছি
অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে তুমি ফিরে আসবে। সূর্য ডুবে গেলে
ম্লান রাত্রি যখন ভর করে বাড়ির ছাদে
...সেই কি তোমার ফিরে আসার চিহ্ন ?"
—লেওপোল্ড সেঙ্গর

ছিল একটা রুমাল, হয়ে গেল একটা বিড়াল !

ছিল একজন বাসনা-লঘু তরুণ কবি, হয়ে গেল এক উপন্যাস লেখক। শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস, ধারাবাহিক উপন্যাস। গদ্য লেখা একবার শুরু করলে যেন পায়ের তলায় রোলার স্কেটার লেগে যায়, থামার উপায় নেই।

সেই বিদেশ থেকে ফেরার পর এক যুগ কেটে গেছে। তারপর হঠাৎ আবার একবার প্যারিস নগরী, যেন নদীর স্রোতে রূপালী মাছের মতন, আমার চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে গেল !

তখন আমি পুরোপুরি ভেতো বাঙালী হয়ে গেছি। বিশ্ব ভ্রমণের শখ মেটাই অন্য লেখকদের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করে এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার পাতা উল্টে। অনেকে বলে, বর্তমানের তুলনায় সদ্য অতীত কিংবা যে-কোনো অতীতের দিনগুলোই ভালো ছিল। কিন্তু আমার মতে এখনকার তুলনায় সপ্তম দশকটি ছিল খুবই দুর্যোগপূর্ণ, খুবই কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা কোনোক্রমে পার হয়ে এসেছি !

সেই রকমই একটি দিনে, আনন্দবাজার পত্রিকার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা গণেশ নাগ একদিন আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। অফিসের কোনো কাজে গণেশবাবুর সঙ্গে আমার কখনো কোনো কথা হয়নি, তার দরকারও হয়নি, তবে অফিসের বাইরে অনেক নেমন্তন্নে ও আড্ডায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, গল্প-গুজব হয়েছে, এক সঙ্গে তাসও খেলেছি। তিনি সজ্জন, বন্ধুবৎসল। বাঙালীদের মধ্যে কে কতখানি মাছের ভক্ত, তা নিয়ে যদি কখনো কোনো প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে গণেশ নাগ নিশ্চিত প্রথম স্থান অধিকার করবেন। একবার ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে তিনি বত্রিশটা ইলিশ মাছ কিনেছিলেন। বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বিলোবার জন্য। আর একবার ঢাকা থেকে প্লেনে ফেরার সময় তিনি হ্যান্ড

ব্যাগের মধ্যে ভরে এনেছিলেন কই মাছ।

নিজের চেম্বারে তিনি গোপন কথার ভঙ্গিতে বললেন, সুনীলবাবু, আপনি প্যারিস যাবেন ?

আমি হকচকিয়ে গেলাম একেবারে। এমন প্রস্তাব গণেশবাবু দেবেন, ভাবতেই পারা যায় না। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কর্তা হঠাৎ আমাকে প্যারিস পাঠাতে চাইবেন কেন ?

আরও রহস্য করে তিনি বললেন, আপনি যদি প্যারিসে কোনো থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেন, তা হলে আপনাকে আমি বিনা ভাড়ায় ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারি।

তখনই আমার মনে পড়লো, কয়েক মাস আগের একটা ঘটনা। সেদিন দুপুরে অফিসে আমার টেবিলে বসে আছি। এমন সময় এক লম্বা মতন, অপরিচিত যুবকের প্রবেশ। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মুখখানা খানিকটা গাম্ভীর্য মাখানো। হাত তুলে বললেন, নমস্কার, আমার নাম অসীমকুমার রায়, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

এরকম অনেকেই আসে, আমি বলেছিলাম, বসুন, আপনি কোনো লেখা দেবেন তো ?

অসীমকুমার রায় বললেন, না, আমি লেখা দিতে আসিনি। অসীম রায় নামে অন্য একজন লেখক আছে আমি জানি। আপনার সঙ্গে শুধু আলাপ করতেই এসেছি। আমি প্যারিসে থাকি, ওখানে আমার একটা বাড়ি আছে। আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি, একবার চলে আসুন না ওদিকে, আমার বাড়িতে কিছুদিন থেকে যাবেন।

আমি বললাম, থাকার জায়গা তো দিতে চাইছেন, কিন্তু প্যারিস যাওয়া কি মুখের কথা ! ভাড়া জুটবে কোথা থেকে !

অসীম রায় বললেন, চেষ্টা করলেই যাওয়া যায়। লেখকদের তো ভ্রমণের নেশা থাকে। তা ছাড়া, বাঙালী লেখকদের পশ্চিম জগৎটা একবার ঘুরে দেখে আসা উচিত। ওদিককার লেখকরা পৃথিবীর কত বিচিত্র জায়গায় যায়, ওদের লেখার জগতটাও সেজন্য অনেক বিস্তৃত হয় !

আমি বললাম, তারা তো আর বাংলা ভাষায় লেখে না ! বাঙালী লেখকদের সংসার চালাতেই হিমসিম খাওয়ার মতন অবস্থা। এদেশে লেখকদের সাহায্য করার মতন কোনো ফাউণ্ডেশনও নেই।

অসীম রায়ের সঙ্গে আরও নানা বিষয়ে গল্প হলো। যুবকটি বহু বছর প্রবাসী। পেশায় টেলিফোন-বিশারদ, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি টান-ভালোবাসা আছে। প্যারিসে কিছু বন্ধু-বান্ধবী মিলে বাঙালী ক্লাব করেছেন। তাদের একটি বাংলা বইয়ের লাইব্রেরিও আছে। সে বইগুলি থাকে অসীম রায়েরই বাড়িতে।

আমি যে এক সময় প্যারিসের রাস্তা পায়ে হেঁটে চষে বেরিয়েছি, তার উল্লেখ করলাম না একবারও। অনেককাল আগের কথা। বলেই বা লাভ কী ?

বিদায় নেবার সময় অসীম রায় তার ঠিকানা রেখে বলে গেলেন, আমার নেমন্তন্নটা মনে রাখবেন, কখনো প্যারিসে গেলে আমার বাড়িতে উঠবেন।

গণেশ নাগের প্রস্তাব শুনে আমার মনে হলো, এ তো ভারি আশ্চর্য যোগাযোগ। গণেশবাবু বলছেন, তিনি বিনা ভাড়ায় আমায় প্যারিস পাঠাবেন। আর অসীম রায়ের বাড়িতে বিনা খরচে থাকা যাবে। তা হলে তো আর কোনো সমস্যা নেই ! এক্ষুনি যেতে চাই।

বিনা ভাড়ায় প্যারিস যাওয়ার রহস্যটা গণেশবাবু একটু পরে ভেঙে বুঝিয়ে দিলেন।

ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বড় বড় উড়ো জাহাজগুলো কেনা হয় ফ্রান্স থেকে। সেই সব এয়ার বাস এক বছর দু' বছর অন্তর প্যারিসে পাঠাতে হয় সংস্কারের জন্য। সেরকমই একটি এয়ার বাস শিগগির যাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের ফ্লাইটে টিকিট-কাটা যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু এয়ার লাইন্সের কর্মী বা অতিথিরা যেতে পারে। সেইজন্য ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ঠিক করেছে, কিছু গায়ক-শিল্পী-লেখকদের নিয়ে যাবে, দিন পনেরো পরে ফিরিয়ে আনবে।

গণেশ নাগের দাদা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একজন খুব উঁচু অফিসার। তিনি আমাকে ঐ দলটির অন্তর্ভুক্ত করে দিতে পারেন।

সেদিন প্রায় হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরলাম। গণেশবাবু বলেছেন, ইচ্ছে করলে আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে পারি। সুতরাং খবরটা এক্ষুনি স্বাতীকে জানানো দরকার।

আমি তো শুধু বাঙালী নই, খাঁটি বাঙাল, গরম ভাত, ডাল আর বেগুন ভাজা আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। স্বাতী ভালোবাসে স্যান্ডুইচ। কাঁচা স্যালাড কোনোদিনই আমার পছন্দ নয়, স্বাতীর বিশেষ প্রিয়। স্বাতী ইলিশ মাছে আঁশটে গন্ধ পায়, আদর করে পুডিং খায়। আমি মিষ্টি দু' চক্ষে দেখতে পারি না। ভাগ্যিস সে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও বিভূতিভূষণের লেখা বিশেষ ভালোবাসে, না হলে এ মেয়ের সঙ্গে বেশিদিন ঘর করা কি আমার পক্ষে সম্ভব হতো ?

স্বাতী প্রায়ই বলে যে আগের জন্মে ও ফরাসী ছিল। কলেজ জীবনে সে পয়সা জমিয়ে ফরাসী শিল্পীদের ছবির বই কিনেছে, শখ করে ফরাসী ভাষা শিক্ষার ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। আমার মুখে আমেরিকা ভ্রমণের গল্প শুনে ও বলতো, আমেরিকায় আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় সব কিছুই বড্ড বড় বড়, কিন্তু একবার ইওরোপ যেতে খুব ইচ্ছে করে, বিশেষ করে ফ্রান্সে। আমি মাঝে মাঝে প্যারিসের স্বপ্ন দেখি।

ওর স্বপ্নকে সম্ভব করার এই তো সুবর্ণ সুযোগ। কিছুদিন আগে আমরা বাংলাদেশ ঘুরে এসেছি; তাই দু' জনেরই পাসপোর্ট চালু আছে। আর কোনো অসুবিধেই নেই !

আগেকার দিনের গল্প-উপন্যাসে প্রায়ই এরকম একটি লাইন থাকতো,'তখন নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিলেন !' আনন্দবাজারে গণেশবাবু যখন প্রস্তাবটি দেন, তখন তাঁর চেম্বারের দরজায় কান দিয়ে নিয়তিদেবী নিশ্চিত খিলখিল করে অনেকটা হেসে নিয়েছিলেন। আমার জীবনে যেমন অকস্মাৎ কিছু কিছু সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে, তেমনি ভাগ্যের অনেক ঠাট্টা-মস্করাও সহ্য করতে হয়েছে আমাকে।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সেই খালি জাহাজে জায়গা পাওয়ার জন্য গোপনে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। উৎসাহী হয়ে উঠলেন সরকারি আমলারা। তারপর রাজনীতির নেতারা। এ কালে নেতাদেরই গায়ের জোর বেশি, তাঁরা ধাক্কা দিয়ে অন্যদের ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন। তারপর নেতাদের সংখ্যাও এত বেশি হয়ে গেল যে তাঁরা ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। বিনা পয়সায় প্যারিস ঘোরার অনেক ক্যান্ডিডেট।

এই বিষয় নিয়ে হঠাৎ একদিন পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠে গেল। সব শুনেটুনে ইন্দিরা গান্ধী রাগ করে বললেন, কারুকেই নিতে হবে না। উড়োজাহাজ খালিই যাবে প্যারিসে।

সব ব্যাপারটাই যেন শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্নের মতন।

এরপর আবার কেটে গেল বছর দেড়েক।

একদিন শুনতে পেলাম আমাদের সহকর্মী ও লেখক বন্ধু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমেরিকা যাচ্ছেন। এবং আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সিরাজের কাছ থেকে সব বৃত্তান্তটা জানা গেল। তিনি যাচ্ছেন পল এঙ্গেলেরই আমন্ত্রণে। তবে সেখানকার রাইটার্স ওয়ার্কশপ এখন অনেক বিস্তৃত ও নিয়ম-কানুনবদ্ধ হয়েছে। আগেকার মতন পল এঙ্গেল নিজে আর বিশ্বময় ঘুরে ঘুরে লেখক নির্বাচন করেন না। এখন বিভিন্ন দেশের মার্কিন দূতাবাস এক একজন লেখককে পাঠান। সিরাজ এবার সেই সুযোগ পেয়েছেন। আমি খুব খুশী হয়ে সিরাজকে আমার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনালাম কিছু কিছু।

পল এঙ্গেল আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন অনেক দিন। আমারই উত্তর দেওয়া হয়ে উঠতো না। একেই চিঠি লেখাতে আমার খুব আলস্য, তাও আবার ইংরিজিতে ! সিরাজ আয়ওয়াতে গেলে পল নিশ্চয়ই তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন আমার কথা, সেইজন্য আমি দ্রুত খসখস করে কয়েক লাইনের একটা চিঠি লিখে দিয়ে দিলাম সিরাজের হাতে।

সেই ছোট্ট চিঠির একটা মস্ত বড় উত্তর এলো। পল এঙ্গেল চিঠি লেখার জন্য বিখ্যাত। লাইফ ম্যাগাজিনে একবার তাঁর এক ইন্টারভিউ-তে পড়েছিলাম। তিনি বছরে তিন হাজারের বেশি চিঠি লেখেন। সবই নিজের হাতে টাইপ করা। অসাধারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি। পল ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমার ব্যক্তিগত খবরাখবর জানতে চেয়েছেন। তারপর একটা আমন্ত্রণ। সুনীল, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি। তুমি আর একবার চলে এসো আয়ওয়া-তে। সস্ত্রীক এসো। যদি কোনোক্রমে চলে আসতে পারো, এখানে তোমাকে তিন-চার মাসের জন্য রেখে দেবো। তোমার থাকা-খাওয়া নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না।

এই আমন্ত্রণ সরকারি নয়, ফর্মাল নয়, পল এঙ্গেলের ব্যক্তিগত। তিনি আয়ওয়াতে আমাকে আতিথ্য দিতে প্রস্তুত, কিন্তু যেতে হবে নিজের উদ্যোগে। অত ভাড়ার টাকা পাবো কোথায় ? মার্কিন দূতাবাস আমাকে সাহায্য করবে না।

তখন আমি একটি উপন্যাস লেখার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রচুর ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বইটি শেষ করার পর মনে হয়েছিল, আর এক বছর কিছু লিখবো না। কিন্তু কলকাতায় থাকলে কিছু না কিছু লিখে যেতেই হবে। একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া। আমেরিকার মতন খরচের দেশে তিন-চার মাসের আতিথ্য পাবার প্রলোভনও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আমেরিকার টিকিট কাটলে ইওরোপে থেমে যাওয়া যায়। এর আগে স্বাতীকে প্যারিসে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রক্ষা করতে পারিনি। নিজের স্ত্রীর কাছে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করারও এই এক সুযোগ। অসীম রায়ের ঠিকানাটা এখনো হারাইনি।

আবার গেলাম গণেশ নাগ-এর কাছে। বললাম, সেবারে আপনি আমাকে বিনা ভাড়ায় প্যারিস পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, সেটা শেষ পর্যন্ত হলো না। এবারে আমি নিজেই প্যারিস যেতে চাই, আপনাকে ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

গণেশ নাগ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে অফিস থেকে আমার জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেন, খুব সুবিধেজনক শর্তে, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে শোধ দিলেই চলবে।

ঠিক সতেরো বছর পর, দ্বিতীয়বার আমি ফিরে এলাম প্যারিসে। যেন অন্য একজন মানুষ। বয়েস বেড়েছে, চেহারা বদলে গেছে। প্লেনের যাত্রীরাও অন্যরকম। সেই ষাটের দশকে পশ্চিম আকাশের বিমানে ভারতীয় দেখা যেত কদাচিৎ। এখন সর্বত্র ভারতীয়। সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশের ফলে এখন যে-কোনো ভারতীয়ই পাসপোর্ট পাবার

অধিকারী। ফরেন এক্সচেঞ্জের কড়াকড়িও হ্রাস হয়েছে। আগেকার দিনে ভারত মাতা তাঁর সন্তানদের মাত্র আটটি ডলার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদেশে পাঠাতেন, এখন পাঁচশো কুড়ি ডলার অনায়াসে নেওয়া যায়; তাই ইওরোপ-আমেরিকা যাওয়া এখন অনেকের কাছে জলভাত। আমি আর স্বাতী যাচ্ছি শুনে শিবাজী রায় নামে আমাদের এক প্রতিবেশী যুবক সঙ্গী হতে চাইলো, সে পাসপোর্ট-ভিসা ফরেন এক্সচেঞ্জ পেয়ে গেল ঝটাপট। আর সেই ষাটের দশকে শুধু পাসপোর্ট বার করতেই জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল আমার।

অসীম রায়ের কথাবার্তার ধরনটি একটু রুক্ষ ও চাঁছাছোলা। মাঝেমাঝে ভুরু কুঁচকে যায়। আগেরবার আমি নেমেছিলাম ওর্লি বিমান বন্দরে, এখন শার্ল দ্যগলের নামে বিশাল নতুন বিমান বন্দর হয়েছে। সেখান থেকে অসীম রায়ের বাড়ি বেশ দূরে। গাড়ি করে সে আমাদের নিয়ে গেল; বাড়িতে পৌঁছোবার একটু পরেই বললো, শুনুন, একটা ব্যাপার আগেই পরিষ্কার করে দিই আপনাদের কাছে। আমার বাড়িতে এসেছেন বলেই যেন ভাববেন না, আমি আপনাদের রান্না করে খাওয়াবো, আপনাদের বাসন মাজবো! দেশের লোকরা নিজেরা কিছু কাজ করে না, ঝি-চাকরদের খাটায়, এখানে এসেও মনে করে সেরকম সব কিছুই অন্যরা করে দেবে। আপনাদের রান্না ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি, কী করে গ্যাস জ্বালাতে হয় বুঝিয়ে দিচ্ছি, নিজেদের সব কিছু করে নিতে হবে।

আমরা সদলবলে তার সঙ্গে রান্না ঘরে ঢুকে একটি নাতিক্ষুদ্র লেকচার শুনলাম। আমি যে পুরো একটি বছর আমেরিকায় ছিলাম, এই রকম চার উনুনের গ্যাস স্টোভে নিজের হাতে রান্না করে খেয়েছি, সে অভিজ্ঞতার কোনো মূল্যই দিল না সে। তার সামনে গ্যাস জ্বালানো ও নেভানোর পরীক্ষা দিয়ে দেখাতে হলো।

রান্না ঘর পর্ব শেষ করার পর সে বসবার ঘরে এসে আমার হাতে তুলে দিল একটি টুরিস্ট গাইড বই এবং একটি মেট্রো ট্রেনের শাখা-প্রশাখার মানচিত্র। তারপর তার দ্বিতীয় লেকচার। তাকে প্রত্যেকদিন অফিস যেতে হবে, সন্ধের পর সে ক্লান্ত থাকে, সুতরাং সে আমাদের প্যারিস ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে না একেবারেই। ঘুরতে হবে নিজেদেরই। এই ভাবে মেট্রোর টিকিট কাটতে হয়, সাতদিনের টিকিট একসঙ্গে কাটলে অনেক সস্তা হয়, কোথায় কোথায় ট্রেন বদল করতে হয়, ইত্যাদি।

তারপর সে শুরু করলো এক গল্প। কিছুদিন আগেই একজন বিখ্যাত, প্রবীণ বাঙালী লেখক এসেছিলেন প্যারিসে, তিনি নানা রকম ছেলেমানুষী আবদার করে এখানকার বাঙালীদের জ্বালিয়ে খেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত রাগ করে একজন কেউ তাকে কোনো হোটেলে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল···।

আমি ও স্বাতী ত্রস্ত ভাবে চোখাচোখি করলাম। এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা! এই লোকটি তো আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল, চিঠিতেও অনেক উৎসাহ দেখিয়েছে। এখন যেন মনে হচ্ছে আমরা ওর কাঁধের ওপর বোঝা হয়ে পড়েছি!

পরদিন সকালে কিন্তু আমরা জাগবার আগেই অসীম রায় চা বানিয়ে আমাদের ডেকে তুললো। একটু পরে ব্রেকফাস্টেরও ব্যবস্থা করে ফেললো সে। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে সে আমাদের সারা দিনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনে বললো, চলুন, আপনাদের অন্য একটা জায়গা দেখিয়ে আনি। গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করলো তক্ষুনি।

দু' তিন দিন পরেই বোঝা গেল, সে আমাদের রান্না করেও খাওয়াবে, নিজের গাড়িতে নানান জায়গায় নিয়েও যাবে, কিন্তু তার ভাবখানা এই, তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করা চলবে না। একটা বেশ গেরেমভারি ভঙ্গি নিয়ে থাকতে সে খুব পছন্দ করে। এই ব্যাপারটা বুঝে

যাবার ফলে তার সঙ্গে ওঠা-বসা করতে কোনো অসুবিধে হয় না।

অসীম রায় বিবাহ করেনি, প্যারিস শহরের প্রান্তে তার নিজস্ব একটি দোতলা বাড়ি, দেশ থেকে অনেকেই গিয়ে তার ওখানে ওঠে। এই সব অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই অবুঝ। বিদেশের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণা নেই, তাদেরও কিছুটা অন্তত খোঁজ-খবর নিয়ে যাওয়া উচিত। এ তো সবারই জানার কথা যে ওসব দেশ থেকে ঝি-চাকর প্রথা উঠে গেছে। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাথরুম পরিষ্কার করা, এ সবই করতে হয় নিজেদের। সুতরাং অতিথিদেরও তাতে অংশ নিতে হবে সমান ভাবে। নইলে গৃহস্বামী যে অতিথিদের গৃহভৃত্য হয়ে যান। ওখানে সারা সপ্তাহ যন্ত্রের মতন খাটতে হয়। যখন তখন ছুটি নেবার কোনো উপায় নেই, তবু অনেকে আশা করে, যিনি আতিথ্য নিয়েছেন, তিনিই তাদের সর্বক্ষণের ভ্রমণ-গাইড হবেন! কোনো এক ধনীর দুলাল নাকি নিজের গেঞ্জি-আণ্ডারওয়ার বাথরুমে ফেলে রেখে যেত, তার ধারণা, অসীম রায় ওগুলো কেচে দেবে!

প্রথমবার যখন আসি, তখন প্যারিসে একজনও বাঙালীকে চিনতাম না। এখন পেয়ে গেলাম বেশ কয়েকজনকে। বিপ্লবী বাঘা যতীনের নাতি পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেশে থাকতেই দেখা হয়েছিল। আমাদের কফি হাউসের এক কালের বন্ধু, কবি ও শিল্প সমালোচক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এক ফরাসী রমণীর পাণিগ্রহণ করে এখানে থাকেন; অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না তাঁর সঙ্গে, এবার দেখা হলো। দেশ পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন প্রীতি সান্যাল, তাঁর স্বামী বিকাশ সান্যাল ইউনেস্কোর শিক্ষা বিভাগের এক হোমরা-চোমরা, দু' জনেই খুব আড্ডা-প্রিয়। শিল্পী শক্তি বর্মণ এখানে রয়েছেন বহুকাল; এসেছেন তরুণ শিল্পী সম্বিৎ সেনগুপ্ত। অসীম রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূপেশ দাস একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তিনি কথাবার্তা বলেন কম, কিন্তু প্রতিটি মন্তব্যই সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত। আর শুভেন্দু চৌধুরী সব সময়েই নিঃশব্দ শ্রোতা। আমরা সারাদিন প্যারিস শহরে ঘুরে বেড়াই, সন্ধের পর অসীমের বাড়ি কিংবা অন্য কারুর বাড়ি খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা বসে।

প্রথম দিন বেড়াতে বেরিয়েই স্বাতী জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার খুব মাগারিটের কথা মনে পড়ছে, তাই না?

না মনে পড়লে ধরে নিতে হতো যে আমার মন বলে কিছু নেই।

কিন্তু সতেরো বছর বড় দীর্ঘ সময়! এতদিন পর হঠাৎ মাগারিটকে দেখলে কি আমি চিনতে পারতাম? কিংবা সে আমাকে?

এই প্যারিস শহরেই তো এক মাস ধরে কত রাস্তা হেঁটেছি, কত দ্রষ্টব্য স্থান তন্নতন্ন করে দেখেছি, কিন্তু এখন সব কিছুই যেন অচেনা লাগছে। মেট্রো ট্রেন ও স্টেশনগুলো পাল্টে গেছে কত! সাতলে লে আল স্টেশনের কী চোখ ধাঁধানো রূপ। এক সময় ঐ লে আল অঞ্চলে এক বিশাল, লোক গিস্‌গিসে বাজার ছিল। মেট্রো ট্রেনগুলোর চেহারাও ছিল বেশ লঝ্‌ঝরে, লন্ডনে এখনো অনেক টিউব ট্রেন যেমন। কিন্তু এবার এসে দেখি মেট্রো একেবারে ঝকঝকে। আগে যে সময় এসেছিলাম, তখনও ফ্রান্স যুদ্ধ-পরবর্তী ডিপ্রেশান কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এখন সেই ফ্রান্স যেন অনেক সমৃদ্ধ।

মাগারিটের কথা যখন তখন মনে পড়ে বটে, কিন্তু সেই স্মৃতির মধ্যে বিষাদ কিংবা কাতরতা নেই। বরং যেন স্মৃতিটাকে কম্বলে মুড়ে রাখা হয়েছে, আমার বুকের খানিকটা অবশ লাগে। মাগারিটের প্রসঙ্গ উঠলেই আমি অন্য কথায় চলে যেতে চাই।

এবারের প্যারিস আসা যেন স্বাতীকেই সব কিছু দেখাবার জন্য। ওর মুগ্ধতা দেখে

আমার আনন্দ হয়। ও ছবি দেখতে ভালোবাসে, এ শহরে রয়েছে ছবির স্বর্ণভাণ্ডার। আসবার পথে আমরা অ্যামস্টারডামে নেমে ভ্যান গঘ ও রেমব্রান্ডট্ দেখে এসেছি দু' চোখ ভরে; এখানে দেখছি ওঁদের সমসাময়িকদের। শিল্প সমালোচক সুপ্রিয়কে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ওর সঙ্গে স্বাতীর বেশ ভাব জমে গেল। সুপ্রিয় আমাদের নিয়ে যায় বাছাই করা ছবির জায়গায়।

আমি আগের বার অতদিন ছিলাম, তবু ইফেল টাওয়ারে চাপিনি আর মোনালিসা দেখিনি শুনে সবাই হাসে। এবারে ঐ স্তম্ভচূড়াতেও ওঠা হলো, ঐ ইতালীয় গর্ভিণীকেও দেখা হলো। লুভ্‌র মিউজিয়ামে ঘুরতে ঘুরতে রেনোয়া'র একটা ছবির সামনে স্বাতী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। বড় আকারের স্নানরতাদের ছবি। প্রকৃতি ও নগ্ন নারী, রেনোয়ার প্রিয় বিষয় ছিল। এই ছবিটা রেনোয়া'র মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে আঁকা। যখন রেনোয়া বাতের ব্যথায় খুব কষ্ট পেতেন, আঙুল নাড়তে পারতেন না, আঙুলের ফাঁকে ব্রাশ বেঁধে নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আঁকতেন।

স্বাতীকে এই সব কথা বোঝাতে বোঝাতে হঠাৎ আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। সতেরো বছর আগে, ঠিক এই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট আমাকে এই কথাগুলোই বলেছিল। তা হলে আমি সেসব ভুলিনি, কিছুই ভুলিনি!

১৭

তুমি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালোই করেছো, আর্থুর র‍্যাঁবো।
বন্ধু ও শত্রুদের প্রতি সমানভাবে তোমার আঠারো বছরের অবহেলা,
প্যারিসের কবিদের ন্যাকামির প্রতি, আর সেই বন্ধ্যা ঝিঁঝির একঘেয়ে সুর—
তোমার গ্রাম্য ও পাগলাটে পরিবার....
তুমি বেশ করেছো, ছেড়ে চলে গেছ অলসদের রাস্তা,
লিরিক-প্রস্রাবকারীদের সরাইখানা...

—রেনে শার

যে-হেতু প্যারিস শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি আবার দেখার তেমন আগ্রহ নেই আমার, তাই এক একদিন দুপুরে স্বাতী ও অন্যরা বেরিয়ে যায়, আমি বাড়িতে শুয়ে থাকি। অসীম রায়ের সংগ্রহের বইগুলি নাড়াচাড়া করি। অসীম রায়ের নেশা ফটোগ্রাফি, নিজে ভালো ছবি তোলে তো বটেই, অনেক ফটোগ্রাফির ম্যাগাজিনও বাড়িতে রাখে। তা ছাড়া বাংলা ও ফরাসী ভাষায় কাব্য-উপন্যাস আছে কিছু কিছু, ইংরিজি খুবই কম।

একলা থাকতে আমার ভালোই লাগে। কখনো বাগানে ঘুরি, কখনো টিভি দেখার চেষ্টা করি। সাধারণত টিভি দেখার জন্য মানুষকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না, বোতাম টিপে যন্ত্রটা চালু করে দিয়ে সামনে বসে থাকলেই তো হলো। কিন্তু অসীম রায়ের বাড়িতে টিভি দেখা অত সহজ নয়। তাঁর টিভি-র পেছনের পাল্লাটা একেবারে খোলা, ভেতরের হাজার-হাজার যন্ত্রপাতি ও সূক্ষ্ম তারের খেলা সব পরিদৃশ্যমান। অর্থাৎ টিভি-র পেছন দিকটা সম্পূর্ণ দেখা যায় কিন্তু সামনের ছবি তেমন স্পষ্ট হয় না। অসীম রায় কোনো এক সময় টিভি-টা সারাবেন বলে ঠিক করেছেন, আপাতত তিনি পেছনের ডালাটা এগিয়ে পিছিয়ে ছবি পরিস্ফুটনের পরীক্ষা করেন। অসীম রায় সেটা পেরে যান, কারণ তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দক্ষতা আছে, আমি আবার এসব যন্ত্রে হাত দিতে ভয় পাই। সুতরাং একলা থাকলে টিভি দেখার সুবিধে হয় না। আমার ইচ্ছে ছিল, টিভি শুনে শুনে ফরাসী ভাষাটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া।

বৃষ্টি না পড়লে বাগানে বেশ ভালোই সময় কাটে। ইওরোপের বাড়িগুলোর এই বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকের বাড়ির সামনে-পেছনে খানিকটা লন ও বাগান থাকবেই। এদেশে সব ভদ্রলোকই ঘেসুড়ে, সপ্তাহে একদিন বাগানের ঘাস ছাঁটা বাধ্যতামূলক। মালী রাখার প্রশ্নই নেই। কারুর বাগানের ঘাস বেশি বেড়ে গেলে অন্যরা অবজ্ঞার চোখে তাকায়। অসীম রায়কে সাহায্য করার জন্য আমিও দু'একবার লন মোয়ার দিয়ে ঘাস ছেঁটেছি।

এসব বাড়িগুলিকে বলে সেমি ডিটাচ্‌ড। অর্থাৎ দূর থেকে একটাই বাড়ি মনে হলেও

আসলে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করে দু'টি বাড়ি হয়েছে। আলাদা বাগান, আলাদা প্রবেশ পথ, আলাদা সব কিছু, তবু বাড়ি দুটো পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মতন। এই সব বাড়িতে আর সবরকম সুযোগ-সুবিধে থাকলেও বেশি রাত পর্যন্ত হৈ-হুল্লোড় করা যায় না। তাতে প্রতিবেশীর ঘুমের অসুবিধে হয়।

অসীম রায়ের প্রতিবেশী এক জোড়া বুড়ো-বুড়ি, তাদের সঙ্গে অসীম রায়ের বেশ সৌহার্দ্য আছে। এক বাড়ির মালিক ছুটিতে কোথাও বেড়াতে গেলে অন্যজনকে চাবি দিয়ে যায়, অন্যজন দুটো বাগানের গাছেই জল দেয়, দৈবাৎ জলের কল বা গ্যাস লিক করলে চাবি খুলে মেরামত করে, চিঠিপত্র রেখে দেয়। তা বলে কিন্তু এরকম ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরাও পরস্পরের বাড়িতে যখন তখন যাওয়া আসা করে না। কেউ কারুর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারে না। ভদ্রতার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করা পশ্চিমী সভ্যতার অঙ্গ। বাগানের বেড়ার দু'পাশ থেকে একবার সৌজন্য বিনিময় হয়, সেইটুকুই যথেষ্ট।

শহরতলির অধিকাংশ বাড়িই বৃদ্ধ দম্পতিতে ভর্তি। ছেলে-মেয়েরা কেউ সঙ্গে থাকে না। ছেলে-মেয়েরা হয়তো বছরে একবার দেখা করতে আসে কিংবা দূর থেকে ক্রিসমাস কার্ড পাঠায়। বার্ধক্যে নিঃসঙ্গতা এদের নিয়তি। আমাদের কাছে এটা নিষ্ঠুর ও করুণ মনে হলেও, এদের বোধহয় সহ্য হয়ে গেছে।

আপেল গাছ এদেশের সব বাগানেই আছে, মনে হয় যেন বিনা যত্নেই এ গাছ বেশ বাড়ে। আমাদের দেশের আম কাঁঠালের মতন। তা ছাড়া অসীমের বাগানে আছে ন্যাসপাতি ও চেরি গাছ, হাত বাড়িয়েই সেগুলির ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া যায়। অসীম টমাটো আর কুর্জেৎ নামে এক ধরনের কুমড়ো লাগিয়েছেন। রান্নার সময় বাগান থেকে সেগুলো তুলে আনা হয়। কাঁচা লঙ্কা নেই। ফরাসীরা কাঁচা লঙ্কা খায় না, কিন্তু এখন ফ্রান্সে কিছু কিছু ভিয়েৎনামীদের কলোনি হয়েছে, তাদের বাজারে কাঁচা লঙ্কা, চালকুমড়ো, খলসে মাছ সবই পাওয়া যায়।

অনেকের বাগানেই একটি দোলনা থাকে। অতি সামান্য পোশাক পরে মেয়েরা সেই দোলনায় দুলতে দুলতে রোদ পোহায়। কিংবা বই পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় অসীমের বাড়ির দু'পাশে সেরকম কোনো তরুণী থাকে না, তাহলে দুপুরবেলা আমার বাগানে ঘোরা অনুচিত হতো। প্রতিবেশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে আমি একবার শুধু বঁ ঝুর বলে অনায়াসে বই পড়তে পারি। নির্মল সুনীল ফরাসী আকাশের নীচে, চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ, ন্যাসপাতি গাছের ছায়ায় একটা সাদা রঙের চেয়ারে আমি একলা বসে আছি, হাতে বই, এরকম একটা দৃশ্য হিসেবে নিজেকে আমি উপভোগ করি সারা দুপুর ধরে।

অসীমের সংগ্রহের বাংলা বইগুলি আমার অধিকাংশই পড়া। ফরাসী বইগুলির পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখি, কিছু কিছু শব্দের মানে বুঝলেও ক্রিয়াপদের ব্যবহার ভুলে গেছি। ইংরিজির সন্ধানে একদিন একটা আটলান্টিক ম্যাগাজিন পেয়ে গেলাম। তাতে রেনে শার বিষয়ে একটা রচনা রয়েছে।

রেনে শার মার্গারিটের প্রিয় কবি ছিলেন। মার্গারিট প্রায়ই ওঁর কথা বলতো। শুধু কবি হিসেবেই নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেজিস্টান্স মুভমেন্টের বীর সেনানী হিসেবেও তাঁর দারুণ সম্মান।

এই কবি প্রথম জীবনে যোগ দিয়েছিলেন সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে ; তারপর এক সময় সুররিয়ালিস্টরা কেউ কেউ সাম্যবাদের দিকে ঝোঁকে, রেনে শার হলেন জাতীয়তাবাদী। তিনি মনে করতেন, জীবনে ও বেঁচে থাকায় প্রত্যেক কবিই তাঁর দেশ ও সমাজের সঙ্গে

জড়িত, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বও তাঁকে নিতে হবে। কিন্তু কবিতা রচনা তাঁর ব্যক্তিগত আরাধনার ব্যাপার। অর্থাৎ একজন কবি প্রতিবাদের মিছিলে যোগ দিতে পারে, কিন্তু তা বলে যে তাঁকে মিছিলের, চ্যাচামেচির কবিতা লিখতে হবে, তার কোনো মানে নেই। দেশের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই করেছেন শার, কিন্তু উগ্র দেশাত্মবোধের কবিতা লেখেননি।

জাতীয় বীরের সম্মান পেলেও রেনে শার পরবর্তীকালে সরকার গঠনে অংশ নেননি, মন্ত্রী-টন্ত্রি হননি। বরং তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর জন্মস্থান লিল-সুর-সরনেই-তে। ভাক্লুজ অঞ্চলে সেটা একটা ছোট্ট জায়গা। শুধু কবিতা লিখেছেন আর তাঁর সমসাময়িক শিল্পী মিরো, ব্রাক-এর ওপর প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

শার-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আলবিয়ার কাম্যু। কাম্যুর মতে শার এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসী কবি। অবশ্য শার-এর সব কবিতার মর্ম বোঝা মোটেই সহজ নয়। তাঁর একটি ছোট্ট কবিতার নাম 'ওরিওল পাখি', সেটি এরকম :

ওরিওল পাখি ছুঁয়েছে উষার রাজধানী
তার সঙ্গীত তলোয়ার, এসে বন্ধ করেছে দুঃখ শয্যা
সব কিছু আজ চির জীবনের শেষ।

এই কবিতাটি পড়ার সময় জানতে হবে যে এর রচনাকাল ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯, অর্থাৎ মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ইওরোপের কালো আকাশ পেরিয়ে উড়ে আসছে একটা ওরিয়ল। ওরিয়ল মানে সোনালি পাখি। আমাদের দেশে যে হলদে পাখিগুলো 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলে ডাকে, অনেকটা সেরকম, এদেশে খুব দেখা যায়। শার মনে করতেন, কবিতায় কোনো সম্পূর্ণ অর্থ থাকার দরকার নেই। কবির আবেগ বা বিশেষ অনুভূতির শুধু প্রথম অংশটুকু নিয়েই হয় কবিতা, সেইটুকু অবলম্বন করে পাঠকদের মানস যাত্রা। অর্থাৎ এই কবি পাঠকদের ওপর অনেকখানি দায়িত্ব দিতে চান।

এই ছোট্ট কবিতাটি আমি মার্গারিটের মুখে বারবার আবৃত্তি শুনেছি। একবার তুষারপাতের সময় কয়েকটা মৃত পাখি দেখে···

শার-এর একটি কবিতা আছে র‍্যাঁবো-র ওপরে। কবিতাটির নাম, 'তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই করেছো, আর্তুর র‍্যাঁবো'। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে র‍্যাঁবো-র কবিতা হঠাৎ কলকাতায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। র‍্যাঁবোর অতি নাটকীয় জীবনের সঙ্গে তাঁর কবিতা মিলিয়ে বিশেষ একটি আকর্ষণ তৈরি হয়। মাত্র আঠেরো বছরের এই বালকটি কবিতা লিখে হুলুস্থুলু ফেলে দেয় ফরাসী দেশে, তারপর হঠাৎই কবিতা লেখা একেবারে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আফ্রিকায়। তারপর থেকেই র‍্যাঁবো একটি লিজেন্ড। একাধিক বাঙালী র‍্যাঁবোর কবিতা অনুবাদ করেছেন। আমারও একসময় ইচ্ছে ছিল র‍্যাঁবোর একটি জীবনী লেখার।

র‍্যাঁবো প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়লো। ফরাসী উচ্চারণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বাংলার র‍্যাঁবো নামটি দেখে অনুমান করা দুঃসাধ্য ঐ নামের মূল ফরাসী রূপ। ফরাসীরা র-অক্ষরটিকে অনেক সময় হ্র-এর মতন উচ্চারণ করে, রেডিও হয়ে যায় হ্রাদিও। Rimbaud-কে আমি মার্গারিটের কণ্ঠে হ্র্যাম্বো শুনেছি। একসময় আমি 'অন্য দেশের কবিতা' নামে একটি অনুবাদের সিরিজ প্রকাশ করছিলাম। তাতে 'র‍্যাঁবো'-র বদলে লিখেছিলাম 'হ্র্যাম্বো' ! আর যায় কোথায়, অনেকেই অবজ্ঞায় ওষ্ঠ ওল্টাতে লাগলো আমি ফরাসী শব্দের উচ্চারণ জানি না বলে, আবার ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলী দেশ পত্রিকার পাতায় ধমক দিয়ে লিখলেন, আজকাল হয়েছে এই এক ধরনের ঐঁচোড়ে

পাকা, অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী, র‍্যাঁবো-র বদলে লিখেছে হ্যাম্বো, এটা কোনো কবির নাম না ছাগলের ডাক তা বোঝাই যায় না !

আমি আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললাম, আপনি আমার ইয়ার্কিটা বুঝতে পারেননি ? ফরাসী উচ্চারণ নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে, ওটা তাদের সম্পর্কে খানিকটা মজা করার জন্য। আমি তো কিছুই জানি না, আমাদের দেশে ক'জনই বা সঠিক ফরাসী জানে, বলুন ? আমরা নেপোলিয়ান কিংবা প্যারিস দেখলে চিনতে পারি, তার বদলে নাপোলিয়ঁ কিংবা পারি লেখার দরকার আছে কি ?

আলী সাহেব বললেন, না লিখলেও চলে। ইংরেজদের ধরনে ফরাসী উচ্চারণই লোকে বোঝে।

আমি বললাম, আমেরিকানরা বলে র‍্যামবো। তবে কি এসব ঝামেলা এড়াবার জন্য বানান অনুযায়ী রিম্‌বড লেখা উচিত ?

উনি বললেন, না, না, এতদিন ধরে র‍্যাঁবো চলছে, সেটাই চলুক।

এই সূত্রে আমার প্রতি সৈয়দ মুজতবা আলীর একটা স্নেহের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়। পরবর্তী কালে তিনি আমাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন।

যাই হোক, সেদিন দুপুরবেলা কেন যেন র‍্যাঁবোর চিন্তা আমায় পেয়ে বসেছিল। দেশপ্রেমিক রেনে শার দেশত্যাগী র‍্যাঁবো সম্পর্কে এতখানি সহানুভূতি দেখিয়েছেন কেন ? রেনে শার সারা জীবন কবিতার সাধনা করেছেন, কিন্তু র‍্যাঁবো যে আঠেরো বছর বয়েসেই কবিতা লেখা ছেড়ে, একেবারে সাহিত্য জগৎ ছেড়েই চলে গেল, সেটাকে কেন তিনি বললেন, 'তুমি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালোই করেছো, আর্তুর র‍্যাঁবো' ?

সাহিত্য একটা তীব্র নেশা, রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যাকে একবার এই নেশা ধরে, তার আর অন্য কোনো গতি থাকে না। আবার এ কথাও হয়তো ঠিক, অনেক লেখকই এক এক সময় এই নেশা থেকে মুক্তি পেতে চায় ! সাহিত্য সৃষ্টিতে খ্যাতি-কীর্তি-অর্থের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তার জন্য লেখককে ভেতরে ভেতরে কত কষ্ট যে সহ্য করতে হয় ! এক একসময় রক্ত ক্ষরণের মধ্যে মিশে যায় শব্দের বিষ, তা অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। প্রত্যেক লেখকেরই বোধহয় জীবনে কোনো না কোনো সময় মনে হয়, দূর ছাই, আর জীবনে এক লাইনও লিখবো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারা যায় না। যে দু'একজন পারে, তাদের প্রতি অন্য লেখকদের শ্রদ্ধা ও ঈর্ষাবোধ হয়। খুব সার্থক কোনো লেখক সম্পর্কে যেমন অন্য লেখকদের ঈর্ষা থাকে, তেমনি কোনো ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক অবহেলায় সাহিত্য-জগৎ ছেড়ে গেলে তাঁর প্রতিও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ঈর্ষা থাকতে পারে। র‍্যাঁবো সম্পর্কে রেনে শার-এর এত উচ্ছ্বাস কি সেইজন্য ?

র‍্যাঁবোর জীবনের নানা ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। আঠেরো বছর, মাত্র আঠেরো বছরের একটি ছেলে 'নরকে এক ঋতু'র মতন অবিস্মরণীয় কাব্য লিখে ফেলেছিল ? আমরা আঠেরো বছর বয়েসে কী করেছি ? কতটুকু জেনেছি সাহিত্য সম্পর্কে ? আর কীভাবে র‍্যাঁবো রচনা করেছিল সেই কাব্য ? সেই সময়ে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ভেরলেইন-এর সঙ্গে ঝগড়া, ভেরলেইন রাগের মাথায় র‍্যাঁবোকে গুলি করেছিল, এ ঘটনা তো অনেকেরই জানা। ভেরলেইনকে গ্রেফতার করে পুলিশ জেলে ভরে দিল, আহত অবস্থাতেও র‍্যাঁবো পুলিশকে জানালো যে বন্ধুর বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই, পুলিশ তা মানলো না। র‍্যাঁবোর তখন কোথাও যাবার জায়গা নেই, কোনো বন্ধু নেই, কর্পদকশূন্য অবস্থা, খাবার জোটাবার সঙ্গতিও নেই। গৃহত্যাগী এই ছেলেকে তার পরিবারের লোকরাও পছন্দ করে না, সকলের

ধারণা কুসঙ্গে মিশে সে উচ্ছন্নে গেছে। (ভেরলেইনের সঙ্গে তখন র‍্যাঁবোর সমকামিতার সম্পর্কের গুজব বহুল প্রচারিত) নিরুপায় অবস্থায় র‍্যাঁবো গ্রামের বাড়িতে ফিরতে বাধ্য হলো, পায়ে হেঁটে, এক হাতে তখনো ব্যান্ডেজ বাঁধা, শীর্ণ শরীর। বাড়িতে সবাই তখন খাবার টেবিলে বসেছে, মা, দুই বোন, এক ভাই। সেখানে এসে দাঁড়ালো সেই অভিশপ্ত পুত্র র‍্যাঁবো। প্রথমে সবাই নিশ্চুপ, র‍্যাঁবো বুঝতে পারছিল না যে তাকে এ বাড়িতে গ্রহণ করা হবে, না তাড়িয়ে দেওয়া হবে ! তারপর মা ছেলেকে বললেন, আয়, বোস ! সেই সামান্য স্নেহের ডাক শুনেই র‍্যাঁবো টেবিলে মাথা গুঁজে হু হু করে কাঁদতে লাগলো।

মায়ের কাছে র‍্যাঁবো আবেদন জানালো যে এখন থেকে বাড়িতে থেকে সে তার বইটি শেষ করতে চায়। এই বইটি ছাপিয়ে সে দেখতে চায়, তার সাহিত্য প্রচেষ্টার সত্যিকারের কোনো মূল্য আছে কি না। মা সাহায্য করতে রাজি হলেন, এমনকি বই ছাপাবার খরচও দেবেন বললেন। ওদের নিজস্ব ফার্মে অন্য ভাই-বোনেরা ও মা রোজ সকাল থেকে চাষ ও হাঁস-মুরগী পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, শুধু এই একটি ভাই কিছু করে না, সে লেখে। তার এক বোন ভিতালি ডায়েরিতে লিখেছিল, আমরা যখন কাজ করতে যাই, আর্তুর আমাদের সঙ্গে আসে না, সে তার কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু আমি এক একদিন শুনেছি, সে একা একা যন্ত্রণায় চ্যাঁচায়, গালাগালি দেয়, গরজায়, যেন সে কোনো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে !

বইটি শেষ হবার পর মা পাণ্ডুলিপিটা পড়লেন। কিছুই বুঝতে না পেরে, ভ্যাবাচ্যাকা, বিমূঢ় অবস্থায় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, এ সবের মানে কী ? শান্তভাবে ছেলে উত্তর দিয়েছিল,"It means exactly what I've said, literally and completely, in all respects."

পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হলো প্যারিসে, ছাপাও হলো, কিন্তু কেউ উচ্চবাচ্য করলো না, প্রকাশকের কাছে গাদা হয়ে পড়ে রইলো সব বই। ওদের অসামাজিক জীবন-যাপন, বিশেষত গুলি ছোঁড়ার ঘটনা ও ভেরলেইনের জেল খাটার জন্য, এই দু'জনকে ফরাসী লেখক-সাহিত্যিকরা বিষবৎ পরিত্যাগ করেছিল।

কিছু দিন বাদে র‍্যাঁবো প্যারিসে এলো তার এই সাহিত্যকীর্তিটি সম্পর্কে লেখককুলের প্রতিক্রিয়া জানতে। কাফে তাবুরি ছিল সাহিত্যিকদের আড্ডা স্থল, সেখানে র‍্যাঁবো আর ভেরলেইনও একসময় প্রচুর সময় কাটিয়েছে। সেটা একটা ছুটির দিন, র‍্যাঁবো এসে বসলো একটা টেবিলে, অন্য টেবিলগুলোতে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক ও তাদের বান্ধবীরা তুমুল হল্লা করছে, তাদের অনেকেই র‍্যাঁবো-কে চেনে, কিন্তু কেউ ডাকলো না, কেউ তার সঙ্গে কথা বললো না। এই আঠেরো বছরের যুবকটি যেন শয়তান, তার দিকে তাকাতেও নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা র‍্যাঁবো বসে রইলো একা। কঠিন মুখে, মাথা নিচু করে। তার অহংকার কম নয়, সেও নিজে থেকে কারুর সঙ্গে কথা বলবে না।

সম্ভবত এই দৃশ্যটি সম্পর্কেই রেনে শার লিখেছেন তাঁর কবিতাটি। 'প্যারিসের কবিদের ন্যাকামি ... লিরিক–প্রস্রাবকারীদের সরাইখানা'...।

সে রাতে বাড়ি ফিরে এসে র‍্যাঁবো তার সব লেখার পাণ্ডুলিপি ও বইপত্রে আগুন ধরিয়ে দিল। তার এক বোন সেই বহ্ন্যুৎসব দেখেও থামাতে পারেনি। সাহিত্যের প্রতি সেই আগুনই ছিল র‍্যাঁবোর শেষ উপহার।

র‍্যাঁবো সম্পর্কে পড়তে পড়তে ও ভাবতে ভাবতে আমি একটু একটু রেড ওয়াইন খাচ্ছিলাম। অসীম রায়ের সেলারে অনেক বোতল ওয়াইন জমা করা ছিল, তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি, কিন্তু প্যারিসে এসে ইচ্ছে মতন ওয়াইন খাবো না, তা কখনো হয় ?

কিছুক্ষণ পরে একসঙ্গে দু'টো নেশা আমায় পেয়ে বসলো। রেড ওয়াইনের নেশায় মাথাটা হালকা হয়ে গেল, আর আঠেরো বছরের সেই দুরন্ত কিশোরটি যেন শতাব্দী পেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে আমায় বলতে লাগলো, এসো, এসো, চলে এসো, লেখা-টেখা ছেড়ে দাও, কী হবে লিখে ? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে যে লিখতেই হবে ? না লিখলে বিশ্বসংসারের কোনো ক্ষতি হয় না। আরও অনেক ভালো ভালো লেখক আছেন, তোমার কিছু না লিখলেও চলবে !

সত্যি সত্যি কাল থেকে যদি ঘোষণা করে দিই, আর কক্ষনো এক লাইনও লিখবো না, তা হলে কেমন হয় ? পাঠক-পাঠিকারা অবশ্য মাথাও ঘামাবে না, কিন্তু চেনাশুনো, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হবে নিশ্চয়ই। তাদের অবিশ্বাসের ওপর বিচ্ছুরিত হবে আমার অহংকার। না-লেখার অহংকার।

আগেও আমার একবার এরকম হয়েছিল। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসে। কিছু একটা অভিমানে আমি ঠিক করেছিলাম, জীবনে আর এক লাইনও কবিতা লিখবো না। আমার সংগ্রহের সমস্ত কবিতার বই ও পত্র-পত্রিকা আমি বিলিয়ে দিয়েছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনো কবিতা জিনিসটার মুখদর্শনও করবো না। সেবারে সে প্রতিজ্ঞা সাতাশ দিনের বেশি রাখতে পারিনি।

এবারে, একাকী প্যারিসের প্রান্তে এক বাড়ির বাগানে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে র‍্যাঁবোর প্রভাব আমাকে আবার অনুপ্রাণিত করে। যেন আমি মাথার টুপি তুলে বলছি, সাহিত্য জগৎ, বিদায়। র‍্যাঁবো সাইপ্রাসে চলে গিয়ে বাড়ি-ঘর বানাবার মিস্তিরির কাজ নিয়েছিলেন, আমি সাঁওতাল পরগনায় কোনো কাঠ গুদামে কাজ নিতে পারি। আমাকে বিয়ে করার সময় স্বাতী বলেছিল, দরকার হলে ও আমার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে গিয়ে থাকতেও রাজি আছে। তা হলে তো আর কোনো অসুবিধেই নেই।

একাধিক রেড ওয়াইনের বোতল শেষ হয়ে গেল। স্বাতীরা ফিরলো ঘোর সন্ধেবেলা। তখনই ওদের কাছে কিছু ভাঙলাম না। নৈশাহারের সময় আরও ওয়াইন পান হলো। তারপর হলো এক কাণ্ড। মাঝ রাত্তিরে আগুনের আঁচে ঘুম ভেঙে আমি লাফিয়ে উঠলাম। বিছানায় আগুন লেগে গেছে, কম্বল জ্বলছে, তোশক জ্বলছে।

শুয়ে শুয়ে বই পড়ার সময় হঠাৎ আমার ঘুম এসে গিয়েছিল। হাতে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানা যে বিপজ্জনক, তা কি আমি জানি না ? অন্য দিন তো এরকম করিও না ! বেশি ওয়াইন খেলে এরকম করা তো একদমই উচিত না, তবু কি আমার মাথায় র‍্যাঁবোর ভূত চেপেছিল ?

কম্বল ফুটো হয়ে তোশকের ভেতরটা জ্বলছে। তুলোর আগুন নেভানো সহজ নয়। অন্যদের ঘুম না ভাঙিয়ে স্বাতী জল এনে এনে অনেকক্ষণ ধরে সেই আগুন নেভালো। সারা রাত আমাদের শুয়ে থাকতে হলো সেই ভেজা বিছানায়। আর আমার ঘুম আসে না। নেশা-ফেশা সব ঘুচে গেছে, অপরাধ বোধে আমি মরমে মরে যাচ্ছি। এ দিকে সবই কাঠের বাড়ি। ছ্যাঁকা লেগে জেগে না উঠলে যদি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতো, তা হলে সারা পাড়া জুড়ে একটা অগ্নিকাণ্ড হতো। অসীম রায়ের সঙ্গে সদ্য পরিচয়, তিনি তাঁর বাড়িতে অনুগ্রহ করে আমাদের থাকতে দিয়েছেন, এই কি তার প্রতিদান ? তিনি রাগী ধরনের মানুষ, এই সব দেখে কী ব্যবহার করবেন কে জানে !

সকালবেলা অসীম রায়কে সব কিছু জানাতেই হলো। তাঁর অফিস যাওয়ার তাড়া ছিল, তিনি দগ্ধ বিছানা নিরীক্ষণ করে বিনা মন্তব্যে চলে গেলেন। আমার মাথা থেকে র‍্যাঁবোর

ভূত চলে গেছে, অসীম রায় বকুনি দিলে আমি কীভাবে ক্ষমা চাইবো, তার সাতরকম ভাষ্য তৈরি করেছিলাম মনে মনে, কিন্তু অফিস থেকে ফিরেও অসীম সে প্রসঙ্গই তুললেন না।

স্বাতী দু'তিনবার বললো, কাল কী কাণ্ড হতে যাচ্ছিল বলুন তো !

অসীম বললেন, শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয়নি তো ! বলুন, আজ কোথায় বেড়াতে যাবেন ?

অসীম যে এত বড় ব্যাপারটায় কোনো গুরুত্বই দিলেন না, তাতেই অস্বস্তি কাটছে না। আমিও আমার সাতরকম ভাষ্য শোনাবার সুযোগ পাচ্ছি না। একবার আমি জানালাম যে কাল তাঁর সেলার থেকে আমি দু'বোতল রেড ওয়াইন শেষ করেছি। তার উত্তরেও অসীম বললেন, আমি তো আপনাদের এখানে নেমন্তন্ন করে এনেছি। এমনি এমনি তো আসেননি। আমার বাড়িতে এসে আমার ওয়াইন খাবেন না ?

কিন্তু নিমন্ত্রিত হয়ে এসে বিছানা পুড়িয়ে দেওয়াও কোনো কাজের কথা নয়। অসীম রায়ের কাছ থেকে কিছু ধমক আমাদের প্রাপ্য তো বটেই !

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে আমি একবার বললাম, দেখুন, আপনার বাড়ির জন্য একটা তোশক আর কম্বল আমরা কিনে দিতে পারি কি ? ও দু'টো ফুটো হয়ে গেছে !

এবার অসীম রায় আমার দিকে ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনার বাড়িতে গিয়ে কেউ যদি একটা কাচের গেলাস ভাঙে, আপনি বুঝি তার দাম চান ? ঠিক আছে, কমপেনসেশান হিসেবে আপনি আমাকে আপনার লেখা একটা কবিতার বই দেবেন !

প্রকৃতপক্ষে সেই দিন থেকে অসীম রায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

১৮

নর্তকীরা নাচে। নাচ
নিজে কখনো নাচে না
নাচের ঠিক কেন্দ্রস্থলে গতিশূন্য হয়ে থাকে নাচ
রণক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে গতিশূন্য হয়ে থাকে যুদ্ধ...

—জাক্ ওদিব্যারতি

উত্তর কলকাতার টাউন স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল ভাস্কর দত্ত। ক্লাস থ্রি-ফোর থেকে আমরা এক সঙ্গে বর্ধিত হয়েছি। কলেজে এসে আমাদের স্ট্রিম আলাদা হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভাস্করের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রইলো। আমাদের স্কুল-কলেজ জীবনের বন্ধুদের একটা ঘননিবদ্ধ দল ছিল, আশুতোষ ঘোষ, উৎপল রায়চৌধুরী, সত্যময় মুখার্জি এবং আরও কয়েকজন, আমরা প্রায়ই আড্ডা দিতে যেতাম ভাস্করের বাড়িতে। ভাস্কর কলকাতার বনেদি বাড়ির ছেলে, ওদের বাড়িতে একটা বৈঠকখানা-কালচার ছিল। আমরা তাস খেলা কিংবা সাহিত্য-রাজনীতি নিয়ে তর্কাতর্কি করতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর মাঝে মাঝেই বাড়ির ভেতর থেকে চা-জলখাবার চলে আসতো।

তারপর আমি কৃত্তিবাস পত্রিকা চালানো এবং লেখালেখির জগতে অনেকখানি চলে আসার পর অন্য একটি বন্ধু গোষ্ঠী তৈরি হয়। স্কুল-কলেজের বন্ধুরা কিছুটা দূরে সরে যায় আস্তে আস্তে, তারা যে-যার জীবিকাতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু ভাস্কর এই লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যেও মিশে গেল। সে কিন্তু লেখে না। তার ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য জ্ঞান যথেষ্ট। কবিতার প্রতি তার বিশেষ ভালোবাসা আছে, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে লেখালেখির লাইনে একেবারেই এলো না। এক সময় ভাস্করের বাড়িটাই ছিল কৃত্তিবাস পত্রিকার অফিস, কাগজ ছাপার ব্যাপারে সে বিশেষ উদ্যোগী, কিন্তু কখনো সে নিজের কবিতা ছাপানোর দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। সে আমলে বহু তরুণ লেখক-লেখিকা ভাস্করকে বিশিষ্ট বন্ধু বলে গণ্য করতো।

আমাদের ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম লন্ডন গিয়েছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উচ্চশিক্ষার্থে। তিনি ফিরে এলেন দু'তিন বছরের মধ্যেই। তারপর দৈবাৎ আমি। আমিও সাত রাজ্য ঘুরে ড্যাং ড্যাং করে ফিরে এলাম এক সময়ে। তখন ভাস্কর বললো, তা হলে আমিও একবার বিলেতটা ঘুরে আসি, ওখানে আমার নামে একটা রাস্তা করে আসবো। এখানকার চাকরি ছেড়ে ভাস্কর চলে গেল লন্ডনে, তারপর কিছুদিন বাদে সে ডেকে নিল উৎপলকুমার বসুকে। এক সময় উৎপলও প্রত্যাবর্তন করলো স্বদেশে, কিন্তু ভাস্করের আর ফেরা হলো না।

অনেকদিন ভাস্করের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু যেদিন দেখা হলো, মনে হলো যেন

আগের রাত্রেই এক সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দেবার পর ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। উত্তর কলকাতার সেই আড্ডাবাজ মেজাজটি ভাস্করের অবিকল একই রয়ে গেছে। ওদেশের চাকরিতে অনেক আগে থেকে বলে-কয়ে না রাখলে ছুটি নেওয়া যায় না। কিন্তু ভাস্কর যে-কোনোদিন বলতে পারে, দূর ছাই, আজ আর অফিস যাবো না! বিলেত-আমেরিকায় পাশ বালিশ বা কোল বালিশ নামে কোনো বস্তু নেই, কিন্তু ভাস্কর পাশ বালিশ, কান-বালিশ, পা-বালিশ নিয়ে শোয়। ইংল্যান্ডে তার প্রায় দু'যুগ কেটে গেল, কিন্তু ওদেশের অনেক নিয়ম-কানুনই সে মানে না, মাঝে মাঝে তার মধ্যে থেকে একটা দুরন্ত বালকের রূপ বেরিয়ে আসে।

ভাস্করের স্ত্রীর নাম ভিকটোরিয়া। নতুন কেউ দেখা করতে এসে হয়তো বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে, ভাস্কর বললো, আমি ভিকটোরিয়াকে ডাকছি, অমনি সেই লোকটি ভাবে, এই রে, এবারে বুঝি একজন মেমসাহেব আসবে, তার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতে হবে! আসলে ভিকটোরিয়া খুবই বাঙালী এবং হুগলির মেয়ে। ফর্সা ফুটফুটে রং বলে তার ঠাকুমা-দিদিমারা তাকে ছোটবেলায় আদর করে রানী ভিকটোরিয়া বলে ডাকতো। ভিকটোরিয়া কখনো কিছু খুব রাগ করে বলতে গেলেও হেসে ফেলে, আর সেই জন্যই তার অবাধ্য স্বামীটি যা খুশি করার প্রশ্রয় পায়। ভিকটোরিয়া নিজেও চাকরি করে। ভোরবেলা উঠে তাকে অফিস যেতে হয়, তবু বাড়িতে কোনো অতিথি এলে সে অন্তত দশ রকম ব্যঞ্জন না খাইয়ে ছাড়ে না। ভাস্করের মতে, ভিকটোরিয়া এক একদিন এত বেশি রান্না করে যে ভাস্করকে হ্যারোর রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে লোক ডাকতে হয় বাড়িতে এনে খাওয়াবার জন্য। আমরা অবশ্য নিজেরাই দেখেছি, ভাস্কর এক একদিন ভিকটোরিয়াকে কিছু না জানিয়ে বাইরে থেকে গোটা তিরিশেক লোককে বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে আসে।

প্যারিস থেকে লন্ডনে এসে ভাস্করদের সঙ্গে হৈ চৈ করে কাটানো গেল কয়েকটা দিন। প্যারিসের অসীম রায়ের সঙ্গে ভাস্করের পরিচয় ছিল না, আমাদের সূত্রে যোগাযোগ হলো, তারপর থেকে বেশ কয়েক বছর প্যারিসই হলো আমাদের আড্ডার একটা কেন্দ্র।

সেবারে আমেরিকা ও কানাডায় প্রচুর ঘোরাঘুরি করে দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পরই আমি সোভিয়েত ইউনিয়ান পরিদর্শনের একটা নেমন্তন্ন পেলাম। আশির দশকে এসে হঠাৎ যেন বিশ্বের অনেকগুলি দেশের দরজা খুলে গেল আমার জন্য। কোনো রকম চেষ্টা করতে হয় না। বাড়ি ফিরে নানা রকম চিঠিপত্রের মধ্যে আচমকা এক একখানা বিদেশী আমন্ত্রণপত্র পেয়ে যাই। ভ্রমণ আমার নেশা, সাঁওতাল পরগনা,উড়িশ্যার জঙ্গল, আসামের পাহাড়ে যখন তখন বেড়াতে যেতে আমার যেমন ভালো লাগে, তেমনি পৃথিবীর যে-কোনো অদেখা দেশের ডাক পেলেই আমি লাফিয়ে উঠি। একটা দেশে নেমন্তন্ন পেলে, কাছাকাছি দু' তিনটে দেশ নিজের উদ্যোগে ঘুরে আসি। প্রবল শীত কিংবা চরম গ্রীষ্মেও আমি অকুতোভয়, শূন্যের নিচে চল্লিশ ডিগ্রি ঠাণ্ডার জায়গাতেও আমি গেছি, আর একবার ইস্তানবুলের এক হোটেলের ঘরে গরমের জ্বালায় আমি এমন ঘামছিলাম, যে মনে হচ্ছিল আমার শরীরের অর্ধেকটাই গলে জল হয়ে যাচ্ছে। বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, এমনকি টার্কি কিংবা কেনিয়া গেলেও মনে হয়, একবার ফ্রান্স ছুঁয়ে গেলে হয় না! আমি এ পর্যন্ত বহু দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেলেও ফ্রান্স থেকে কখনো পাইনি, কিন্তু ফ্রান্সেই গেছি সবচেয়ে বেশিবার। মার্গারিট আমাকে প্রথমে ফ্রান্সে নিয়ে গিয়েছিল, সে দেশ এখনো যেন আমাকে চুম্বকের মত টানে।

রাশিয়া যাওয়ার সময় ভাবলাম, ওদের টিকিটের সঙ্গে সামান্য কিছু জুড়ে দিলেই তো

ফ্রান্স ঘুরে আসা যায়। অসীম রায়ের সঙ্গে এর মধ্যে আমার আপনি থেকে তুমি'র সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাকে সেই মর্মে চিঠি দিতেই সে উৎসাহের সঙ্গে জানালো, ঠিক আছে, চলে এসো, আমি ছুটি নিয়ে রাখবো, গাড়ি করে বেশ দূরে কোথাও বেড়াবার পরিকল্পনা করা যাবে।

সেখান থেকে প্যারিস যাবো শুনে রাশিয়াতে বেশ কয়েকজন সাহেব বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো দু'এক মুহূর্ত। যেন চোখে মুখে একটা ঈর্ষার ভাব। কেউ কেউ মস্করা করে বলেছিল, প্যারিস যাচ্ছো, দেখো, হারিয়ে যেও না যেন! বী গুড!

মস্কো থেকে প্যারিসে উড়ে এসে দেখি সেখানে আগে থেকেই ভাস্কর বসে আছে, সঙ্গে তার এক বন্ধু মৃণাল চৌধুরী। এই মৃণাল বর্ধমানের এক জমিদার বাড়ির ছেলে, এখন লন্ডনপ্রবাসী; তার স্বভাবে একটুও জমিদারি মেজাজ নেই, অতি বিনীত, ভদ্র ও নির্ভরযোগ্য মানুষ।

প্রথম দু'দিন কাটলো কোথায় কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে, সেই আলোচনায়। অনেক ম্যাপ দেখা, অনেক জল্পনা। চারজনের এই দলটির দলপতি কে হবে, তা নিয়ে একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চললো ভাস্কর আর অসীমের মধ্যে। অসীম গাড়ি চালাবে, নেতৃত্বে তারই অধিকার, কিন্তু যে-কোনো পরিবেশে ভাস্কর তার ব্যক্তিত্ব জাহির করতেই অভ্যস্ত। দেশে থাকতে আমরা যখন ধলভূমগড় কিংবা চাইবাসার দিকে বেড়াতে গেছি, তখন ভাস্করই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলপতি হয়েছে। কিন্তু এখানে মুশকিল এই, ভাস্কর ফরাসী ভাষা একবর্ণ জানে না। ফ্রান্সের রাস্তাঘাট সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই।

অসীম নির্দেশ দিল বেরুতে হবে খুব ভোরবেলা, শেষ রাতে উঠে তৈরি হয়ে নিতে হবে সবাইকে। ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, কেন, অত তাড়া কিসের? আমরা প্লেন ধরতে যাচ্ছি না, কোথাও ঠিক সময়ে পৌঁছোবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। এসেছি আরাম করে বেড়াতে, হুড়োহুড়ি করতে যাবো কেন? ব্রেকফাস্ট ও তিন কাপ চা খেয়ে বেরুবো!

আমাদেরও সেরকমই ইচ্ছে, তাই প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেল অসীম।

অসীমের বাড়ির গেট ছাড়িয়ে গাড়িটা রাস্তায় পড়লো প্রায় দশটার সময়। চমৎকার রোদ্দুরে ধোওয়া দিন। এসব দেশে রোদ দেখলেই মন মেজাজ ভালো হয়ে যায়। আমি লক্ষ করেছি, রোদ্দুরের সঙ্গে আমার বেশ ভাব আছে, যখন যে-দেশে গেছি, রোদ পেয়েছি। এমনকি একবার সুইডেন গিয়েছিলাম অকটোবর মাসে, সবাই বলেছিল, ঐ সময় সুইডেনে সব সময় বৃষ্টি আর কুয়াশা, দিনের বেলাতেও রাস্তা দেখা যায় না, গাড়িগুলো ফগ লাইট জ্বেলে চলে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি প্রায় দিন দশেক স্টকহল্‌মে রইলাম, মাঝে মাঝে কয়েক পশলা বৃষ্টি ছাড়া আকাশ পরিষ্কার, দুপুরগুলো ঝকঝকে, সেখানকার অনেকেই বলেছে, এমন নাকি বহু বছর হয়নি। রোদ্দুরের সঙ্গে আমার এমনই বন্ধুত্ব যে দু' দুবার আমি চেরাপুঞ্জি গেছি, একবারও বৃষ্টি দেখিনি!

ঠিক হয়েছে যে, প্যারিস থেকে বেরিয়ে আমরা ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে নেমে যাবো। বড় রাস্তা না ধরে, ছোট ছোট রাস্তা দিয়ে যাবো গ্রামের পথে, রাত্তির হয়ে গেলে যে-জায়গাটা পছন্দ হবে, সেখানে কোনো হোটেলে উঠে পড়বো। দুপুরবেলা রুটি, মাখন, চিজ, সসেজ, পাতে, ওয়াইন আর কিছু ফল কিনে নিয়ে রাস্তার ধারেই কোনো গাছতলায় পিকনিক হবে। রাত্তিরবেলা কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়া হবে খাঁটি ফরাসী ডিনার।

পশ্চিম দেশগুলিতে গাড়ির ড্রাইভারদের তো বটেই, ড্রাইভারের পাশে যে বসে তাকেও সিট বেল্ট বাঁধতে হয়। আমি ঐ জন্য পারতপক্ষে সামনের সিটে বসি না। অভ্যেস নেই

বলেই সিট বেল্ট বাঁধলে কেমন যেন বন্দী বন্দী লাগে। আমি আগেভাগেই পেছনের দরজা খুলে উঠে বসেছিলাম, মৃণালও আমার সঙ্গে, ভাস্কর অসীমের পাশে। দূরপাল্লার যাত্রায় একজন ন্যাভিগেটর লাগে, ম্যাপ ছাড়া উপায় নেই। ভাস্কর কোলের ওপর একটা ম্যাপ খুলে বসেছে, বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে একটা চুরুট। সেটা জ্বালানো হয়নি। অসীম রায়ের গাড়িতে চাপতে গেলে কয়েকটা নিয়ম মানতে হয়। অসীম নিজে যদিও একজন স্মোকার, কিন্তু তার গাড়িতে চলন্ত অবস্থায় কেউ সিগারেট খেতে পারবে না। কোনো এক সময় তার গাড়িতে অতি হাওয়ার বেগে কারুর হাত থেকে সিগারেট ছিটকে গিয়ে পড়েছিল অন্য একজনের গায়ে। সেই থেকে তার গাড়িতে সিগারেট নিষিদ্ধ। ভাস্কর নিয়মিত ধূমপান করে না, কিন্তু কখনো কখনো ব্যক্তিত্ব বাড়াবার জন্য সে হাতে একটা জ্বলন্ত সিগার রাখতে ভালোবাসে।

খানিক দূর যাবার পর অসীম জিজ্ঞেস করলো, ভাস্কর, দ্যাখো তো ভাই, সাঁ শেরোঁ কোন্ দিকে?

ভাস্কর ঝুঁকে পড়ে ম্যাপ দেখতে লাগলো।

এক মিনিট যায়, দু' মিনিট যায়, ভাস্কর আর কোনো কথা বলে না।

অসীম অস্থির ভাবে বললো, কী হলো? সামনে ক্রশিং আসছে, কোন্ দিকে যাবো?

ভাস্কর বললো, সাশেঁরো, সাশেঁরো, কই ঐ নামে তো কোনো জায়গা দেখছি না!

অসীম নিজেই ম্যাপটা টেনে নিয়ে একটু দেখে বললো, এই তো। এটা কি?

ভাস্কর বললো, এটা আমি আগেই দেখেছি। কিন্তু এটা তো সেইন্ট চেরন।

অসীম বললো, এটা ইংল্যান্ড নয়। মনে রাখবে, সেন্ট ফরাসীতে হয় সাঁ, আর সি-এইচ-এর উচ্চারণ শ।

ভাস্কর বললো, আর যেখানে সেখানে একটা করে চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দিলেই হয়, তাই তো!

অসীম ভাস্করের দিকে করুণার চোখে তাকালো। যেন ভাস্কর একটি অবোধ শিশু! আরও খানিকটা বাদে অসীম আবার জিজ্ঞেস করলো, ভাস্কর, চট করে দেখো তো, শারত্র্ ডান দিকে, না বাঁ দিকে!

ভাস্কর আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে মানচিত্র দেখতে লাগলো। সম্পূর্ণ নিঃশব্দ।

অসীম তাড়া দিয়ে বললো, ম্যাপটা ভালো করে দ্যাখো। তোমাকে সামনে বসিয়েছি কী জন্য?

ভাস্কর বললো, দূর ছাই, এই ম্যাপে নেই, অন্য ম্যাপে আছে বোধহয়।

অসীম ম্যাপটা নিয়ে আঙুল দেখিয়ে বললো, এই যে এত বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, তাও দেখতে পাচ্ছো না!

ভাস্কর বললো, এটা তো দেখছি চারট্রেস!

অসীম বললো, একটু আগেই বললুম না, সি-এইচ হবে শ!

ভাস্কর বললো, শারট্রেস! কিন্তু তুমি যে জাঁ পল সার্ত্রর না কী যেন বললে!

অসীম বললো, ওঃ! এত বছর ইংলন্ডে রইলে ভাস্কর, সামান্য একটু ফরাসীও কি শেখোনি?

ভাস্কর উষ্মার সঙ্গে বললো, কী দুঃখে শিখতে যাবো? এ দেশে স্ট্রিট সাইনের কোনো মাথামুণ্ডু নেই, আগে থেকে কিছু বোঝা যায় না। এদেশের উচিত ইংল্যান্ডে গিয়ে শিখে আসা। আমাদের ওখানে যে-কোনো মোড়ের দশ মাইল আগে থেকে সব রাস্তা দেখিয়ে

দেয়, চোখ বুজে গাড়ি চালানো যায়। আর এদেশের ড্রাইভারগুলোও তো দেখছি গাড়লের মতন গাড়ি চালায়, কেউ কারুকে রাস্তা ছাড়ে না!

অসীম এ কথায় একটুও রাগ না করে হো-হো করে হেসে উঠে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাস্করকে খুব জব্দ করা গেছে, অ্যাঁ। এখানে গাড়ি থামিয়ে একটা বিড়ি খেয়ে নেওয়া যাক!

গাড়ি থামতেই ভাস্কর দরজা খুলে বললো, আমি পেছনে বসবো, মৃণাল ভালো ন্যাভিগেটর হতে পারবে!

পেছনের সিটে আসা মানেই নেতৃত্বপদ থেকে ভাস্করের পতন।

আধ ঘন্টাটাক মন-মরা হয়ে রইলো ভাস্কর। তারপর হঠাৎই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো তার ব্যক্তিত্ব। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাস্কর বললো, বাঃ, এই জায়গাটা বেশ সুন্দর তো! দারুণ সবুজ! অসীম, আমরা এখানেই কোথাও থেমে দুপুরের খাবার খাবো!

অসীম বললো, আর একটু এগিয়ে যাই, সামনে আরও ভালো জায়গা পাওয়া যাবে!

ভাস্কর বললো, এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখানে গাড়ি থামাও! ঐ তো সামনেই একটা খাবার-দাবারের দোকান আছে দেখতে পাচ্ছো না!

খানিকক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর অসীমকে মেনে নিতেই হলো, ভাস্করের জয় হলো।

জায়গাটা খুবই নিরিবিলি এবং সুন্দর। একটু দূরে মাঝারি ধরনের একটা সুপার মার্কেট, পাশে একটা পেট্রল পাম্প। পথে একটা জলাশয় দেখে এসেছি, এখান থেকে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গিয়ে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে পিকনিকে বসবো।

বাজার করার ভার ভাস্কর আর মৃণালের ওপর, ওরা চলে গেল দোকানে। অসীম পেট্রল পাম্পে গেল কিছু একটা দেখাতে। দলের মধ্যে আমিই বলতে গেলে নিষ্কর্মা।

এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য একটা কাফের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও আমি রাস্তার ধারে জায়গাটার নাম দেখে থমকে দাঁড়ালাম। জায়গাটার নাম লুদাঁ। লুদাঁ? এই নাম যে আমার খুব চেনা। এই নামে কি একাধিক জায়গা থাকতে পারে? আর একটা বড় রোড সাইনে দেখলাম, এই জেলার নাম পোয়াতিয়ে। আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। পোয়াতিয়ে জেলার লুদাঁ, এটাই তো মার্গারিটের গ্রাম! কী অদ্ভুত যোগাযোগ, এই লুদাঁ-তেই আমাদের গাড়ি থামলো!

সুপার মার্কেটের সামনে কিছু নারী-পুরুষ যাতায়াত করছে। ওদের মধ্যে মার্গারিট থাকতে পারে না? একজন মহিলা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলছেন, অনেকটা মার্গারিটের মতনই তো দেখতে! এখানে হঠাৎ মার্গারিটের দেখা পাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব?

পল এঙ্গেল দ্বিতীয়বার যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তিনি মার্গারিটের পুরো খবর প্রথমে কিছুতেই বলতে চাননি। একদিন আমি পল এঙ্গেলকে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে একটা বাংলা সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী', ইংরিজি সাব টাইট্‌ল ছিল। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, কিছুতেই সেই ফিল্‌মটা পুরো দেখানো গেল না। তখন কলকাতা শহরে লোডশেডিং নামে ব্যাপারটা সবে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছে, সিনেমা দেখতে দেখতে তিনবার আলো নিভলো ও জ্বললো, তারপর মাঝামাঝি জায়গায় এসে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে ঘুটঘুটে কালো রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম গড়িয়াহাট ব্রিজের

দিকে। এক সময় আমি ওঁর হাত চেপে ধরে বললাম, পল, সত্যি করে বলো তো, মার্গারিটের কী হয়েছে? যতই মর্মান্তিক হোক, আমি শুনতে চাই। তুমি বলো!

পল এঙ্গেল তবু খানিকটা দ্বিধা করে বললেন, আমি ঠিক জানি না, যতটা শুনেছি, খুবই দুঃখের ব্যাপার, তুমি তো জানো, মেয়েটি কত সরল ছিল! একদিন সন্ধেবেলা সে কোনো একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, এমন সময় তার পাশে একটা গাড়ি থামে। কয়েকজন কালো লোক ছিল সেই গাড়িতে, খুব সম্ভব নেশাগ্রস্ত। তারা মার্গারিটকে একটা ঠিকানার কথা জিজ্ঞেস করে, তারপর সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেবার জন্য মার্গারিটকে গাড়িতে তুলে নেয়। ঐ রকম অবস্থায় কোনো মেয়েরই অপরিচিতদের গাড়িতে ওঠা উচিত নয়! কিন্তু মার্গারিট ওদের বিশ্বাস করেছিল। ওরা সেই বিশ্বাসের মূল্য দেয়নি!

আমি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারপর?

পল এঙ্গেল বলেছিলেন, তারপর আর কিছু নেই। সেই থেকে মার্গারিট অদৃশ্য হয়ে যায়। ঐ লোকগুলি খুব সম্ভবত মেয়েটিকে···

আমি বললাম, কেন? এমন হতে পারে না, ওদের মধ্যে কোনো একজন নিগ্রোকে, মানে, কালো লোককে ওর পছন্দ হয়ে গেছে, তাকে বিয়ে করে মার্গারিট ওদের সঙ্গেই কোথাও আছে?

পল এঙ্গেল বললেন, সেটা খুবই আন্‌লাইকলি। কোনো শ্বেতাঙ্গ মেয়ের পক্ষে একজন কালো লোককে বিয়ে করা এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। আজকাল অনেকেই তো করে। সেরকম হলে ওরা গোপন রাখবে কেন? মার্গারিট তার বন্ধু-বান্ধবদের এটা নিশ্চয়ই জানাতো। না, সুনীল, আমার মনে হয়, সে আর নেই।

আমি তবু জোর দিয়ে বলেছিলাম, পুলিশ তার খোঁজ করেনি? পুলিশ কিছু জানতে পারেনি?

পল এঙ্গেল বললেন, পুলিশ অনেক তোলপাড় করেছে, খবরের কাগজে তিন চারদিন হৈ চৈ হয়েছে। কিন্তু মার্গারিটের শরীরটাও পাওয়া যায়নি। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে, বললাম না?

একটু থেমে পল এঙ্গেল বললেন, এসবই আমার শোনা কথা। আমার ভুলও হতে পারে।

এরকম দুঃসংবাদ কেউ ভুল শোনে না। তাছাড়া ঘটনাটা মার্গারিটের চরিত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমেরিকায় কালো মানুষরা নিপীড়িত ও নির্যাতিত বলে তাদের প্রতি মার্গারিটের বেশি বেশি সহানুভূতি ছিল, সে আগ বাড়িয়ে তাদের উপকার করতে যেত। কিন্তু তাদের মধ্যে মাতাল, গুণ্ডা, খুনীও তো কম নয়। শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের সর্বনাশ করতেও তারা অনেকে উৎসুক। আয়ওয়াতে আমার একদিনের ঘটনা মনে আছে। মার্গারিট তিনজন দৈত্যাকৃতি কালো মানুষকে নিয়ে এসেছিল। তারা রাস্তায় মার্গারিটকে কোনো একটা কফির দোকানের কথা জিজ্ঞেস করেছিল, মার্গারিট তাদের কফি খাওয়াতে চায়।

আমার স্পষ্ট মনে হয়েছিল, লোকগুলোর মতলব ভালো ছিল না, তাদের মুখে মদের গন্ধ, চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। তারা ভেবেছিল, মার্গারিট একা থাকে, ঘরের মধ্যে আমাকে বসে থাকতে দেখে তারা ঈষৎ বিচলিত হয়েছিল। আমাকে তারা মোটেই পছন্দ করেনি, আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি, ইচ্ছে করলে তারা সেদিন আমাকেও খুন করে রেখে যেতে পারতো।

মার্গারিট হারিয়ে গেছে, তার শরীরটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি?

ওরা সাধারণত তাই করে, কোনো চিহ্ন রাখতে চায় না। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে কোনো নোংরা ডোবার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এরকম বীভৎস কাণ্ড হয়েছিল বলেই কি মার্গারিটের বাবা-মা আমার চিঠির উত্তর দেননি? ওঁরাও কি আর বেঁচে আছেন এতদিন?

এমনও তো হতে পারে, মার্গারিটকে ওরা প্রাণে মারতে পারেনি, মার্গারিটের শরীর বিকৃত, বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। সেই জন্যই সে চেনাশুনো কারুর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেনি! তাহলে কি আমাকেও চিঠি লিখবে না? আমার সঙ্গে তো তার শরীরের সম্পর্ক ছিল না!

এই সেই লুদা! মার্গারিট বলেছিল, লুদা একটা গ্রাম, কিন্তু এখন আর তেমন গ্রাম বলে মনে হয় না। সুপার মার্কেট আছে, প্রচুর গাড়ি, তবে গাছপালাও প্রচুর। মার্গারিটদের বাড়ির ঠিকানাটাও মনে নেই, লিখেও আনিনি। মার্গারিটের চেহারা যতই বদলে যাক, আমি ঠিক চিনতে পারবো। তার কণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে বাজে। সুপার মার্কেটের সামনে যেখানে গাড়িগুলি পার্ক করা, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোনো মহিলাকেই মার্গারিটের মতন মনে হয় না, কেউ আমার দিকে তাকায় না। কারুকে গিয়ে মার্গারিট বিষয়ে প্রশ্ন করাটা বোধহয় অতি নাটকীয় হয়ে যাবে!

আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যেন একটা গাছ হয়ে যাচ্ছি। এই লুদা গ্রামে এক সময় মার্গারিট খেলা করতো, এখানেই সে বালিকা বয়েস থেকে কৈশোরে পৌঁছেছিল। সামনের দিকে একটা চার্চের পাশ দিয়ে ছোট রাস্তা চলে গেছে, এই রাস্তা দিয়ে সে হেঁটেছে বহুবার। এখানকার মেয়ে হয়ে সে কবিতা ও কবিদের এত ভালোবাসতে শিখলো কী করে? সব সময় সে একটা শিল্পের ঘোরের মধ্যে থাকতো, বাস্তবজ্ঞান ছিল না একেবারেই। এ রকম একটা নিষ্পাপ মেয়েকে এই পৃথিবী বাঁচতে দিল না? সত্যিই মার্গারিট একেবারে হারিয়ে গেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তার শরীরটা আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এখানে অন্য যে-সব তরুণীদের দেখছি, তারা কেমন যেন সদা ব্যস্ত, সংসারী ধরনের। কেউ কেউ বেশ রূপসী, কিন্তু কারুকেই মার্গারিটের মতন কাব্য-পাগল মনে হয় না! হঠাৎ কোনো গাড়ির আড়াল থেকে মার্গারিট এসে আমার সামনে দাঁড়ালো, মেঘলা রাতের জ্যোৎস্নার মতন হাসলো, পৃথিবীতে এমন মিরাক্‌ল কি ঘটতে পারে না?

পেছন থেকে ভাস্কর এসে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার ঘোর ভাঙালো।

ভাস্কর মার্গারিটের প্রসঙ্গ কিছুটা জানতো। অসীমকে সংক্ষেপে জানালাম।

ভাস্কর বললো, ওদের পদবী ছিল ম্যাতিউ, চলো, লোকদের জিজ্ঞেস করে ম্যাতিউদের বাড়িতে একবার খোঁজ নেওয়া যাক।

অসীম এর ঘোর বিরুদ্ধে। কুড়ি বছর পরে কোনো মহিলার খোঁজ করতে হঠাৎ তাদের বাড়িতে যাওয়া যায় না। অসীমের দৃঢ় ধারণা, সে মেয়েটি বেঁচে থাকতে পারে না। যদি কোনোক্রমে সে বেঁচেও থাকে, তা হলেও এতগুলো বছর সে যখন কোনো যোগাযোগ রাখেনি, তখন জোর করে তার সন্ধান করতে যাওয়াও অসভ্যতা!

ভাস্কর তবু বললো, মেয়েটার বাড়ি অন্তত দেখে আসতে দোষ কী?

ভাস্কর এগিয়ে গিয়ে একজন বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞেস করলো, এখানে ম্যাতিউ পরিবারের বাড়িটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?

বৃদ্ধটি সাদা চোখে তাকিয়ে রইলেন। ভাস্করের ইংরিজি এক বর্ণ বুঝতে পারেননি।

অসীম বললো, এটা কি একটা পশ্চিমবাংলার গণ্ডগ্রাম? ঠিকানা ছাড়া বাড়ি খোঁজা যায়?

ভাস্কর তবু ছাড়বে না। পেট্রোল পাম্পে গিয়ে টেলিফোন গাইড দেখলো। লুদা একটা গ্রাম হলেও এখানে প্রত্যেক বাড়িতে ফোন আছে, গাইডে দেখা গেল ম্যাতিউ নামে দশ-এগারো জন। তাদের বিভিন্ন ঠিকানা।

অসীম বললো, এখন কি এদের প্রত্যেকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে একটি মেয়ের খোঁজ করা যায়? বিশেষত, মেয়েটি যদি বহুকাল আগে হারিয়ে গিয়ে থাকে—

আমার দিকে তাকিয়ে অসীম বললো, মার্গারিট হঠাৎ তোমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করেছিল, এটা অস্বাভাবিক, অন্তত ক্রিসমাস কার্ড পাঠাতেই, নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে—

আমি চুপ করে রইলাম। যদি ঠিকানা খুঁজে পাওয়াও যায়, তবু মার্গারিটের বাবা-মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না।

অসীম জোর দিয়ে বললো, আমরা এখানে থাকবো না। এখানে বসে থাকলে সুনীলের আরও মন খারাপ হবে। চলো ভাস্কর, আমরা আরও এগিয়ে যাই!

১৯

"আমি দাঁড়িয়ে আছি এই নারীসুলভ ভূমিদৃশ্যের সামনে
যেন আগুনের সামনে একটি বালক
ঠোঁটে অস্পষ্ট হাস্য চোখে অশ্রুবিন্দু
এই দৃশ্যের সামনে আয়না ঝাপসা হয়ে যায়,
আয়না ঝকঝক করে, প্রতিফলিত হয় দু'টি নগ্ন শরীর
এক ঋতুর প্রতি অন্য ঋতু"

—পল এলুয়ার

শহর দিয়ে কোনো দেশকে প্রকৃতভাবে চেনা যায় না। খুব বড় কোনো শহর কিংবা রাজধানী সেই দেশের মস্তিষ্ক ঠিকই, তাতে অনেকরকম বাহার থাকে বটে, আবার শিরঃপীড়াও কম থাকে না। প্রত্যেক বড় শহরই তার ভেতরে ভেতরে কিছু ক্ষত লুকিয়ে রাখে। কোথাও বেশি, কোথাও কম। কলকাতায় অনেক বস্তি-টস্তি আছে, তা বলে লন্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্ক-প্রাগ-মস্কো-বেইজিং-এ বস্তি-ব্যারাক-বেশ্যালয় একেবারে নেই, তাও তো নয়!

আমরা ঠিক করেছিলাম, ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলই বেশি করে দেখবো। রাত কাটাবো ছোট্ট কোনো সরাইখানায়। বাঁধা পথে যাবো না। আজকাল উন্নত দেশগুলির উন্নতির প্রধান চিহ্ন হচ্ছে রাস্তা। সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য রাস্তা এবং কোথাও একটুও ভাঙাচুরো নয়। ব্যস্ত মানুষদের জন্য আছে সুপার হাইওয়ে কিংবা অটো রুট, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, এবং সেই সব রাস্তায় পড়লেই বোঝা যায়, প্রতিদিন এই বহু ব্যবহৃত পথের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষের নজর আছে। অবশ্য সেজন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পয়সাও নেওয়া হয় যথেষ্ট।

অটো রুটিগুলি যে-হেতু জনবসতি এড়িয়ে চলে, তাই দৃশ্য হিসেবে একঘেয়ে। আমার ভালো লাগে না। আমাদের কোথাও পৌঁছোবার তাড়াহুড়ো ছিল না বলে আমরা গ্রাম্য পথ ধরেছিলাম। গ্রামের রাস্তা দেখলেই বোঝা যায় একটা দেশের প্রকৃত শক্তি কতখানি। এই সব দেশে এমন একটা গ্রামও নেই, যেখানে গাড়ি করে পৌঁছোনো যায় না। গ্রামকে বঞ্চিত করে এরা এখন আর শহরের মাথা ভারি করে না, বরং শহরের অনেক সুযোগ-সুবিধে এরা গ্রামের দ্বারপ্রান্তে এনে দেয়।

ছোট রাস্তা মানেই একটু ঘোরা পথ। তাতেও ক্ষতি নেই, আমরা মোটামুটি মানচিত্র ধরে নেমে যাচ্ছি নিচের দিকে। পোয়াতিয়ে ছাড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এক সময় নেমে এলাম সমুদ্রের ধারে। সমুদ্র মানে আটলান্টিকের ব্যাক ওয়াটার। ম্যাপে দেশের মধ্যে ঢুকে পড়া এক চিলতে নীল রেখা দেখালেও প্রকৃতপক্ষে সামনে এলে সমুদ্র বলেই মনে হয়। আকাশ

ও জলের রং একই রকম নীল, পরপার দেখা যায় না। এখানে গাড়িসুদ্ধ ফেরিতে পার হতে হবে। আর কী সুন্দর দিনটা। জাহাজের ডেকে দু'টি ছেলে তাদের গায়ের জামা খুলে রোদ পোহাতে লাগলো। সাহেবরা যেমন ঘরের মধ্যেও গলা-টেপা টাই পরে থাকে, তেমনি লোকজনের সামনেও খালি গা হতে এদের দ্বিধা নেই। যুবক দু'টির স্বাস্থ্য এমন চমৎকার যে তাদের তরুণ দেবতার মতো মনে হয়! কেন দেবতার মতন মনে হলো? আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম! আমাদের সব দেব-দেবীরাই খুব ফর্সা! বহুকাল ধরে আমাদের পুরাণ, ধর্মগ্রন্থগুলিতে এরকমই বর্ণনা দেওয়া আছে। মানুষ তার ভগবান কিংবা ঠাকুর-দেবতাদের তো নিজের আদলেই গড়েছে, তা হলে ভারতীয়দের মতন চেহারার কেউ দেবতা হতে পারবে না কেন? কালো মানুষদের জন্য কালো ঈশ্বর নেই?

জিরঁদ প্রণালী পেরিয়ে খানিকটা নামলেই বোরদো শহর।

যারা দ্রাক্ষা-আসব রসিক, তাদের কানে বোরদো নামটা শোনালেই চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটবে। বোরদো'র ওয়াইন ভুবনবিখ্যাত। তাছাড়া বোরদো শহরের খ্যাতির অনেক কারণ আছে।

ভাস্কর ব্রিটিশ নাগরিক, অসীম ফরাসী। বহু শতাব্দী ধরে ফরাসী-ইংরেজদের ঝগড়া এখনও তলায় তলায় রয়ে গেছে, ক্ষণে ক্ষণে শ্লেষ-বিদ্রূপ ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। আমাদের এই দুই বাঙালী বন্ধুও এক এক সময় ব্রিটিশ ও ফরাসী হয়ে যায়।

বোরদো শহরটি বড়োই সুশ্রী। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে গারোন্ নদী, শহরের মধ্যে বড় বড় উদ্যান, ক্যাথিড্রাল এবং একটি বিখ্যাত বেল টাওয়ার।

নানারকম মূর্তি-শোভিত একটি বিশাল ফোয়ারার কাছে আমরা মধ্যাহ্নভোজে বসেছি, এমন সময় ভাস্কর বললো, এই শহরটাকে বেশ সুপুরুষ দেখতে। ইংরেজরা বানিয়েছে তো!

অসীম সঙ্গে সঙ্গে বললো, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ভাস্কর? খোদ ব্রিটেনে এত সুন্দর শহর একটাও আছে যে ফ্রান্সে এসে এমন গড়বে ইংরেজরা?

ভাস্কর বললো, বোরদো একসময় ইংরেজদের সম্পত্তি ছিল না? রাজা দ্বিতীয় হেনরি এটা বিয়ের যৌতুক হিসেবে পায়নি? দ্বিতীয় রিচার্ডের জন্ম হয়েছিল এই শহরে। তুমি ইতিহাসের কিস্যু জানো না!

অসীম বললো, ওসব ইস্কুলের ইতিহাস সবাই জানে। এই জায়গাটা ইংরেজদের ছিল সে কতকাল আগে! এটা একসময় ছিল রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে, তারপর ইংরেজরা কিছুদিন রাজত্ব করে গেছে, কিন্তু ফিফ্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরিতে ফরাসীরা এটা আবার জিতে নেয়। এই যে এখানকার এত বড় বড় সব বাড়িঘর, আর বাগান দেখছো, এগুলো সব ফরাসী আমলে তৈরি। বোরদো ফ্রান্সের খুব বড় একটা ব্যবসার কেন্দ্র।

ভাস্কর বললো, ইংরেজরাই এই জায়গাটাকে সভ্য করে দিয়ে গেছে। আগে এরা ব্যবসা-বাণিজ্যেরও কিস্যু জানতো না।

আমিই বা এখানে একটু বিদ্যে ফলাতে ছাড়ি কেন? গাড়ি চলবার সময় আমার যে-হেতু কোনো কাজ নেই। তাই আমি জায়গাগুলোর কিছু কিছু তথ্য-বিবরণ ও ইতিহাস পড়ে নিই। আমি বললাম, আসলে এই চমৎকার শহরটার উন্নতির মূলে আছে আফ্রিকা।

ওরা অবাক হয়ে তাকাতেই আমি আবার বললাম, এই সব বড় বড় গীর্জা-ক্যাথিড্রাল ও স্তম্ভওয়ালা বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে কালো মানুষদের টাকায়। ইংরেজরা শোষণ করেছে ভারতবর্ষ আর এরা শোষণ করেছে আফ্রিকা। এই বোরদো'র বিশেষ সমৃদ্ধি হয়েছিল দু'শো

বছর আগে, তখন এরা আফ্রিকা থেকে মানুষ ধরে এনে চালান দিত ওয়েস্ট ইন্ডিজে। তাছাড়াও আফ্রিকা থেকে আনতো চিনি আর কফি। আর সেখানে এরা বিক্রি করতো মদ আর বন্দুক। একেই বলা হতো 'ত্রিকোণ ব্যবসা'।

অসীম আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো।

বোরদো শহর ছাড়িয়ে আমরা যেতে লাগলাম ক্রোশের পর ক্রোশ আঙুর খেতের পাশ দিয়ে। এখানকার জমির দাম নাকি সোনার টুকরোর সমান। যতদূর চোখ যায়, শুধু আঙুর গাছ, সেগুলি বুক সমান উঁচু মাচার ওপর তুলে দেওয়া। লাল ও সাদা আঙুর ফলে আছে। আমাদের দেশ হলে নিশ্চিত চতুর্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করতে হতো, কিন্তু এখানে কোথাও জন-মনুষ্য নেই, কাঁটা তারের বেড়া নেই। গাড়ি থামিয়ে নেমে আমরা এক জায়গায় বেশ কিছু আঙুর তুললাম, শিকারী কুকুর নিয়ে কেউ বন্দুক হাতে তেড়ে এলো না।

অসীম বললো, শুধু আঙুরের তো দাম বেশি নয়, ওয়াইন তৈরি হবার পর মূল্য হয়। এমনি খাবার জন্য কেউ কয়েক থোকা আঙুর তুললে এরা গ্রাহ্য করে না।

আঙুর খেতের সামনে লাল লাল ফুল দেখে আমার প্রথমে ধারণা হয়েছিল, ঐ বুঝি আঙুরের ফুল। তা নয়, ওগুলো এক ধরনের গোলাপ, সামনের দিকে দু'এক সারি ঐ গাছ লাগিয়ে রেখেছে খুব সম্ভবত শোভা বৃদ্ধির জন্য। হয়তো অন্য কারণও থাকতে পারে, কিন্তু খেতগুলোর সামনের দিকে ফুলের পাড় দেখতে চমৎকার লাগে। এ দেশের চাষীদেরও সৌন্দর্য বোধ আছে।

প্রথম রাত কাটাবার জন্য আমরা উঠলাম একটা ছোট্ট হোটেলে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তেই দু'টো-তিনটে করে হোটেল। এত হোটেল, তবু জায়গা পাওয়া সহজ নয়। সন্ধের পর হোটেলের সন্ধানে আমাদের গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়, অনেক হোটেলের সামনেই লেখা আছে সব ঘর ভর্তি। কোনো হোটেলে ঘর খালি থাকলেও পরিবেশটা আমাদের পছন্দ হওয়া দরকার, একেবারে জনবসতির মাঝখানে আমরা থাকতে চাই না।

হোটেলগুলির ভাড়া কিন্তু বেশি নয়। মাথা পিছু ষাট-সত্তর টাকা পড়ে। হোটেল মালিকদের সঙ্গে দরাদরি করার খুবই ইচ্ছে ভাস্করের, কিন্তু তারা ইংরিজি না বুঝলে ভাস্কর খুবই নিরাশ হয়ে যায়। কেউ কেউ ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে এবং টুরিস্টদের কাছে সেই ইংরিজি জ্ঞান জাহির করতেও চায়। অসীম এত বছর এদেশে আছে, তার ধারণা, হোটেলের ভাড়া একেবারে নির্দিষ্ট, এখানে দরাদরি করার প্রশ্নই নেই, কিন্তু ভাস্কর ইংরিজি বলার একটু সুযোগ পেলে কিছুতেই ছাড়ে না। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, হোটেলের মালিকের সঙ্গে দু'মিনিটের আলাপে গলাগলি বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে দশ-কুড়ি টাকা ভাড়া কমিয়েও ফেলে।

অধিকাংশ হোটেলেই খাবারের ব্যবস্থা নেই। গাড়ি পার্ক করে, পোশাক বদলে আমরা রাত্তিরবেলা হেঁটে হেঁটে রেস্তোরাঁ খুঁজতে যাই। সত্যিকারের গ্রাম, কিন্তু একটাও খোলার চালের বাড়ি কিংবা ভাঙা বাড়ি চোখে পড়ে না। দোকানগুলি জিনিসপত্রে ঠাসা। তবে রেস্তোরাঁয় ঢুকলে যে-সব পুরুষদের দেখা যায়, তারা অধিকাংশই ইতালিয়ান কিংবা গ্রীক। ঐসব গরিব দেশ থেকে শ্রমিকরা এখানকার গ্রামের খেতে-কল-কারখানায় কাজ করতে আসে, ফরাসী তরুণরা উন্নত কাজের আশায় শহরে চলে যায়।

ভাস্কর আর অসীমের মতন দুই ব্যক্তিত্বের এক ঘরে স্থান হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া নাক ডাকার একটা সমস্যা আছে। দু'টি ঘরের একটিতে থাকে অসীম আর মৃণাল, অন্যটিতে ভাস্কর ও আমি। ভাস্করের বেশি রাত জাগা স্বভাব, অসীম সারাদিন গাড়ি চালায় বলে পরিশ্রান্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে চায়। ভাস্কর আর মৃণাল দু'জনেই গাড়ি

চালানোতে দক্ষ, কিন্তু অসীম ওদের হাতে কিছুতেই নিজের গাড়ি ছাড়বে না। কারণ ওরা ইংরিজি মতে গাড়ি চালায়, ফরাসী মতটা তার ঠিক উল্টো। ফরাসী গাড়ির স্টিয়ারিং বাঁ-দিকে, ইংরিজি গাড়ির ডান-দিকে। বস্তুত রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ শুধু ব্রিটেন, ভারত আর দু'চারটে কলোনিতে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

ভাস্করের সঙ্গে আমার অনেক রাত পর্যন্ত গল্প চলে।

প্রথম রাতে ভাস্কর একসময় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে, ঐ লুর্দ গ্রামের মার্গারিট নামে মেয়েটার সঙ্গে তোর যদি সত্যিই দেখা হয়ে যেত, তা হলে তুই কী করতিস?

আমি চুপ করে রইলাম।

ভাস্কর আবার বললো, মেয়েটা তোকে এত ভালোবাসতো, সে বেঁচে থাকলে তোর সঙ্গে হঠাৎ সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেবে কেন? মেয়েটার সব কথা শুনে মনে হয়, এরকম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি তবু চুপ করে রইলাম।

ভাস্কর বললো, এই পৃথিবীটা এত খারাপ হয়ে গেছে যে, যারা সত্যিকারের ভালো, তাদের যেন জায়গা নেই। আমাদের মতন তেয়েঁটে লোকরাই শুধু এখানে টিকে থাকতে পারে। মার্গারিটের জন্যই তুই ফ্রান্স এত ভালোবাসিস, তাই না?

এবার আমি হেসে বললাম, আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সাঁওতাল পরগনা।

পরের রাতটা আমরা কাটালাম লাস্কো-র কাছে এক গ্রামের মধ্যে। এবার কোনো হোটেলেও নয়, এক চাষীর বাড়িতে।

দরদোন উপত্যকা পেরিয়ে আমরা পৌঁছোলাম লাস্কো-তে। এই অঞ্চলের প্রকৃতি দেখলে রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় জাগে। দরদোন-এর এমন সুবিশাল ও গভীর গিরিখাদ আমি আগে বা পরে কখনো দেখিনি। আর লাস্কো, এখানে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র। বেশিদিন আগের কথা নয়, মাত্র এই ১৯৪০ সালে আদিম মানুষদের এই চিত্রসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড় ও জঙ্গল এলাকা, চারটে ছেলে এখানে তাদের একটা হারানো কুকুর খুঁজতে খুঁজতে লাস্কো'র গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সন্ধের পর আমরা পৌঁছোলাম সেই অঞ্চলে। পরদিন গুহা দেখা হবে, আগে রাত্তিরের মতন থাকার ব্যবস্থা করা দরকার। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে উৎসাহী লোকেরা লাস্কো'র গুহাচিত্র দেখতে আসে বলে এখানে নানারকম হোটেল আছে। রাস্তার ধারে ধারে গাছের গায়ে টাঙানো বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, কোনো কোনো চাষীর বাড়িতেও রাত্রির শয্যা ও সকালের জলখাবারের ব্যবস্থা আছে।

আমিই বেশি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, হোটেলের বদলে চাষীর বাড়িতে থাকবো। ওদের জীবন-যাপনটাও খানিকটা দেখা হবে। আমার এই প্রস্তাবে অসীম প্রথমে রাজি হতে চায়নি, কারণ মূল রাস্তা ছেড়ে অনেকটা ভেতরে যেতে হবে, লাস্কো গুহা দেখতে হলে যাওয়া-আসায় পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার বেশি লেগে যাবে। অনেক পীড়াপীড়িতে অসীম গাড়ি ঘোরাতে রাজি হলো বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রাত্রিবাসে আমাদের হর্ষ-বিষাদ মিশ্রিত এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

চাষীর বাড়িটি দোতলা, পাথরের। কাছাকাছি হাঁস-মুর্গী রাখার জায়গা আর গরুর গোয়াল। সবই বেশ পরিচ্ছন্ন। বেল বাজাতে দরজা খুললেন এক মধ্যবয়স্কা মহিলা। চাষীর বউ বললে আমাদের মনে যে ছবি ফোটে তার সঙ্গে কোনো মিল নেই, বেশ ঝলমলে স্কার্ট পরা, এবং এখনও তাঁকে বেশ রূপসীই বলা যায়, মুখখানায় ভালো মানুষের ছাপ আছে,

হাসিটি সহৃদয়। ইনি একবর্ণ ইংরিজি জানেন না, সুতরাং অসীমকেই কথাবার্তার ভার নিতে হলো।

এঁদের বাড়িতে এঁরা গোটা চারেক ঘর রেখেছেন সারা বছরই ভাড়া দেবার জন্য। জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, তাছাড়া ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, তাই খদ্দেরও ঠিক জোটে। এখন ঠিক দু'টি ঘর খালি আছে। আমরা দোতলায় উঠে দেখলাম, ঘরগুলো সাধারণ হোটেলের চেয়েও অনেক ভালো সাজানো, বিরাট বিরাট খাট, পরিষ্কার শয্যা, সিল্কের ওয়াড় দেওয়া লেপ। ভাড়া কিন্তু হোটেলের চেয়ে কম। সকালবেলা এই মহিলাই আমাদের চা ও ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দেবেন, তার জন্য অতিরিক্ত কিছু লাগবে না। আমরা সবাই চোখে চোখে সম্মতি জানালাম।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ভাস্কর আর পারলো না। মহিলার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আই অ্যাম ভাস্কর ডাট্। কামিং ফ্রম লন্ডন। ভেরি প্লিজ্‌ড টু মীট ইউ!

মহিলাটি হাসি মুখে বললেন, জ্য ন পার্ল পা অংলে! ইংরিজি জানি না। লন্ডনে কখনো যাইনি। আমার নাম ওদেৎ। আমার স্বামী দোকানপাট করতে গেছে, একটু বাদেই ফিরবে।

ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও মহিলার সঙ্গে ভাস্করের ভাব জমে গেল। তিনি আমাদের কফি তৈরি করে খাওয়ালেন, এটা হিসেবের বাইরে। আগামীকাল সকালে উনি নিজেদের পালিত মুর্গীর ডিম খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এসব দেশে ফার্ম এগ্‌স রীতিমতন বিলাসিতার দ্রব্য।

গোলাবাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছিল, র‍্যাঁবোর মা, ভাই-বোনেরা যে বাড়িতে থাকতো, সেটাও কি এরকমই দেখতে ছিল? সেই বাড়িটাও কি ছিল দোতলা? এই চাষীদের অবস্থা বেশ সচ্ছলই তো মনে হয়। আমেরিকার চাষাদের দেখেছি বিরাট ধনী। সেদেশে ক্ষুদ্র চাষী নেই-ই বলতে গেলে। আমি দেখিনি একটিও। আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষী মাত্র দশ-পনেরো বিঘে জমি চাষ করে, তাও সেচের জল পায় না, প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা অনেকখানি। এক একটি মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য দু'পাঁচ বিঘে বিক্রি করে দিতে হয়। ফলে তারা দিন দিন দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে নেমে যায়।

হাত-মুখ ধুয়ে নৈশভোজের জন্য রেস্তোরাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার পর অসীম বললো, এই লাম্বো জায়গাটা শুধু গুহাচিত্রের জন্যই বিখ্যাত নয়, একটা বিশেষ খাবারের জন্যও এই জায়গাটার খুব নাম আছে। তবে খাবারটা খুব দামী।

ভাস্কর বললো, যতই দাম হোক, স্থানীয় ভালো খাবার আর ভালো ওয়াইন খেতেই হবে। জিনিসটা কী?

অসীম বললো, ফোয়া গ্রা। তোমরা নাম শোনোনি?

আমরা তিনজনেই মাথা ঝাঁকালাম দু'দিকে। ভাস্কর বললো, কী রে, সুনীল, তুই তো একটু-আধটু ফ্রেঞ্চ জানিস, তুইও শুনিসনি? তোর বান্ধবী মার্গারিট তোকে এই ফোয়া মোয়া কী বলছে অসীম, সেটা খাওয়ায়নি?

আমি বললাম, আমরা সেবার যখন প্যারিসে এসেছিলাম, আমাদের পয়সা খুবই কম ছিল, দামী খাবারের কথা চিন্তাও করিনি।

অসীম আমাদের ফোয়া গ্রা মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিল। তৈরির প্রক্রিয়াটি অতি নিষ্ঠুর ধরনের। এক ধরনের খয়েরি রঙের বড় বড় রাজহাঁসকে কয়েক দিন ধরে জোর করে খাবার খাওয়ানো হয়। তার ঠোঁট ফাঁক করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে শস্যের দানা। জোর করে গিলতে

গিলতে একসময় হাঁসটার মুমূর্ষু দশা হয়। তখন তার পেট চিরে বার করে নেওয়া হয় শুধু লিভারটা। সেই লিভারটুকুই ঐ বিশেষ খাদ্য, হাঁসের মাংসটা নয়। একটা হাঁসের লিভার আর কতটুকু, সেই জন্য ফোয়া গ্রা বানাবার জন্য অনেক হাঁস মারতে হয়।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ছবির মতন সুশ্রী, নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম আমরা। প্রথমেই অর্ডার দেওয়া হলো ফোয়া গ্রা আর বোরদো-র হোয়াইট ওয়াইন। ফোয়া গ্রা দিয়ে গেল নাপ্‌তে বাটির মতন ছোট্ট পোর্সিলিনের বাটিতে, দেখতে অনেকটা মাখনের মতন। পাতলা পাঁউরুটির টোস্টের ওপর ছোট ছোট টুকরোতে মাখিয়ে খেতে হয়। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে প্রথমবার মুখে দিলাম।

অনেক বিখ্যাত খাদ্যই প্রথমবার মুখে দিয়ে মনে হয়, দূর ছাই, এ আর এমন কী! এমন আমার হয়েছিল কাভিয়ের খেয়ে। আমি জীবনে প্রথম কাভিয়ের খাই লন্ডনে। কাস্পিয়ান হ্রদের স্টার্জন মাছের এই ডিমও পৃথিবীতে অতি দুর্মূল্য খাদ্য। প্রথমবার খেয়ে আমার মনে হয়েছিল, এর এত দাম? এর চেয়ে আমাদের ইলিশের ডিম অনেক ভালো। পরে রাশিয়াতে গিয়ে আমি আবার বেশ কয়েকবার কাভিয়ের খেয়ে তার টেস্ট অ্যাকোয়ার করেছিলাম। প্রথম বার শ্যাম্পেইন কিংবা রয়াল স্যালিউট আস্বাদ করেও আমাকে হতাশ হতে হয়েছিল।

কিন্তু ফোয়া গ্রা প্রথম মুখে দিয়েই মনে হলো, এমন সুস্বাদু দ্রব্য আগে কখনো খাইনি। মুখের মধ্যে যেন একটা আনন্দের উপলব্ধি ছড়িয়ে যায়।

ঐটুকু খাবার পাঁচ মিনিটে শেষ। ভাস্কর বললো, মুখে দিতে দিতেই যে মিলিয়ে গেল, অসীম, আবার অর্ডার দাও! আমি সব দাম দেবো!

ওদেশে ওদের সুবিধে এই, পকেটে টাকা-কড়ি কম থাকলেও অসুবিধে নেই। যে-কোনো জায়গায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যায়। গ্রামের রেস্তোরাঁও সেই সব কার্ড মান্য করে।

অসীম বললো, দামের জন্য নয়, বেশি ফোয়া গ্রা খেলে পেট গরম হতে পারে শুনেছি!

ভাস্কর বললো, গুলি মারো পেট গরম! আগে তো প্রাণ ঠাণ্ডা হোক।

আবার এলো ফোয়া গ্রা। সেই সঙ্গে হোয়াইট ওয়াইন তো থাকবেই। এখানকার ওয়েটাররা এমন চালু যে কিছু একটা খাবারের অর্ডার দিলে অমনি জিজ্ঞেস করে, কী ওয়াইন দেবো? যেন, সঙ্গে ওয়াইন পান না করাটা একটা বর্বরতা।

প্রায় ঘন্টা দু'এক ধরে আমরা ডিনার খেলাম। পেট গরম কিংবা মাথা গরম হলো কিনা জানি না, মেজাজটা খুব ফুরফুরে হয়ে গেল। আকাশ ভরে গেছে জ্যোৎস্নায়। রেস্তোরাঁর মধ্যে অন্য আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই মিলে গান গাইতে গাইতে ফিরলাম সেই চাষীর বাড়ির দিকে।

২০

রাত্রি তুমি পবিত্র, রাত্রি তুমি পরিব্যাপ্ত, রাত্রি তুমি সুন্দর
বিশাল আস্তরাখায় ঢাকা রাত্রি
রাত্রি তোমায় ভালোবাসি, তোমায় সাদর সম্ভাষণ জানাই,
তোমায় গৌরবোজ্জ্বল করি,
তুমিই আমার জ্যোৎস্না কন্যা এবং আমার সৃষ্টি
হে রূপসী রাত, বিশাল আস্তরাখায় ঢাকা রাত
তারকা সজ্জিত আস্তরাখায় ঢাকা আমার কন্যা
তুমি ফিরিয়ে আনো আমার মনে, ফিরিয়ে আনো
সেই উদার নিস্তব্ধতা, আমার অকৃতজ্ঞতার বন্যাধার
ধুয়ে দেবার আগে, যা এখানেই ছিল ছড়িয়ে····

—শার্ল পেদি

এক একটা রাতে জ্যোৎস্নাকে মনে হয় তরল, কিংবা সাবানের ফেনার মতন, গায়ে লেগে যায়। এক একটা রাতে বাতাস হয়ে যায় মখমলের মতন। এক একটা রাতে আকাশের নীচে অনেকক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করে।

আমরা ফিরে এসে দেখি চাষী পরিবার তখন খেতে বসেছে। এই সব দেশে নৈশ ভোজ সচ্ছে সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে তার ব্যতিক্রম। আমাদেরও তারা খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ জানালো।

কর্তা ও গৃহিণী ছাড়া অন্য গ্রাম থেকে এসেছে তাদের মেয়ে-জামাই এবং একটি উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণী। এঁদের মধ্যে জামাইটিই একটু একটু ইংরিজি জানে, আমাদের দলের ফরাসী-ভাষী একমাত্র অসীম। তবু সকলে মিলে গল্প জমে গেল। ওরা আমাদের অনুরোধ করলো নিজেদের বাড়ির তৈরি ওয়াইন পান করার জন্য, ভাস্করও নিজের স্টকের পানীয় দিল ওদের।

ওরা আগে কোনো হিন্দু (অর্থাৎ ভারতীয়) দেখেনি এত কাছ থেকে, ভারত সম্পর্কে ওদের জ্ঞানের বহর যৎসামান্য বললেও বেশি বলা হয়। আমাদের দলের দু'জন লন্ডন প্রবাসী শুনে ওরা বেশ মুগ্ধ, লন্ডন সম্পর্কে এদের বেশ একটা মোহ আছে মনে হলো। এদের মধ্যে ঐ জামাইটি ছাড়া আর কেউ লন্ডন দেখেনি।

বেশ সরল সাদা-সিধে মানুষগুলি, এরা প্রাণ খুলে হাসতে জানে। ভাস্কর এক বিন্দু ফরাসী না জেনেও জমিয়ে তুললো। আমরা অতদূরের ভারতবর্ষ থেকে লাস্কোর গুহাচিত্র দেখতে এসেছি শুনে ওদের বিস্ময় আর কাটে না। আমাদের অজন্তা কিংবা ভীম ভেটকার নামও ওরা শোনেনি।

পরিবারের কর্তাটি এক সময় উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা পাথর এনে বললো, এটা দ্যাখো, খুব মূল্যবান জিনিস।

সেটা তিন নম্বর ফুটবলের সাইজের একটা পাথরের টুকরো, তার একদিকে সামান্য একটা মুখের আদল।

জামাইটি বললো, এখানে অনেক জমি খুঁড়ে এখনো প্রাগৈতিহাসিক পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও মূর্তি পাওয়া যায়। এটা এ বাড়ির চাষের জমিতেই পাওয়া গেছে। এরকম গোটা তিনেক।

কর্তাটি বললো, তোমাদের যদি খুব আগ্রহ থাকে, তোমাদের দিতে পারি। এই মূর্তিটা চালকোলিথিক পিরিয়ডের।

ভাস্কর পাথরটা হাতে নিয়ে বললো, বাঃ, ভারি সুন্দর জিনিস তো। সত্যি আমাদের দেবে ?

কর্তাটি বললো, হ্যাঁ, নাও না। মাত্র পাঁচ হাজার ফ্র্যাংক পেলেই আমি সন্তুষ্ট হবো।

চাষী বউটি তার মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি করলো। তারপর আমাকে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। কায়রো থেকে উটের পিঠে চেপে মরুভূমির মধ্যে পিরামিড দেখতে গিয়েছিলাম। একটা পিরামিডের ভগ্নস্তূপ থেকে একজন সান গ্লাস পরা লোক বেরিয়ে এসে ফিসফিস করে আমাকে বলেছিল, তোমাকে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো এক ফারাও-এর একটা মূর্তি দিতে পারি। খুব গোপনে নিয়ে যেতে হবে। এ দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারলেই এর অনেক দাম।

আমি হাতে নিয়ে দেখলাম। একটা এক বিঘৎ লম্বা পাথরের মূর্তি। সেটার বয়েস পাঁচ হাজার বছর নয়, খুব বেশি হলে পাঁচ মাস। কোনো পুতুল কারখানায় তৈরি। তৈরির পর খুব করে মাটি ঘষা হয়েছে।

লোকটি বলেছিল, তোমায় খুব সস্তায় দেবো। মাত্র পঞ্চাশ ডলার।

আমি চাই না বলাতেও সে কিছুতেই ছাড়বে না, মূর্তিটা আমার হাতে থেকে নেবে না। তার খুব ক্যাশ টাকা দরকার, একজনকে ধার শোধ করতে হবে, সেই জন্য সে এত সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, সে চল্লিশ ডলারেই বিক্রি করতে রাজি !

দর নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত সে দু'প্যাকেট সিগারেটের বিনিময়ে সেটা দিতে রাজি হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, কারখানায় তৈরি হলেও এটা মিশরীয় পুতুল তো, দু' প্যাকেট সিগারেটের বদলে নিলে ঠকা হবে না।

এখানে এই চাষীটির সাহস তো কম নয়। প্রথমেই চেয়ে বসলো পাঁচ হাজার ফ্র্যাংক !

অসীম বাংলায় বললো, ভাস্কর, ওটা রেখে দাও। আমাদের বোকা ভেবে গালে চড় মারতে চাইছে।

ভাস্কর কিন্তু দাম শুনে একটুও চমকালো না। যদিও প্রথমে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছিল, লোকটি ওটা আমাদের বিনা পয়সায় উপহার দিতে চায়।

ভাস্কর বললো, পাঁচ হাজার ফ্রাঁ ? এমন একটা ঐতিহাসিক জিনিসের আরও অনেক বেশি দাম হওয়া উচিত।

লোকটি উৎসাহিত হয়ে বললো, হ্যাঁ, একজন বিশেষজ্ঞ দেখে বলেছিল, এর দাম অনায়াসে দশ হাজার হতে পারে।

ভাস্কর বললো, দশ কেন, চোদ্দ-পনেরো হাজার ফ্রাঁ-ও হতে পারে। দাম কমিও না একদম। কাঁধে দুটো ক্যামেরা ঝোলানো টাক-মাথা কোনো আমেরিকান টুরিস্ট পেলেই

বেচে দিও। সঙ্গে যদি তার একটা কচি বউ থাকে, তা হলে শিওর তুমি ভালো দাম পাবে। আমাদের মতন ফেক্‌লু পার্টিকে খবরদার যেন এ জিনিস আর কক্ষনো দেখিও না!

এরপর আর আড্ডা জমলো না, সভা ভঙ্গ হলো।

মেয়ে-জামাইরা বিদায় নিল, কর্তা-গিন্নী শুতে চলে গেল। আমাদের কিন্তু এর মধ্যেই ঘুমোতে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই, ঘরের মধ্যেও বসে থাকার কোনো মানে হয় না, বাইরের আকাশে চাঁদ হাতছানি দিচ্ছে।

বাড়ির সামনেই একটা চাতাল, আমরা চারজন গিয়ে বসলাম সেখানে। বাগানে অনেক বড় বড় গাছপালা, এখন বাগানটিকে গভীর জঙ্গল বলে মনে হয়। এই অঞ্চলে পনেরো-কুড়ি হাজার বছর আগেও মানুষের বসতি ছিল। সেই সব মানুষেরা বৃষ্টি কিংবা তুষারপাতের সময় গুহার মধ্যে বসে সময় কাটাবার জন্য ছবি এঁকেছে।

কিছু একটা গল্পে আমরা খুব হাসছিলাম, হঠাৎ পেছনের দরজাটা খুলে গেল। চাষী গিন্নী রাত-পোশাক পরে সেখানে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে কী যেন বললো, অসীম তার সঙ্গে বাক্যালাপ চালালো। তারপর সেই রমণী আবার দরজা বন্ধ করে চলে যেতেই অসীম আমাদের জানালো যে গৃহকর্ত্রী আমাদের আড্ডা ভাঙতে বলছে। এ বাড়িতে আরও দুটি ঘরে অতিথি আছে, আমাদের হাসি-গল্পের আওয়াজে অসুবিধে হচ্ছে তাদের।

এখন বেশ শীত শীত ভাব, আমরা চাদর জড়িয়ে বসেছি। এদের দেশে কেউ শীতের মধ্যে জানলা খুলে শোয় না। সব দরজা-জানলা বন্ধ, তবু আমাদের কথাবার্তায় অন্যদের এমন কী ব্যাঘাত হতে পারে? আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি, আমরা যখন ইচ্ছে ঘুমোবো!

আমরা ভেতরে যেতে রাজি হলাম না। তবে গলার আওয়াজ কমিয়ে দিলাম। কিন্তু ভাস্কর এমন সব মজার গল্প শুরু করেছে যে হাসি চাপা দায়। আর ফিসফিস করে তো কেউ হাসতে পারে না। দু' একবার হো-হো হা-হা হবেই।

আরও কিছুক্ষণ বাদে গৃহকর্তা এসে কড়া গলায় কী যেন বললো। এবার অসীম দু'তিনবার দা কর, উই উই বললো। এবং অসীমের তাড়নাতে আমাদের উঠে পড়তেই হলো। ভেতরে কাঠের সিঁড়ি। উঠতে গেলে মচমচ শব্দ হয়, অসীম বললো, এই, আস্তে আস্তে! কিন্তু রাত্তিরবেলা সামান্য আওয়াজও বেশি শোনায়, কাঠের সিঁড়িতে একটু শব্দ হবেই। আমাদের শয়নকক্ষ দোতলায়, বাথরুম একতলায়, সুতরাং ওঠা-নামাও করতে হলো দু' একবার। তারপর এক সময় আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন বেলা আটটায় অসীম আমাদের ঘরে এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে গম্ভীর ভাবে বললো, এই তোমরা কাল রাত্তিরে যা কাণ্ড করেছো, এরা ভয়ংকর চটে গেছে।

আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী করেছি কাল রাত্তিরে!

অসীম বললো, কাল অত রাত পর্যন্ত বাইরে আড্ডা দিয়েছো, হৈ চৈ করেছো, এদের ঘুমের খুব ব্যাঘাত হয়েছে।

ভাস্কর বললো, অ্যাই অসীম, তুমি বুঝি আড্ডা দাওনি? তুমি বুঝি হাসোনি?

অসীম বললো, আমি তোমাদের মতন অত জোরে হাসিনি। সে যাই হোক, ওরা বলছে, এক্ষুনি আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

ভাস্কর বললো, সে কী! ব্রেকফাস্ট দেবে না?

অসীম বললো, না, দেবে না। চটপট তৈরি হয়ে নাও। দশটার মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে বলেছে।

ভাস্কর বললো, আমরা একদিনের পুরো ভাড়া দিচ্ছি। সব জায়গায় বারোটা পর্যন্ত থাকা

যায়।

অসীম বললো, সে তো হোটেলের নিয়ম। এটা চাষীর বাড়ি। এদের সঙ্গে তর্ক করে তো লাভ নেই। চলে যেতে বলেছে, তারপরেও কি জোর করে থাকবে?

না, তা থাকা যায় না বটে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সকালবেলায় চা কিংবা কফি না পেলে বাথরুম-টাথরুম যাওয়া যায় না যে! সেগুলো সেরে তো বেরুতে হবে!

অসীম আর মৃণালের সে সমস্যা নেই, কিন্তু ভাস্কর আর আমার বেড টি খাওয়ার অভ্যেস। অসীম জানিয়ে দিল, সে ওদের কাছে কিছু চাইতে পারবে না।

তখন আমাকেই উঠতে হলো। বাড়িটা মনে হলো জনশূন্য। এ বাড়ির অন্য অতিথিরা কোথায় কে জানে, হয়তো অনেক সকালেই বেরিয়ে গেছে। খাওয়ার ঘরে কেউ নেই। চাষীটিও বোধহয় কাজে গেছে। বাইরে মুর্গীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চাষী গিন্নী।

আমি দূর থেকে বললাম, বঁ ঝুর, মাদাম!

তিনি এই সম্ভাষণের কোনো উত্তর দিলেন না। আমি আরও কাছে গিয়ে বললাম, বঁ ঝুর, বঁ ঝুর, সিল ভু প্লে, পারদোঁ, সিল ভু প্লে···। এবার তিনি মুখ ফিরিয়ে বেশ রাগত স্বরে উত্তর দিলেন, বঁ ঝুর!

আমি বিনীত ভাবে বললাম, পারদোঁ, সিল ভু প্লে, দোনে মোয়া দো কাফে ও লে।

সেই সুন্দরী মহিলা মুখখানা খুব কঠোর করে ঝরঝর করে এক সঙ্গে অনেক কথা বলে গেলেন। অতি কষ্টে আমি তার মর্ম বুঝলাম। আমরা রাত্তিরে গোলমাল করেছি বলে আমাদের মতন অতিথি তিনি আর রাখতে চান না। তিনি আমাদের চা-কফি কিছু দিতে পারবেন না, তাঁর এখন অনেক কাজ আছে। এখান থেকে তিন মাইল দূরে একটা কাফে আছে, সেখানে গিয়ে আমরা জলখাবার খেতে পারি। দশটার সময় তাঁর বাড়িতে অন্য লোক আসবে, তার মধ্যে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে!

সুন্দরী মহিলাদের অহেতুক রাগ দেখলে আমার মজাই লাগে। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, এই মহিলার সঙ্গে খানিকটা ইয়ার্কি-ঠাট্টা করার। ওঁর ঐ বাক্যবাণের অনেক মজা করে উত্তর দিতে পারতাম, শেষ পর্যন্ত ওঁকে হাসিয়ে ছাড়তাম ঠিকই। কিন্তু আমি অসহায়। সেই ভাষার জোর যে আমার নেই! আমাদের গ্রামের কোনো চাষীর কাছে গিয়ে শহুরে বাবুরা ইংরিজিতে বুকনি ঝাড়লে যে অবস্থাটা হয়, এখানে হলো তার ঠিক উল্টো। এক চাষীর বউ আমার ওপর ফরাসী ঝাড়ছে, আমি শহুরে বাবু হয়েও উত্তর দিতে পারছি না।

আমাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে দেখে ভাস্কর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললো, চল, তা হলে এক্ষুনি চলে যাবো!

খুব দ্রুত আমাদের ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। জুতো মোজা পরে নেমে এলাম নীচে। অসীম গম্ভীরভাবে চাষী গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কত দিতে হবে?

মহিলাটি একটি কাগজে লিখে দিল টাকার অঙ্কটা। পুরো যা ভাড়া দেবার কথা তাই-ই, যদিও এর মধ্যে ব্রেকফাস্ট পাওয়ার কথা ছিল। মহিলার মুখ দেখে মনে হলো, উনি ধরে নিয়েছেন যে আমরা কিছু টাকা কমাবার চেষ্টা করবো। উনি সেজন্য তর্কাতর্কি করার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু অসীম সে দিক দিয়েই গেল না। অত্যন্ত রাশভারি ভঙ্গিতে পকেট থেকে চেক বই বার করে খচখচ করে লিখে দিল সম্পূর্ণ অঙ্কটা। তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, মেসি মাদাম!

প্রায় বিতাড়িত হয়েই আমরা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠলাম গাড়িতে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। তারপর আবহাওয়া হালকা করার জন্য অসীম ভাস্করের পেছনে লাগলো। হাসতে হাসতে বললো, কী ভাস্কর, একেবারে চুপসে গেলে যে! খুব যে কাল সন্ধেবেলা মহিলার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলে, ওর স্বামীকে আর জামাইকে তোমার দামী স্কচ খাওয়ালে, কত গল্প শোনালে, আজ সকালবেলা আশা করেছিলে ওরা তোমাকে নিজেদের ফার্মের মুর্গীর ডিম খাওয়াবে। সব ফস্কে গেল?

ভাস্কর দপ করে জ্বলে উঠে বললো, শালা, আমি এই সব চাষী-ফাসিদের বাড়িতে আর কক্ষনো থাকছি না। এর চেয়ে হোটেল অনেক ভালো! খাবার টেবিলে বসে জোরে হাসা যাবে না, বারান্দায় বসে হাসা যাবে না, এ রকম অদ্ভুত নিয়ম বাপের জন্মে দেখিনি! সকালে এক কাপ চা পর্যন্ত দিল না?

অসীম বললো, যেমন তোমরা গোলমাল করেছো! এরা আওয়াজ একেবারে সহ্য করতে পারে না। প্যারিসে কী হয় জানো, কোনো বাড়িতে রাত্রির পার্টিতে বেশি চ্যাঁচামেচি হলে পাশের বাড়ির লোক থানায় ফোন করে।

আমি বললাম, দ্যাখো অসীম, আমার তবু খটকা লাগছে। কাল অত ভালো ব্যবহার করলো ওরা, সেধে কফি খাওয়ালো, নিজেদের ওয়াইন খাওয়ালো, কত গল্প করলো, তারপর হঠাৎ এত বদলে গেল কী করে? শহরে পাশাপাশি বাড়িতে অসুবিধে হতে পারে, কিন্তু এখানে কাছাকাছি কোনো লোকজনই ছিল না, আমরাও এমন কিছু হৈ-হল্লা করিনি; গল্প করেছি আর হেসেছি। হাসিটা এমন কী দোষের? তার জন্য সকালবেলা এতটা খারাপ ব্যবহার করার কোনো যুক্তি নেই।

অসীম বললো, তোমরা সিঁড়িতে ধুপধাপ আওয়াজ করেছিলে?

ভাস্কর বললো, আমরা কি পাখি যে উড়ে উড়ে দোতলায় যাবো? অসীম, তোমার বাড়ির কাঠের সিঁড়িতেও রাত্তিরে আওয়াজ হয়।

অসীম বললো, এটা তো গ্রাম! এরা ঘুমোতে খুব ভালোবাসে!

মৃণাল এমনিতে চুপচাপ থাকে। সে বললো, আপনারা কেউ পাথরের মূর্তিটা কিনতে চাইলেন না, তাই বোধহয় চটে গেছে!

ভাস্কর আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললো, একটা ঝুটো পাথর, সেটার ওপর উকো দিয়ে ঘষে একটা মুখ ফুটিয়েছে, সেটাকে বলে কি না প্রি-হিস্টোরিকাল! গ্যাঁজা দেবার আর জায়গা পায়নি! আবার পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দাম চায়, সাধ কত! আর একটু হলে আমি লোকটাকে গাঁট্টা মারতাম!

আমি বললাম, কোনো জায়গায় এসে ঘর ভাড়া নিলেই যে সে বাড়ির পাথর কিনতে হবে, এ রকম নিশ্চয়ই শর্ত থাকতে পারে না!

ফরাসী চাষীদের পক্ষ সমর্থন করার আর কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে অসীম বললো, ঠিক আছে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, এবার ওসব বাদ দাও তো!

সেই সকালটাই আমাদের খারাপ কাটলো। তখনো রাস্তার ধারের কাফে-রেস্তোরাঁগুলো খোলেনি বলে অনেকক্ষণ আমাদের সহ্য করতে হলো চা-কফির তেষ্টা। তারপর অনেকখানি পথ উজিয়ে গিয়েও লাস্কো'র বিশ্ববিখ্যাত গুহাচিত্রও আমাদের দেখা হলো না।

সেখানে পৌঁছে দেখা গেল একটা লম্বা নোটিশ ঝুলছে। তার মর্ম এই যে, লাস্কো'র প্রাগৈতিহাসিক গুহার দরজা সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাটির তলার ঐ সব মহা মূল্যবান ছবি বহু মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেইজন্যই একমাত্র ইতিহাস, নৃতত্ত্ব কিংবা শিল্পকলার গবেষক ছাড়া আর কারুকে ভেতরে ঢুকতে

দেওয়া হয় না। সেই সব গবেষকদেরও প্যারিস থেকে চিঠি আনতে হবে। তবে, একটু দূরেই একটা কৃত্রিম গুহা তৈরি করা হয়েছে, হুবহু ঐ একই রকম, সেখানে একজন জাপানী মহিলা শিল্পী অবিকল সব গুহাচিত্র এঁকে রেখেছেন। টিকিট কেটে সেটা দেখা যেতে পারে!

অসীম সেটাই দেখতে চায়, কিন্তু ভাস্কর হাত-পা ছুঁড়ে বললো, অ্যাঁ? আসলেরও নকল? এখানেও ভুসিমাল গছাবার চেষ্টা, তার জন্য আবার পয়সা দিতে হবে? হি হি হি, ফরাসী দেশটার হলো কি! এত পয়সার খাঁই? ইংল্যান্ডে যাও, বড় বড় মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি সব ফ্রি! এসব দেখতে হবে না, চল!

অসীম বললো, তবু একবার দেখে যাই। খানিকটা আন্দাজ তো পাওয়া যাবে!

ভাস্কর বললো, পয়সা খরচ করে আমি নকল জিনিস দেখবো? কিছুতেই না। এর চেয়ে তো বইতে ছাপা ছবি দেখলেই হয়! আসল ব্যাপার তো গুহার ভেতরটার অ্যাটমোসফিয়ার!

আবার গাড়ির কাছে ফেরার সময় আমি চুপিচুপি অসীমকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার বলো তো, অসীম। তুমি ভাস্করের কাছে এত সহজে হার স্বীকার করলে? দ্বিতীয় গুহাটা না দেখেই চলে এলে?

অসীম মুচকি হেসে বললো, দ্বিতীয়টার কাছে গেলে দেখা যেত সেটাও বন্ধ। হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজ সোমবার। এ দেশে প্রত্যেক সোমবার সমস্ত মিউজিয়াম কিংবা এই ধরনের ব্যাপার বন্ধ থাকে।

চাষী পরিবারের কাহিনী কিন্তু এখনো শেষ হয়নি।

এবারে আমরা যাবো এক্স অঁ প্রভাঁস-এর দিকে। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক্স শহরটির নাম শুনলেই আমার মনে পড়ে সাহিত্য ও শিল্প-জগতের দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা। এমিল জোলা এবং পল সেজান্। এই দু'জন ছিল স্কুলের বন্ধু এবং সারাজীবন বন্ধু থাকার অঙ্গীকার করেছিল। তখন কেউই জানতো না, একজন হবে সাহিত্য জগতের মহারথী আর অন্যজন হবে শিল্পের এক বিস্ময়।

দু'জনকেই কৈশোর-যৌবনে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। জোলাকে দারিদ্র্য তাড়া করে ফিরেছে অনেকদিন, প্যারিসে এসে খবরের কাগজে ফিচার লিখে কোনোক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে হতো। আর পল সেজান অবস্থাপন্ন বাড়ির সন্তান হলেও তাঁর বাবা ছিলেন এক স্বৈরাচারী, শক্ত হাতে ছেলের রাশ ধরে রেখেছিলেন। পিতার ইচ্ছে ছিল ছেলে হোক আইনজীবী, পারিবারিক ব্যবসা দেখাশুনো করুক। আইন পড়া ছেড়ে সেজান্ যখন ছবি আঁকতে এক্স শহর ছেড়ে গেলেন প্যারিসে, তখন তাঁর বাবা অতি কম টাকা দিতেন। বাবার ভয়ে সেজান্ নিজের প্রেমিকাকে বিয়ে করতে পারেননি, তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং প্রথম সন্তানের জন্মের পরও সে-খবর জানাননি বাড়িতে।

এই দুই প্রতিভার মধ্যে জোলা ছিলেন পরোপকারী ও বন্ধু-বৎসল, আর সেজান পাগলাটে, অতিশয় দুর্মুখ। ক্রমে ক্রমে জোলা ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান হলেন, আর্থিক অবস্থাও ফিরলো, সমাজে প্রতিষ্ঠা হলো। আর সেজান্‌কে তখনও কেউ বড় শিল্পী হিসেবে গণ্য করে না, কামিল পিসারো ছাড়া অন্য শিল্পীরা তাঁকে সহ্য করতেও পারে না। অথচ নিয়তির কৌতুক এই যে, পরবর্তীকালের সেজান্ এই দলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হয়েছেন। ইমপ্রেশানিস্টদের আন্দোলনের সময় তিনি কিছুদিন ছিলেন ইমপ্রেশানিস্ট, অথচ তখনই তাঁর মধ্যে পোস্ট-ইমপ্রেশানিজ্‌ম্-এর লক্ষণ

দেখা যাচ্ছে। তিনি এক্সপ্রেশানিস্টদেরও পুরোধা এবং কিউবিস্টদেরও পূর্বপুরুষ।

আমি আর অসীম এই দুই লেখক ও শিল্পীর জীবন ও শিল্প নিয়ে টুকরো টুকরো কথা বলছিলাম। অসীম এক সময় জিজ্ঞেস করলো, এদের এত গভীর বন্ধুত্বও কী করে নষ্ট হয়ে গেল, তা তুমি জানো সুনীল ?

আমি বললাম, এমিল জোলার 'দা মাস্টারপিস' উপন্যাসটা উপলক্ষ করে তো ?

এটা একটা ট্র্যাজেডি। উপন্যাসের বিষয়বস্তু খুঁজতে খুঁজতে এমিল জোলা শেষ পর্যন্ত তাঁর বন্ধুদের জীবনকাহিনী অবলম্বন করলেন শুধু না, বন্ধুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়লেন না। উপন্যাসটিও তেমন কিছু উচ্চাঙ্গের হয়নি। 'দা মাস্টারপিস' উপন্যাসে জোলা তাঁর সমসাময়িক শিল্পীগোষ্ঠীর কথা লিখলেন, যে ইমপ্রেশানিস্টদের একসময় প্রবল সমর্থক ছিলেন তিনি, এখন দেখা গেল এঁদের শিল্পরীতি সম্পর্কে তাঁর তেমন উচ্চ ধারণা নেই। প্রধান চরিত্রটি, যে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করলো, সেটি তাঁর প্রাণের বন্ধু পল সেজান-এর আদলে গড়া।

এমিল জোলার এই উপন্যাসটি তাঁর শিল্পী বন্ধুরা কেউই পছন্দ করেনি। এক কপি উপহার পাবার পর পল সেজান অত্যন্ত নীরস ভদ্রভাষায় এবং ভাববাচ্যে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি লেখককে ধন্যবাদ জানাই। পুরোনো দিনের স্মৃতিতে আমি তাঁর করমর্দনের অনুমতি প্রার্থনা করি।'

এরপর সেজান্ বাকি জীবনে আর কখনো জোলাকে কোনো চিঠি লেখেননি। কোনো যোগাযোগও রাখেননি !

গল্প করতে করতে আমরা প্রায় দেড়শো কিলোমিটার চলে এসেছি, ভাস্কর একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, এই রে, আমার শাল ! অসীম গাড়ি থামাও !

অসীম ব্রেকে পা দিয়ে বললো, শাল মানে ?

ভাস্কর বললো, আমার কাশ্মীরী শাল ! দেশ থেকে আনা।

আমার সঙ্গে একবার বেলজিয়ামে বেড়াবার সময় ভাস্কর ওর দামী ক্যামেরা হারিয়েছিল। আর একবার লন্ডনে আমার সামনেই ওর পার্স পকেটমার হয়। ক্যামেরা, পার্স ইত্যাদি ও যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে, জিনিসপত্র হারাবার দিকে ভাস্করের বেশ ঝোঁক আছে। চাষীর বাড়িতে হুড়োহুড়ি করে ব্যাগ গোছাবার সময় ও কাশ্মীরী শালটা ভরে নিতে ভুলে গেছে। তা ছাড়া তখন মেজাজও বেশ খারাপ ছিল !

গাড়ি থামিয়ে সব ব্যাগ খুঁজে দেখা গেল সত্যিই শালটা আনা হয়নি। অথচ গতকাল রাতে ভাস্কর শালটা জড়িয়ে বসেছিল, আমরা সবাই দেখেছি। শালটার দাম যতই হোক, তার চেয়ে বড় কথা, শালটা ভাস্করকে ওর মা দিয়েছেন, সেটা হারাবার কোনো মানে হয় না !

আবার অতখানি রাস্তা ফিরে যেতে হলে আজকের সারাদিনটাই নষ্ট হবে। অথচ কীই-বা করা যায়, যেতে তো হবেই। ভাস্কর নিজে অবশ্য বললো, আবার ঐ গোমড়ামুখো মেয়েছেলেটির কাছে ফিরে যেতে হবে ? দূর ছাই, দরকার নেই, চল চল ! ও ব্যাটারাই শালটা গায়ে দিক !

অসীম বললো, একটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। চাষীদের বাড়িতে চিঠি লিখবো, ওরা যেন শালটা ডাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

ভাস্কর বললো, ওদের ঠিকানা তো আনিনি ? আন্দাজে কোথায় চিঠি লিখবো ?

অসীম বললো, মহিলাটি আমাকে একটা রিসিট দিয়েছে। তাতে নাম-ঠিকানা সব

আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, চিঠি পেলেই ওরা ফেরত পাঠাবে ? নিজেরা ডাক খরচ করে ?

অসীম বললো, ডাক খরচ পরে পাঠিয়ে দেবো। কিংবা ওরা ভি পি করে পাঠাতে পারে, আমরা ছাড়িয়ে নেবো। হ্যাঁ, সেই ভালো, ভি পি-তে পাঠাবার জন্যই অনুরোধ জানাবো।

এরপরেই রাস্তায় যে পোস্টঅফিসটি পড়লো, সেখান থেকে লেখা হলো চিঠি।

সেই চাষী পরিবারটিকে আজও আমরা মনে রেখেছি, তাদের প্রতি একটুও বিরূপ ভাব নেই, বরং পুরো ঘটনাটাই একটা মজার স্মৃতি হয়ে আছে এই জন্য যে, যথা সময়ে সেই শালটিকে কেচে, ভালোভাবে প্যাক করে তারা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

২১

কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো, হেঁয়ালি-মানুষ, আমায় বলো ?
তোমার বাবা, মা, বোন, ভাইকে ?
—আমার বাবা নেই, মা নেই, বোন নেই, ভাই নেই।
—তোমার বন্ধুদের ?
—তুমি এমন একটা শব্দ ব্যবহার করছো, যার অর্থ আমি আজ পর্যন্ত বুঝিনি
—তোমার দেশ ?
—কোন্ দ্রাঘিমায় তার অবস্থান আমি জানি না
—সৌন্দর্যকে ?
—আমি আনন্দের সঙ্গেই তাকে ভালোবাসতাম, যদি হতো সে কোনো দেবী এবং অমর
—সোনা ?
—আমি তা ঘৃণা করি, যেমন তুমি ঈশ্বরকে
—তবে, কী তুমি ভালোবাসো, অসাধারণ আগন্তুক ?
—আমি ভালোবাসি মেঘ, যে-সব মেঘেরা ভেসে যায়, ঐ ওখানে,... ঐ সেখানে... বিস্ময়ময় মেঘেরা !

—শার্ল বোদলেয়ার

ফরাসীদেশটা এককালে ছিল গল নামে এক জাতির দেশ। এই গল শব্দটা এখন বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি এবং পরবর্তী কালের রাষ্ট্রনায়ক দ্য গলের নামের মধ্যে রয়ে গেছে সেই স্মৃতি, এ দেশের এক জনপ্রিয় সিগারেটের ব্র্যান্ড হচ্ছে গলোয়াজ। এই গলদের ওপর রোমানরা বেশ কিছুকাল প্রভুত্ব করেছিল। অ্যাস্টারিক্স-এর জনপ্রিয় কমিক্সে জুলিয়াস সিজারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গলদের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের লড়াইয়ের অনেক কৌতুক কাহিনী পাওয়া যায়। রোমান সাম্রাজ্য যখন টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তখন বিভিন্ন রোমান সামন্ত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হয়ে বসেছিল। ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে এই প্রভাঁস অঞ্চলও সেই রকম এক রোমান রাজার অধীনে ছিল কিছুকাল। তার কিছু ঐতিহাসিক চিহ্নও রয়ে গেছে।

এক্স শহরে আমাদের বেশিক্ষণ থাকা হলো না। দেখা হলো না এমিল জোলা কিংবা পল সেজান্-এর বাড়ি, শুধু ঘুরে গেলাম রোমানদের গড়া এক অ্যামফিথিয়েটার, আজকাল যাকে আমরা বলি স্টেডিয়াম। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর গড়া সেই বিশাল ব্যাপার, আজও অনেকটা অক্ষত। ওপরের দিকে গিয়ে দাঁড়ালে অনায়াসে কল্পনা করা যায়, একদিকে বসে আছেন বিলাসী রোম-সম্রাট, পাশে তাঁর ব্যভিচারিণী পত্নী, নেশাগ্রস্ত চোখে তাঁরা উপভোগ করছেন

আরীন্যার মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহদের সঙ্গে গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রাণপণ লড়াই ! একটা সিংহ একজন মানুষকে মেরে হামহুম করে খাচ্ছে, এই দৃশ্যও এককালে মানুষের কাছে উপভোগ্য ছিল !

এক্স শহর থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম দুপুর-দুপুর। প্যারিস ছাড়ার পর আমরা তিন রাত কাটিয়েছি পথে, এবার কোথাও কয়েকদিনের জন্য থিতু হওয়া দরকার। অসীম একলা গাড়ি চালাচ্ছে, তাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

আমি ইংল্যান্ডের গ্রাম বিশেষ দেখিনি। লন্ডন থেকে কখনো গেছি অক্সফোর্ডে, কখনো ডোভারে, তাও বড় রাস্তা ধরে, বিখ্যাত ব্রিটিশ কান্ট্রিসাইড আমার দেখা হয়নি আজও। কিছু গ্রাম দেখেছি বটে আমেরিকায়, কিন্তু সেগুলো কেমন যেন ছন্নছাড়া, ধূ ধূ করা মাঠ বা ফসলের ক্ষেতের মধ্যে একটা-আধটা বাড়ি। তা ছাড়া, আমেরিকার অধিকাংশ গ্রামগুলিরই নামের সঙ্গে সিটি বা টাউন যোগ করা। মোট শ' দেড়েক পরিবারের বাস, এমন জায়গার নাম স্টোন সিটি। বড় রাস্তার ধারে ধারে যে-সব জায়গা পড়ে, সেখানকার জনসংখ্যা বোর্ডে লেখা থাকে। যে-জায়গায় জনসংখ্যা মাত্র ছত্রিশ, সেটাও একটা টাউন। আমেরিকায় ভূতের গ্রামও আছে একাধিক। জনশূন্য কিংবা পরিত্যক্ত কোনো এলাকার নাম গোস্ট সিটি।

সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা চীনের বড় বড় শহরগুলিই শুধু আমি দেখেছি, গ্রাম দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ভারতের বাইরে সত্যিকারের বহু গ্রাম আমি শুধু দেখেছি ফরাসীদেশেই। ভারি চোখ জুড়োনো সেই সব গ্রাম। গ্রাম্য ভাব একেবারে মুছে যায়নি, অথচ ঝকঝকে তকতকে, বাড়িগুলি মনে হয় চকোলেটের তৈরি। এমনকি কবরখানাগুলিও বড়ো সুন্দর। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সবসময় যে দারিদ্র্য কিংবা প্রাচুর্যের কোনো সম্পর্ক আছে, তাও বলা যায় না। ফরাসীরা এমন কিছু বড়লোক নয়, কিন্তু রাস্তার পাশের একটা কবরখানাও যে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হয়, অন্য লোকের চক্ষুপীড়ার কারণ না ঘটে, সে বোধটুকু তাদের আছে।

এক একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে লম্বা কোন স্তম্ভের ওপর একটা পাথরের মুর্গী। প্রথম প্রথম দেখে মজা লাগে। ব্রিটেনের জাতীয় প্রতীক যেমন সিংহ, আমেরিকার ঈগল, সেরকম ফ্রান্সের জাতীয় প্রতীক মুর্গী, ওরা মুর্গীরও মূর্তি বানিয়ে রেখেছে।

দু' একটা ছোট ছোট শহর বা গ্রামের নাম দেখলে চমকে চমকে উঠতে হয়। মনে পড়ে যায় অনেক ইতিহাস ও কাহিনী। যেমন একটা অপূর্ব মনোহর জায়গায় কফি খাওয়ার জন্য অসীম গাড়ি থামিয়েছিল। সেই জায়গাটার নাম বারজেরাক। নামটা চেনা চেনা লাগে। আমি অসীমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই জায়গাটার সঙ্গে সিরানো দ্য বারজেরাকের কি কোনো সম্পর্ক আছে ?

অসীম বললো, ঠিক ধরেছো ! এই জায়গাটাকে কেন্দ্র করেই সিরানোর কাহিনী প্রচলিত।

সিরানো ছিল প্রেমিক, শিল্পী, কবি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার নাকটি ছিল বড়ো বেশি লম্বা। তার মুখে, নাকের বদলে যেন মনে হতো, একটা কলা বসানো আছে। সেই লজ্জায় সে কোনো মেয়ের সামনে বেরুতো না। অন্য এক অপদার্থ প্রেমিক, যার আর কোনো গুণই ছিল না, শুধু চেহারাটা ছিল কার্তিকের মতন, তার হয়ে তার প্রেমিকার কাছে সিরানো প্রেমপত্র লিখে দিত। এমনকি সেই প্রেমিকার বাড়ির ব্যালকনির নীচে লুকিয়ে থেকে

সিরানো তার বন্ধুর বকলমে বলে যেত অপরূপ সব প্রণয়বাক্য, যা আসলে তার নিজেরই হাহাকার ! আমাদের ছাত্র বয়েসে এই কাহিনী নিয়ে চমৎকার একটি ফিল্ম হয়েছিল, যাতে নাক-লম্বা সিরানোর ভূমিকায় ছিল জোসে ফেরার।

আর একটি শহরের নাম লোত্রেক। শুনলেই মনে পড়ে শিল্পী তুলুজ লোত্রেকের কথা। ধনীর সন্তান লোত্রেক অল্প বয়েসে একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যায়, কোমরে ও পায়ে খুব চোট লাগে। সেই থেকে তার শরীর আর বাড়েনি, সে হয়ে গেল একটি বামন। কিন্তু সে অসাধারণ শিল্পী হয়ে উঠেছিল, মেয়েরা তার দিকে করুণার চক্ষে তাকালেও সে পানশালার নর্তকী ও বারবনিতাদের নিজের ছবিতে অমর করে রেখেছে। এই তুলুজ লোত্রেককে নিয়েও আমরা একটা ভালো ফিল্ম দেখেছি এক সময়, এবং কী আশ্চর্য ব্যাপার, সেখানেও ঐ বামন শিল্পীর ভূমিকায় জোসে ফেরার অনবদ্য অভিনয় করেছিল।

নিম শহরটি দেখিয়ে অসীম বলেছিল, আজকাল যে জিন্‌স-এর প্যান্ট পরার খুব ফ্যাসান হয়েছে সব দেশে, সেই জিন্‌স কাপড়টার জন্ম এখানে।

ভাস্কর প্রতিবাদ করে বললো, যাঃ, জিন্‌স তো চালু হয়েছে আমেরিকায় !

অসীম বললো, এইখান থেকে প্রথম কাপড়টা গেছে। এখনও দেখবে, জিন্‌স-কে অনেকে বলে ডেনিম। ঐ ডেনিম আসলে হচ্ছে দ্য নিম। ফরাসী দ্য মানে ইংরিজি অফ, বাংলায় ষষ্ঠী তৎপুরুষ। দ্য নিম, অফ নিম,অর্থাৎ নিম-এর জিনিস। একটু একটু ফরাসী শেখো, ভাস্কর !

ভাস্কর নাকের পাটা ফুলিয়ে বললো, কোন দুঃখে শিখতে যাবো ? না শিখেও জীবনের এতগুলো বচ্ছর কোনোই অসুবিধে হয়নি, বাকি জীবনটাও সচ্ছন্দে কেটে যাবে ! ঐ সব ফালতু জেনারাল নলেজের লেকচার তুমি সুনীলের ওপর যত ইচ্ছে ঝাড়ো না ভাই !

প্রায় বিকেলের দিকে আমরা এসে পৌঁছোলাম সমুদ্রের কাছাকাছি। বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ পাওয়া যায়, চোখে পড়ে সাদা ধপধপে পাখি। আমরা এসে গেছি ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে, বিশ্ববিখ্যাত 'সাউথ অফ ফ্রান্স'। কোত্ দাজুর !

মার্সেই একটা বড় বন্দর এবং ভিড়-ভাট্টার জায়গা বলে সেখানটা এড়িয়ে আমরা এগুতে লাগলাম তটরেখা ধরে। সামনের দিকে কান্, আনতিব, নিস-এর মতন নাম করা সব শহর, এ ছাড়াও সমস্ত তটরেখা জুড়েই ছোট-বড় অজস্র শহর। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ধনী, ফিল্মস্টার, শিল্পী, লেখকরা এখানে নিজস্ব বাড়ি করে রাখে। তাছাড়াও পর্যটকদের জন্য কত রকমের যে হোটেল, গেস্ট হাউজ, লজ তার ইয়ত্তা নেই।

বিকেলের স্বর্ণাভ রোদে অসীম এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বললো, এবার ?

আমরা কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

অসীম বললো, এখানে প্রথম দৃশ্যটা কী দেখবে তা কি জানো ? কোনো আন্দাজ আছে ? আমি ইচ্ছে করেই আগে কিছু বলিনি।

অসীম কী যে রহস্য করছে, তা সত্যি ধরা গেল না। এখানে ভূমধ্যসাগরের নিবিড় নীল সৌন্দর্য দেখবো, এটাই তো জানি।

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় সেনাপতির ভঙ্গিতে অসীম আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। যেখানে গাড়ি পার্ক করা হয়েছে, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না, একটা কাঁধ সমান উঁচু প্রাচীর। সেখানে এসে অসীম বললো, ওয়ান, টু, থ্রি··· !

সত্যিই এমন দৃশ্য কল্পনা করিনি। প্রথমে চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হবেই।

আদিগন্ত নীল জলরাশির সামনের বেলাভূমিতে বালির ওপর শুয়ে-বসে আছে অন্তত

হাজার খানেক নারী, পুরুষ, শিশু। কেউ শুয়ে আছে, কেউ পা ছড়িয়ে বসা, কেউ ছুটোছুটি করে নেমে যাচ্ছে জলে, খেলছে বাচ্চারা। সকলেই প্রায় উলঙ্গ। প্রায় বললাম এই কারণে যে, পুরুষ-নারী কারুরই ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা সুতোও নেই, নিম্নাঙ্গে এক চিলতে কটি-বস্ত্র আছে বটে, তাও প্রায় দেখাই যায় না।

পুরুষরা সুঠাম তরুণীদের নগ্ন বক্ষদেশ দেখে পুলকিত হবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম দর্শনে আমার ঠিক কী অনুভূতি হয়েছিল, তাও অকপটে জানানো দরকার।

সেখানে কালো বা খয়েরি রঙের মানুষ একজনও চোখে পড়েনি। সবাই শ্বেতাঙ্গ, অনেকেরই সোনালি চুল, গায়ের রোমও সোনালি। সবাই কাছাকাছি শুয়ে-বসে আছে, এবং প্রায় নিঃশব্দ। হঠাৎ দেখেই আমার মনে হয়েছিল, এরা কেউ মানুষ নয়, মানুষের পূর্বপুরুষ একদল বাঁদর। আমি আসামে, মানসের জঙ্গলে একবার এক ঝাঁক গোল্ডেন লাঙ্গুর দেখেছিলাম, পুরুষ-স্ত্রী-শিশু মিলিয়ে চোদ্দ-পনেরো জনের একটা পরিবার, তাদের সারা গা সোনালি। অবিকল যেন সেই বাঁদরের ঝাঁকের মতন এই মানুষগুলি।

সেই গণ-নগ্নতা আমার তেমন পছন্দ হয়নি। প্রত্যেক মানুষের শরীরেই একটা রহস্য আছে, পোশাক তা ঢেকে রাখে। দু'জন মাত্র নারী-পুরুষ নিভৃত ভাবে সেই রহস্য জানার চেষ্টা করে, ব্যাকুল হয়, অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবনেও জানা হয় না।

আমরা চারজন পুরো পোশাক-পরিহিত মানুষ এতগুলি প্রায়-নগ্ন নারী-পুরুষের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা বিসদৃশ, যদিও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তবু আমরা সেখান থেকে সরে এলাম। পরে কখনো আমরাও সমুদ্র-স্নানে আসবো নিশ্চিত, তার আগে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা দরকার।

এত রকম হোটেল থেকে বেছে নেওয়া সোজা কথা নয়। তাছাড়া আমাদের সস্তার জায়গা খুঁজতে হবে। এখানে সব হোটেলের বাইরে স্পষ্টভাবে স্টার-রেটিং দেওয়া থাকে। ফাইভ স্টার, ফোর স্টার, থ্রি স্টার হোটেলগুলোর ধারেকাছেও আমরা ঘেঁষি না। টু স্টারই যথেষ্ট, এমনকি ওয়ান স্টারে-ও আপত্তি নেই। এখানে আমরা তিন চারদিন থাকবো। সুতরাং পাকাপাকি একটা ভালো আস্তানা খোঁজা দরকার।

বেশ কিছু বছর আগে অসীম তার এক বন্ধুর সঙ্গে এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে একটা লজে ছিল, জায়গাটা পরিচ্ছন্ন ও সস্তা, সুতরাং অসীম সেখানেই যেতে চায়। বেশ ভালো কথা। কিন্তু প্রায় ঘন্টা দেড়েক ধরে প্রচুর জায়গা ঘোরাঘুরি করেও কিছুতেই আর সে জায়গাটা খুঁজে বার করা যায় না। সেই ছোট্ট শহরটির নাম জুয়্যাঁ লে-প্যাঁ, ম্যাপে সেরকম একটা নাম আছে বটে, কিন্তু কোনোক্রমেই আমরা সেখানে পৌঁছোতে পারি না। হয় পেরিয়ে যাই, আবার ফিরতে গেলে রাস্তা হারাই। অসীম প্রায় দু'যুগ ধরে ফ্রান্সে আছে, প্রতিদিন গাড়ি চালায়, তবু রাস্তা ভুল করতে সে খুব ওস্তাদ।

এক সময় অতি কষ্টে জুয়্যাঁ লে-প্যাঁ-তে আসা গেল বটে, কিন্তু অসীমের সেই চেনা বাড়ি মিললো না কোনোক্রমেই। অসীমও জেদ ধরেছে, সে বাড়িটা আগে দেখবেই। এক একটা রাস্তা তার অস্পষ্টভাবে চেনা-চেনা মনে হয়, কিন্তু সেখানে কোনো লজ নেই। এদেশে অনবরত বাড়ি-ঘর ভেঙে নতুন নতুন বাড়ি হয়, এমনকি গোটা রাস্তাটাই বদলে যায়। আমেরিকার আয়ওয়া শহরে দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি আগেরবার যে-বাড়িটাতে ছিলাম, সেটা কিছুতেই খুঁজে পাইনি। অথচ রাস্তার নাম, নম্বর সবই আমার মুখস্থ। কিন্তু মার্গারিটের মতন সেই বাড়িটাও শূন্যে মিলিয়ে গেছে, পুরো পাড়াটাই অন্যরকম !

এক সময় ভাস্করের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

তার নেতৃত্ব-বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, সে এক ধমক দিয়ে বললো, যথেষ্ট হয়েছে, অসীম ! তোমার ঐ লে-প্যাঁ না মে-প্যাঁ ছাড়ো তো ! এবার আমি সামনে যে টু-স্টার হোটেল দেখবো, সেটাতেই উঠবো !

ভাস্কর জোর করেই নেমে গেল গাড়ি থেকে। এতক্ষণ ধরে রাস্তা ভুল করে অসীমও খানিকটা চুপসে গেছে।

তিন-চারটে হোটেল ঘুরে এক জায়গায় ঘর ঠিক করে ফেললো ভাস্কর। এবং অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। চার জনের জন্য দুটি ঘরের বদলে পাওয়া গেল একটা স্যুইট,তাতে একটা বড় ঘর, একটা বসবার ঘর, এমনকি সংলগ্ন একটা রান্নাঘরও ব্যবহার করা যাবে। এখানে সারা বিশ্বের ভ্রমণার্থীরা আসে বলে সব হোটেল মালিকই কিছু কিছু ইংরিজি জানে, সুতরাং ইংরিজি বলার সুযোগ পেয়ে ভাস্কর হাসি-ঠাট্টা-মস্করায় এই হোটেল মালিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললো অবিলম্বে, সেই সুযোগে ভাড়াও কমিয়ে ফেললো অনেক।

হোটেলের মালিকটি তরুণ বয়স্ক, অতিশয় সুপুরুষ, মুখখানি হাস্যময়। কথায় কথায় সে জানালো যে তার নাম লুই এবং সে কর্সিকার লোক। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পর এই দ্বিতীয় একজন কর্সিকানের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। সে শুধু হোটেলের মালিক নয়, সে একজন কবি, শিগগিরই তার প্রথম কবিতার বই বেরুচ্ছে, তার প্রুফ দেখা চলছে।

তার এই পরিচয় পেয়ে ভাস্কর আরও হৈ হৈ করে উঠে বললো, তবে তো চমৎকার, আমরা সবাই কবিতা ভালোবাসি, আজ আমরা তোমার কবিতা শুনবো। কাল এখানে একটা কবি-সম্মেলন হবে। তুমি ফরাসী কবিদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো ?

লুই বললো, বোদলেয়ার। আমার দেবতা হচ্ছে শার্ল বোদলেয়ার।

ভাস্কর অসীম ও আমার দিকে হাত দেখিয়ে বললো, ওরা দু' জনেও খুব বোদলেয়ারের ভক্ত। ঐ কবি সম্পর্কে অনেক কিছু জানে, তোমার সঙ্গে জমে যাবে।

লুই বললো, আমার স্ত্রী ইংরেজ। সে এখন নেই। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। সে তোমাদের সঙ্গে ইংরিজিতে আরও ভালো করে কথা বলতে পারবে।

ভাস্কর ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, তুমিও তো চমৎকার ইংরিজি বলছো। এই যথেষ্ট ! এই তো যথেষ্ট ! কাল তোমার বউ আর তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে। তোমাদের ভারতীয় রান্না খাওয়াবো। তোমরা কাল আমাদের অতিথি। তা হলে ঐ কথাই রইলো ?

এরপর নিজেদের ঘরে এসে জুতো-মোজা খুলতে খুলতে অসীম জিজ্ঞেস করলো, এই যে, ভাস্কর, তুমি তো দিব্যি ঐ কর্সিকান ছেলেটিকে কাল রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে বসলে ! রাঁধবে কে ?

ভাস্কর ভুরু তুলে বিরাট বিস্ময়ের ভাব করে বললো, কেন, তুমি রাঁধবে ? তুমি ব্যাচিলার, এত বছর একলা একলা এ দেশে রয়েছো, রান্নাবান্নায় তোমারই বেশি ইন্টারেস্ট থাকার কথা। আমি তো মনে মনে আগে থেকেই তোমাকে ঐ ভার দিয়ে রেখেছি। মৃণাল বাজার করে দেবে, আর তুমি রাঁধবে। আমার বউ ভাই আমাকে বরাবর খাতির যত্ন করে, রান্না করে খাওয়ায়, আমি সেজন্য ও লাইনে নেই।

অসীম বললো, আমি রাঁধবো ? তোমার মাথা খারাপ ? হোটেলে এসে নিজেরা রান্না করে খেতে যাবো কেন ? বাইরে খাবো। কেন তুমি ঝামেলা করতে গেলে ?

ভাস্কর বললো, এ হোটেলে একটা ফাঁকা রান্নাঘর পড়ে আছে কেন ? নিশ্চয়ই অনেকে এখানে এসে নিজেদের পছন্দমতন রান্না করে খায়।

দু'জনে তর্ক জমে উঠলো।

এই সব হোটেলে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট দেবার ব্যবস্থা আছে, দুপুরে ও রাত্তিরে খাবার-দাবারের কোনো পাট নেই। যারা ঘর ভাড়া নেয়, তারা বাইরের কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে আসে।

ফ্রান্সের এই সব হোটেলের আর একটা ব্যাপার দেখে চমকে গেছি। এর আগে আমি যতগুলো দেশেই গেছি, সব জায়গাতেই কোনো হোটেলে এসে প্রথমেই কাউন্টারে মস্ত বড় খাতায় নাম-ধাম অনেক কিছু লিখতে হয়, পাসপোর্ট দেখাতে হয়, ফ্রান্সে এ পর্যন্ত কোনো হোটেলেই সে-রকম কোনো ঝামেলাই নেই। খাতায় নাম লেখার বালাই নেই, কেউ পাসপোর্টও দেখতে চায় না। অফিসঘরে কোনো লোকই থাকে না। বেল বাজালে একজন কেউ ভেতর থেকে আসে, ঘর দেখিয়ে, ভাড়া ঠিক করে, চাবি দিয়ে চলে যায়। তারপর আর সেই হোটেলের মালিক বা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখাই হয় না। কোনো অ্যাডভান্সও চায় না। আমাদের যখন হোটেল ছাড়ার ইচ্ছে হবে, তখন আবার অফিসঘরে গিয়ে বেল বাজালে সেই লোকটি আসবে, তার হাতে ভাড়ার টাকা চুকিয়ে দিলেই হবে। ভাড়া না দিয়েও যদি কেউ চলে যেতে চায়, তাকে আটকাবার ব্যবস্থা নেই কোনো।

আমার মনে এই প্রশ্নটা খচখচ করে। এরা কি সব লোককেই বিশ্বাস করে এতখানি ? সকলেই গাড়ি নিয়ে আসে, কেউ কোথাও নাম সই করে না, সুতরাং যে-কোনো সময় গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে চলে গেলে কেউ তো ধরতে পারবে না ? পরে কখনো দেখা হয়ে গেলেও আইনত টাকা চাওয়ার কোনো অধিকার থাকে না।

অসীম এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, কেউ কেউ ভাড়ার টাকা না দিয়েই চলে যায় হয়তো ! এরা হিসেব করে দেখেছে, শতকরা তিন-চারজন খুব জোর টাকা মেরে দেয়। এরা সেটা গ্রাহ্য করে না। কারণ, কাউন্টারে একজন লোককে সারাক্ষণ রাখতে গেলে তাকে অনেক বেশি মাইনে দিতে হবে।

অদ্ভুত সহজ ব্যবস্থা। আমাদের দেশের হোটেলগুলোতে এই রকম ব্যবস্থা চালু করলে শতকরা ক'জন ভাড়া না দিয়ে পালাবে ? কিংবা, প্রশ্নটা ঘুরিয়ে করা যায়, শতকরা ক'জন ফাঁকা অফিসঘরে বেল বাজিয়ে মালিককে ডেকে ভাড়ার টাকা বুঝিয়ে দেবে।

অসীম কিছুতেই রান্না করতে রাজি নয়, শেষ পর্যন্ত ভাস্কর সগর্বে বললো তা হলে ঠিক আছে, আমি নিজেই মাংস রাঁধবো কাল। দেখবে কেমন রাঁধি !

অসীম আর মৃণাল হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। অসীম বললো, ভাস্কর, তুমি নর্থ ক্যালকাটার বনেদি বাড়ির ছেলে, জীবনে কখনো এক কাপ চা তৈরি করেছো ?

ভাস্কর বললো, রণক্ষেত্রে হবে পরিচয় ! কাল রাত্তিরে এমন রাঁধবো, জীবনে সেরকম কখনো খাওনি !

অসীম বললো, সে মাংস খেয়ে জীবনটাই চলে যাবে না তো ?

এরপর ওরা তিনজন চিঠি লিখতে বসলো। অসীম লিখছে কাজের চিঠি, বাকি দু'জন তাদের স্ত্রীদের। আমি জানলার কাছে গিয়ে সমুদ্রের জলে অস্তরশ্মির আভা দেখতে লাগলাম।

মৃণাল আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বাড়িতে চিঠি পাঠাবেন না !

আমি বললাম, দু' একদিন যাক, জায়গাটা ভালো করে দেখি, তারপর তো লিখবো, এখন লেখার মতন কী আছে ?

ভাস্কর বললো, কবিরা চিঠি লেখে না ! তারা সব কিছু ছাপার জন্য লেখে। এই কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা আছে। আমি ভাস্করকে সারা বছরে একটাও চিঠি লিখি

কিনা সন্দেহ।

মৃণাল বললো, কবিরা চিঠি লেখে না? রবীন্দ্রনাথ কত লিখেছেন, অন্তত কয়েক হাজার।

ভাস্কর বললো, রবীন্দ্রনাথ জানতেন, তাঁর সব চিঠিই ছাপা হবে। মৃত্যুর পরেও বহু বছর ধরে অপ্রকাশিত চিঠিপত্র বেরুবে।

অসীম বললো, রবীন্দ্রনাথ কী করে অত চিঠি লিখেছেন, ভাবলে সত্যি হাঁ হয়ে যেতে হয়। পৃথিবীর আর কোনো কবি বোধহয় এত চিঠি লেখেননি।

আমি বললাম, একই দিনে, একই ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি চিঠি লেখার রেকর্ড কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নয়। এক ফরাসী কবির। ঐ কর্সিকান ছেলেটি যাঁর ভক্ত, সেই শার্ল বোদলেয়ারের। চিঠিগুলো একটা হোটেলে বসেই লেখা।

ভাস্কর বললো, প্রেমিকাকে চিঠি লিখেছিল? একদিনে ক'খানা!

আমি বললাম, প্রেমিকাকে নয়, নিজের মাকে। ক'খানা আন্দাজ করতে পারবি? সাতখানা। প্রত্যেক ঘণ্টায় একখানা করে।

ঘটনাটি এই রকম।

বোদলেয়ারের তখন পঁয়তিরিশ বছর বয়েস। কিছুদিন আগে অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁর কবিতার বইটি নিষিদ্ধ হয়েছে। চরম অর্থাভাব। সেই সময়ই বোদলেয়ারের মা তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হয়েছেন। উচ্ছৃঙ্খল ছেলের জন্য তিনি একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছেন বটে, কিন্তু ছেলের তাতে কুলোয় না। প্রচুর ধার দেনা করে ফেলে বোদলেয়ার মায়ের কাছে আরও টাকা চেয়ে কাকুতি-মিনতির চিঠি লেখেন।

ওঁদের এক পারিবারিক বন্ধু ছিলেন একজন আইনজীবী, তাঁর নাম আনসেল্। একবার বোদলেয়ার এক হোটেল থেকে মাকে চিঠি লিখেছিলেন যে সেখানে তিনি সাঙ্ঘাতিক ঋণে আবদ্ধ। বোদলেয়ারের প্রকৃত অবস্থাটা কী, তা জানার জন্য আনসেল একদিন চলে এলেন সেই হোটেলে। তখন বোদলেয়ার সেখানে ছিলেন না, বাড়িওয়ালার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে আনসেল চলে এলেন। বোদলেয়ার ফেরার পর হোটেলের মালিক সাতকাহন করে লাগালো। একটা লোক এসেছিল স্পাইগিরি করতে, জিজ্ঞেস করছিল, ম্যসিউ বোদলেয়ার কত রাত করে বাড়ি ফেরেন, তাঁর ঘরে কোনো মেয়ে নিয়ে আসেন কিনা, এই সব।

বোদলেয়ার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। আনসেলকে তিনি এমনিতেই দেখতে পারতেন না, আনসেলকে মধ্যস্থ রাখার শর্তটাও তাঁর অসহ্য ছিল। বোদলেয়ার ভাবলেন, এইভাবে গোয়েন্দাগিরি করতে এসে আনসেল তাঁকে অপমান করেছেন। বাল্যকাল থেকেই এই কবিটি বদরাগী, এখন এই ঘটনা শুনে রাগে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন, চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এক্ষুনি তিনি আনসেলের বাড়ি গিয়ে তাকে মারবেন, তার সঙ্গে ডুয়েল লড়বেন।

তারপর তিনি তাঁর মাকে চিঠি লিখতে বসলেন। বেলা দুটোর সময় প্রথম চিঠি : আমি এক্ষুনি যাচ্ছি আনসেলের বাড়িতে। ঐ ইতরটার আমি কান মুলে দেবো ওর বউ ও ছেলের সামনে। ও বাড়িতে না থাকলে আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবো। আজ সব কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

বোদলেয়ারের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে বাড়িওয়ালাটি ভয় পেয়ে গেল। আসলে সে আনসেলের নামে অনেক কিছু বানিয়ে বলেছিল, আনসেল অপমানজনক কোনো প্রশ্ন বোদলেয়ার বিষয়ে করেননি।

বাড়িওয়ালা বোদলেয়ারকে আটকালেন। তখন বোদলেয়ার লিখলেন দ্বিতীয় চিঠি : আমি এক্ষুনি আনসেলের বাড়িতে যাচ্ছি না বটে, কিন্তু আনসেলকে ক্ষমা চাইতেই হবে। তাকে তুমি ধমকাবে।

তৃতীয় চিঠিতে লিখলেন, অপমানে আমার সারা শরীর জ্বলছে, আনসেল যদি ক্ষমা না চায়, প্রতিশোধ না নিলে আমি শান্ত হতে পারবো না। আমি আনসেলকে থাপ্পড় মারবো, ওর ছেলেকে থাপ্পড় মারবো। তারপর গুণ্ডামির অভিযোগে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যায় তো যাক।

পরের চিঠি লেখার সময় বোদলেয়ারের স্ট্যাম্প কেনারও পয়সা ছিল না। বিয়রিং চিঠি পাঠালেন মাকে। ততক্ষণে তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব জড়ো হয়েছে, তারা কবিকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতে লাগলো।

সপ্তম চিঠিতে বোদলেয়ার লিখছেন, সবাই বলছে, ছেলেমেয়েদের সামনে একজন বৃদ্ধ লোককে চড় মারা একটা নোংরা কাজ। ঠিক আছে, তা আমি করবো না, কিন্তু আমার অপমানের জ্বালা মিটবে কিসে? ও যদি ক্ষমা না চায়, আমি ওর বাড়িতে গিয়ে ওর বউ ছেলেমেয়েদের সামনে আমি আমার যা মনে আসে বলবো। এর পরেও যদি লোকটা আমাকে অপমান করে? বাড়ি থেকে বার করে দেয়? মা, তুমি তোমার ছেলেকে এ কী সাঙ্ঘাতিক বিশ্রী অবস্থায় ফেললে?

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এতগুলি চিঠি লেখার ফলে বোদলেয়ার অসুস্থ হয়ে পড়লেন খুব। বিছানায় শুয়ে রইলেন সাত দিন।

২২

সকলেরই মুখে সূর্যাস্তের কথা
পৃথিবীর এ অঞ্চলে সব পর্যটকরাই
সূর্যাস্ত বিষয়ে কথা বলতে একমত
এমন অসংখ্য বই আছে,
যাতে শুধু সূর্যাস্তেরই বর্ণনা
গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যাস্ত
হ্যাঁ, সত্যি ভারি চমৎকার
কিন্তু আমি ভালোবাসি সূর্যোদয়
ভোর
আমি একটি প্রত্যূষও হারাই না
আমি ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি
নগ্ন
আমি একা সূর্যোদয়ের বন্দনা করি
কিন্তু আমি সূর্যোদয়ের বর্ণনা করতে চাই না
আমি আমার ভোরগুলি শুধু
নিজের জন্যই রেখে দেবো।

—*ব্রেইজ স্যাঁদরার*

পৃথিবীতে যতগুলো সমুদ্র আছে, তাদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরই হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ। এশিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপের মাঝখানের এই সমুদ্রের ওপর দিয়েই মানব সভ্যতা অনেকবার পারাপার করেছে। তা ছাড়া এই সমুদ্রটি দেখতে যত সুন্দর, তেমনই উপকারী। এর জল নরডিক রূপসীদের চোখের তারার মতন নীল। এখানে বড় বড় ঢেউ ওঠে না, তাই বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম, সেকেলে জাহাজগুলিও এই সমুদ্র অনায়াসে পার হয়ে গেছে। এখনও সন্তরণকারীরা নির্ভাবনায় বহুদূর চলে যায়, মায়েরা তাদের দু'তিন বছরের বাচ্চাদেরও দু'হাতে দুটি বেলুন বেঁধে এই সমুদ্রে ছেড়ে দেয়। হাঙর-কুমিরের মতন হিংস্র প্রাণীদের উৎপাতের কথা কখনো শোনা যায়নি। তার বদলে আছে প্রচুর মাছ, জাল ফেললেই জালভর্তি রুপোলি মাছ উঠে আসে। ভূমধ্যসাগর যেন এক বিশাল, নিরাপদ অ্যাকোয়ারিয়াম।

এই সমুদ্রকে ঘিরে অনেকগুলি দেশ, স্পেইন, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস, টার্কি, সিরিয়া, ইজিপ্ট, লিবিয়া, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া। তবু দক্ষিণ ফ্রান্সের বেলাভূমিই বিশ্ববিখ্যাত, ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা সারা পৃথিবীর বিলাসীদের লীলাভূমি। কাছাকাছি ইতালিয়ান রিভিয়েরা'রও সুনাম আছে। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা'র আবহাওয়াও একটা বিশেষ আকর্ষণ, কখনো এখানে খুব শীত

পড়ে না, তুষারপাত হয় না, আবার গ্রীষ্মকালেও গরমের আঁচ নেই।

পর্যটকরা এখানে টাকা খরচ করতে আসে, তাই সুদীর্ঘ বেলাভূমি সাজানো হয়েছে অতি সুন্দর ভাবে। বালির ওপরেই বেঁটে বেঁটে পাম ও খেজুর গাছ, কোথাও ফুলের সমারোহ। যে-জায়গাগুলো শুধু পাথুরে ছিল, সেখানেও জাহাজে করে বালি এনে ফেলা হয়েছে। একসঙ্গে এত হোটেল ও রেস্তোরাঁর সমাবেশও পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। আমরা চার বাঙালী এর মধ্যে পয়সার হিসেব করে চলি, দিনের বেলা সস্তার খাবার কিনি কিংবা স্যান্ডুইচ খেয়ে পেট ভরাই, রাত্তিরে বড় বড় হোটেলগুলি এড়িয়ে গলিঘুঁজির মধ্যে ছোট ছোট দোকান, যেখানে স্বামী-স্ত্রী মিলে রান্না করে খাওয়ায়, সেখানে ঢুকে পড়ি। বড় হোটেলের চেয়ে তাদের রান্না অনেক সময় বেশি সুস্বাদু হয়। অসীম-ভাস্কর-মৃণাল নিজেদের মধ্যে কিছু একটা চুক্তি করে রেখেছে, আমাকে তারা পয়সা খরচ করার সুযোগই দেয় না।

সকাল থেকেই এখানে চলে স্নানের উৎসব।

রিভিয়েরাতে এসে কেউ ঘরে বসে থাকতে চায় না। সমুদ্রই এখানকার প্রধান আকর্ষণ, যে-যতক্ষণ পারে সমুদ্রকে উপভোগ করে। সাজ-পোশাকের বালাই নেই, একখানা তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হলো। কেউ কেউ চার পাঁচ ঘণ্টা জলের মধ্যে কাটিয়ে দেয়, কেউ খানিকক্ষণ সমুদ্রে গা ভাসিয়ে আবার বালির ওপর শুয়ে থাকে।

আমরা বেলাভূমির নানা অংশ ও ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে ঘুরে ঘুরে স্নানের জায়গা বদল করি। যে যেখানে খুশি যেতে পারে, কোনো বাধা নেই। এখানে বিশ্বের বহু ধনীর নিজস্ব বাড়ি আছে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। এক সময় কেউ কেউ নিজের বাড়ির দরজা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বেড়া বা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল, যাতে সেই জায়গার সমুদ্রটুকু তাদের নিজস্ব হয়ে যায়, তাদের প্রাইভেসি কেউ নষ্ট না করে। কিন্তু ফরাসী সরকারের আদেশবলে সেই সব বেড়া ও পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কারণ, যে-কোনো সাধারণ মানুষেরই সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটার অধিকার আছে, সমুদ্রের সৌন্দর্যকে কেউ ব্যক্তিগত সম্পত্তি করতে পারবে না। বিখ্যাত চিত্রতারকা ব্রিজিৎ বারদো-র নিজস্ব বাড়ি আছে সাঁ ত্রোপে নামে এক নির্জন অংশে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ব্রিজিৎ বারদো'র নাম শুনলে বুক কাঁপতো না, এমন সিনেমা-দর্শক পুরুষের সংখ্যা বিরল। রজার ভাদিমের ছবি 'অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড উয়োম্যান' দেখে মনে হয়েছিল ব্রিজিৎ যেন পৃথিবীর নারী-সৌন্দর্যের প্রতীক। আমেরিকায় মেরিলিন মনরো, ইউরোপে ব্রিজিৎ বারদো। মেরিলিন যৌবন থাকতে থাকতেই আত্মহত্যা করে, ব্রিজিৎ যৌবন ফুরোবার আগেই সিনেমা থেকে বিদায় নেয়। গ্রেটা গার্বো যেমন কোনোদিন মা-মাসি-পিসির ভূমিকায় অভিনয় করেনি, নায়িকা থাকতে থাকতেই আত্ম-নির্বাসনে চলে যায়, কোনোদিন আর বাইরের লোকের সামনে দেখা দেয়নি, ব্রিজিৎ বারদো-ও তেমনি এখানে একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে। তার জন্তু-জানোয়ারের খুব শখ। মানুষের সঙ্গ পরিহার করে সেই রূপবতী এখন ঘোড়া ও কুকুরদের সঙ্গে সময় কাটায়।

ব্রিজিৎ বারদো'র বাড়ির সামনের পাঁচিলও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে সেখান দিয়েও হেঁটে যাওয়া যায়, আমরা অবশ্য যাইনি। চতুর্দিকেই অসংখ্য সুন্দরী, আলাদা করে সিনেমার নায়িকাকে দেখার কোনো প্রয়োজন হয় না।

সমুদ্রতীরে সাধারণ মানুষের এই অধিকারের কথা শুনে আমার মনে পড়ে সুইডেনের কথা। স্টকহল্‌মে গিয়ে একটা সুন্দর নিয়মের কথা শুনেছিলাম। প্রকৃতির ওপর সব

মানুষের সমান অধিকার। সুইডেনে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আছে। স্টকহলমের কাছেই নাকি চব্বিশ হাজার। ইচ্ছে করলেই পুরো একটা দ্বীপ কিনে ফেলা যায়। অন্যান্য দেশে যেমন লোকের গাড়ি থাকে, সুইডেনে অনেকের থাকে নিজস্ব মটোর বোট বা লঞ্চ। শহর থেকে নিজস্ব মটোর বোটে, নিজস্ব দ্বীপে তারা ছুটি কাটাতে যায়। কিন্তু সেই সব দ্বীপে অন্য যে-কেউই পা দিতে পারবে, কেউ যদি দল বেঁধে কোনো দ্বীপে পিকনিক করতে চায়, মালিক বাধা দিতে পারবে না। এমনকি বাগানের ফুল-ফলও মালিকের একার নয়, সেও তো প্রকৃতির দান, যার ইচ্ছে হবে সেই ফল ছিঁড়ে খেতে পারে। এমনকি রাজার বাগানও ব্যতিক্রম নয়। আমি নিজে স্টকহলমের রাজার বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখেছি, বহু অফিসযাত্রী সেই বাগানের রাস্তায় শর্টকাট করে। রাজার পুকুরে বাইরের লোক এসে সাঁতার কাটে। অবশ্য ফুল-ফল ছিঁড়তে কারুকে দেখা যায় না, অনেক গাছ থেকে আপেল-আঙুর এমনিই ঝরে পড়ে যায়, কেউ খায় না।

সারাদিন স্নানের পর বিকেলবেলা আমরা পা ছড়িয়ে বসে থাকি বালিতে। ভূমধ্যসাগরের সূর্যাস্ত না দেখে ঘরে ফেরার কোনো মানে হয় না। প্রথমবার প্রবাসবাসের শেষে দেশে ফেরার সময় আমি বিমানে বসে এক সূর্যাস্ত দেখেছিলাম, সেই দৃশ্য আমার মনে আজও জ্বলজ্বল করে। আথেন্‌স থেকে বিমানটি উড়ে যাচ্ছিল কায়রো'র দিকে, এই ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়েই। পাশ্চাত্য ছেড়ে আমি আসছি প্রাচ্যের দিকে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হলো পেছনের ইওরোপ যেন প্রবল আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর সামনের প্রাচ্য দেশে জমাট অন্ধকার!

এবারে এখানকার সূর্যাস্তে সেই আগুনের দীপ্তি নেই, সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেল সোনালি আভা, সমুদ্রের নীল জলে যেন অন্তরীক্ষ থেকে ঝরে পড়ছে অসংখ্য স্বর্ণময় তীর। কিংবা স্বর্ণরেণুর বৃষ্টি।

অসীম বললো, ভাস্কর, এখানকার সানরাইজ আরও সুন্দর। কিন্তু তোমার তো দেখা হবে না, তুমি আটটার আগে ঘুম থেকে উঠবেই না!

ভাস্কর বললো, সানরাইজ আর সানসেট দুটো একসঙ্গে হজম হবে না ভাই। একটাই যথেষ্ট!

অসীম আবার বললো, জীবনে কখনো কি সূর্য ওঠার আগে বিছানা ছেড়ে উঠেছো?

ভাস্কর বললো, খামোখা ভোরবেলা জাগতে যাবো কোন দুঃখে? আমি কি মেথর না মুদ্দোফরাস?

দু'জনের খুনসুটি চললো কিছুক্ষণ। তখন আমার মনে পড়লো ব্রেইজ স্যাঁদরার উপরি-উদ্ধৃত কবিতাটি। সত্যিই তো, সূর্যাস্তের বর্ণনা যত লোক লিখেছে, সূর্যোদয়ের বর্ণনা সেই তুলনায় অনেক কম। আমাদের মুনি-ঋষিরা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, গরমের দেশে তবু অনেকে ভোরবেলা ওঠে, কিন্তু এই সব ঠাণ্ডার দেশে খুব ভোরে কার বা বিছানা ছাড়তে সাধ হয়!

হঠাৎ আর একটা কথাও মনে পড়লো। এই কবিকে নিয়ে মার্গারিটের সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্ক হতো! ব্রেইজ স্যাঁদরার সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের গুরু, সেইজন্য তাঁকে আমার খুব পছন্দ, কিন্তু মার্গারিট বলতো, স্যাঁদরার গুরু হলে কী হয়, তাঁর কবিতা নীরস, কর্কশ! তাঁর চেয়ে পীয়ের রেভার্দি অনেক বড়! আমি আবার বলতাম, পীয়ের রেভার্দি কাপুরুষ। সে কবিতা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল!

পীয়ের রেভার্দির জন্ম এই সাউথ অফ ফ্রান্সেই, গত শতাব্দীর শেষ বছরে। অল্প বয়েসে

প্যারিসে গিয়েছিলেন একটা খবরের কাগজে প্রুফ রীডারের চাকরি নিয়ে। তখন শিল্পে চলছে কিউবিস্টদের আন্দোলন, সাহিত্যে ডাডাইস্ট ও সুররিয়ালিস্টদের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। পীয়ের রেভার্দি এর মধ্যে জড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গীয়ম আপোলিনেয়ারের মতন পীয়ের রেভার্দিকেও যুদ্ধে যেতে হলো। দুজনেই ফিরে এলেন যুদ্ধ শেষ হবার আগেই, আপোলিনেয়ার মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে, রেভার্দি ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে। এর কিছুদিন পরে প্রকাশিত হলো বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'নর-সুদ' (উত্তর-দক্ষিণ), রেভার্দি মেতে উঠলেন তা নিয়ে, তিনি তখন সাহিত্য জগতের তরুণ বিপ্লবী। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর মনোজগতে কী পরিবর্তন এলো কে জানে। বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়ে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন, শুধু তাই নয়, তিনি চলে গেলেন এক নির্জন মঠে। লেখা তো বন্ধ করলেন বটেই, অন্য কারুর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখলেন না। পীয়ের রেভার্দি এর পরেও বেঁচে ছিলেন ৩৪ বছর, কিন্তু সাহিত্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ পলাতক। মার্গারিট গোঁড়া ক্যাথলিক, সেইজন্যই পীয়ের রেভার্দিকে তার খুব পছন্দ ছিল।

এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্ত আসে। আমার বুকটা কেঁপে উঠলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা অসীম, ফ্রান্সে যদি কোনো মেয়ে নান্ বা সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়, তা হলে তারা কি বাইরের কোনো লোককে চিঠিপত্রও লিখতে পারে না?

অসীম ধীর স্বরে বললো, তোমার বুঝি সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছে? মার্গারিট?

আমি বললাম, মার্গারিট বলতো, ওদের পরিবার খুব ধর্মভীরু। ওর এক বোন সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠে থাকে। ওর বাবা মা তাতে খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন। মার্গারিট কবিতা ভালোবাসতো খুব, ওয়াইন ভালোবাসতো, একটু-আধটু সিগারেটও টানতো, সেই জন্য সন্ন্যাসিনী হয়নি, কিন্তু গীর্জায় যাওয়া, বিশেষ বিশেষ খ্রীস্টান পরবে উপোস করা বাদ দিত না। আমি পল এঙ্গেলের কাছে যা শুনেছি, কয়েকজন কালো লম্পট ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারা ওর ওপর শারীরিক অত্যাচার ও চরম অবমাননার পর যদি কোথাও ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়, তারপর যদি কোনোক্রমে ও বেঁচে ওঠে, তা হলে—

ভাস্কর বললো, তুই দুঃখ পাবি, তবু বলছি, সাধারণত ওরা চান্স নেয় না, একেবারে মেরেই ফেলে, মেরে কোনো এঁদো-জলার মধ্যে ফেলে দিয়ে যায়।

আমি বললাম, ওর শরীরটা তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুতরাং বেঁচে থাকা একেবারে অসম্ভব কী? ধর যদি বেঁচে থাকে, তা হলে অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় ও হয়তো নান্ হয়ে যেতে পারে। পারে না?

অসীম বললো, তা হতে পারে। ওদের পরিবারে যখন ট্র্যাডিশান আছে, তাতে এটা অসম্ভব নয়। যদি সে কোনো মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকে, তা হলে সে আর তোমাকে চিঠি লিখবে না। বাইরের কারুর সঙ্গে এ রকম যোগাযোগ ওদের রাখতে নেই।

আমি বললাম, ওর বাবা-মাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। তাঁরা উত্তর দেননি। সেটাও কি এই কারণে হতে পারে? সন্ন্যাসিনীদের সমস্ত পূর্ব পরিচয় একেবারে মুছে ফেলতে হয়?

অসীম বললো, মেয়েটি যদি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়ে থাকে, তাতেও তো তোমার খুশি হওয়ার কথা। সে বেঁচে আছে। এই ফ্রান্সেরই কোথাও সে আছে।

ভাস্কর বললো, এরপর নান্‌দের কোনো শোভাযাত্রা দেখলেই সুনীল খুব খুঁটিয়ে দেখবে। যদি মেয়েটাকে চিনতে পারে!

অসীম বললো, সুনীল চিনলেও সে মেয়েটি চিনবে না। খুব সম্ভবত সে সুনীলের সঙ্গে

একটাও কথা বলবে না।

আমি বললাম, কথা না বলুক, চিনতে না পারুক, তবু সে বেঁচে থাক। আচ্ছা অসীম, মঠে যারা সন্ন্যাসিনী হয়, তারা কি শুধু বাইবেল পড়ে, না অন্য কবিতাও পড়ে ? মার্গারিট এমন কবিতা-পাগল ছিল, সব কি ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ?

অসীম বললো, এত সব আমি জানবো কী করে ? আমার কি কোনা নান্-এর সঙ্গে প্রেম হয়েছে ? তবে যতদূর মনে হয়, আধুনিক কবিতা-টবিতা ওদের পড়তে দেওয়া হয় না। তাতে চিত্ত-বিক্ষোভ হতে পারে। নান্ হওয়া তো ছেলেখেলা নয়, সারাজীবনের মতন নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দিতে হয়।

ভাস্কর বললো, সাউন্ড অফ মিউজিক সিনেমাটা হবার পর আমরা অ্যাবে-র ভেতরকার জীবন অনেকটা দেখতে পেয়েছি। কোনো নান্ যদি জুলি অ্যান্ড্রুজ-এর মতন হয়, গান গাইতে ভালোবাসে, টম বয়ের মতন ছুটোছুটি করে···।

তারপর ভাস্কর সাউন্ড অফ মিউজিকের একটা গানের লাইন গুনগুন করলো, হাউ টু সল্ভ আ প্রবলেম লাইক মারিয়া—

অসীম আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, তুমি ঠিক বলেছো। আমার সঙ্গে ওর আর দেখা না হোক, আমাকে চিনতে না পারুক দৈবাৎ দেখা হলেও, তবু ও বেঁচে থাক।

সূর্যাস্তের আলো অনেকক্ষণ লেগে থাকে আকাশের গায়। পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসার পর আমাদের উঠে পড়তে হলো।

অসীম বললো, ভাস্কর, তুমি হোটেলের মালিক আর তার বউকে নেমন্তন্ন করেছো। তোমাকে এখন গিয়ে রান্না করতে হবে, মনে রেখো!

ভাস্কর বললো, সে ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়! ম্যাজিক দেখাবো, ম্যাজিক!

মৃণাল লন্ডনে ভাস্করের প্রতিবেশী। সে জানালো যে ভাস্কর শুধু ওমলেট ছাড়া আর কিছু রান্না করতে জানে, এমন কখনো শোনা যায়নি। ভিক্টোরিয়া কখনো দেশে গেলে ভাস্কর যাতে দিনের পর দিন শুধু টোস্ট আর ওমলেট খেয়ে না কাটায়, সেইজন্য তার প্রতিবেশীরা তাকে প্রত্যেক দিন নেমন্তন্ন করে।

আমিও ভাস্করের বানানো ওমলেট ছাড়া অন্য কিছু কখনো খাইনি। কিছু একটা মাংস আমিও রেঁধে ফেলতে পারি, অসীম কিংবা মৃণালও ভালোই রান্না জানে। কিন্তু অসীম জেদ ধরে আছে, ভাস্করকেই রাঁধতে হবে! কারণ, ভাস্কর আগ বাড়িয়ে হোটেলের মালিককে নেমন্তন্ন করতে গেল কেন ? কোথায় হোটেলের মালিক আমাদের খাওয়াবে, তা নয়, এ যে উল্টো!

ভাস্করের বক্তব্য এই যে, বিদেশ-বিভূঁইয়ে এসে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা না করলে লাভ কী ? আর হোটেলের মালিক যখন কবি, তখন তার সঙ্গে আড্ডা মারা বিশেষ দরকার। তা ছাড়া, আমরা একবার খাওয়ালে পরদিন হোটেলের মালিকও নিশ্চয়ই আমাদের ভোজ দেবে। নতুন ধরনের কর্সিকান রান্না খাওয়া যাবে!

আমি চুপি চুপি ভাস্করকে বললাম, এখানে একটা গ্রীক দোকান দেখেছি, চল সেখান থেকে রান্না মাংস কিনে নিয়ে যাই। গ্রীক রান্না আর ভারতীয় রান্না অনেকটা এক রকম।

ভাস্কর ধমক দিয়ে বললো, চুপ কর না! দ্যাখ না কী করি। আদা চাই, অনেকখানি আদা!

সব সুপার মার্কেটেই আদা পাওয়া যায়। আলু, মাংস, পেঁয়াজ আরও কী সব কিনলো ভাস্কর। তারপর ফেরা হলো হোটেলে।

হোটেলের তরুণ মালিক লুই একটু লাজুক ধরনের। তার স্ত্রী ইংরেজ, বয়েসে খানিকটা বড়, তাকে দেখলে অভিনেত্রী মনে হয়। সত্যি সে স্টেজে কিছুদিন অভিনয় করেছিল, তার মুখখানা অতিশয় ধারালো। লুই নিজের কবিতা পাঠ করতে লজ্জা পায়, তার কবিতা পড়ে শোনালো তার স্ত্রী। লুই আবৃত্তি করলো বোদলেয়ারের কবিতা। আমরা বসে আছি চওড়া বারান্দায়, আমাদের পায়ের কাছে লুটোচ্ছে চাঁদের আলো।

ভাস্কর রান্নাঘরে গিয়ে বিপুল উদ্যমে রান্না শুরু করে দিল। মাঝে মাঝেই বাসনপত্র পড়ে যাওয়ার ঝন-ঝন, ঠন-ঠনাৎ শব্দ হচ্ছে। ভাস্কর ঘুরে ঘুরে এসে কবিতা শুনে যাচ্ছে, গেলাসে ওয়াইন ঢেলে রান্নাঘরে গিয়ে খাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে গেলাশ ভর্তি করতে। যেন রান্নাটা কোনো ব্যাপারই না!

মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ভাস্কর হাত ধুয়ে এসে বললো, রান্না কমপ্লিট। ভাত, মাংস, সালাড। আমরা সভয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম। অতিথিরা কী বলবে কে জানে!

আমিই প্রথমে খানিকটা মাংস টেস্ট করলাম। তারপর বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সত্যিই যে ম্যাজিক। অপূর্ব সুন্দর স্বাদ হয়েছে। নুন, ঝাল, মশলা সব ঠিকঠাক।

অতিথি দু'জনও ধন্য ধন্য করতে লাগলো। সেটা যে নিছক ভদ্রতা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাদের খাওয়ার পরিমাণে। কর্সিকান কবিটি তিনবার মাংস চেয়ে নিল। তার ইংরেজ পত্নী বললো, আমরা এত ভালো রাঁধতে জানি না, তবু তোমরা যদি কাল রাত্তিরে আমাদের কাছে এসে খাও, তা হলে ধন্য হবো।

মুখে একটা চুরুট দিয়ে ভাস্কর বীরের মতন ভঙ্গিতে হাসলো আমাদের দিকে চেয়ে।

২৩

...আকাশ কুয়াশা ছাড়া কিছুই না,
শূন্যতা শুধু জল
দেখো, এখন সব কিছুই মিশ্রিত, তবু চারপাশে আমি
খুঁজি রেখা ও আঙ্কিক
দিগন্তের জন্যও কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার
রঙের অবশেষ
সব দ্রব্য মিলিত হয়েছে এক জলে, যে জল
আমি অনুভব করি
আমার চিবুকে গড়ানো অশ্রুর ধারায়...

—পল ক্লোদেল

কান্ শহরটির পরিচিতি আমাদের কাছে প্রধানত চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য। প্রত্যেক বছর কান্ ফিল্ম ফেস্টিভালের প্রতি থাকে সারা বিশ্বের ফিল্ম-বাফদের মনোযোগ। এই ফেস্টিভালেরই একটি শাখায় সত্যজিৎ রায় নামের এক অখ্যাত তরুণ পরিচালকের 'পথের পাঁচালী' নামে একটি ফিল্ম পুরস্কৃত হয়ে পৃথিবীবিখ্যাত হয়।

অনেকে এই শহরটির নাম উচ্চারণ করে ক্যান্। কান্ না ক্যান্, কোনটা সঠিক আমি জানি না। তবে নামটির উৎপত্তি খুব সম্ভবত বেতসকুঞ্জ থেকে, এককালে এখানকার বালিয়াড়িতে বেতের ঝাড় ছিল অনেক।

রিভিয়েরাতে উপকূলবর্তী পর পর চোখ ধাঁধানো সব কটি শহরই এক সময় ছিল জেলেদের গ্রাম। তবু এসব গ্রামেরও দু' হাজার বছরের ইতিহাস আছে। ফোসিয়ান, কেল্ট ও রোমানরা এই সব গ্রামের অধিকার নিয়ে লড়ালড়ি করেছে। দশম শতাব্দীতে প্রাচ্যদেশ থেকে মুসলমানরা রণতরীতে এসে একাধিকবার আক্রমণ করেছে এই উপকূল।

নেপোলিয়ান যখন এলবা দ্বীপের নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসেন, তখন প্রথম রাত্তিরটা তাঁবু গেড়েছিলেন এই কান্ গ্রামের বালিয়াড়িতে। ছোটখাটো একটি অনুচরবাহিনী সংগ্রহ করে এখান থেকে শুরু হয় তাঁর প্যারিস অভিযান।

আমরা গাড়ি চালিয়ে এক দুপুরবেলা উপস্থিত হলাম কান্ শহরে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সময় এখানে চিত্রতারকা, হবু চিত্রতারকা এবং সুযোগ সন্ধানীরা গিসগিস করে, এখন সেসব কিছু নেই, অন্য শহরগুলির মতনই টুরিস্টদের ভিড়। সকালবেলা এক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েছিল, এখন আবার নরম রোদ উঠেছে। বেলাভূমিতে শুয়ে আছে হাজার হাজার নারী পুরুষ। কারুরই উর্ধ্বাঙ্গে কোনো বস্ত্র নেই, আর নিম্নাঙ্গের পোশাক সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর বর্ণনা ধার করে বলা যায়, 'আমার গলার টাই দিয়ে তিনটে মেয়ের জাঙ্গিয়া হয়

যায়।'

আমরা কেউ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নই, প্রায়-অনাবৃতা রমণীদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই। কিন্তু প্রথম দু' একদিন যে-রকম চিত্ত চাঞ্চল্য হচ্ছিল, আস্তে আস্তে তা বেশ কমে গেল, এখন পাশ দিয়ে কোনো আধা-উর্বশী হেঁটে গেলেও তেমন আকর্ষণ বোধ করি না, ফিরেও তাকাই না। আমি জন্ম-রোমান্টিক, নারীদের খানিকটা কল্পনার রহস্যে মুড়ে রাখতে চাই। এরকম প্রকাশ্য নগ্নতা আমার অরুচিকর লাগে।

জমকালো হোটেলগুলি দেখতে দেখতে এক সময় মনে হয়, দুশো বছর আগেকার কোনো জেলে যদি হঠাৎ এখানে ফিরে আসতো, তা হলে তাদের গ্রামটাকে কি চিনতে পারতো ? স্বয়ং নেপোলিয়ানই যদি আবার আসতেন, তিনিও নিশ্চয়ই ভাবতেন, এ কোন্ অচেনা স্বর্গপুরীতে এলাম রে বাবা !

রিভিয়েরার গ্রামগুলির এই হঠাৎ সমৃদ্ধির মূলে আছে ইংরেজরা। এক সময় তারা ফ্রান্সের অনেকটা অংশ দখল করেছিল। ইংরেজরা দ্বীপবাসী হলেও তাদের নিজস্ব কোনো উল্লেখযোগ্য বীচ নেই। ফরাসীদেশের এই গ্রামগুলিতে তারা স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করতে শুরু করে। যতই ধুরন্ধর ব্যবসায়ী হোক, ইংরেজদের যে সৌন্দর্যসন্ধানী চোখ আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দার্জিলিং-কালিম্পং-এর মতন সুন্দর পাহাড়ী শহর যে বানানো যায়, তা ইংরেজরাই তো খুঁজে বার করেছিল। বাঙালীরা পুরীতে তীর্থ করতে গেছে কিন্তু বাংলায় কোনো উপকূল-নগরী বানায়নি, আর নিজের দেশের মধ্যে এত চমৎকার পাহাড় থাকতেও পাহাড়চূড়ায় বসতি স্থাপনের কথা তাদের মাথাতেই আসেনি।

উপকূলের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে আমরা এক সময় নিস্ শহর ছাড়িয়ে গেলাম। কান্ আর নিস্-এর বহিরঙ্গ রূপের তেমন কিছু তফাত নেই। সেই বড় বড় হোটেল, পাম গাছের সারি ও বালির ওপর শুয়ে থাকা নারী-পুরুষ। নিস্ শহরে না থেমে আমরা চলে গেলাম মনাকো।

ফ্রান্স আর ইতালির মাঝখানে মনাকো একটা আলাদা রাজ্য। ভূমধ্যসাগরের কিনারে ছোট্ট একটা বিন্দু। মনাকোতে কোনো গ্রামবাসী থাকে না, কারণ গ্রামই নেই, একটা শহরই একটা রাজ্য। স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র চব্বিশ হাজার।

আমাদের ছাত্র বয়েসে এই মনাকোর রাজা আমাদের বুকে বড়ো দাগা দিয়েছিলেন। মনাকোর নাম তখনই প্রথম শুনি ! চলচ্চিত্র জগতে আমাদের প্রিয় নায়িকা ছিল গ্রেস কেলি, তাকে এই মনাকোর রাজা বিয়ে করে একেবারে চলচ্চিত্র জগৎ থেকেই সরিয়ে নিয়ে গেল। কান্ট্রি গার্ল, রিয়ার উইণ্ডোতে গ্রেস কেলি অপূর্ব অভিনয় করেছিল। গ্রেস কেলির সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তার সারল্য মাখা মুখখানা দেখলে মনে হতো, খুব সাধারণ মেয়ে, যেন পাশের বাড়িতেই থাকে। সেই গ্রেস কেলি হয়ে গেল রানী। বড়লোকরা সিনেমার নায়িকাদের যখন তখন বিয়ে করে নিয়ে যেত তখন, বিশ্ববিখ্যাত ধনী আগা খাঁর ছেলে যেমন হলিউড থেকে হরণ করেছিল রিটা হেওয়ার্থকে।

এ রাজ্যে ঢুকতে আলাদা কোনো ভিসা লাগে না। গাড়ি পার্ক করে আমরা হাঁটছি, রাস্তার এক পাশে শুধু হীরে-জহরতের দোকান।

অসীম বললো, সুনীল, এর কোনো একটা দোকানে ঢোকার চেষ্টা করবে নাকি ?

আমি বললাম, কেন, ঢুকতে দেবে না নাকি ?

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এসব দেশে যত বড়লোকি দোকান কিংবা হোটেলই হোক, সেখান থেকে আমি কিছু কিনি বা না কিনি, থাকি বা না থাকি, তবু ঢুকতে কেউ বাধা দেয়

না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এখানে এমনই প্রবল যে কারুর পোশাক দেখে তার ক্রয়ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তোলে না। সেই জন্যই অসীমের প্রশ্ন শুনে আমার একটু খটকা লাগলো।

অসীম বললো, না, না, ঢুকতে দেবে নিশ্চয়ই। ঢুকে একটা মুক্তোর মালার দাম জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না কী হয়।

বুঝতে পারলাম, অসীম আমার সঙ্গে কিছু একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক করতে চাইছে। ঐ ফাঁদে আমি পা দিই, মাথা খারাপ!

চেপে ধরতে অসীম বললো, ঐ সব দোকানের নাকি বিশেষ একটা কায়দা আছে। ঐ সব দোকানের আসল খদ্দেররা কেউ কক্ষনো কোনো জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করে না। কেউ দাম জিজ্ঞেস করলেই দোকানদাররা বুঝে নেবে, সে লোক ঐ দ্রব্য কেনার উপযুক্ত নয়। খুব বিনীতভাবে তাকে জানাবে, ওটা বিক্রির জন্য নয়। আসল খদ্দের কোনো একটা জিনিস পছন্দ করে বলবে, এটা আমার হোটেলে পাঠিয়ে দিন। সেই সব খদ্দেররা নিজেদের কাছে পয়সাও রাখে না, তারা পেছন ফিরে সেক্রেটারিদের বলে, পেমেন্ট করে দিও।

দোকানগুলোর শো-কেসে লক্ষ-কোটি টাকা দামের হীরে-মুক্তোর হার সাজানো রয়েছে। এসব জিনিস বাপের জন্মে দেখিনি, দেখতে ক্ষতি কী? সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ বাধা দেয় না।

আর একটু এগোলেই দুনিয়াখ্যাত জুয়োর আড্ডা, মন্টিকার্লো। বহু কোটিপতি এখানে নিঃস্ব হতে আসে। জোচ্চোর ছাড়া, জুয়োখেলায় শেষ পর্যন্ত কেউ জেতে, এমন কদাচিৎ শোনা যায়। কাছাকাছি বড় হোটেলগুলি থেকে এই মন্টিকার্লোতে যাবার জন্য মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ আছে। পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ওপরের রাস্তা দিয়ে কেউ যেতে সাহস করে না, মাঝপথে ছিনতাই হয়ে যেতে পারে।

আমরা মন্টিকার্লোর সামনে দাঁড়ালাম। বাড়িখানাও দেখবার মতন, সোনালি রঙের বিশাল গেট। ইচ্ছে করলেই ভেতরে ঢোকা যায়, পকেটে পয়সা না থাকলেও ঢুকে এক চক্কর মেরে বেরিয়ে এলে কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু জুয়াখানা দেখার কোনো আগ্রহ বোধ করলাম না।

মনাকো এমনই একটি রাজ্য, যেখানে একজনও গরিব নাগরিক নেই। প্রত্যেকের গাড়ি আছে, টেলিফোন আছে, টি ভি আছে। স্বর্গ-টর্গ কি এই রকমই? আমরা গরিবদেশের মানুষ, পৃথিবীরই একটা অংশের এরকম সচ্ছলতা দেখলে আমাদের ঈর্ষা হয়, রাগও হয়। এখানকার ট্রাফিক পুলিশদের পর্যন্ত সাজপোশাক দারুণ, প্রত্যেকের হাতে সাদা গ্লাভস!

ভাস্কর অনেকটা অকারণ ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, হুঁ, ব্যাটারা সাদা হাত দেখাচ্ছে! ফুটানি কত!

বলাই বাহুল্য, রাস্তাঘাটগুলো ঝকঝকে তকতকে। যেখানে সেখানে পার্ক। আমরা একটা পার্কে বসে আমাদের রুটি-মাখন-চিজ-সালামি বার করে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে খেতে শুরু করলাম। পার্কটা ধাপে ধাপে নিচের দিকে নেমে গেছে। একেবারে তলায় ঘন নীল সমুদ্র। যেন ওল্টানো আকাশ। অতি নয়নাভিরাম দৃশ্য। আমরা গরিবদেশের লোক হলেও এই দৃশ্যটি বিনা পয়সায় উপভোগ করা যায়। এখানে জনসংখ্যা এতই কম যে পার্কে লোকজন প্রায় দেখাই যায় না, তবু এত পার্ক বানিয়ে রেখেছে। আর কলকাতার মতন জনাকীর্ণ শহরে পার্কই নেই বলতে গেলে। আমার মতন নাস্তিকের মুখ দিয়েও আর একটু হলে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভগবানের কী অবিচার।

যারা আস্তিক, তাদের প্রতি আমার এই প্রশ্নটা করতে ইচ্ছে করে, তোমাদের ভগবান কি সত্যিই সব মানুষকে ভালোবাসে? এই যে একটা শহর, এখানে কিছু মানুষ নিছক জুয়াখেলাকে কেন্দ্র করে দিব্যি সুখে আছে, ভালো খাচ্ছে-দাচ্ছে, সব রকম আরাম ভোগ করছে। আর আমাদের দেশের একটা চাষা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু' বেলা খেতে পায় না। তবু তোমরা বলবে, সব মানুষের মধ্যে ভগবান আছে? নাকি এর পর পূর্বজন্মের কর্মফলের মতন গাঁজাখুরি ব্যাপারও মানতে হবে!

অসীম একটা খবরের কাগজ কিনেছিল, তাতে একটা মজার খবর বেরিয়েছে। একজন জেলে একটা বিরাট মাছ ধরেছে, সেটা সে বিক্রি করেছে একজন দোকানদারকে। দোকানদার সেই মাছটা কেটে দেখে, না, শকুন্তলার হারানো আংটি নয়, প্রায় আড়াই কেজি ডিম। মাছের পেটে ডিম থাকবে, এটা অভিনব কিছু নয়, কিন্তু মাছটা হচ্ছে স্টার্জন মাছ, সুতরাং তার পেটের ডিমটা হয়ে গেল ক্যাভিয়ের। ক্যাভিয়ের অতি দুর্মূল্য খাদ্য। মাছটার দাম বড়ো জোর হাজার খানেক টাকা হবে, কিন্তু ক্যাভিয়েরের দাম অন্তত এক লাখ টাকা। জেলেটি মাছটা চিনতে পারেনি, এখন দোকানদারের সৌভাগ্যোদয় দেখে সেও ডিমের বখরা দাবি করছে। কিন্তু দোকানদারই বা তা দেবে কেন, সে তো কিনেছে পুরো মাছটা।

মনাকোর মতন রাজ্যে এই সবই হচ্ছে বড় খবর।

পার্কে কিছুক্ষণ বসার পর আমরা গাড়িতে পুরো রাজ্যটাই এক চক্কর ঘুরে এলাম। আধ ঘণ্টাও লাগলো না, তাতেই একটা দেশ দেখা হয়ে গেল। এবার মনাকো ছেড়ে এসে অসীম গাড়ি চালালো সামনের দিকে।

কিছুক্ষণ পর খেয়াল হলো, আমরা ইতালিতে ঢুকে পড়েছি। আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, এ কী, কী করছো, গাড়ি ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও।

আমার ইতালিয়ান ভিসা নেই। অন্য তিনজন ইওরোপের যে-কোনো দেশে যখন খুশি যেতে পারে, কিন্তু আমাকে সীমান্তরক্ষীরা ক্যাঁক করে চেপে ধরবে। এর মধ্যে যে একটা চেকপোস্ট পেরিয়ে এসেছি, সেটা লক্ষই করিনি কেউ, ওরাও আটকায়নি। ফেরার পথে আমার বুক দুরদুর করতে লাগলো। আমাকে ওরা ধরে-টরে রাখবে কি না কে জানে।

কিন্তু খোলা গেট দিয়ে অসীম সোজা গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এলো। সীমান্তরক্ষীরা রোদ্দুরে চেয়ার পেতে বসে রেড ওয়াইন পান করছে। তারা খোসমেজাজে আছে, কোনো গাড়িই চেক করছে না। অর্থাৎ আমি বিনা ভিসায় অনায়াসে ইতালির মধ্যে চলে যেতে পারতাম।

আজকাল ভিসার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। কিন্তু বজ্র আঁটুনির মধ্যে ফস্কা গেরোও আছে। একবার সুইডেন থেকে নরওয়ে যাবার জন্য ভিসা জোগাড় করতে আমার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। এখন দেশ ছাড়ার আগে কোন কোন দেশে যেতে চাই, তা ঠিক করে ভিসা নিয়ে নিতে হয়। বিদেশে বসে হঠাৎ কোনো দেশের ভিসা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভবই বলতে গেলে। সেবারে আমার নরওয়ের ভিসা ছিল না, কিন্তু স্টকহল্‌মে থাকতে থাকতেই অস্‌লো'র একটি বাঙালী ক্লাব আমাকে নেমন্তন্ন করলো। কিন্তু যাই কী করে। শেষ পর্যন্ত অস্‌লোর উদ্যোক্তারা সেখানকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ধরে সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানিয়ে ভিসার ব্যবস্থা করেছিলেন, ভিসার ফি-ও দিতে হলো চার-পাঁচশো টাকা। সেই ভিসায় সশস্ত্র হয়ে আমি স্টকহল্‌ম থেকে ট্রেনে চাপলাম দুপুরবেলা। তারপর সারা দুপুর বিকেল সন্ধে দু' ধারের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে রাত প্রায় দশটার সময় পৌঁছোলাম অস্‌লোতে, এর মধ্যে কেউ একবারও আমার পাসপোর্ট দেখতে চায়নি, স্টেশানেও কেউ

আটকালো না। সুইডেন-নরওয়ের লোকেরা বিনা কিলায় প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াত করে, তার মধ্যে আমার মতন বিদেশী কেউ থাকবে কি না, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ কিসা জোগাড় করার কত কসরত।

সুইডেনের ট্রেনের একটি অভিজ্ঞতা আজও মনে পড়ে।

প্রথম দিকে কামরায় অনেক রকম যাত্রী ছিল। একজন অত্যন্ত রূপবান যুবক ও এক প্রৌঢ়া আমার সামনেই বসেছিল, ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ওয়াইন পান শুরু করে দিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তারা ইঙ্গিতে আমাকে ওয়াইনের একটা গেলাস দিতে চাইলো, কিন্তু অচেনা লোকদের কাছ থেকে আমি ওয়াইনে ভাগ বসাতে যাবো কেন? আমার প্রস্তাবখানে মহিলাটি বেশ চটে গেলেন মনে হলো। যুবকটির সঙ্গে মহিলাটির বয়েস তফাত অন্তত পনেরো বছর তো হবেই। যুবকটিকে রাজকুমারের মতন দেখতে বললে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু মহিলাটির মুখে বেশ ভাঁজ পড়ে গেছে, চুল এলোমেলো, একটুক্ষণের মধ্যেই তিনি বেশ মাতাল হয়ে গেলেন। শ্বেতাঙ্গ জাতিদের মধ্যে দেখেছি, একমাত্র সুইডিসরাই প্রকাশ্যে মাতলামি করতে লজ্জা পায় না। মহিলাটির ব্যবহার রীতিমতন বিরক্তিকর, কিন্তু যুবকটি নারুণ ধৈর্যে ও মমতায় মহিলাটিকে সামলাচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে তার ওষ্ঠে চুম্বন করছিল।

এদের দু' জনের মধ্যে কী সম্পর্ক তাই-ই আমি বুঝতে পারছিলাম না। এই দুটি চরিত্রকে নিয়ে যেন একটা গল্প লেখা যায়, শুধু ভেতরের কথা একটু জানা দরকার। কিন্তু নেশাগ্রস্ত মহিলাটি এক সময় চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন, একটা স্টেশানে ট্রেন থামতেই যুবকটি তাঁকে নিয়ে নেমে গেল, আমার অজানা রয়ে গেল ওদের গল্পটি।

খানিক বাদে পুরো কামরাটিই খালি হয়ে গেল, উঠলো একটা নতুন ছেলে। তাকে আমি গ্রীক বলে ভুল করেছিলাম, পরে বোঝা গেল সে আরবদেশীয়। বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, প্যান্টের সঙ্গে কোটটা ঠিক মানানসই নয়। উঠেই সে বই-খাতাপত্র খুলে পড়াশুনো শুরু করে দিল এবং খুব সিগারেট টানতে লাগলো। তখন সন্ধে হয়ে গেছে, বাইরে কিছুই দেখার নেই, আমার কাছে কোনো বই-ই নেই। ছেলেটি মুখ তুললেই তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়।

একবার সে সুইডিস ভাষায় আমায় কী যেন জিজ্ঞেস করলো।

আমি ইংরিজিতে জানালাম যে আমি সুইডিস বুঝি না।

তখন সে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোন্ দেশের লোক?

আমি ভারতীয় শুনে সে বেশ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ভারত তো অনেক দূরের দেশ। তুমি সেখান থেকে এসেছো কি চাকরি করবার জন্য?

আমি বেড়াতে এসেছি জেনে সে আরও বিস্মিত হয়ে বললো, সুইডেনে বেড়াতে এসেছো? এখানে দেখবার কী আছে? এ দেশটা অতি বিশ্রী। এখানকার মেয়েরাও বিশ্রী।

এবার আমার অবাক হবার পালা। সুইডেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্ববিদিত। গ্রেটা গার্বো, ইনগ্রিড বার্গমানের দেশের মেয়েদের কেউ বিশ্রী বলতে পারে, এ যে কল্পনার অতীত। সুইডেনে অসুন্দর কোনো মেয়ে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

ছেলেটি আবার মুখ বিকৃত করে বললো, এ দেশের সব কিছু বিশ্রী। কিচ্ছু ভালো না।

আমি বললাম, তুমিও তো বিদেশী। তা হলে তুমি এ-দেশে আছো কেন?

ছেলেটি বললো, আমার দেশ ইরাক। আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

আমার মনে হলো, এই ছেলেটিও একটি গল্পের চরিত্র। আগেকার যুবক ও প্রৌঢ়ার কাহিনীটি জানা হয়নি, এই যুবকটি সম্পর্কে আমি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, তা গল্প নয়, একটি বিভ্রান্তিকর করুণ কাহিনী।

ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি জানো, আমাদের দেশের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ চলছে? যুদ্ধটা কেন হচ্ছে তুমি জানো?

সেই সময় ইরান ও ইরাকের মধ্যে ঘোরতর লড়াই চলছিল। দুটোই ইসলামিক আরব দেশ, শিয়া-সুন্নির বিভেদের জন্য তারা পরস্পরের ওপর কেন বোমাবর্ষণ করছে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

ছেলেটি জানালো, তার বাড়ি ছিল বাগদাদ থেকে সত্তর মাইল দূরে। তাদের গ্রামের ওপর গোলাবর্ষণ হয়। তার এক ভাই যুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা গেছে। দেশে থাকলে তাকেও যুদ্ধে যোগ দিতে হতো, তাই সে পালিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছে সুইডেনে। এখানে অবশ্য তাকে এখন একটা কারখানায় কাজ করতে হয়। তার একটা সুইডিস বান্ধবীও জুটেছে। কিন্তু সুইডিস মেয়েদের তার পছন্দ নয়, কারণ, সবাই তাকে পড়াশুনো করতে বলে সব সময়। তাকে শিক্ষিত করতে চায়।

ছেলেটি খুব সরল ধরনের। সে বললো, তুমি ইরাকে বেড়াতে যাও, আমার গ্রামের ঠিকানা দেবো, দেখে এসো, কী সুন্দর সেই গ্রাম। সুইডেনের চেয়ে অনেক ভালো। আমার খুব ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেখানে। কিন্তু ফিরলেই আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। যে-যুদ্ধ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, কেন যুদ্ধ চলছে তাও জানি না, সেই যুদ্ধে যোগ দিয়ে আমি মরতে যাবো কেন?

ছেলেটির চোখ ছলছল করে উঠলো। ইরাকের গ্রাম তাকে টানছে। কিন্তু সেখানে তার ফেরার উপায় নেই। এক অদ্ভুত যুদ্ধ তাকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছে।

আমাদের পাশের বাংলাদেশের ওপর অনেক যুদ্ধবিগ্রহ গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমরা কখনো যুদ্ধের আঁচ তেমনভাবে অনুভব করিনি। ছেলেটিকে দেখে আমার অসম্ভব মায়া হচ্ছিল। আমার মতন অচেনা এক বিদেশীকেও সে ব্যাকুলভাবে বার বার জিজ্ঞেস করছিল, এই সব যুদ্ধ কেন হয় বলো তো? কেন শুধু শুধু আমি যুদ্ধে গিয়ে মরবো? কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আমি আর কী দেবো! বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক, যারা যুদ্ধ বাধায়, তাদের মনে কি একবারও এই সব প্রশ্ন আসে না?

২৪

"এই ঘেরা চত্বরগুলোয় কে কোনটার মালিক ? কার
পাহাড়ের একেবারে চূড়া পর্যন্ত ঢেকে থাকা
সুস্থির দেয়ালগুলি, হলুদ গম, অ্যামন্ড বৃক্ষেরা ?
এই সুন্দর সম্পত্তিটি কি তোমার, তোমার
এই বাড়ি, চমৎকার একটা পুকুর
উঠোনে যে শিশুটি কাঁদছে, সেও ?
আহা, কে নিজের হাতে ধরে রাখতে পারে
ভেঙে পড়া সব দেয়াল, অবিনশ্বর কুসুম
টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া জমিদারি, শুকিয়ে যাওয়া কুয়ো
লতা পাতা গজিয়ে যাওয়া বিস্মৃত কবরখানায়
কে পড়বে মৃত পরিবারের সব কটা নাম ?
এবং বাতাস, পাথর, মৃত্যু, এসব কার ?

—আঁদ্রে শেনো"

মনাকো থেকে ফেরার পথে ভাস্করের হঠাৎ হেঁচকি উঠতে লাগলো। প্রথমে আমরা তেমন কিছু গুরুত্ব দিইনি। হেঁচকি কেন যে যখন তখন আরম্ভ হয় তা কে জানে, আবার একটু বাদে থেমেও যায়। ভাস্কর একটা মজার গল্প আরম্ভ করেছিল, তার মাঝখানে হেঁচকির শব্দে বাধা পড়তে লাগলো। অসীম বললো, জল খাও, ভাস্কর, জল খাও ভালো করে ! তোমরা ইংল্যান্ডের লোকেরা শুধু কোল্ড ড্রিংকস আর বোতলের পেরিয়ের ওয়াটার খাও, এমনি জল খেতে ভুলেই গেছো !

আমি একবার আমেরিকার টি ভি দেখে হেঁচকির কয়েকটা চমৎকার টোট্‌কা শিখেছিলাম। ওদেশে টিভি'র অনেকগুলি চ্যানেলে বহু রকম বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু একটা থাকে পাবলিক নেট ওয়ার্ক। সেটা সম্পূর্ণ অবাণিজ্যিক, তাতে কোনো বিজ্ঞাপন থাকে না। বড় বড় কম্পানির চাঁদায় এটা চলে, এতে থাকে দেশী-বিদেশী নানা রকম ভালো ভালো অনুষ্ঠান, বেশ কিছু আকর্ষণীয় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। মাঝে মাঝে দু' এক মিনিটের জন্য কিছু কিছু অসুখ সম্পর্কেও বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

তাতেই দেখেছিলাম যে হঠাৎ খুব হেঁচকি উঠলে দু' চামচ চিনি খেয়ে নিতে হয়। তাতে কাজ হয় ম্যাজিকের মতন। যারা চিনি খায় না, বা হাতের কাছে চিনি না থাকলে দু-তিনটে বিস্কুট গুঁড়ো করে এক সঙ্গে মুখে ফেলে দিলেও একই কাজ হবে। আমি নিজে পরীক্ষা করে এই টোট্‌কার সুফল পেয়েছি প্রত্যেকবার। শুধু জল খেলে হেঁচকি কমতে চায় না, জল খাওয়ার সময় নাক টিপে ধরে দম বন্ধ করে থাকা দরকার।

ভাস্করের ওপর এই সব কটি টোট্‌কা পরীক্ষা করেও কোনো কাজ হলো না, তার হেঁচকি বাড়তেই লাগলো। শরীর খারাপ হলে কোনো সুন্দর দৃশ্যই চোখে পড়ে না। ভাস্করের জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত, তাতে সে বেশ বিরক্ত, ঐ অবস্থাতেও সে জোর করে হাসি-গল্প ও জানলার বাইরে মনোযোগ ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলো। যারা প্রকৃত ভদ্রলোক ও যাদের খাঁটি রসবোধ থাকে, তারা কক্ষনো নিজেদের শরীর খারাপ কিংবা অসুখ-বিসুখ নিয়ে অন্যদের বিব্রত করতে চায় না।

হোটেলে ফিরে আসার পর ভাস্করকে একটু শুয়ে থাকতে বলা হলো। সে কিছুতেই শুনবে না, আমরা প্রায় জোর করেই তাকে শোয়ালাম। দেখা গেল, তাতে হেঁচকির প্রাবল্য বাড়ছে। উঠে এসে ভাস্কর বললো, বুঝেছি, এ কিছু না ! খুব অ্যাসিডিটি হয়েছে, দুপুরের হোয়াইট ওয়াইনটা বড্ড টক টক ছিল। এই বলে দু' তিন রকম অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট মট মট করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো ভাস্কর, তাতেও কাজ হলো না কিছু।

সন্ধের দিকে আমরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ভাস্করের হেঁচকি এমন বেড়েছে যে ভালো করে কথাই বলতে পারছে না। ঠিক হেঁচকি না, এ যেন ঢেকুর আর হেঁচকির মাঝামাঝি একটা ব্যাপার। এ রকম আগে কখনো দেখিনি। এক সময় ভাস্কর ছুটে গিয়ে বাথরুমে বমি করলো।

অসীম বললো, চলো, কাল সকালেই আমরা ফিরে যাই। ভাস্করকে যদি ডাক্তার দেখাতে হয়, প্যারিসেই সুবিধে।

আমি ও মৃণাল সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। এখানে আরও দু-একদিন হেসে খেলে থেকে গেলে মন্দ হতো না। সস্তায় পছন্দমতন হোটেল পাওয়া গিয়েছিল, আবহাওয়াও খুব সুন্দর। কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে ভাস্করই নানা রকম পাগলামি ও গালগল্পে সব সময় জমিয়ে রাখে।

পরদিন বেশ ভোর ভোরই বেরিয়ে পড়া গেল।

এবার ধরা হলো অন্য রাস্তা। অটো রুট। চওড়া এই মসৃণ পথে গাড়ি ছোটে একশো কুড়ি কিলোমিটার স্পীডে। আমেরিকার রাস্তায় পঞ্চান্ন মাইলের বেশি স্পীডে গাড়ি চালালেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ ক্যাঁক করে চেপে ধরে। ফ্রান্সে তখনও সে বালাই ছিল না। এই অটো রুট ধরে সন্ধের মধ্যেই প্যারিস পৌঁছে যাবার কথা। আসবার পথে আমাদের দু' রাত কিংবা তিন রাত হোটেলে কাটাতে হয়েছিল, ফেরার সময় সে খরচ নেই বটে, কিন্তু কিছুদূর অন্তর অন্তর টোল দিতে হয়, তাও কম নয়, এক একবার সত্তর-আশি টাকা। গাড়ির চালকদের কাছ থেকে এত বেশি পয়সা নেয় বলেই এরা রাস্তাগুলো এত নিখুঁত রাখে। সব সময় দেখা যায়, কোথাও না কোথাও মেরামত কিংবা নতুন করে সাজাবার পালা চলছে।

অটো রুটগুলো কোনো বাধা মানে না বটে, এমনকি এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ও ব্রীজ দিয়ে জোড়া, তবে ট্রাফিক জ্যাম হতেই পারে যে-কোনো সময়। এত চওড়া রাস্তা, কিন্তু গাড়িও তো হাজার হাজার।

ট্রাফিক জ্যামে গাড়ির গতি মন্থর হলে আমি স্বস্তি বোধ করি। দিনের বেলা দু' ধারের দৃশ্য না দেখতে পেলে গাড়ি চড়ার আনন্দই মাটি। উল্কার বেগে গাড়ি ছুটলে কিছুই দেখি না।

অটো রুট দিয়ে যারা গাড়ি চালায় তারা দৃশ্য-ফৃশ্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদের শুধু তাড়াতাড়ি পৌঁছোবার ব্যস্ততা। গতি কমাতে হলে তারা বিরক্ত হয়।

এক জায়গায় গাড়ি একেবারে স্থির হয়ে গেল, সামনে অসংখ্য গাড়ি থেমে আছে। অসীম ছটফট করছে, আমি বললাম, বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নাও।

অসীম ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, এখানে তো শুধু মাঠ, দেখবার কী আছে ? তবু যদি একটা সুন্দর জায়গায় থামতে হতো।

আমি ঠিক গুছিয়ে উত্তর দিতে পারলাম না। তবে আমার মনের মধ্যে যে কথা গুঞ্জরিত হলো, তা হচ্ছে এই : দৃশ্য সব সময় সুন্দর হবার তো দরকার নেই। অনেকখানি বিস্তীর্ণ মাঠের শূন্যতাও একটা দৃশ্য। একটা-দুটো ন্যাড়া গাছও দৃশ্য। এক পাল গরুও দৃশ্য। এসব নিয়ে কবিত্ব করার দরকার নেই, কিন্তু এই সব ছবিও আমাদের মাথার মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিক্রিয়া থেকে অন্যরকম একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এদেশে শহুরে মানুষ আজকাল সব সময় কৃত্রিম জিনিস দেখে। গাড়ি-টেলিফোন- ফ্রিজ-টিভি-সানমাইকার টেবিল, চীনে মাটির বাসন। কংক্রিটের বাড়ি, কলম-পেন্সিল-বই ! এয়ার কন্ডিশান্ড ঘর। এয়ার কন্ডিশান্ড গাড়ি। এর মধ্যে প্রকৃতির কোনো এলিমেন্টাল ব্যাপার নেই। এমনকি আমাদের দেশেও একবার এক হোমরাচোমরা অফিসারের ঘরে গিয়ে লক্ষ করেছিলাম, সেখানে সব কিছুই মানুষের ও মেশিনের তৈরি, প্রকৃতির কাছ থেকে সরাসরি পাওয়া একটা কিছুও নেই। মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছর আমরা এইভাবে প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি, আমাদের চোখ কি এই জন্য তৈরি হয়েছে ? একটা কারখানার ছবির চেয়ে সাধারণ একটা পাহাড়ের ছবি তা হলে এখনো আমাদের আকৃষ্ট করে কেন ? পাহাড় তো ফালতু, তা থেকে আর কী পাওয়া যাবে, কারখানাই তো আমাদের সব কিছু দেয়।

কৃত্রিমতার জন্য মানুষের চোখ এখনো তৈরি হয়নি। এখনো অনেকটা জল, ফাঁকা মাঠ কিংবা দু-চারটে গাছ দেখলে আমাদের চোখের আরাম হয়। এর প্রভাব হয়তো তক্ষুনি বোঝা যায় না, কিন্তু মাথার মধ্যে কাজ করে যায়।

সুতরাং দৃশ্য মানেই ক্যালেন্ডারের সুন্দর ছবি হবার দরকার নেই।

ভাস্কর ঘুমিয়ে পড়েছে। তার হেঁচকি এখন বন্ধ বলে আমরা স্বস্তি বোধ করছি।

আমি আর অসীম নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। সামনে অসংখ্য গাড়ির নিশ্চল ঢেউ। দু-চার কিলোমিটার আগে কিছু একটা ঘটেছে বোধহয়। অনেকেই গাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে খানিকটা হাঁটতেই একটা বাড়ি চোখে পড়লো। আমি খানিকটা কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে রইলাম। এ বাড়িটা যেন এখানে থাকার কথা নয়। রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে, একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। কোনো কারখানা, বা অফিসবাড়ি নয়। কারুর শখের বসতবাড়ি, সামনে বাগান, গেটের দু' পাশে দুটি নগ্ন নারীমূর্তি, মাঝখানে একটা লিলি পুলের ওপর সুন্দর ছোট্ট ব্রীজ।

কাছাকাছি আট দশ মাইলের মধ্যে কোনো জনবসতি নেই, এখানে হঠাৎ এরকম একটা একলা বাড়ি থাকার মানে কী ?

আমার প্রশ্ন শুনে অসীম বললো, কেন, কেউ কি ফাঁকা জায়গায় থাকার জন্য বাড়ি বানাতে পারে না ? অনেক সময় বুড়ি-বুড়িরা থাকে !

আমি বললাম, ইলেকট্রিক, জলের লাইন, সেসবও না হয় এসব দেশে ব্যবস্থা হয়ে যায়, কিন্তু চোর ডাকাতেরও কি ভয় নেই ?

অসীম বললো, চোর ডাকাতদের খুব মুশকিল হয়ে গেছে আজকাল। বাড়িতে কেউ গয়না-গাঁটি রাখে না। ব্যাঙ্কে থাকে। ক্যাশ টাকাও কেউ রাখে না। কয়েকখানা ক্রেডিট

কার্ড রাখলেই কাজ চলে যায়। চোরেরা কী নেবে ?

আমি বললাম, ফ্রিজ, টিভি এই সব কিছু দামী জিনিস তো থাকেই।

অসীম বললো, ওসব জিনিস গরিব দেশের চোরেরা নিতে পারে। এখানে পুরোনো ফ্রিজ, টি ভি ইত্যাদির রিসেল ভ্যালু খুব কম। এখন একমাত্র দামী জিনিস হলো মেয়েদের যৌবন। সেজন্যই তো বললাম, ফাঁকা জায়গায় শুধু বুড়ো-বুড়িরাই থাকতে সাহস করে।

বাড়িটাকে দেখে মনে হয়, অনেকদিন এখানে কেউ থাকেনি। গেটে তালা। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ। পর্চে পড়ে আছে এলোমেলোভাবে কিছু পুরোনো কাগজ।

অসীম বললো, হয়তো বুড়ো-বুড়ি বাড়ি বন্ধ করে কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে গেছে।

আমার অন্যরকম মনে হয়। হয়তো এখানে এককালে কোনো শৌখিন মানুষের সংসার ছিল। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে চলে গেছে শহরে, তারা কেন পড়ে থাকতে যাবে এই ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে, বাবা-মায়েরাও মরে হেজে গেছে কবে, বন্ধ ঘরগুলোর মধ্যে রয়ে গেছে শুধু তাদের দীর্ঘশ্বাস। এখানে এই বাড়ি আর কেউ কিনবে না, আস্তে আস্তে খসে পড়বে জানলা-দরজা। পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি দুটোর হাত আর নাক ভাঙবে, চোখ অন্ধ হবে।

বাড়িটার পেছন দিকে, খানিকটা দূরে একটা টিলা। সেখানে কয়েক সারি গাছ। খুব একটা রোদ নেই আজ, ছায়া ছায়া ভাব। দৃশ্যটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো। এক একদিন এরকম হয়, কোনো অচেনা জায়গায় এসেও মনে হয়, আগে দেখেছি। কোনো অচেনা মানুষ সম্পর্কেও মনে হয়, ঠিক এরকম একজনের সঙ্গে আগে কথা বলেছি।

এই অটো রুট দিয়ে আমি আগে কখনো যাইনি। অপ্রত্যাশিত ট্রাফিক জ্যাম না হলে এখানে থামারও কোনো প্রশ্নই উঠতো না। তবু এই অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যটা চেনা মনে হলো কেন ?

আমি এক সময় বিড়বিড় করে বলে উঠলাম, কামিল পিসারো !

অসীম বললো, কী ?

আমি বললাম, ঠিক এরকমই একটা ল্যান্ডস্কেপ আছে না কামিল পিসারোর আঁকা ? ব্যাক গ্রাউন্ডে টিলা, গাছের সারি, সামনের দিকে একটা বাড়ি, কী যেন ছবিটার নাম ?

অসীম বললো, হ্যাঁ, আছে এরকম ছবি। দাঁড়াও, নামটা বলছি। রোড টু দা হার্মিটেজ। সেখানে অবশ্য একটা বাড়ি নয়, আরও দু-চারটে ছোট ছোট ঘর। পাশের দিকে একটা বেশ বড় গাছ।

আমি বললাম, তোমার তো বেশ মনে আছে ছবিটা।

অসীম বললো, পিসারো অতি সাধারণ সব গ্রাম্য দৃশ্যের ছবি আঁকতেন। তবু একবার দেখলেই মনে থেকে যায়।

আমি বললাম, পিসারো যেসব ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন, দৃশ্য হিসেবে সেগুলোর সত্যিই কোনো মূল্য নেই। কিন্তু দিনের আলোর স্বাভাবিক রং ব্যবহার করে তিনি যে-সব ছবি এঁকে গেছেন, সেগুলো প্রথম দেখলে মনে হয় কোনো অসাধারণত্ব নেই, তাঁর সমসাময়িক দেগা, রেনোয়া কিংবা সেজান্-এর ছবি অনেক বেশি মৌলিক এবং নাটকীয়, তবু পিসারোর ছবি মনে একটা ছাপ ফেলে যায়।

অসীম বললো, পিসারোই তো ওপ্ন এয়ারে ছবি আঁকার জন্য সে সময় একটা আন্দোলন চালিয়েছিল। সেজান্ অনেক বেশি বিখ্যাত হয়েছিল, সেজান্-এর মতন

অহংকারী এবং দুর্মুখও কিন্তু পিসারোর কাছে শিষ্যের মতন ল্যান্ডস্কেপ আঁকা শিখেছিল। পিসারো মানুষটা ছিল সাধুর মতন, শান্ত মেজাজ, তখনকার আর্টিস্টদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই ঝগড়া ছিল, এ ওর মুখ দেখতো না, কিন্তু পিসারোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল সকলেরই। পিসারো সম্পর্কে একটা মজার গল্প শুনবে ?

দূরে গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ হতেই আর গল্প হলো না, আমরা দৌড় লাগালাম। সমস্ত গাড়িই আবার শম্বুক গতিতে এগোতে লাগলো বটে, কিন্তু সন্ধের মধ্যে প্যারিসে পৌঁছোবার আশা দুরাশা।

অসীম বললো, মুশকিল হচ্ছে, আজ রবিবার তো। যারা উইক এন্ডের ছুটি কাটাতে শুক্রবার প্যারিস ছেড়ে বেরিয়েছিল, সবাই আজ ফিরছে।

গাড়ির সংখ্যা দেখলে মনে হয়, অন্তত কয়েক লাখ মানুষ সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাতে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তাও তো এই একটাই নয়, আরও বিভিন্ন দিকে আছে অটো রুট। আমার ধারণা, যারা মাসের পর মাস শহর ছেড়ে বাইরে যায় না, তাদের মাথার গোলমাল হতে বাধ্য।

জেগে ওঠার পর ভাস্করের আবার হেঁচকি শুরু হয়েছে। ভাস্কর তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললো, আরও তিন চারদিন ছুটি আছে, সাউথ অফ ফ্রান্সের রিভিয়েরা ছেড়ে প্যারিসে যাবার কোনো মানে হয় ? চলো ফিরি। ঐ হোটেলটায় আবার জায়গা পাওয়া যাবে। আরও কিছু সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমার হেঁচকি ঠিক হয়ে যাবে !

প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, অসীম, তুমি কামিল পিসারো সম্পর্কে কী যেন একটা গল্প বলতে যাচ্ছিলে ?

অসীম আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝলো, তারপর বললো, ও হ্যাঁ, সেই গল্পটা। একটা সুন্দরী মেয়ের গল্প। ভাস্কর, তুমি তো জানোই, ইমপ্রেশানিস্টরা এক সময় কী রকম গরিব ছিল, কত রকম কষ্ট সহ্য করেছে। এর মধ্যে পিসারোকে সহ্য করতে হয়েছে চরম দারিদ্র্য, কারণ তার ল্যান্ডস্কেপ বিক্রি হতোই না প্রায়। একবার ইউজিন মুরে নামের একজন লোক, তার একটা কেকপেস্ট্রির দোকান ছিল, সে পিসারোকে সাহায্য করবার জন্য পিসারোর একটা ছবি লটারি করবে ঠিক করলো। এক টাকার টিকিট, তাতে যদি চার-পাঁচশো টাকা ওঠে, সেটাই পিসারোর লাভ, তখন তার বাড়িতে একেবারে না খেতে পাওয়ার অবস্থা। কিন্তু সেই এক টাকার টিকিটও বিশেষ কেউ কিনতে চায় না। তিরিশ চল্লিশখানা বিক্রি হলেও লটারির কথা যখন ঘোষণা করা হয়েছে, তখন করতেই হবে, যদিও ঐ কটা টাকায় রঙের দামও ওঠে না। লটারি হলো, জিতলো সেই পাড়ারই একটা সুন্দরী মেয়ে। যুবতী, আর বেশ ফচ্‌কে ধরনের। সে ছবিটা উল্টে-পাল্টে দেখে জিভ উল্টে বললো, ম্যাগো ! এ ছবি কে নেবে ?

দোকানদারকে সে বললো, এই ছবিটার বদলে আমাকে একটা ক্রিম বান দাও না !

ছবির বদলে সে একটা মিষ্টি রুটি নিয়ে চলে গেল।

ভাস্কর বললো, পাগলী ! সে মেয়েটা ঐ ছবিটা রাখলে আজ তার নাতি-পুতিরা লাখ লাখ টাকায় বিক্রি করতে পারতো !

বাকি পথ শিল্পীদের বিষয়ে গল্প করতে করতে এলাম। অসীমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে বেশ রাত হয়ে গেল। শেষের দিকে ভাস্করের হেঁচকি বেড়ে গেল বেশ। ভাস্কর অবশ্য একটুও না ঘাবড়ে বললো, বুঝেছি, পর পর কয়েকটা রাত ভালো ঘুম হয়নি। সেইজন্য এই ব্যাপার। আজ ঘুমের ওষুধ খেতে হবে।

পরদিন ভাস্কর বেশ স্বাভাবিক রইলো। ও ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে চায় না। ফরাসী ডাক্তারের ভাষা বুঝতে পারবে না। নিজেও কিছু বোঝাতে পারবে না। ভুল ওষুধ খেয়ে মারা পড়বে নাকি ! নিজেই সে ইচ্ছেমতন ওষুধ খেতে লাগলো।

প্যারিসের কাফে-রেস্তোরাঁয় পূর্ব পরিচিতদের কারুর সঙ্গে দেখা হলে আমাদের কাছে সাউথ অফ ফ্রান্সের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী শুনতে চায়। অনেকের ধারণা, ওখানকার ভ্রমণ বেশ ব্যয়বহুল, আমরা বেশ সস্তায় সেরে এসেছি শুনে তারা অবাক হয়। ভারলার ল্যামবারসি নামে একজন বেলজিয়ান কবি আমাদের নাম দিয়েছে, বেঙ্গলি মস্কিয়া। চারজন পুরুষ মানুষ এক সঙ্গে দিনের পর দিন গাড়িতে করে ঘুরছে, এরকম দৃশ্য এসব দেশে প্রায় দেখাই যায় না। দু'জন পুরুষ ও দু'জন নারীই স্বাভাবিক। একমাত্র খুনে-গুণ্ডারাই নারীবর্জিত হয় অনেক সময়।

প্রীতি ও বিকাশ সান্যালের বাড়িতে এক সন্ধেবেলা। যতবারই প্যারিসে আসি, এ দম্পতির কাছে নেমন্তন্ন একেবারে বাঁধা। দু'জনেই আড্ডা দিতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন, নেমন্তন্ন করেন আরও অনেককে। প্যারিসের বাঙালীদের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি। প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত, নিছক সাধারণ চাকরি করতে কেউ ফ্রান্সে আসে না। কেউ বিজ্ঞান-গবেষক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, বা বিশেষ ধরনের টেকনিশিয়ান, কেউ সমাজতাত্ত্বিক, কিন্তু এঁরা সকলেই ফরাসী শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে খবর রাখেন। এটা বোধহয় ফরাসী দেশের জল-হাওয়ার গুণ। অন্যত্র এমন দেখিনি। এখানকার আড্ডার আলোচনাও একটু উচ্চস্তরের, রসিকতাগুলি সূক্ষ্ম, কেউ একটাও অনার্য শব্দ ব্যবহার করেন না। এরই মধ্যে ভাস্কর একটি মূর্তিমান ব্যতিক্রম। ভাস্কর কবিতা ভালোবাসে, ছবি দেখা ওর নেশা, কিন্তু কথাবার্তায় তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল সাজতে একেবারেই রাজি নয়, উত্তর কলকাতার কাঁচা বাংলা যখন তখন বেরিয়ে আসে, যাকে খুব আপন মনে করে, তাকে শালা বলে সম্বোধন করে। প্রীতি ও বিকাশের বাড়িতে ভাস্কর শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার কলকাতার চীনে পাড়ায় কয়েকটি এমন অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শুরু করে দিল যে বিশিষ্ট অতিথিরা আঁতকে উঠলেন প্রথমে, তারপর বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতায় এসব একেবারে নতুন।

গল্পের মাঝপথে ভাস্করের হঠাৎ আবার খুব হেঁচকি উঠতে শুরু করলো। সে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও তার যে বেশ কষ্ট হচ্ছে, তা বোঝা যায়।

অগত্যা পরের দিন ভাস্কর আর মৃণালকে প্রায় জোর করেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো লন্ডনে। আমার বিমানের রিজার্ভেশান আরও দিন তিনেক পরে, আমাকে থেকে যেতে হবে। অসীমও অফিস যেতে শুরু করলো, দুপুরে আমি সম্পূর্ণ একা। তাতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা আছে। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো যায়। এ শহরে আকর্ষণের কোনো অভাব হয় না। ছবির প্রদর্শনী লেগেই আছে। এবার আমার মাথায় কামিল পিসারো গেঁথে গেছে। আমি বিভিন্ন গ্যালারিতে গিয়ে তার ছবি দেখছি।

দুপুরবেলা সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়কেও পাওয়া যায়। তার অফিস থেকে কেটে পড়ার কোনো অসুবিধে নেই বোধহয়। ইংরেজরা না-বলে ছুটি নেওয়াকে বলে ফ্রেঞ্চ লীভ। ফরাসীদের নাকি এ অভ্যেস আছেই।

সুপ্রিয় ছবি-বিশেষজ্ঞ, কোন্ গ্যালারিতে কোন ছবি আছে, সব তার নখদর্পণে। প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে সারা প্যারিস চষে বেড়ায়। কোথায় সস্তায় অত্যুত্তম খাবার

পাওয়া যায়, সে ব্যাপারেও আমি সব সময় সুপ্রিয়-অনুসরণকারী।

একদিন দুপুরবেলা সুপ্রিয় বললো, চলো, আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ? তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো !

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হঠাৎ আমি আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গে আলাপ করতে যাবো কেন ? অত বিখ্যাত লেখকদের ধারে-কাছে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না।

সুপ্রিয় বললো, ইতালিয়ান দূতাবাসে মোরাভিয়া গীর্জার কাচে আঁকা ছবি বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন, আমার কাছে দুটো কার্ড আছে, সেখানে গেলেই আলাপ হবে।

আমি বললাম, আমার কোনো দরকার নেই, সুপ্রিয়। মোরাভিয়ার দু' চারটে উপন্যাস ও গল্প এক সময় ভালো লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষটি সম্পর্কে আমার কোনোই আকর্ষণ নেই। প্রথম কথা, তিনি নিশ্চিত এখন বেশ বুড়ো। দ্বিতীয় কথা, ভারত সম্পর্কে তাঁর কোনো ভালো ধারণা নেই, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে দিল্লি গিয়ে তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু জানি না, তাজমহল দেখতে এসেছি ! তাহলে আমি মোরাভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবো কেন ?

সুপ্রিয় বললো, তুমি এই কথা বলছো ? তোমাদের কলকাতায় অমুক প্রবন্ধ লেখক একবার প্যারিসে এসে জাঁ পল সার্ত্রর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। সার্ত্র-কে চিঠি লেখা হলো, উনি দেখা করতে রাজি হলেন না। তারপর যে-কাফেতে সার্ত্র রোজ সকালে যেতেন সেখানে আমি ঐ বাঙালী প্রবন্ধ লেখককে একদিন নিয়ে গেলাম। সার্ত্র তাঁকে পাত্তাই দিলেন না, বসতেও বললেন না, টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দু' চারটে কথা বলে বিদায় করে দিলেন। তারপর দেখি, সেই প্রবন্ধকার দেশে ফিরে সার্ত্র-এর ওপর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছেন।

সুপ্রিয়র কথা শুনে মনে হয়, জাঁ পল সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভোয়া, রেনে সার, আলবার্তো মোরাভিয়া ইত্যাদি বিখ্যাত বহু ব্যক্তির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তুই-তুকারির সম্পর্ক। আমি বললাম, আমার ভাই কোনো খ্যাতিমান লেখকের সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছে নেই। আমি আসি স্রেফ বেড়াতে।

অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করেও হার মানতে হলো সুপ্রিয়র কাছে। অগত্যা যেতে হলো তার সঙ্গে ইতালিয়ান দূতাবাসে। সেখানে গিয়ে অবশ্য এক আকস্মিক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। বৃদ্ধ আলবার্তো মোরাভিয়ার বদলে আলাপ হলো এক অত্যন্ত আকর্ষণীয়া মহিলা শিল্পীর সঙ্গে।

২৫

যুবতীটি খেলা করছিল তার বেড়ালটাকে নিয়ে
কী চমৎকার সেই দৃশ্য
শুভ্র হাত আর একটি শুভ্র থাবা
জমে-ওঠা অন্ধকারে তাদের খুনসুটি

কালো সুতোর দস্তানার মধ্যে
লুকিয়ে রেখেছে সে—আহ্ কী চতুরা ?
অলীক রক্তের মত তার সাংঘাতিক নোখ
ক্ষুরের মতন ধারালো আর ঝকঝকে

বেড়ালটিও, তারই মতন, দেখতে যেন কত শান্ত
ঢেকে রেখেছে লোমশ থাবার মধ্যে তীক্ষ্ণ নোখ
কিন্তু তার মধ্যে রয়ে গেছে শিকারী শয়তান

আর সেই ঘরের মধ্যে হাসির হররা
ঝনঝন করছে পরীদের ঘণ্টার মতন
ঝলসে উঠছে চারটি সূক্ষ্ম ফসফরাসের স্ফুলিঙ্গ

—পল ভ্যারলেইন

ইতালিয়ান দূতাবাসে আমরা যখন পৌঁছোলাম, ততক্ষণে আলবার্তো মোরাভিয়ার বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। তখন চলছে পানাহার। সুপ্রিয়র কছে দুখানা কার্ড আছে, সুতরাং আমাদের যোগ দিতে বাধা নেই। বক্তৃতাটাই উপলক্ষ, সেটা না শুনে শুধু খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা উচিত কি না, এই ভেবে আমার একটু বিবেক দংশন হচ্ছিল, কিন্তু দরজার কাছে পেছন থেকে আমাদের ঠেলতে লাগলো কয়েকজন। অর্থাৎ এখনো লোকজন আসছে, তারাও আসছে ইতালিয়ান ম্যাকারুনি ও রেড ওয়াইনের টানে।

প্রশস্ত হল ঘরে প্রায় শ' দেড়েক লোক, কাছাকাছি আরও দু'তিনটে ঘরেও ছড়িয়ে আছে মানুষজন। মৃদু গুঞ্জন ও খুচখাচ হাসির শব্দে ঝনঝন করছে ভেতরের বাতাস। সকলেরই হাতে হাতে লাল সুরার গেলাস। সুপ্রিয় আমার হাতে একটা গেলাস ধরিয়ে দিয়ে কাকে যেন খুঁজতে চলে গেল।

এতজন লোকের মধ্যে আমি একজনকেও চিনি না। আমি একটা নন্ এনটিটি'র মতন এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম। প্রথম প্রথম বিদেশে এসে এই ধরনের পার্টিতে আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করতাম। সব সময় মনে হতো, অন্যরা ভাবছে, এই লোকটা আবার কে ?

আমার পোশাক নিশ্চিত ঠিকঠাক নয়। আমি এই সব জায়গায় একেবারেই অনুপযুক্ত, বেমানান।

আমেরিকান পার্টিতে অবশ্য বেশিক্ষণ একা থাকা যায় না, ওদের শিষ্টাচার অনুযায়ী কারুকে একলা দেখলেই অন্য কেউ না কেউ এগিয়ে এসে কথা বলবে। সে সব অবশ্যই খেজুরে আলাপ। একেবারেই অনাবশ্যক। মিনিট তিনেক পর সেই ব্যক্তিটি এক্সকিউজ মি বলে সরে পড়বে, আবার একজন আসবে, আবার ঠিক একই রকমের কথাবার্তা।

ফরাসী বা ইতালিয়ানরা তেমন আলাপী নয়, আমার সঙ্গে যেচে কেউ কোনো কথা বললো না। আমি একটা কোনো দেওয়ালের কাছাকাছি ফাঁকা জায়গা খুঁজতে লাগলাম, যেখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো যায়। যেখান থেকে সকলকে দেখা যায়।

মাইকেল অ্যাঞ্জোলোর একটা ছবির নীচে আমি দাঁড়াবার জায়গা পেলাম। দু'তিনজন লোক ট্রে-তে করে পানীয় নিয়ে ঘুরছে, সুতরাং খালি গেলাস ভরে নিতে অসুবিধে নেই। নিজের হীনমন্যতা কাটাবার জন্য আমি এই সব পার্টিতে শুধু নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা নিই। অন্যরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে তাতে কিছু আসে যায় না। আমি কী দেখছি, সেটাই বড় কথা। এমনকি কেউ যদি আমায় অবজ্ঞা করে, সেটাও আমার কাছে দর্শনীয়।

বাড়িটি পুরোনো আমলের, বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, দেওয়ালে দেওয়ালে ইতালিয়ান শিল্পীদের ছবির প্রিন্ট। রোম ছাড়া ইতালির আর কোনো শহরে আমার যাওয়া হয়নি। অনেককাল আগে যেবার রোমে গিয়েছিলাম, তখন পকেটে পয়সা এত কম ছিল যে অনবরত গুনতে হতো। যে-কোনো সাধারণ একটা জিনিসের দাম দশ হাজার, পনেরো হাজার লিরা শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত। যদিও লিরার মূল্যমান অতি সামান্য, তবু দশ-পনেরো হাজার শোনার অভ্যেস তো আমাদের নেই! সেবার রোম শহর আর ভ্যাটিকান-সিসটিন চ্যাপেল দেখতে দেখতেই পয়সা ফুরিয়ে গেল, পালাতে হলো ওদেশ ছেড়ে। ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলান শহরগুলির নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়, আমার দেখা হয়নি আজও।

দূতাবাসের এই পার্টিতে ইতালিয়ান ও ফরাসীদের এক মিশ্র সমাবেশ, সবাই বেশ সুসজ্জিত। আমি ছাড়া কালো কিংবা খয়েরি রঙের মানুষ আর একটিও নেই। সুপ্রিয় মুখার্জির গায়ের রং বেশ ফর্সা, তেমন বয়েস না হলেও তার মাথার চুলগুলো ধবধবে সাদা, অনেক বড় সাইড বার্নস্, তাও সাদা, বহুদিন এদেশে থাকার জন্য তার মুখের ভঙ্গিরও খানিকটা বদল হয়েছে, সুতরাং তাকে অনেকটা সাহেব-সাহেব দেখায়। গ্রীক কিংবা যুগোশ্লাভদের অনেকের গায়ের রং একটু চাপা, সুপ্রিয়কে গ্রীক বা যুগোশ্লাভ বলে যে কেউ ভুল করতে পারে।

একটু বাদে সুপ্রিয় ফিরে এসে বললো, একটা কোণের ঘরে আলবার্তো মোরাভিয়া বসে আছেন, চলো গিয়ে কথা বলে আসবে?

আমি কাকুতি-মিনতি করে সুপ্রিয়কে নিবৃত্ত করলাম। দূর থেকে দেখাই যথেষ্ট, কাছে গিয়ে মোরাভিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

একটু পরে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি সুপ্রিয়কে দেখে দূর থেকে এসে কী যেন গল্প জুড়ে দিল। ভদ্রলোক এত তাড়াতাড়ি কথা বলেন যে আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। সুপ্রিয় আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। লোকটির নাম পীয়ের, রেডিয়োতে সাহিত্য বিষয়ক একটি শাখা পরিচালনা করেন। সুপ্রিয় তাঁর কাছে আমার সম্পর্কে এমন বাড়িয়ে বাড়িয়ে, সত্য-মিথ্যে জুড়ে পরিচয় দিতে লাগল যে আমি বারবার সুপ্রিয়র কোটের পেছন

টেনে তাকে থামাবার চেষ্টা করলাম।

লোকটি আমার দিকে ফিরে তাঁর মাতৃভাষায় কিছু বলতে শুরু করতেই আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, এক্সকুজে মোয়া, জ্য ন পার্ল পা ফ্রাঁসে।

ভদ্রলোক এবার ইংরিজি বলতে লাগলেন, বেশ থেমে থেমে, শব্দ খুঁজে খুঁজে। এতে আমি স্বস্তিবোধ করলাম। অন্য ভাষা খুব ভালো করে না জেনে কথা বলতে গেলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকটা কমে যায়। এখন এই লোকটার মুখখানাও কাঁচুমাচু ধরনের হয়ে গেছে।

ডাক্তার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ভিয়েনা থেকে প্রথমবার যখন একটা সেমিনারে যোগ দিতে প্যারিসে আসেন, তখন তাঁর অনেকটা এই অবস্থা হয়েছিল। বই পড়ে ফ্রয়েড ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন, তাঁর ধারণা তিনি ঐ ভাষা ভালোই জানেন। প্যারিসে এসে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না, প্রায়ই উপযুক্ত শব্দটা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁকে থেমে যেতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। ফ্রয়েডের আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লাগলো, তিনি ভাবলেন, কী, অশিক্ষিত লোকদের মতন তাঁকে ভাঙা ভাঙা ভাষায় কথা বলতে হবে? এঁরা তাঁকে ভুল বুঝবে? সেমিনারে যোগ না দিয়েই ফ্রয়েড ফিরে গেলেন ভিয়েনাতে। বছর দু'এক বাদে অত্যুত্তম চোস্ত ফরাসী শিখে তিনি আবার এসেছিলেন প্যারিসে।

ফ্রয়েডের মতন জেদ আর ক'জন মানুষের থাকে! বেশির ভাগ মানুষ ভাঙা ভাঙা ভাষায় কাজ চালায়!

পীয়ের বললো, এসো, চট করে খাবার খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে? মিশেলের ছবি দেখবে?

কে মিশেল?

পীয়ের বললো, মিশেল এখানেই আছে। দাঁড়াও আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

পাশের ঘর থেকে সে একটি রমণীকে ডেকে নিয়ে এলো। গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট পরা সেই দীর্ঘাঙ্গিনীর মাথার চুল সোনালি। চোখ দুটি কাজল-টানা, যদিও কাজল লাগায়নি। পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী একেই বলা যায়।

রমণীটিকে দেখে আমার প্রথম অনুভূতি হলো বিস্ময়ের। সে খুবই সুন্দরী তো বটেই, তা ছাড়া কিছু যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে। তার দৃষ্টি, তার মুখের ত্বক, তার হেঁটে আসার ভঙ্গি সবই যেন অন্যরকম। সে যৌবনের পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গেছে, তার বয়েস পঁয়তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। এই নারীরত্নটি ছবি আঁকে? একে নিয়েই তো বহু শিল্পীর ছবি আঁকার, কবিতা লেখার কথা। এ তো মূর্তিমতী প্রেরণা হতে পারে।

আমাদের দেখে সে ছেলেমানুষের মতন বলে উঠলো, একদিনে দু'জন ভারতীয়? এর আগে আমার সঙ্গে একজন ভারতীয়েরও আলাপ হয়নি। আমি ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই, একবার সেই রহস্যময় দেশে যেতে চাই।

এই সুন্দরী যে একজন মহিলা শিল্পী তা আমি এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। সুপ্রিয় ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, আমি একদৃষ্টিতে ওকে দেখছি। রূপসী হলেও রমণীটির মধ্যে অহংকারের ভাব নেই, কথাবার্তা বেশ সরল।

খানিক বাদে মিশেল বললো, তোমরা আমার ছবি দেখতে যাবে? আমার বাড়ি কাছেই।

আমরা সবাই খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলাম বটে, কিন্তু আমি মনে মনে ধরেই নিলাম, এবার গিয়ে বেশ কিছু বাজে ছবি দেখতে হবে। সুন্দরীর আঁকা শখের ছবি আর কী আহামরি

হবে !

প্যারিস শহরের কেন্দ্রস্থলে কেউ সচরাচর গাড়ি আনতে চায় না। গাড়ি পার্ক করতেই অন্তত এক ঘন্টা সময় নষ্ট হয়। পীয়ের কিংবা মিশেলের সঙ্গে গাড়ি নেই, আমরা বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। চারজন যাত্রী থাকলে এখানকার অনেক ট্যাক্সিই থামতে চায় না। ড্রাইভারের পাশে তার পোষা কুকুর থাকে, সেইজন্য সামনে বসতে দিতে চায় না কোনো যাত্রীকে। কিন্তু মিশেলের মতন যাত্রিণী দেখেও প্রত্যাখ্যান করবে, এমন পুরুষ ট্যাক্সি ড্রাইভার পৃথিবীতে থাকা সম্ভব নয়।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর মিশেল আমাকে জিজ্ঞেস করলো, প্যারিস তোমার কেমন লাগছে ?

আমি যে আগেও বেশ কয়েকবার এ শহরে এসেছি তা গোপন করে বললাম, যত দেখছি, ততই বিস্ময় বাড়ছে।

মিশেল বললো, আমার কিন্তু শহরগুলোর রঙের ব্যবহার খুব খারাপ লাগে। ইওরোপের বেশির ভাগ রাজধানীগুলোতেই দেখবে লাল আর সোনালি রং খুব বেশি। প্রাসাদগুলো লাল, লোহার বর্শা-বসানো গেট সব সোনালি। লাল হচ্ছে রক্তের রং, ক্ষমতার রং। আর সোনালি রং হচ্ছে লোভের রং। ক্ষমতা আর লোভ। একবার মস্কোতে গিয়ে দেখি, কী একটা উৎসবের জন্য যেন গোটা শহরটা লাল পতাকায় মোড়া। আমার মনে হচ্ছিল, চতুর্দিকে থকথকে রক্ত। এক সঙ্গে বেশি লাল রং কি মানুষের চোখে সহ্য হয় ? কোনো শিল্পী তো এত লাল রং ব্যবহার করে না !

এবার আমি আর একটু অবাক হলাম। এ মেয়েটির শুধু রূপই নেই,নানা বিষয়ে চিন্তাও করে। রূপসী মাত্রই বোকা হবে, এ ধারণাটাও অবশ্যই ভুল।

খুব বেশি দূর যেতে হলো না। ট্যাক্সি এসে থামলো একটা বড় বাড়ির সামনে। মিশেল একটা ফ্ল্যাটের দরজার তালা খুলে আমাদের বললো, এসো !

রেডিও পরিচালক পীয়ের যে মিশেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তা ওদের ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়। এই বন্ধুত্বও খানিকটা বিচিত্র। পীয়েরকে মোটেই সুপুরুষ বলা যায় না, মাঝারি আকারের মোটাসোটা ধরনের মানুষ। অন্যমনস্ক অধ্যাপকের মতন তার পোশাকও বেশ অগোছালো। রেডিওতে কাজ করে সে কতই বা মাইনে পায় ? এই চোখ ধাঁধানো সুন্দরী তার বান্ধবী হলো কী করে ?

অ্যাপার্টমেন্টটাও খুব দামী। সোফা-সেটগুলি অ্যান্টিক, কয়েকটি অপূর্ব পাথরের মূর্তি সাজানো রয়েছে, দেয়ালে ঝুলছে দুটি আসল মাতিস্ ও পিকাসো।

মিশেল ভেতরে চলে যেতেই পীয়ের আমাদের অনেক কিছু খুলে বললো। এই অ্যাপার্টমেন্টটা মিশেলের দ্বিতীয় স্বামীর। তার এই দ্বিতীয় স্বামী একজন ধনী ব্যবসায়ী। তার বয়েস আটাত্তর। ব্যবসার কাজে তাকে প্রায়ই ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় থাকতে হয়। সেই বৃদ্ধ সমাজে মিশেলকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেও মিশেলকে সে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে। মিশেলের ছবি আঁকার ব্যাপারে তার অঢেল প্রশ্রয় আছে এবং এই সূত্রে মিশেলকে যে অনেকের কাছে যাতায়াত করতে হয়, তাতেও তার আপত্তি নেই। পীয়েরের মতন আরও দু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে মিশেলের, সেটা তার স্বামী জেনেও না জানার ভান করে।

এ সব শুনে মিশেলের অনুপস্থিত স্বামীর সম্পর্কে আমার বেশ শ্রদ্ধাই হলো। লোকটি মোটেই সাধারণ ধনীদের মতন নয়। সে এই সুন্দরীকে কুক্ষিগত করে রাখেনি !

প্রায় গোটা দশেক ক্যানভ্যাস ও চোদ্দ-পনেরোখানা ছবি ভেতর থেকে নিয়ে এলো মিশেল। তারপর একেবারে উদীয়মান শিল্পীদের মতন লাজুকভাবে হেসে বললো, আমি মাত্র দু'বছর ধরে ছবি আঁকছি। এখনো কিছুই শিখিনি বলতে গেলে। তোমাদের কেমন লাগবে জানি না।

সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করলো, মাত্র দু' বছর ? আগে তুমি কী করতে ?

মিশেল বললো, আগে আমি সিনেমায় অভিনয় করতাম, জানো না ? তুমি আমার কোনো ছবি দেখোনি ?

এবার আমার কাছে একটা রহস্য উন্মোচিত হলো। এই জন্যই প্রথম থেকেই মিশেলকে খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। শুটিং-এর সময় বহুক্ষণ কড়া আলো পড়ে অভিনেত্রীদের মুখের চামড়া একটু অন্যরকম হয়ে যায়। তাদের তাকানো, তাদের দাঁড়ানোও অন্যরকম। কথা বলার মধ্যে ঠিক ঠিক পজ এবং প্রো থাকে। এগুলিকে আমি ঠিক কৃত্রিম বলে খাটো করতে চাই না, সব শিল্পীই তো কৃত্রিম, কবিতা-ছবি-গান সবই তো অতিরঞ্জনের সুষমা।

মিশেল বহু নামকরা পরিচালক, যেমন ত্রুফো, গদার, রেনে'র ছবিতেও অভিনয় করেছে। নায়িকা নয়, পার্শ্বচরিত্র।

মিশেল নিজেই হাসতে হাসতে বললো, আমার নিশ্চয়ই অভিনয় প্রতিভা নেই। তাই পরিচালকরা আমার শরীরটাকে বেশি করে দেখাতে চাইতো। বৃষ্টিভেজা, জলে সাঁতার কাটা, চলন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া, এই সব দৃশ্য যে আমি কতবার করেছি ! আর কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাক, বিচ্ছিরি, কিন্তু আপত্তি জানাবার উপায় নেই ! তারপর একদিন দূর ছাই বলে ছেড়ে দিলাম ! আরও কেন ছাড়তে ইচ্ছে হলো জানো, অন্তত পাঁচখানা ছবিতে আমাকে মৃত্যু দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়েছে। বন্দুকের গুলি খেয়ে, ছুরি খেয়ে, এগারোতলা বাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে আমি খালি মরছি ! তা একদিন ঠিক করলাম, আমি আর মরতে চাই না। আমি অন্যরকম ভাবে বাঁচবো ! ছেলেবেলা থেকেই ছবি ভালো লাগে, শিল্পীদের ভালো লাগে, তাই ভাবলাম, আমি এদের সঙ্গে মিশবো।

পীয়ের বললো, সিনেমা ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম মিশেল অনেক শিল্পীর মডেল হয়েছে। অনেকেই মিশেলের ছবি এঁকেছে, তার মধ্যে দুটি ছবি বেশ বিখ্যাত হয়েছে। আমিই প্রথম মিশেল-এর নিজের আঁকা ছবি দেখে বলেছিলাম, তুমি নিজেই তো ভালো আঁকতে পারো, তা হলে তুমি শুধু শুধু মডেল হয়ে সময় নষ্ট করছো কেন ?

মিশেল বললো, আমি নিজে যখন ছবি আঁকা শুরু করলাম, তখন কিন্তু অনেক শিল্পীই তা পছন্দ করেনি। অনেকেই আমার ছবি দেখে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

আমি বললাম, বার্থ মরিসো !

মিশেল বললো, ও লালা ! তুমি বার্থ মরিসোর নাম জানো ? একজাক্টলি !

সুপ্রিয় বললো, বার্থ মরিসো মিশেলের মতনই সুন্দরী ছিল। এদুয়ার মানে তাকে মডেল করে বেশ কয়েকখানা ছবি এঁকেছেন। তারপর বার্থ মরিসো নিজেই যখন ছবি আঁকতে শুরু করলো, মানে তখন তা ঠিক মেনে নিতে পারেননি। মরিসো'র ছবির প্রদর্শনীর সময় মানে আপত্তি জানিয়েছিলেন। একবার মানে মরিসোর একটা ছবিকে ভালো করে দেবার জন্য তার ওপর তুলি চাপিয়ে সেটাকে কদাকার করে দিয়েছিলেন।

পীয়ের বললো, বার্থ মরিসো কিন্তু বরাবর মানে-কেই ভালোবাসতো। শ্রদ্ধা ও প্রেম দুটো মিশিয়ে অর্ঘ্য দিত সেই শিল্পীকে। মানে বিবাহিত বলে বার্থ মরিসো বিয়ে করেছিল

মানে'র ছোট ভাইকে, যদিও আরও অনেকেই বার্থ মরিসোকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

আমি বললাম, শেষ পর্যন্ত বার্থ মরিসো নামকরা শিল্পী হয়েছিলেন। ইমপ্রেশনিস্টদের মধ্যে তার বিশিষ্ট স্থান আছে।

মিশেল বললো, তখন যেমন, এখনও তেমনি এরা মহিলা শিল্পীদের দাঁড়াতে দেয় না। অবজ্ঞা করে। মেয়েরা যেন শুধু মডেলই হতে পারে, শিল্পী হতে পারে না। আমি লড়াই করে যাবো! আমার প্রতিভা আছে কি না জানি না, কিন্তু সাধনার ত্রুটি রাখবো না, দেখবো শেষ পর্যন্ত।

এবার তবে ছবিগুলো দেখা যাক।

ছবিগুলো দেখে অবশ্য আমার বিস্ময় জাগলো না। আগে যা ভেবেছিলাম, তাই। আমি ছবি তেমন বুঝি না, কিন্তু কোনো কোনো ছবি দেখলে মনে একটা আবেগের ঝাপ্টা লাগে। অনেক ছবি নিখুঁত কিন্তু মনে দাগ কাটে না। আবার কোনো ছবির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয়, সত্যিকারের নতুন কিছু দেখছি, রং, রেখা, ও আয়তন নিয়ে খেলা করেছে কোনো মহৎ আঙুল।

মিশেলের ছবিগুলো ছেলেমানুষের আঁকা নয়। ফিগার ড্রয়িং সে জানে। মানুষ ও গাছপালা সে ঠিকঠাক আঁকে। রঙের ব্যবহার চোখকে পীড়া দেয় না। আপাতদৃষ্টিতে তার ছবিগুলিকে মনে হয় সুন্দর। শুধুই সুন্দর! তার বেশি কিছু না।

আমরা এক একটা ছবি দেখছি আর বলছি, বাঃ, চমৎকার! অপূর্ব! দারুণ! এই ছবিখানা এক্সেলেন্ট!

এরকমই বলতে হয়। একজন শিল্পী, তার ওপর রূপবতী নারী, সামনে বসে নিজের ছবি দেখাচ্ছে, তখন কি অন্য কথা বলা যায়?

সব শেষ হবার পর মিশেল জিজ্ঞেস করলো, এবার সত্যি করে বলো তো, কেমন লেগেছে! আমাকে খুশি করার জন্য প্রশংসা করার দরকার নেই। আমি প্রশংসা এ জীবনে অনেক শুনেছি।

আমি কথা ফেরাবার জন্য বললাম, একটা প্রশ্ন করতে পারি? তোমার এত ছবির মধ্যে মাত্র তিন-চারখানা ল্যান্ডস্কেপ। আর সব কটাই কোনো মেয়ের ছবি। ন্যুড স্টাডি। তুমি নিজে একজন মহিলা শিল্পী হয়ে শুধু মেয়েদের নগ্ন মূর্তি এঁকেছো কেন?

মিশেল আমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলো না, সম্ভবত আমার ভাষার দোষেই। সে ভুরু তুলে বললো, কেন? আমি অন্য মেয়েকে মডেল করে ন্যুড এঁকেছি। আঁকা ঠিক হয়নি?

আমি বললাম, তুমি মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাও। শিল্প জগতে নিজের স্থান করে নিতে চাও। তবু তুমি নগ্ন নারী আঁকবে কেন?

মিশেল বললো, নগ্ন নারী আঁকবো না? কেন বলো তো?

আমি বললাম, এটা কি পুরুষদের অনুকরণ নয়? সব পুরুষরাই নগ্ন নারী আঁকে! তাদের মতে রমণী শরীরই সৌন্দর্যের আধার। একজন রমণীর নিশ্চয়ই সেরকম মনে হবে না। মেয়েরা নিশ্চয়ই পুরুষদের শরীরের গড়নে সেইরকম সৌন্দর্য খোঁজে।

মিশেল হো হো করে হেসে উঠে বললো, ও বুঝেছি! তুমি বলতে চাও, মেয়েদের বদলে আমার নগ্ন পুরুষদের আঁকা উচিত? যাঃ, তা আবার হয় নাকি!

আমি বললাম, কেন হয় না? তুমি নারীদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ। এই পুরুষশাসিত সমাজে সমস্ত পণ্যের বিজ্ঞাপনে, ফিল্মের পোস্টারে, এমনকি শিল্প-সাহিত্যেও নারীকে শরীরসর্বস্ব করে দেখানো হয়। তুমি মেয়ে হয়েও তা করবে কেন? আমার তো মনে হয়,

কোনো মহিলা শিল্পীর পক্ষে পুরুষদের শরীর আঁকাই স্বাভাবিক।

সুপ্রিয় আর পীয়ের দু'জনেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাদের বাধা দিয়ে বললাম, আমি মিশেলের বক্তব্যটাই জানতে চাই।

মিশেল বললো, আমি যে নারীমূর্তিগুলি এঁকেছি তা আসলে নারী হিসেবে আঁকিনি, গাছ-পাহাড়-নদীর মতনই একটা শিল্পের বিষয়বস্তু। বহু শতাব্দী ধরে পশ্চিমের শিল্পীরা নগ্ন নারীমূর্তি এঁকেছে, ন্যুড স্টাডি এখন শিল্পের ট্র্যাডিশানের অঙ্গ। যে-কোনো শিল্পীকেই বার বার এই স্টাডি করতে হয়। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরাবরণ নারী যে আঁকতে পারে না, সে যেন শিল্পীই নয়। তার শিল্পজগতে প্রবেশের যোগ্যতা নেই। পুরুষমূর্তি নিয়ে এরকম আঁকার যে ট্র্যাডিশন নেই।

আমি মিশেলের কথা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না। পুরুষের হাতে বহু নারী-সৌন্দর্য অমর হয়েছে। কোনো মেয়ের তুলিতে পুরুষ-সৌন্দর্য মর্যাদা পাবে না কেন? একটি মেয়ে যদি পুরুষ মডেল নিয়ে নানারকম স্টাডি করে, তবে সেটাই তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য করা উচিত।

মিশেল আবার আপন মনে বললো, শুধু ছবি আঁকলেই তো হয় না, তার মধ্যে একটা জীবন-দর্শনের প্রতিফলন চাই। শুধু ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে মেশাতে হয় নিজের আত্মা। আমি আমার জীবনদর্শনটাই খুঁজে পাচ্ছি না। ভারতীয় দর্শনের কথা আমি একটু একটু শুনেছি, কিন্তু ঠিক বুঝিনি। আরও ভালো করে জানতে হবে। আচ্ছা, ভারতীয় দর্শন যাকে বলে, আধুনিক ভারত কি সেই অনুযায়ী চলে?

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, না।

মিশেল বললো, ভারতেও মারামারি, কাটাকাটি, স্বার্থের লড়াই, এই সবই আছে?

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। রেডিও'র লোক হিসেবে পীয়ের ঘোষণার সুরে বললো, ভারত দু'দুটো যুদ্ধ করেছে, সীমান্তে প্রচুর সৈন্য রাখে। বুদ্ধ কিংবা গান্ধীর অহিংসার বাণী এখন শুধু বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ।

মিশেল আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কলকাতা থেকে এসেছো। কলকাতায় অনেক মানুষ, তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ, প্রচুর মানুষ, সব সময় পথে পথে মানুষ গিসগিস করছে, প্রতিদিন শিয়ালদা স্টেশনে যত লোক নামে, নরওয়ে-ডেনমার্কের মতন দেশগুলোতে জনসংখ্যাই তার চেয়ে কম।

মিশেল কলকাতা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নয়। বললো, আমি জানি, তোমাদের দেশবিভাগ হয়েছে, তারপরেই কলকাতার জনসংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ রেফিউজি এসেছে। রেফিউজিদের কী কষ্ট তা আমি জানি! আমি নিজে এক সময় রেফিউজি ছিলাম।

পীয়ের পর্যন্ত সচকিত হয়ে উঠলো। এ খবর তারও অজানা। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আবার কবে রেফিউজি ছিলে, মিশেল?

মিশেল বললো, আমার বাবা ফ্রেঞ্চ, মা ছিলেন ইতালিয়ান। আমরা ইতালিতেই থাকতাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের ইতালি ছেড়ে পালাতে হয়। চতুর্দিকে বোমা পড়ছে, তার মধ্যে আমরা ট্রেনে চেপে পালাচ্ছিলাম স্পেনের দিকে। মাঝপথে ট্রেন থেমে গেল, তখন আমরা পায়ে হেঁটেছিলাম অনেকটা, আমার তখন চার-পাঁচ বছর বয়েস, তবু স্পষ্ট মনে আছে। বাবা মারা গেল পথেই, তিনটি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে মা আশ্রয়

নিল একটা ফাঁকা রেলওয়ে প্লাটফর্মে। তিন চারদিন আমরা প্রায় কিছুই খেতে পাইনি। তখন ঐ বয়েসেই বুঝেছিলাম, মানুষের ব্যবহার কত হিংস্র হতে পারে। তারপর লিবারেশানের সময় আমরা কী সাংঘাতিক কষ্ট করে যে ফ্রান্সে পৌঁছেছিলাম, তা তোমরা শুনলেও বিশ্বাস করতে পারবে না। পরবর্তী কালে মা যতবার সেই ঘটনা বলতে গেছে, অমনি ঝরঝর করে তার চোখ দিয়ে জল ঝরেছে।

কথা বলতে বলতে মিশেলের স্বর গাঢ় হয়ে এলো, চোখের কোণে চিকচিক করে উঠলো অশ্রুবিন্দু। সিনেমার অভিনেত্রী কিংবা জাঁহাবাজ সুন্দরী নয়। মিশেলকে এখন মনে হলো খুব চেনা একজন মানুষ।

২৬

> "সুন্দর দিনগুলি, সময়ের ইঁদুরেরা চিবিয়ে খাচ্ছে
> একটু একটু করে আমার জীবন
> হা ভগবান! এই বসন্তে প্রায় আঠাশ বছরে পৌঁছোবো
> এর মধ্যেও অনেকটাই বাজে খরচ হয়ে গেছে, ইস্!"
>
> —গীয়ম আপোলিনেয়ার

এবার ফরাসী দেশের অন্য একটি দিকে অভিযান। কয়েকটি চরিত্রও নতুন। এর আগে আমি পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে আমন্ত্রণ পেয়ে ঘোরাঘুরি করেছি বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ডিত জার্মানির কোনো অংশেই পা ছোঁয়াবার সুযোগ ঘটেনি। সেই সুযোগ পাওয়া গেল, ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলার সৌজন্যে। সেবারে, ১৯৮৬ সালে, বিশ্ব বইমেলায় ভারত ছিল বিশেষ আকর্ষণ, সেই সূত্রে চোদ্দ-পনেরো জন ভারতীয় লেখক-লেখিকাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেই তালিকায় কী করে যেন এই অধমেরও একটা স্থান জুটে গেল। এমন সুযোগ পাওয়া খুব আনন্দের তো বটেই, তার সঙ্গে খানিকটা আশঙ্কাও মিশে থাকে। এমনি এমনি তো নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে না, সেমিনারে একখানা বক্তৃতাও দিতে হবে। বক্তৃতার প্রসঙ্গ উঠলেই আমার হৃৎকম্প হয়।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্ক টোয়েনের একটা চমৎকার গল্প বলা যেতে পারে।

পশ্চিম দেশগুলিতে এক ধরনের আনুষ্ঠানিক ভোজের প্রচলন আছে। কোনো উপলক্ষে চাঁদা তোলার জন্য কিংবা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ভালো কোনো হোটেলে ফর্মাল ডিনার হয়, লোকেরা অনেক টাকা দামের টিকিট কেটে সেই ডিনার খেতে আসে। খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি একটি বক্তৃতা দেন। সুখাদ্যের সঙ্গে সেই বক্তৃতাটি উপরি পাওনা।

সে-রকম একটি ভোজসভায় মার্ক টোয়েন একবার প্রধান অতিথি হয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়া চুকে যাওয়ার পর মার্ক টোয়েনকে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। মার্ক টোয়েন প্রথমে উঠতেই চাইলেন না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, অন্যদের পেড়াপিড়িতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বেজার মুখে দাঁড়াতেই হলো। কিন্তু বক্তৃতার বদলে তিনি একটা গল্প শোনালেন।

মার্ক টোয়েন বললেন, রোমান সম্রাটদের আমলে একবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সবাই জানেন নিশ্চয়ই, রোমান সম্রাটদের কিছু কিছু নিষ্ঠুর বিলাসিতা ছিল। গ্ল্যাডিয়েটররা লড়াই করতে করতে একজন আর একজনকে খুন করছে, সেই দৃশ্য সম্রাট-সম্রাজ্ঞী উপভোগ করতেন। কিংবা স্টেডিয়ামের মাঝখানে বেঁধে রাখা হতো কোনো ক্রীতদাস

কিংবা ভিনদেশী বন্দীকে, তারপর একটি ক্ষুধার্ত সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হতো সেখানে। সিংহটা সেই জ্যান্ত মানুষটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, তাই দেখে উল্লাসে হাততালি দেবেন সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ও পারিষদরা।

সেই রকমই একবার এক বিদেশী কবিকে ধরে এনে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিন চার দিন ধরে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি, এমন সময় একটা সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হলো খাঁচা থেকে। সিংহটা বুক কাঁপানো গর্জন করে ছুটে গিয়ে সেই বন্দীকে প্রথম কামড়টা দিতে যাবে, এমন সময় বন্দীটি কী যেন বলে উঠলো। সেই কথাটা শুনেই সিংহটা থেমে গেল, বুজে গেল তার হাঁ করা মুখ, ল্যাজ ঝুলে পড়লো। লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সিংহটা বিমর্ষভাবে ফিরে গেল খাঁচার মধ্যে।

সবাই হতবাক্। এমন কাণ্ড কখনো ঘটেনি। সম্রাটের আদেশে তক্ষুনি বন্দী সেই কবিকে নিয়ে আসা হলো তাঁর সামনে। সম্রাট বললেন, তোমাকে মুক্তি দিয়ে দেবো। তার আগে সত্যি করে বলো তো, তুমি সিংহটাকে কী বলে ফেরালে?

কবিটি বললো, হে সম্রাট, আমি সিংহটাকে শুধু মনে করিয়ে দিলাম, খাচ্ছো খাও! কিন্তু মনে রেখো, এর পর তোমাকে একটা আফটার ডিনার স্পীচ দিতে হবে!

যাই হোক, ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলা দেখার সুযোগ, জার্মানির অন্যত্র ঘোরাঘুরি, ঐতিহাসিক বার্লিনের প্রাচীর সন্দর্শন এই সব ভালো ভালো সম্ভাবনার বিনিময়ে সেমিনারে একটা অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে আমি মনকে রাজি করিয়ে ফেললাম। তা ছাড়া জার্মানি গেলে আর একবার ফ্রান্সও ছুঁয়ে আসা যাবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ফ্রান্সের দূরত্ব মাত্র এক ঘণ্টা।

অসীমকে চিঠি লিখতেই সে জানালো, তুমি ফ্রাঙ্কফুর্টে যাবার দিন সাতেক আগেই প্যারিস চলে এসো। আমি অফিস থেকে ছুটি নিচ্ছি। একটা নতুন দিকে বেড়াবার পরিকল্পনা করে রেখেছি, চলো, আগে সেই দিকটা দেখে আসবো। তারপর বইমেলাতে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ব বইমেলায় প্রতি বছর কলকাতা থেকে যোগ দিতে যান বাদল বসু। ইনি আনন্দ পাবলিশার্স-এর কর্ণধার। সেখানে বাংলা বইয়ের স্টল সাজিয়ে একলা বসে থাকেন। সে বছর কলকাতা থেকে অনেক প্রকাশক গিয়েছিলেন, কিন্তু অন্য কোনো কোনো বছরে বিশ্ব বইমেলায় বাংলা বই দেখা যায় একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্সের স্টলে।

বাদল বসু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি স্বাতীকে নিয়ে যাচ্ছেন? তা হলে আমার স্ত্রীকেও এবার সঙ্গে নিতে পারি।

স্বাতী কোনোক্রমে কথাটা শোনামাত্র আর দ্বিরুক্তির অবকাশ পাওয়া গেল না। এ কালের স্ত্রীরা 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'-তে বিশ্বাসী নয়। চরম শরীর খারাপ থাকলেও কোথাও বেড়াতে যাবার নাম শুনলেই স্বাতী চাঙ্গা হয়ে ওঠে, এমনই ওর ভ্রমণের নেশা। তা ছাড়া, জার্মানি থেকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী ট্রুবার্টা আলাদাভাবে স্বাতীকে নেমন্তন্ন করেছেন, বইমেলা কর্তৃপক্ষও আমন্ত্রিত লেখকদের স্ত্রীদের আতিথ্য দিতে রাজি। সুতরাং বিশেষ অতিরিক্ত খরচের ব্যাপার নেই।

বাদল বসুর স্ত্রীর নাম কুমকুম। এটা তার ডাক নাম, অন্য একটা কী যেন ভালো নাম আছে, সেটা মনেই থাকে না। কুমকুমই তো ভাল নাম। যেমন বাদলের পোশাকি নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ, কিন্তু বাদল নামটিতেই তাকে ঠিক ঠিক মানায়।

শরৎকালের এক সকালে আবার আমরা পৌঁছোলাম ফ্রান্সে। বাদল সস্ত্রীক উঠলো তার বাল্যবন্ধু শুভেন্দু চৌধুরীর অ্যাপার্টমেন্টে, আমি আর স্বাতী অসীম রায়ের আবাসে। গেট

দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই আমার মনে হলো, অসীমের টিভি সেটটার অবস্থাটা আগে দেখতে হবে। বসবার ঘরে এসে আমি প্রথমেই টিভি'র পাশে চলে গেলাম। চার-পাঁচ বছর ধরে যেমন দেখছি, সেই রকমই পেছনের ডালাটা সম্পূর্ণ খোলা, সমস্ত তার-কার, যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আছে। বছরের পর বছর ধরেই অসীম ওটা সারাবার কথা ভেবে যাচ্ছে। ডালাটা ধরে এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করলেই অবশ্য ছবি ফোটে, কাজ চলে যায়।

সারা বাড়ির আর কোনো পরিবর্তন হয়নি, এমনকি আমি একবার যে কম্বল ও তোশক পুড়িয়ে ফুটো করে দিয়েছিলাম, সে সবও অবিকল এক জায়গায় রয়েছে। কিন্তু অসীমের রান্নাঘরটা দেখে আমরা চমৎকৃত। এ যে একেবারে নতুন রান্নাঘর। আগে ছিল ময়লা ওয়ালপেপার, এখন ঝকঝকে নতুন, পাখি-আঁকা সুদৃশ্য টালি সারা দেয়ালে। নানা রকম কাঠের খোপ, অনেক বাহারি ব্যবস্থা। এই সব কাজই অসীম নিজের হাতে করেছে। দেয়ালে টালি বসানো, কাঠ কাটা, পেরেক ইস্কুরুপ মারা, ঘষাঘষি, রং করা সব কিছু। এসব দেশে মিস্তিরি ডাকতে গেলে প্রচুর খরচ, তাই অনেককেই ছাদ সারাই থেকে জলের কল বদলানো পর্যন্ত সব কাজ শিখে নিতে হয়, নানা রকম বই আছে এ সব বিষয়ে, সুবিধেজনক যন্ত্রপাতিও পাওয়া যায়। আমাদের দেশ থেকে যে-সব ভালো ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকরা ও-সব দেশে বসতি নেয়, তারা কিছু দিনের মধ্যেই খুব ভালো রাঁধুনি, ছুতোর ও কলের মিস্তিরি, ঘরামী ও মালী হয়ে যায়।

অবশ্য অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতন যদি কারুর ভাগ্যে অতিশয় পতিব্রতা ও দশভুজা স্ত্রী থাকে, তার কথা আলাদা। শুনেছি কবি অলোকরঞ্জন এখনো চা বানাতে জানেন না। এক দিন ফাঁকা বাড়িতে তিনি একটা ডিম সেদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, সসপ্যানের মধ্যে একটা ডিম রেখে সেটা চাপিয়েছিলেন উনুনে, কিন্তু সসপ্যানের মধ্যে যে খানিকটা জলও দিতে হয়, সেটা তাঁর জানা ছিল না। তার ফলে ডিমটার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল কে জানে!

অসীমের রান্নাঘরটা একেবারে চকচকে নতুন হয়ে গেলেও অনেক দিনের একটা তোবড়ানো কেতলি, যেটার তলাটা একেবারে ঝিরকুট কালো হয়ে গেছে, সেটা সে ফেলেনি। একটা হাতল ভাঙা ডেকচি, কয়েকটা চল্‌টা ওঠা কাপও যথাস্থানে রয়েছে। অসীম বোধহয় এ-সবগুলোকে অ্যান্টিক বানাতে চায়।

পুরো একটা রান্নাঘর বানিয়ে ফেলেছে, অসীমের হাতের কাজ ভালোই। যদিও দু'একটা টালি ঈষৎ ব্যাঁকা হয়েছে, তাতে কিছু আসে যায় না। অসীমের স্বভাবের অদ্ভুত দিক হচ্ছে এই যে, সে আশা করে, নতুন কেউ এলে তার রান্নাঘরটার প্রশংসা করবে। কিন্তু তারা যদি দু'একটা টালির বক্রতা সম্পর্কে উল্লেখ না করে, তা হলে অসীম বলবে, সেই লোকগুলোর পর্যবেক্ষণ শক্তি নেই!

অসীম টেলিফোন কম্পানিতে বড় চাকরি করে তো বটেই, তা ছাড়া প্যারিস শহরে সে একটা রেস্তোরাঁর মালিক হয়েছে। সারা দিন অফিস করার পর প্রায় সন্ধেবেলাতেই সে তার রেস্তোরাঁ দেখতে যায়। প্রথমে সে তার এক সিলোনিজ বন্ধুর সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে রেস্তোরাঁর ব্যবসা শুরু করেছিল, এখন জড়িয়ে পড়েছে পুরোদস্তুর। এ ছাড়া তার ছবি তোলার শখ, প্রাইজ পাবার মতন ছবি তোলে, বই পড়ে, রবিবার সকালে বাগানের পরিচর্যা করে ও ঘাস ছাঁটে। ব্যাচেলর মানুষ, নিজস্ব একটা বাড়ি, অর্থ-চিন্তা নেই, যখন যা খুশি করতে পারে। অসীমের এই একলা স্বাধীন জীবন ঠিক ঈর্ষাযোগ্য কি না আমি বুঝতে পারি না। আমাদের সকলেরই একাকিত্ব সম্পর্কে মোহ আছে। শহরে জীবনের হুড়োহুড়ি থেকে

কিছু দিন বাইরে গিয়ে কিছু দিনের নির্জন বাস আমিও বেশ উপভোগ করি, কিন্তু কয়েক দিন পরেই তো মন আকুলি-বিকুলি করে। মানুষ বন্ধু-বান্ধবদের সংসর্গ পাবার জন্য ছুটে যায়। আবার জীবনের একটা পর্বে বন্ধুর সংখ্যা কমতে থাকে হু-হু করে, সেই উপলব্ধির নির্মমতাও বড় সত্য। অসীমের অবশ্য বেশ কয়েকজন ভালো বন্ধু-বান্ধবী আছে, সে একটা ফাঁকা বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু তাকে ঘিরে একটা বৃত্তও রয়েছে। এ এক-অন্যরকম জীবন, ঠিক ঘরোয়া বাঙালিপনাও নেই, আবার পুরোপুরি পশ্চিমীও নয়।

দুপুরবেলা বসা হলো ম্যাপ ও বইপত্র নিয়ে। এবার যাওয়া হবে কোন্ দিকে ? অসীম আগে থেকেই খানিকটা এঁচে রেখেছে, আমায় বললো, নর্মান্ডির দিকে গেলে কেমন হয় ? একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত চলে গিয়ে ধার দিয়ে দিয়ে এগোবো। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক স্মৃতিচিহ্ন এখনো আছে। তারপর একেবারে মঁ-সাঁ-মিশেল দেখে আসবো। সেটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলতে পারো।

আমি মঁ-সাঁ-মিশেল নামটা আগে শুনিনি। জিজ্ঞেস করলাম, সেখানে কী আছে ?

আগে থেকে এই জায়গাটার নাম না জানা আমার অপরাধ, সেই জন্যই অসীম আমাকে ধমক দিয়ে বললো, গেলেই দেখতে পাবে !

এবারে প্রশ্ন উঠলো, ভাস্করকে নেওয়া হবে কি না। ভাস্কর প্রত্যেকবার আমাদের সঙ্গে যায়। ভাস্কর না থাকলে জমে না। কিন্তু ভাস্করের সেই হেঁচকির অসুখ আজও সারেনি, বরং বেড়েছে, ইংল্যান্ডে ওদের ব্যবসার ব্যাপার নিয়ে কিছু গণ্ডগোল চলছে। সে জন্য এ সময় ভাস্করকে টেনে আনা ঠিক হবে না। তা ছাড়া এক গাড়িতে পাঁচ জনের বেশি যাওয়া অসুবিধেজনক ; অসীমের গাড়িটা হচ্ছে পেজো, তাতে পাঁচজনেই বেশ আঁটাআঁটি হয়। ভাস্কর থাকবে না বলে আমার মনটা খচখচ করলেও মেনে নিতেই হলো। অবশ্য ইংল্যান্ডে ভাস্করের বাড়িতে একবার যেতে হবেই।

দু' একদিন প্যারিসে থেকে আবহাওয়া গায়ে সইয়ে নিতে হয়। প্যারিসের বাতাস অতি হালকা। আজকাল ইউরোপে পরিবেশ ও বাতাস দূষণের প্রশ্ন উঠেছে খুবই, কিন্তু আমরা কলকাতা থেকে গিয়ে তার কিছু টেরই পাই না। এই সব জায়গায় এলে টের পাওয়া যায়, কলকাতার হাওয়া ধোঁয়া ও ধুলোয় কতটা ভারী।

স্বাতী এর আগে একবার ইওরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা ঘুরে গেলেও কুমকুম দেশের বাইরে আগে কখনো আসেনি। বাংলার বাইরেও খুব বেশি ঘোরাঘুরি করেনি। প্রথম বিদেশ বলতেই একেবারে প্যারিস। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তার ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা নেই, কোনো কিছুতেই সে ঘাবড়ায় না। স্বাতীর থেকে সে অনেক বেশি স্মার্ট। স্বাতী পাক্কা তিন বছর ফরাসী শিখেছে, কিন্তু প্যারিসে এসে সে একটাও কথা বলতে পারে না, লজ্জায় তার মুখ ফোটে না, যদিও আমি অন্য লোকের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ বলতে গেলে স্বাতী আমার ব্যাকরণের ভুল ধরে। এদিকে কুমকুমের কোনো অসুবিধেই নেই, সে ইংরিজি-বাংলা মিলিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে দেয়। দোকান থেকে একা একা গিয়ে জিনিস কিনে আনে। কুমকুমের ভাবখানা এই, ফরাসী সাহেবরা ফ্রেঞ্চ বলে তাতে কী হয়েছে, তা বলে কি আমাকেও ওদের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বলতে হবে ? কেন, ওরা কি আমাদের দেশে গিয়ে বাংলা বলে ? কিংবা, সাহেবদের দেশে পার্কগুলো খুব সুন্দর হবে, দোকানপাট খুব সাজানো-গোছানো হবে, এতেই বা অবাক হবার কী আছে ? এ-রকমই যে হবার কথা, তা তো সবাই জানে ! এর উল্টো কিছু হলেই বরং অবাক হবার ব্যাপার ছিল ! হ্যাঁ, যদি দেখতাম, এখানকার রাস্তাও কলকাতার মতন ভাঙাচোরা আর নোংরা, তা হলে বলতাম,

ম্যাগোঃ, এই নাকি তোমাদের প্যারিস !

কুমকুমের ব্যবহার দেখে আমার সুকুমার রায়ের কিছু কিছু চিঠির কথা মনে পড়ে। প্রথম বিলেতে গিয়ে সুকুমার রায় তাঁর বাবাকে ও মাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন, যা অনেক কাল পরে ছাপা হয়েছে। সেকালে ইংল্যান্ড ছিল অনেক দূরের দেশ। জাহাজে তিন সপ্তাহের ধাক্কা। অথচ লন্ডন শহর সম্পর্কেও সুকুমার রায়ের কোনো বিস্ময়বোধ নেই, সবই যেন তাঁর জানা। বরং কোনো একটা দোকানে গিয়ে বিশেষ কিছু ব্লক বা ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম খোঁজ করেও পাওয়া যাচ্ছে না বলে তিনি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করছেন। অথচ তাঁর পরেও কত বঙ্গ সন্তান লন্ডনে গিয়েই একেবারে গদোগদো হয়ে গেছে !

বাদল বসুকে যারা কলকাতায় দেখেছে, তারা বিদেশে দেখলে চট করে চিনতেই পারবে না। কলকাতায় বাদলের প্রতিদিনের পোশাক ধুতির ওপর সাদা শার্ট। ক্যালকাটা ক্লাব কিংবা রাজভবনে নেমন্তন্ন থাকলেও বাদল বসু ধুতি-শার্ট আর চটি বদলাবে না। কিন্তু শীতের দেশে গিয়ে কোট-প্যান্ট পরতেই হয়। সাহেবী পোশাক পরলে অনেকের মেজাজটাও সাহেবী হয়ে যায়, বাদলের ক্ষেত্রে হয়ে যায় ঠিক তার উল্টো। কলকাতায় ধুতি-শার্ট পরা যে বাদল বসুর এত হাঁকডাক ও ব্যক্তিত্বের দাপট, তারই গলার স্বরটা কেমন যেন চুপসে যায় কোট-প্যান্ট আর জুতো-মোজা পরার পর। অবশ্য বিদেশেও বাড়ির মধ্যে ঐ সব ধড়াচুড়ো ছেড়ে লুঙ্গিটা পরে কোমরে গিঁট দিতে না দিতেই আবার কণ্ঠস্বরের তেজ ফিরে আসে। মেদিনীপুরের ছেলে বাদল, প্যারিস হোক বা লন্ডনই হোক, লুঙ্গিটা না পরলে তার ঠিক জুত হয় না।

দু'একদিন প্যারিসের রাস্তায় সবাই মিলে বেড়াতে বেড়াতে আমি লক্ষ করলাম, বাদলের বন্ধু শুভেন্দুকে সবাই যেন একটু একটু ভয় পায়। এমনকি অসীম পর্যন্ত। মাঝে মাঝে সকলের ওপরই দাদাগিরি করার স্বভাব অসীমের, সেও শুভেন্দুকে ধমকে কথা বলার সাহস পায় না। যদিও শুভেন্দু চৌধুরী খুবই সুদর্শন ও শান্ত ধরনের মানুষ। কখনো গলার আওয়াজ উঁচুতে ওঠে না, তবু তাকে সবাই এমন সমঝে চলার কারণ তার মুড। কখন কিসে তার মুড নষ্ট হয়ে যাবে তার কোনো ঠিক নেই, সেই জন্য সবাই সব সময় সতর্ক থাকে। মুড নষ্ট হয়ে গেলেই শুভেন্দু একেবারে গম্ভীর হয়ে যাবে, ঘন্টার পর ঘন্টা একটাও কথা বলবে না। শুভেন্দু নিজে কখনো কারুকে সামান্য আঘাত দেয় না, কোনো আড্ডার পরিবেশ তার পছন্দ না হলে সেখান থেকে সে নিঃশব্দে সরে পড়ে। কখনো কোনো জায়গায় একসঙ্গে যাবার প্রস্তাব হলে শুভেন্দু একবার যদি বলে সেখানে সে যাবে না, তা হলে কিছুতেই আর তাকে রাজি করানো যাবে না। কেন সে যাবে না, সে কারণও সে জানাবে না।

অসীম একলা বাড়িতে থাকলেও অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করে, নিয়মিত অন্যদের খবরাখবর নেয়। সত্যিকারের একাকিত্ব ভোগ করে শুভেন্দু, স্বেচ্ছায়। আমার চেনাশুনো সমস্ত বাঙালিদের মধ্যে শুভেন্দুর মতন এমন নীরবতা উপভোগ করতে বা পালন করতে আর কারুকে দেখিনি। একেবারে অন্য রকম চরিত্রের মানুষ বলেই তাকে আমার বেশ পছন্দ হয়।

শুভেন্দু সিগারেট খায় খুব কম। কিন্তু কোনো সময়ে যদি চেনা কারুর কাছ থেকে সে একটা সিগারেট চায়, তা হলে বুঝতে হবে তার মেজাজ তখন ভালো আছে। সে হাসবে, কথা বলবে। কিছুক্ষণের জন্য যেন সে বাস্তব জগতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তখন।

আমাদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য শুভেন্দুকে কোনো প্রস্তাবই দেওয়া হলো

না। দিলেই হয়তো সে প্রত্যাখ্যান করবে, এই ভয়ে।

এক সন্ধেবেলা আমি হাঁটতে হাঁটতে অন্যদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছি, স্বাতী আমার কাছে এসে বললো, এই, তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন ? মার্গারিটের কথা মনে পড়ছে বুঝি ?

আমি বললাম, তা তো মনে পড়বেই ! পডবে না ?

স্বাতী বললো, এখন যদি হঠাৎ রাস্তায় মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হলে কেমন হয় ?

আমি বললাম, তা হলে···তা হলে সবাই মিলে একসঙ্গে হৈ-হৈ করা হতো। মার্গারিট তোমাকে এমন সব ছোট ছোট ছবির গ্যালারিতে নিয়ে যেত, যার সন্ধান অনেকেই জানে না।

স্বাতী বললো, মার্গারিটকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, এই যে রাস্তা দিয়ে অনেক মেয়ে যাচ্ছে, অনেকেই খুব সুন্দর, এদের মধ্যে মার্গারিটকে ঠিক কার মতন দেখতে ছিল বলো তো ?

আমি বললাম, কারুর মতনই নয়। মার্গারিটকে তেমন একটা সুন্দরী বলা যায় না। তবে সে অন্য রকম। এই সব সুন্দর সুন্দর মেয়েদের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে না।

যুক্তি দিয়ে আমি বুঝি, হঠাৎ রাস্তায় মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তার সে-রকম স্বাভাবিক জীবন থাকলে সে কিছুতেই হঠাৎ আমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করতো না। কিন্তু চোখ এই যুক্তি মানে না। মাঝে মাঝে কোনো কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠি। ঠিক যেন মনে হয়, দূর থেকে মার্গারিট হেঁটে আসছে আমার দিকে। চেহারার মিল না থাকলেও ফরাসী মেয়েদের হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে কিছুটা মিল খুঁজে পাই।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্বাতী বললো, তুমি বলেছিলে, প্রথমবার যখন তুমি ফরাসীদেশে এসেছিলে, তখন তোমার মনে হয়েছিল, এখানে সবাই কবি। তারপর সত্যি সত্যি কোনো ফরাসী কবির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি ? এখানে এসে আমরা কি শুধু বাঙালীদের সঙ্গে মিশবো আর বাঙালীদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাবো ? আমার খুব ইচ্ছে করে কোনো ফরাসীর বাড়ি যেতে, দু'একজন কবি কিংবা শিল্পীকে দেখতে।

বেলজিয়ামের এক কাব্য সম্মেলনে একবার বেশ কিছু ফরাসী কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। অনেকে ঠিকানা ও নিজেদের কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়েছিল আমাকে। সে সব কিছুই আনিনি সঙ্গে। তবে আর এক্‌জনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার নাম পিলিপ লামবিয়ার। প্যারিসে একটি 'মেইজো দ্য পোয়েজি' অর্থাৎ 'কবিতা-ভবন' আছে, পিলিপ লামবিয়ার তার পরিচালক। সেখানে প্রচুর কবিতার বই ও পত্র-পত্রিকা থাকে, মাঝে মাঝেই বসে একক কবিতা পাঠের আসর, অন্য সময় তরুণ-তরুণী কবিরা আসে আড্ডা দিতে। সেখানে যাওয়া যেতে পারে।

তারপর মনে পড়লো ভ্যারনার ল্যামবারসির কথা। এই ভ্যারনারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়, বেশ কিছু বছর আগে। নারায়ণ মুখার্জি এক সকালবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল আমাদের ফ্ল্যাটে। ভ্যারনারের চেহারায় এমনই বৈশিষ্ট্য আছে যে প্রথম দেখলে চমকে উঠতে হয়। তার মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখভর্তি শুভ্র দাড়ি, অথচ চোখ ও মুখ তারুণ্যে উজ্জ্বল, তার বয়েস তখন চল্লিশেরও কম। আই সি সি আর-এর আমন্ত্রণে সে ভারত দর্শনে এসেছিল।

ভ্যারনার ফরাসী নয়, বেলজিয়ান। অতটুকু দেশ বেলজিয়াম, সেখানেও ভাষা সমস্যা আছে, ফ্লেমিশ ও ফরাসী ভাষাভাষীদের মধ্যে রেষারেষি ফুটে ওঠে কখনো কখনো। বেলজিয়ামে থেকে যারা ফরাসী ভাষায় লেখে, মূল ফরাসী সাহিত্যে স্থান পেতে হলে তাদের প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়। এরকম দু'চারজনই পেরেছেন শুধু। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মরিস মেটারলিঙ্ক। এককালে তাঁর দুটি নাটক 'মন্না ভান্না' আর 'নীল পাখি' বাংলাতেও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক নাটকগুলি রচনা করার সময় মেটারলিঙ্কের লেখার প্রভাবে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়েসে এক বছরের ছোট ছিলেন মেটারলিঙ্ক কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন দু'বছর আগে।

ফরাসী সাহিত্যে স্থান পাবার জন্য মেটারলিঙ্ককে বেলজিয়াম ছেড়ে ফ্রান্সে বসবাস করতে হয়েছিল। ভ্যারনার ল্যামবারসিও তাঁর এই বিখ্যাত পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। শুধু দেশ নয়, নিজের স্ত্রী ও কন্যাকেও পরিত্যাগ করে সে প্যারিসে সংসার পেতেছে।

ভ্যারনার খুব নম্র ও মৃদুভাষী মানুষ। প্রতিটি কথাই চিন্তা করে বলে। তার কবিতাও খুব সূক্ষ্ম ধরনের। আগাগোড়া বিমূর্ত বলা যেতে পারে। ভ্যারনারের একটা সঙ্কল্প শুনে আমি হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। সে একজন কবি, সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনে এক লাইনও গদ্য লিখবে না !

অধিকাংশ কবিই গল্প-উপন্যাস ছুঁতে চায় না। কিন্তু তারা সমালোচনা, প্রবন্ধ কিংবা ভ্রমণকাহিনী লেখে, সমসাময়িক লেখকদের খোঁচা মারা রম্য রচনা লিখতে ছাড়ে না। কবিদের গদ্য সাধারণত ঔপন্যাসিকদের চেয়েও ভালো হয়। কিন্তু ভ্যারনার কোনো গদ্যই লিখবে না। পৃথিবীর এত দেশ ঘুরেছে, তবু ভ্রমণকাহিনীও না ! এ কথাটা শুনে হৃদয়ঙ্গম করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। আমাকে এতরকম গদ্য লিখতে হয়, অথচ এই একজন এক লাইনও গদ্য লিখবে না, কী সুখে আছে এই লোকটা !

প্যারিসে ভ্যারনারের সঙ্গে আমার আগে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। বেলজিয়াম ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম সে বেশ অসুবিধেয় পড়েছিলো। প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ একটা প্রাসাদ-বাজার আছে, সেখানে একটা দোকানে সেল্‌স ম্যানেজারের চাকরি নিতে হয়েছিল তাকে। আমাদের নারায়ণ মুখার্জিও তখন প্যারিসে। নারায়ণকে স্বাতী অনেকদিন ধরেই চেনে। এক পাড়ার ছেলে হিসেবে। আর কলকাতার তরুণ সাহিত্যিক মহলে নারায়ণ ফরাসীবিদ হিসেবে পরিচিত। ফ্রান্সে সে তখন গবেষণা করছে, তার সূত্রেই আবার যোগাযোগ হয়েছিল ভ্যারনারের সঙ্গে।

সারা ভরতবর্ষ ঘুরলেও কলকাতা সম্পর্কে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ জন্মে গেছে ভ্যারনারের। সে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে প্যাট্রিসিয়া নামে একটি তরুণী কবিকে, এবং হনিমুন করতে নববধূকে নিয়ে এলো কলকাতায়। পৃথিবীতে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে কেউ কি কলকাতার গরমে, নোংরায়, ভিড়ে, গাড়ির হর্নের বিকট শব্দের মধ্যে মধুযামিনী যাপনের কথা ভাবতে পারে ? সেবার ভ্যারনার সস্ত্রীক উঠেছিল আমাদের বাড়িতে। বলেছিল, জানো তো বিয়ের আগেই আমি প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে শর্ত করেছিলাম, কলকাতায় হনিমুন করতে যাবো কিন্তু, রাজি তো ?

প্যাট্রিসিয়ার মতন এমন নরম, লাজুক মেয়ে খুব কম দেখা যায়। সে কথা প্রায় বলেই না। শুধু হাসে। আমাদের বাড়িতে কত রকম অসুবিধে, বাথরুম-টাথরুম তো আর সাহেবদের মতন নয়, আর রান্নাও নিছক বাঙালী ধরনের, তবু কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই। কোনো অভিযোগ নেই কলকাতা সম্পর্কে। সব কিছুই তার ভালো লাগছে।

ওদের নিয়ে একদিন গিয়েছিলাম শহর ছাড়িয়ে গঙ্গা দেখতে। ডায়মণ্ড হারবার পার হয়ে হারউড পয়েন্টের কাছটা একেবারে ফাঁকা, নদীও অনেক চওড়া। সেখানে একটা নৌকো ভাড়া করে ঘোরা হলো। মাঝগঙ্গায় এসে ভ্যারনার জিজ্ঞেস করলো, এখানে সাঁতার কাটা যায় না ?

আমরা কেউ সাঁতারের জন্য তৈরি হয়ে আসিনি। তাছাড়া, মাঝিরা বললো, সমুদ্রের কাছাকাছি বলে এখানকার গঙ্গায় মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাঙর দেখা যায়। সেই ভয়ে এখানকার মাঝনদীতে কেউ সাঁতার কাটতে নামে না।

ভ্যারনার সেই সতর্কবাণী গ্রাহ্য করলো না। সে অনেকটা আপন মনে বললো, মানুষের জীবনটা কত সংক্ষিপ্ত, তার মধ্যেও কত সময় আমরা নষ্ট করি।

তারপর আবার বললো, এই নদী কী অপূর্ব। নদীতে অবগাহন না করলে নদীকে ঠিক উপভোগ করা যায় না।

স্ত্রীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, নামবো ?

প্যাট্রিসিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো।

জুতো-জামা-প্যান্ট খুলে ফেলে, শুধু জাঙ্গিয়া পরে ভ্যারনার লাফ দিল মাঝগঙ্গায়।

আমার মনে পড়লো জামসেদপুরের কাছে সুবর্ণরেখা নদী দেখে অ্যালেন গীন্‌সবার্গও ঠিক এই রকমই ব্যবহার করেছিল। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর, দূরের পাহাড় অস্পষ্ট। অ্যালেন বললো, বাঃ ! তারপর জামা-প্যান্ট খুলে জলে নেমে গেল।

ওদের নদী-দর্শন আর আমাদের নদী-দর্শন আলাদা। ওদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলিও শরীর-মাধ্যম।

ভ্যারনার ল্যামবারসির প্যারিসের বাড়িতে খেতে গেছি বার দু'এক। একবার বিজয়া মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও আরও কেউ কেউ সঙ্গে ছিল। সেবার ভ্যারনারকে ফোন করতেই সে চলে এলো। একদিন এক কাফেতে অনেকক্ষণ আড্ডা হলো ও পরবর্তী রাতে নেমন্তন্ন করলো আমাদের। প্যাট্রিসিয়া স্বাতীকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বাতী এসেছে শুনে সে তার লাজুক স্বভাবেও উচ্ছ্বসিত।

খাঁটি ফরাসী সংসার নয়, বেলজিয়ান-ফ্রেঞ্চ মিশ্র পরিবার। শুধু দু'জন। ওদের অ্যাপার্টমেন্টটি বেশ ছোট। প্যারিসের বুকে পুরোনো আমলের পাঁচ তলা বাড়ি, কিন্তু লিফ্‌ট নেই, সরু, কাঠের সিঁড়ি। ভ্যারনার স্বাতীকে ও আমাকে ওদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকার জন্য খুব পেড়াপিড়ি করেছিল, কিন্তু আমরা বুঝেছিলাম, তাতে ওদের খুবই কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। একখানা শোবার ঘর ও একটি বসবার ঘর, তাও বেশ ক্ষুদে ক্ষুদে। প্যাট্রিসিয়া স্কুলে পড়ায়, ভ্যারনার তখন বেলজিয়ান সরকারের একটি চাকরি পেয়েছে। সুতরাং বোঝা যায়, প্যারিসের বাড়ি ভাড়া কী সাঙ্ঘাতিক। তবে, কবি-দম্পতির এমন ছোট্ট বাসাই মানায়। যেন বৃক্ষচূড়ে কপোত-কপোতী।

সেবার গেছি অসীম, স্বাতী ও আমি। নানা রকম সুখাদ্য। প্যাট্রিসিয়া জানালো যে সে কিছুই রান্না করেনি, সবই রেঁধেছে ভ্যারনার। ভ্যারনার গদ্য লেখে না বটে, কিন্তু তার রান্নার শখ আছে। সে বলে, অনেকের যেমন বাগান করা কিংবা গাড়ি কিংবা ফটোগ্রাফির বাতিক থাকে, তেমনি তার শখ রান্না। সে রান্নাটাকেও শিল্পের স্তরে নিয়ে যেতে চায়।

অসীম এখন একটা রেস্তোরাঁ চালাচ্ছে, সুতরাং রান্না সম্পর্কে মতামত দেবার তার একটা অধিকার আছে। সেও স্বীকার করলো যে শ্যাম্পেন দিয়ে পাখির মাংসের পদটি অত্যুত্তম।

ভ্যারনার সম্পর্কে এত কথা মনে পড়ার আর একটি কারণ আছে। মানুষের মধ্যে যে

কত রহস্য তা আমি সেদিন একটি কথা শুনে নতুন করে অনুভব করেছিলাম। এখনো মানব প্রকৃতির অনেকটাই আমরা জানি না।

ভ্যারনারকে সেদিন প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে কলকাতা সম্পর্কে তার এত আকর্ষণের কারণ কী ? কেন সে বার বার কলকাতায় যেতে চায় ?

ভ্যারনার বললো, ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তবে এর প্রধান কারণ আমার মা। তিনি থাকেন বেলজিয়ামে, বেশ অসুস্থ। একবার আমি মায়ের শিয়রের পাশে বসে নানান দেশে বেড়াবার গল্প বলছি, বিভিন্ন শহরের নাম বলতে বলতে যেই কলকাতার নাম বলেছি, মা অমনি মাথা উঁচু করে বললেন, ঐ তো ! ঐ কলকাতাই তোর জায়গা।

আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মা কখনো কলকাতায় গিয়েছিলেন ? কিংবা পীয়ের দ্য লাপিয়ের-এর বই পড়েছেন ?

ভ্যারনার বললো, না। মা বিদেশে বিশেষ যাননি। ঐ বইও পড়েননি। তবু মা বললেন, ঐ কলকাতা থেকে তোর একটা বই বেরুবে। নিশ্চয়ই বেরুবে। তুই যখন মরবি, তখন কলকাতায় যাবি। মরার পক্ষে কলকাতাই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জায়গা।

ভ্যারনারের মা কেন এই কথা বলেছিলেন, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

২৭

যে দৈবাৎ ঢুকে পড়ে কবির নিজস্ব ঘরে, সে জানে না
এ ঘরের প্রতিটি আসবাব তাকে জাদু করতে পারে
চেয়ার আলমারির কাঠে সব ক'টি গ্রন্থি ধরে রাখে
যত বিহঙ্গের গান অরণ্যের বুকে আছে, তারও বেশি।
হঠাৎ টেবিল ল্যাম্প—মেয়েদের মত তার গ্রীবার ভঙ্গিমা
মসৃণ দেয়াল থেকে উঁকি দিতে পারে কোনো পড়ন্ত সন্ধ্যায়
চকিতে সে দেবে ডাক নানা বর্ণ নানা জাতি মৌমাছির ঝাঁক

ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছে তাজা পাউরুটির গন্ধ সে পারে জাগাতে...

—রেনে গী কাদু

বেশ সকাল সকালই আমরা প্যারিস ছেড়ে রওনা দিলাম নর্মাণ্ডির পথে।

আবহাওয়া বেশ অনুকূল। এ সব দেশে মেঘলা আকাশ কেউ পছন্দ করে না, রোদ্দুর উঠলেই আনন্দ। রোদ আছে কিন্তু গরম নেই। আমাদের পৌঁছোবার কোনো তাড়া নেই। এবারে আমাদের দলটির গঠনই আলাদা। সঙ্গে রয়েছে দুই নারী। শাড়ি পরা নারীরা এখনো এখানে কৌতূহলের বিষয়। কোনো হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঢুকলে লোকে তাকাবেই। গাড়ির পেছনের সিটে কুমকুম ও স্বাতী এবং বাদল বসু। সামনের সিটে, অসীমের পাশে আমাকে ম্যাপ খুলে বসতে হয়েছে। ম্যাপ ছাড়া গাড়ি চালানো এ দেশে দুঃসাধ্য, এতরকম রাস্তা যে একটু অনমনস্ক হলেই ভুল পথে যাবার সম্ভাবনা।

আমি অসীমের কাছে মাঝেসাঝে বকুনি খাবার জন্য তৈরি হয়ে আছি। এবারে ভাস্কর নেই, অসীম ও ভাস্করের মধ্যে ছদ্ম রেষারেষি ও কথার টক্কর চলবে না, ভাস্করের তুলনায় আমি অনেক মিনমিনে। বাদলকে করা হয়েছে ম্যানেজার ও কোষাধ্যক্ষ, আমরা কিছু কিছু চাঁদা ওর কাছে জমা দিয়েছি, যা কিছু খরচ বাদলের হাত দিয়েই হবে।

দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে প্রকৃতি অনেক বেশি সুন্দর ছিল। জঙ্গল, পাহাড়, গিরিখাদ ও ভূমধ্যসাগরের গাঢ় নীল জল খুবই দৃষ্টি-নন্দন। সেই তুলনায় এই অঞ্চলের প্রকৃতি অনেক রুক্ষ। ধু-ধু মাঠ, শ্লেট রঙের মাটি।

নর্মান্ডির নাম শুনলেই ভাইকিংদের কথা মনে পড়ে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সেই সব জলদস্যু, যাদের পরাক্রম এক সময় সারা ইওরোপ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই ভাইকিংরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেনি, বাহুবল ও দুঃসাহসই ছিল তাদের ধর্ম, সেই জন্য তাদের বলা হতো বারবেরিয়ান, হিদেন! রণতরী নিয়ে অকূলে ভেসে পড়তো তারা, তাদের উদ্দেশ্য সোনা ও নারী লুণ্ঠন।

সেই ভাইকিংদের একটি দল ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে এক সময় বসতি স্থাপন করে।

নবম শতাব্দীতে। অনেক যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও তারা এই জায়গার দখল ছাড়েনি। পরে এই এলাকাটির নাম হয় নর্মান্ডি, সেই দুর্ধর্ষ জলদস্যুরা ক্রমে খ্রিস্টধর্ম বরণ করে নেয়, ফরাসী ভাষাও গ্রহণ করে এবং তাদের নাম হয় নর্মান।

এই নর্মানদের শ্রেষ্ঠ বীর উইলিয়াম দা কংকোরার সাগর পেরিয়ে গিয়ে ইংল্যান্ড জয় করেছিলেন। নর্মান শাসন ছড়িয়ে পড়ে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং আয়র্ল্যাণ্ডে। নর্মান শাসনে ব্রিটিশ জাতি সুসভ্য হয়। পরে অবশ্য ইংরেজরাও ফ্রান্স আক্রমণ ও দখল করেছে অনেকবার। এই নর্মান্ডিই প্রধান রণক্ষেত্র এবং বহুবার হাত বদল হয়েছে।

ইতিহাসের সেই সব চিহ্ন এখন বিশেষ চোখে পড়ে না।

ঘণ্টা কয়েক চলার পরেই গাড়ির কী যেন একটা গণ্ডগোল শুরু হলো। প্রত্যেকবারই বেড়াতে বেরুবার আগে অসীম তার গাড়ি ভালো করে দেখিয়ে-টেখিয়ে, সার্ভিস করে নেয়, তবু যন্ত্রপাতির কথা তো বলা যায় না। আমি গাড়ি বিষয়ে কিছু জানি না, গাড়িটা চলছে ঠিকই, কোথাও কিছু একটা শব্দ হচ্ছে, সেটা সারিয়ে না নিলে বেশি গোলমাল হতে পারে।

বাদলও একজন গাড়ির এক্সপার্ট, সে বললো, হ্যাঁ, একটা শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু ওতে কোনো অসুবিধে হবে না, রাত্তিরে যেখানে থামবো, সেখানে দেখিয়ে নিলেই হবে।

অসীম বললো, হ্যাঁ, তা ঠিক, পরে দেখালেও চলবে।

এই বলেই সে ধাঁ করে একটা পেট্রল পাম্পের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে ফেললো। তারপর খোঁজ করলো মেকানিকের।

সেখানে কোনো মেকানিক নেই, তারা বলে দিল পাঁচ-দশ মাইল দূরের আর একটা কোনো পাম্পে যেতে। দ্বিতীয় পাম্পে গিয়ে জানা গেল, সেখানে অন্য দিন একজন মেকানিক থাকে বটে, কিন্তু আজ রবিবার বলে তার ছুটি। তারা আবার আর একটি জায়গার সন্ধান দিল।

এই রকম ভাবে আমরা সাতখানা পেট্রল পাম্প ও গ্যারাজে ঢুঁ মারলাম, কিন্তু রবিবার দিন কিছুতেই মেকানিক পাওয়া যাবে না। রবিবার দিন কারুর সাঙ্ঘাতিক অসুখ হলেও ডাক্তার পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

গাড়িখানার অসুখ বিষয়ে বাদল ও অসীমের সামান্য মতভেদ হতে লাগলো। বাদলের মতে, এক্ষুনি গাড়িটার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। আর মেকানিক পাওয়া যাচ্ছে না বলেই অসীমের আরও জেদ চেপে যাচ্ছে, আজ দেখাতেই হবে।

দু' জন মহিলার মতন, আমারও এ বিষয়ে কোনো মতামত দেবার অধিকার নেই। গাড়িখানা দিব্যি চলছে এটাই দেখতে পাচ্ছি। চলাই তো গাড়ির জীবনের লক্ষণ। যদিও সন্ত কবীর বলেছেন, গাড়ি মানে যার গেড়ে বসে থাকার কথা, কিন্তু বিস্ময় এই যে, 'চলতি কা নাম গাড়ি'।

প্রায় পঞ্চাশ মাইল এ গ্যারাজ সে গ্যারাজে ঘোরাঘুরি করার পর একটি বন্ধ কারখানার দারোয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল যে কাছেই একজন মেকানিকের বাড়ি, সে রবিবারেও কাজ করে।

লোকটি নিশ্চয়ই খুবই দরিদ্র কিংবা বিদেশী!

খুঁজে বার করা হলো তার বাড়ি। সে লোকটি কালি-ঝুলি মাখা ওভারঅল পরে ছিল। বাড়িতেই কাজ করছিল কিছু। আমার সন্দেহ সত্য, লোকটি ফরাসী নয়, খুব সম্ভবত ইতালিয়ান অথবা গ্রীক।

অসীমের প্রস্তাব শুনে সে প্রথমেই বললো, দেড়শো ফ্রাংক লাগবে।

তারপর গাড়ির সামনের ডালাটা তুলে সে এক মিনিট পর্যবেক্ষণ করলো, কয়েকবার ফুঁ দিল, হাতের ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিল কী যেন। ডালাটা নামিয়ে একটা চাঁটি মেরে বললো, ঠিক আছে!

পাঁচ মিনিটও সময় ব্যয় করেনি, তার জন্য দেড়শো ফ্রাংক!

বাদল আগেই তো আমি বলেছিলুম্ জাতীয় একটা হাসি দিতে যেতেই অসীম গম্ভীর ভাবে বললো, গাড়িটা সত্যিই বেশি খারাপ হয়ে গেলে বুঝি আপনি খুশি হতেন?

আমি মনে মনে ভাবলাম, বাদল এই প্রথম অসীমের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে, প্রথম প্রথম কয়েকবার তো বকুনি খাবেই। ক্রমশ সে নিজেই বুঝে যাবে, কী করে উল্টো প্যাঁচে অসীমকে টিট করতে হয়।

মেকানিকটিকে দেড়শো ফ্রাংক দেওয়া এই জন্য সার্থক যে এর পর শব্দটা থেমে গেল, অসীমের মনের খচখচানি ঘুচে গেল এবং বাকি রাস্তায় একবারও গাড়িটা কোনো গণ্ডগোল করলো না।

ম্যাপে মনোযোগ দিয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে আমি অসীমকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আমরা কি ব্রিটানির দিকেও যাবো? নর্মান্ডির পরেই তো ব্রিটানি দেখতে পাচ্ছি।

অসীম বললো, ব্রিটানি তো অনেক দূর হয়ে যাবে। সেখানে কেন যেতে চাও!

আমি বললাম, রেনে কাদু নামে একজনের একটা কবিতা খুব ভালো লেগেছিল। কবিতাটার নাম খুব সম্ভবত 'কবির ঘর'। রেনে কাদু ব্রিটানিতে থাকতেন। একবার তাহলে তাঁর বাড়িটা দেখে আসতাম।

অসীম জিজ্ঞেস করলো, রেনে কাদু, খুব বড় কবি?

আমি বললাম, তেমন একটা বিখ্যাত নয়। কিন্তু ওঁর ঠাণ্ডা মতন কবিতা আর ওঁর জীবনটা বেশ লাগে। এ যুগে অধিকাংশ কবিই কোনো এক সময় শহরে চলে যায়, এখন তো শহরগুলোই সাহিত্যের কেন্দ্র। কিন্তু রেনে কাদু বরাবর গ্রামেই রয়ে গেলেন, বি এ পাশও করতে পারেননি, একটা ইস্কুলে মাস্টারি করতেন, আর নিরিবিলিতে কবিতা লিখতেন। এক সময় আমারও বাসনা ছিল, কোনো গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করবো আর শুধু কবিতা লিখবো। সারা জীবনে তিন চারখানা কবিতার বই বার করতে পারলেই যথেষ্ট।

অসীম হেসে বললো, সবার কি সব শখ মেটে। সময় পেলে ব্রিটানিতে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেখানে তুমি রেনে কাদু'র বাড়িটা খুঁজে পাবে কি না খুব সন্দেহ আছে। ব্রিটানি তো বিরাট এলাকা।

আমি বললাম, নর্মান্ডি নামটার মধ্যেই যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ। ব্রিটানির সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। অনেক লেখায় পড়েছি।

অসীম বললো, ব্রিটানিতেও যুদ্ধ কম হয়নি। তবে, সর্বকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সমর-অভিযান কোথায় হয়েছিল, তা তুমি জানো?

আমি বললাম, যারা একটু-আধটু ইতিহাস পড়েছে, তারা সবাই জানে। আচ্ছা, ব্রিটানিতে কি পল গগ্যাঁ থাকতেন এক সময়? তাহিতি দ্বীপে যখন পল গগ্যাঁ মৃত্যুশয্যায়, তখনো তাঁর মনে পড়তো ব্রিটানির কথা! তিনি শেষ যে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করেছিলেন সেটার নাম 'ব্রিটানির তুষার' না?

অসীম ভুরু কুঁচকে বললো, ব্রিটানির তুষার? না, তা তো হতে পারে না! ব্রিটানিতে কি বরফ পড়ে নাকি? না তো, তোমার ভুল হচ্ছে।

আমারও খটকা লাগলো। নিশ্চয়ই আমার ভুল। কিন্তু কেন যেন 'ব্রিটানির তুষার'

আমার মাথায় গেঁথে আছে। ভুলটা না ভাঙলেই বা ক্ষতি কী!

পেছন থেকে মহিলাদের একজন বললো, এখন একটু চা কিংবা কফি খাওয়ার জন্য থামলে হয় না?

গাড়িটা যাচ্ছে একটা ছোট্ট শহরের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি অনেক কাফে ও রেস্তোরাঁ। একই কফি রেস্তোরাঁয় খেলে দাম বেশি, কাফে-তে সস্তা।

অসীম বললো, হ্যাঁ, একটা ভালো দোকান দেখে থামতে হবে।

অসীমের ভালো দোকান বলতে কী বোঝায়, তা আন্দাজ করা শিবের বাবারও অসাধ্য। বেশ ভালো ভালো দোকান পেরিয়ে যাচ্ছে, দেখতে সুন্দর দোকান, পার্কিং-এর জায়গা আছে এমন দোকান, ফাঁকা জায়গায় নিরিবিলি দোকান, সবই পার হয়ে গেল অসীম, শহর ছাড়িয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো, একই রাস্তায় চক্কর মারলো, তারপর সে এমন একটা জায়গায় থামলো, যেখানকার বিশেষ নির্বাচন-যোগ্যতা যে কী তা আমরা কেউ বুঝলাম না।

অসীম কিন্তু সস্তা খোঁজে না, তবে সে কী যে খোঁজে, তা কেউ জানে না। বড় রাস্তার ওপরের খুব বেশি সাজানো-গোছানো দোকান তার পছন্দ নয়, আবার একেবারে নিরিবিলি জায়গাতেও সে থামতে চায় না। রোতিসেরি নামে দোকানে এক ধরনের ঝলসানো মুর্গী পাওয়া যায়। সে রকম একটা মুর্গী দেখে স্বাতীর একবার খাবার সাধ হয়েছিল। অসীম বলেছিল, দাঁড়ান, আপনাকে খুব ভালো একটা জায়গায় ঐ মুর্গী খাওয়াবো! তারপর পাঁচ ছ'দিন ধরে ফ্রান্সের অনেকখানি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি হলো, ঐ রকম রোতিসেরি কত পেরিয়ে গেল, কোনোটাই অসীমের পছন্দ নয়,স্বাতীর আর সেটা খাওয়াই হলো না। আজও স্বাতী সেই মুর্গীর প্রসঙ্গ তুলে অসীমকে খোঁচা দেয়।

এই সব ছোটখাটো জায়গার কাফেতে বেশ গরম গরম ক্রোয়াশঁ কিংবা প্যান কেক পাওয়া যায়। তার সঙ্গে কফি খুব জমে। চলন্ত গাড়িতে সিগারেট টানার উপায় নেই বলে এই সময়টা আমরা আরাম করে সিগারেট ধরাই। যার যা ইচ্ছে মতন খাওয়া, দাম দেবে বাদল। প্রথম প্রথম পয়সা মেটাতে গিয়ে বাদল অস্বস্তিতে পড়তো। ফরাসী এক দুই যে জানে না, সে হঠাৎ টাকা দেবার সময় দিজ উইত কিংবা কাত্র ভ্যাঁ শুনলে কী বুঝবে? কিন্তু বাদল চালাক ছেলে, কাফে-রেস্তোরাঁর কাউন্টারে কিংবা পেট্রল পাম্পের মেশিনের দিকে সে খর দৃষ্টি রাখে, টাকার অঙ্কটা সেখানে দেখে নেয় টপ করে।

আজ আর বেশি দূর যাওয়া হবে না, আমিই প্রস্তাব তুললাম, এবার রাত্রিবাসের জন্য হোটেল ঠিক করা হোক। কারণ, জানি তো, সে জন্যও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় ব্যয় হবে। ভাস্কর নেই, কেই বা ভিটো দেবে অসীমের ওপর!

মাত্র গোটা দশেক হোটেল ঘোরার পর একটি হোটেল পছন্দ হলো। চতুর্দিকে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, কিছুই দেখবার নেই। যাই হোক, একটা রাত্তিরের মোটে মামলা।

কিন্তু হোটেলটি যে খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা বোঝা গেল পরদিন সকালবেলা।

এসব হোটেলে এক রাতের অতিথিরা আসে বেশি। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমাদের ব্যস্ততা নেই, তা ছাড়া মহিলাদের স্নানপর্ব সারতে অনেক সময় লাগে। আমরা ব্রেকফাস্ট খাবার পর একটি ঘরে বসে গল্প করছি। এক বুড়ি আমাদের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করেছে। কাউন্টারেও আর এক বৃদ্ধাকে দেখেছি।

কুমকুম বললো, ঐ দুই বুড়ি দুই বোন!

বুড়িদের সঙ্গে তার একটাও কথা হয়নি, তবু কুমকুম বুঝলো কী করে? বুড়িরা এক বর্ণ ইংরিজি জানে না, অসীমের মাধ্যম ছাড়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করারও কোনো উপায়

নেই। কুমকুম বেশি কথা বলে না, কিন্তু সব কিছু লক্ষ করে। বুড়ি দু' জনের চেহারায়ও তেমন মিল নেই। তবু ওদের ভাবভঙ্গি দেখে কুমকুম ঠিকই আন্দাজ করেছে, অসীম বুড়িদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিল, তারা সত্যিই দু' বোন।

আরও একজন বৃদ্ধা আমাদের বিছানা-টিছানা পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। সে-ও অন্য দু' জনের সহোদরা না হলেও কিছু একটা আত্মীয়। এই তিন বৃদ্ধার কারুরই বয়েস সত্তরের কম নয়। আর কোনো পুরুষ নেই, তিন বুড়ি এই হোটেল চালাচ্ছে।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, পশ্চিমী দেশগুলির ভোগ্যপণ্যের বিপুল সমারোহের জন্যও নয়, সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর চকচকে রাস্তার জন্যও নয়, এই সব দেশের মেয়েদের আত্মনির্ভরতা দেখলেই মনে হয়, আমাদের দেশ কত পিছিয়ে আছে। একটা গোটা হোটেল চালাবার জন্যও কোনো পুরুষের সাহায্য লাগে না, তিন বুড়িই যথেষ্ট। আর আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা আঁতুড়ঘর আর রান্নাঘর থেকে বেশি দূর যেতেই পারেননি।

শাড়ি পরা কুমকুম ও স্বাতীকে দেখে বুড়িরা খুবই কৌতূহলী, মাঝে মাঝেই কলকল করে কত কী বলে যাচ্ছে, ওরা কিছুই বুঝছে না। তবে এরাও হাসছে, ওরাও হাসছে। হাসির মতন এমন সর্বজনবোধ্য ভাষা আর হয় না।

স্বাতী এক বৃদ্ধাকে একটি উপহার দিতে চাইলো। একটা ব্রোচ, ওপরের দিকটা ছুরির আকারের। হোটেলের মালিক আর খদ্দেরের মধ্যে উপহার দেবার সম্পর্ক হয় না সাধারণত। বৃদ্ধাটি খানিকটা প্রতিবাদের সুরে কী যেন বলতে লাগলো অসীমকে। এই রে, বৃদ্ধা কিছু মনে করেছে নাকি ?

অসীম বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। বৃদ্ধা খুবই মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে কেউ যেমন রুমাল উপহার নেয় না, প্রেমিকাও প্রেমিককে রুমালের বিনিময়ে পয়সা দেয়, সে-রকম ওদেরও নিয়ম, কারুর কাছ থেকে বিনা পয়সায় ছুরি নিতে নেই। বুড়ি তার দাম দেবেই, স্বাতীও নেবে না। শেষ পর্যন্ত সেই বুড়ি পুরোনো আমলের একটা এক পয়সা খুঁজে বার করলো কোথা থেকে।

শুধু তাই নয়, বৃদ্ধা আমাদের সবাইকেই উপহার দিল কয়েকটি ছোট ছোট ফ্রান্সের পতাকা।

গাড়িতে আমাদের মালপত্র তোলা হচ্ছে, আমাদের বিদায় দেবার জন্য দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে দুই বৃদ্ধা। হঠাৎ মনে হতে পারে, আমরা যেন কোনো আত্মীয়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মাসি-পিসিরা। এদের মুখ সেই রকমই স্নেহময়।

বাদল বললো, বেশ বাড়ি-বাড়ির মতন লাগলো, তাই না ?

স্বাতী বললো, এখানে আর দু' একটা দিন থেকে গেলে হয় না ?

অসীম হেসে বললো, এতই ভালো লেগে গেছে ? কিন্তু শহরের মধ্যে একটা হোটেলে কাটাবার জন্য তো আমরা বেড়াতে বেরোইনি !

আগের বার দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে যাবার পথে লাসকো-তে আমরা এক চাষীর বাড়িতে উঠেছিলাম। সেবারে সকালবেলা সেখান থেকে আমাদের প্রায় বিতাড়িত হতে হয়েছিল। গাড়ি চলতে শুরু করার পর আমি সেই গল্প শোনালাম অন্যদের। সেবারের তুলনায় এবারের অভিজ্ঞতা কত অন্যরকম।

আমাদের সেই হেনস্থার কাহিনী শুনে দুই মহিলা খুব হাসতে লাগলো। যেন তারা বলতে চায়, বেশ হয়েছে ! আমাদের না নিয়ে বেরিয়েছিলে, তাই তো ঐ রকম অবস্থা !

২৮

“বৃষ্টি পড়ছে নারীদের কণ্ঠস্বরে
যে নদী তারা সবাই মৃত
এমন কি স্মৃতিতেও
তুমি আমার বৃষ্টিতে ভিজছো
আমার সারা শরীরে
আমার মায়ের জীবনে
তুমি বৃষ্টিতে ঝরে পড়ছো
আমার বিশ্বময়
তুমি বৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছো
আমার সর্বস্বে
তুমি বৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছো
আমার সঙ্গে অপূর্ব সাক্ষাৎকারে
আমার মুখে শোনো শোনো
এ ই বৃষ্টি
দু' পা
বৃষ্টি পা
ত য়
খ
ন
অ
নু
তা
প
আ
র
তা
ছি
ল্য
কা
দ
ছে
পূ
রো
নো
স
ঙ্গী
তে
র
ম
ত
ন

তুমি আর শোনো এ ই তো মা র অ স্তি ত্ব র প ত ন
আর বিশ্বময় তা ছি ল্য কা দ ছে পূ রো নো স ঙ্গী তে র ম ত ন
কানসর্বস্বনগরগুলিতে ছড়া ছে ছে যা ধ্ব নি

—ঈয়ম আপোলিনেয়ার”

বিকেলের আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম দোভিল। এই প্রথম সমুদ্রদর্শন হলো। একটা সাদামাটা হোটেল ঠিক করে, মালপত্র রেখে, সময় নষ্ট না করে চলে এলাম বেলাভূমিতে।

মানচিত্রের কথা মনে রাখলে একে ঠিক সমুদ্র বলা যায় না। এ তো ইংলিশ চ্যানেল। কত নারী-পুরুষ সাঁতরে পার হয়েছে। এমনকি আমাদের দু'একজন বঙ্গ ললনাও সে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। অবশ্য এখানে ইংলিশ চ্যানেল বেশ চওড়া। ক্যালে কিংবা ডানকার্কের কাছে ইংল্যান্ড ও ফরাসীদেশ খুব কাছাকাছি, সাঁতারুরা ওদিকেই পারাপার করে, যাত্রীবাহী জাহাজগুলোও চলে ডোভার আর ক্যালে'র মধ্যে। দোভিল-এ এই দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব সবচেয়ে বেশি, এখানে কোনো বন্দরও নেই।

মানচিত্রে যা-ই থাক, চোখের সামনে যে ঢেউ-সঙ্কুল জলরাশির পরপার দেখা যায় না, তাই তো সমুদ্র। ইস্তানবুলে গিয়ে আমি বসফরাস প্রণালী প্রতিদিন দু'বার করে পার হতাম, স্টিমারে কিংবা ব্রিজের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে, সেটাও তো সমুদ্র। এখানকার ইংলিশ চ্যানেলের চেয়ে বসফরাস অনেক সরু, তবু তার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। কিন্তু এখানকার সমুদ্র কেমন যেন রুক্ষ, জলের রং নীল নয়, কালচে ধরনের, বেলাভূমি মসৃণ বালুকাময় নয়, এবড়ো-খেবড়ো, পাথর ছড়ানো। এখন ভাটার সময়, জলরেখা অনেকটা দূরে। ওড়িশার চাঁদিপুরে যেমন সমুদ্রের ঢেউ এক একসময় পান্থনিবাসের দোরগোড়ায় এসে ছলাত ছলাত করে, আবার অন্য সময় এক দেড় মাইল দূরে সরে যায়, নানান চিহ্ন দেখে মনে হলো এখানকার সমুদ্রের চরিত্রও সেরকম।

পৃথিবীর নানান জায়গাতেই আমার সমুদ্রদর্শন হয়েছে, ডুব দিয়েছি কয়েকটি মহাসাগরে, কিন্তু এই সামান্য ইংলিশ চ্যানেলের অখ্যাত একটা জায়গায় এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তা আর কোথাও দেখিনি। এত ঝিনুক! যেদিকে তাকাই শুধু ঝিনুক! আর এত পাখি!

সব সমুদ্রের পেটেই ঝিনুক থাকে। প্রতিটি ঢেউ তীরে এসে কিছু ঝিনুকের উপহার রেখে যায়। পুরীর সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে কে না ঝিনুক কুড়িয়েছে? বাচ্চারা কাঁড়ি কাঁড়ি ঝিনুক জমায়, তারপর বাড়ি ফেরার সময় সেগুলো সঙ্গে আনতে চাইলে মা-বাবারা আর বোঝা বাড়াতে চায় না। ঝিনুকের মালা, ঝিনুকের তৈরি কত রকম খেলনা বিক্রি হয়। আন্দামানের এক নির্জন দ্বীপে আমি ঝিনুকের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খও উঠে আসতে দেখেছি। সেসব ঝিনুকের কত বৈচিত্র্য, রং ও আকৃতির কী নিপুণ শিল্প!

তবু আগেকার দেখা কোনো ঝিনুক-সম্পদের সঙ্গেই এখানকার দৃশ্যের তুলনা চলে না। প্রতিটি ঢেউতে এখানে যে ঝিনুক উঠে আসছে, তা সব একই রকম, দেখতেও সুন্দর নয়, ওপরটা কালো শ্যাওলার মতন, দু'ইঞ্চি, তিন ইঞ্চি সাইজের। আমাদের দেশের অনেক পুকুরে এরকম ঝিনুক দেখা যায়। আমরা এই ঝিনুকের খোলার মাঝখানটা ফুটো করে ছুরি বানাতাম, সেই ছুরিতে কাঁচা আম ছুলতাম।

সেই আমাদের চেনা ঝিনুক এখানকার সমুদ্র থেকে উঠে আসছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ। সংখ্যাটা একটুও বাড়িয়ে বলছি না, কোটি কোটি বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেদিকেই তাকাই ঝিনুক ছড়ানো। হাঁটতে গেলে ঝিনুকের ওপর দিয়েই হাঁটতে হবে। কোথাও কোথাও ঝিনুকের স্তূপ হয়ে আছে। প্রতিবারের ঢেউতে আরও আসছে।

অনেক সমুদ্রের ধারেই ধপধপে সাদা রঙের পাখিদের দেখা যায়। সি গাল! এখানে তাদের খাদ্য এত বেশি বলেই তাদের সংখ্যাও প্রচুর। হাজার হাজার পাখি উড়ছে কিংবা মাটিতে বসে ঝিনুক ঠোকরাচ্ছে। এরই মধ্যে কারুর পোষা একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর তেড়ে যাচ্ছে পাখিদের। দুর্দান্ত ধরনের স্বাস্থ্যবান সেই কুকুর প্রবল বেগে ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু

পাখি ধরা কি চাট্টিখানি কথা। পাখিগুলো যেন খেলছে কুকুরটাকে নিয়ে, তাদের ভয়ডর নেই, কুকুরটা একদম কাছে যাওয়া পর্যন্ত তারা চুপ করে বসে থাকে, তারপর হঠাৎ এক ঝাঁক পাখি ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায়, ঘুরতে থাকে কুকুরটার মাথার ওপর। কুকুরটা আবার ছোটে অন্য একটা ঝাঁকের দিকে। ছুটতে ছুটতে কুকুরটা অনেক দূরে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত চলে যায়। আসন্ন সন্ধ্যায় সূর্য একটু একটু করে নামছে সমুদ্রের বুকে। অতি গাঢ় লাল সূর্য, হাজার হাজার শ্বেত বিহঙ্গ ও একটি ধূসর রঙের সারমেয়, সব মিলিয়ে এক মনোহরণ দৃশ্য।

এই ঝিনুক শুধু পাখিদের খাদ্য নয়, মানুষেরও। কাছাকাছি অঞ্চল থেকে অনেক লোক গাড়ি নিয়ে আসছে, গাড়ি থেকে নামছে পায়ে গাম বুট পরে, হাতে বালতি। যেখানে ঢেউ ভাঙছে, সেই পর্যন্ত চলে গিয়ে তারা বালতিতে ভরছে জ্যান্ত ঝিনুক। বিনা পয়সায় প্রোটিন। ফরাসীতে এই ঝিনুকগুলোকে বলে মূল (Moules), হোটেল-রেস্তোরাঁয় বেশ দামে বিক্রি হয়। হঠাৎ কখনো এই ঝিনুকের মধ্যে মুক্তোও পাওয়া যেতে পারে। সেইজন্যই তো সমুদ্রের আর এক নাম রত্নাকর। তবে, এত লক্ষ লক্ষ ঝিনুকের মধ্যে কোনোটায় মুক্তো আছে কি না তা কে ভেঙে দেখবে! এখানকার অনেক হোটেল-রেস্তোঁরার লোকেরাও বালতি ভরে ভরে ঝিনুক নিয়ে যাচ্ছে, কোনো খরচই নেই! এদিকের হোটেলে খুব পাখির মাংসের রোস্টও পাওয়া যায়। সেগুলো কি সি-গাল? ছররা বন্দুক দিয়ে কয়েক ডজন সি-গাল যখন তখন মারা যায়।

অসীম দু'তিন রকম ক্যামেরা এনেছে, ক্যামেরা বদলে বদলে ছবি তুলছে মন দিয়ে। ফটোগ্রাফিতে তার বিশেষ ঝোঁক। সে তার ছবি প্রতিযোগিতায় পাঠায়। অসীম যখন ছবি তোলে তখন বিশেষ কথা বলে না, যেন ধ্যানে মগ্ন থাকে। আমরা ঘুরছি একদিকে, অসীম অন্যদিকে, প্যান্ট গুটিয়ে নিয়েছে হাঁটু পর্যন্ত, জল-কাদা ভেঙে ভেঙে সে চলে যাচ্ছে কিনার পর্যন্ত, উড়ন্ত পাখি ও শিকারী কুকুরের দৃশ্যটি সে অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে তুললো।

সাধারণত কোনো পুরোনো ভাঙা বাড়ি, মাঠের মধ্যে একলা গাছ, ঝুলন্ত মাকড়সা, ফড়িং-এর ওড়াউড়ি, এই সব দেখলেই অসীম তার ক্যামেরা বার করে চোখে লাগায়। বাদল অনেক সময় ঠাট্টা করে বলে, এই যে রায়দা, আপনার ক্যামেরায় বুঝি মানুষের ছবি ওঠে না? আমরা যে রয়েছি, একসঙ্গে ঘুরছি, এর কোনো ছবি তোলা যায় না?

অসীম ভুরু কুঁচকে বলে, ধ্যাত মশাই, আপনাদের চেহারায় ছবি তোলার কী আছে?

স্বাতী তখন বলে, আমরা দেখতে খারাপ, তাই অসীমবাবু পাত্তা দিচ্ছেন না।

অসীম তখন হাসতে শুরু করে। তবু কিন্তু ক্যামেরার লেন্স ফেরায় না আমাদের দিকে। আবার সে কুকুর কিংবা পাখি ধরতে যায়।

কখনো কখনো অবশ্য অসীমের দয়া হয়। আমাদের না জানিয়ে একটু দূর থেকে ক্যামেরা ফিরিয়ে ক্লিক ক্লিক করে। কাছে এসে বলে, দেখি, পাশাপাশি দাঁড়ান তো। এতই যখন ইচ্ছে, আপনাদের, একটা ছবি তুলে দিই!

যে-কোনো কারণেই হোক, সেই সব ছবি ঠিক প্রাইজ পাবার উপযুক্ত হয় না।

সন্ধের মুখে বৃষ্টি নামলো। প্রথমে খুব গুঁড়ি গুঁড়ি। যেন আমাদের ঘরে ফেরার সময় দিচ্ছে। আকাশের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, যাকে বলে বিদ্যুৎ-বজ্রপাত সহ বৃষ্টি, তার সম্ভাবনা যথেষ্ট। ফেরার পথে আমরা কয়েকটা খড়ের চালের বাড়ি দেখলাম। ঠিক আমাদের গ্রামের গরিব মানুষদের বাড়ির মতন। অসীম জানালো, এদেশের অত্যন্ত বড়লোকরাই এরকম শখের খড়ের চাল দেওয়া বাড়ি বানায়। বাইরেটা যতই সামান্য

দেখাক, ভেতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম তো রাখতেই হবে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। তখন আমার মনে পড়লো, আমেরিকার একটি শহরে আমি খাপরার চাল দেওয়া মাটির বাড়ি দেখেছিলাম। পুরুলিয়া কিংবা বিহারে যেরকম বাড়ি খুব দেখা যায়। সেগুলোও আসলে খুব শখের বাড়ি, খুবই ব্যয়বহুল ! কী আজব শখ !

রাত্তিরে রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমি প্রথমেই দাবি তুললাম, ঝিনুক খেতে হবে !

মেনিউ-তে ঝিনুকের নানারকম পদ আছে, তার মধ্যে ওয়াইন দিয়ে সেদ্ধ করা মূল পদটিই অসীম সুপারিশ করলো। কিন্তু মুশকিল হলো কুমকুমকে নিয়ে। সে খাবে না।

পশ্চিম জগতে বেড়াতে যাবার আগে অনেকেই প্রতিজ্ঞা করে, গোরুর মাংস আর মদ কিছুতেই ছোঁবে না। কিন্তু এই দুটি বস্তুই এড়ানো প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। কতরকম রান্নার মধ্যে যে ওয়াইন, শ্যাম্পেন কিংবা কনিয়াক থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। আইসক্রিম, কেক, চকোলেট, বিস্কুটের মধ্যেও থাকে। আর গোরুর মাংস যে কোথায় মিশে আছে, তাও ধরবার উপায় নেই। এমনকি অতি নিরীহ আলুভাজা, সেটাও ভাজা হতে পারে এমন লার্ড দিয়ে, যা বিশুদ্ধ গোরুর চর্বি। ঘি-ও যেমন গোরুর চর্বি, সেটা অবশ্য পাওয়া যায় জ্যান্ত গোরুর কাছ থেকে। অনেকে হ্যামবার্গার খায় এই ভেবে যে শুয়োরের মাংস হিন্দুর কাছে নিষিদ্ধ মাংস নয়, কিন্তু হ্যামবার্গারের সঙ্গে হ্যামের কোনো সম্পর্ক নেই। হ্যামবুর্গ শহরের নামে প্রচলিত এই খাদ্যটির মাঝখানে থাকে এক চাকা গোমাংস !

আমাদের শাস্ত্রকাররা অতি বাস্তববাদী ছিলেন, তাঁরা বলে গেছেন যস্মিন দেশে যদাচারঃ। কিংবা, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। একালে অনেকে এই সব শাস্ত্রবচন মানতে চায় না বলেই যত বিপত্তি।

কুমকুম ঝিনুক খাবে না বলে নিল এক বাটি সুপ। তার এক চামচ মুখে ঠেকিয়েই সে শিউরে উঠেলো। একটা কী রকম গন্ধ লাগছে ! ঐ সুপও তার মুখে রুচবে না। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমবার আমেরিকা গিয়ে প্রথম এক দোকানের সুপে চুমুক দিয়ে আমারও এরকম গা গুলিয়ে উঠেছিল। কী রকম যেন একটা গন্ধ, একেবারে অচেনা, আমাদের স্বাদের সঙ্গে মেলে না। তারপর আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গেল, পরে আমি সেধে সেধে বাটি বাটি সুপ খেতাম।

কুমকুম সুপও খাবে না, তা হলে কী খাবে ? বাদলের মুখ কাঁচুমাচু। বউ কিছু না খেলে সে নিজে খায় কী করে ?

কুমকুম অবশ্য ঘাবড়াবার পাত্রী নয়। চারপাশের সব কিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করা তার স্বভাব। সে এর মধ্যেই দেখে নিয়েছে যে দূরের একটা টেবিলে একজন লোক একটা বেশ লম্বা মাছ ভাজা খাচ্ছে। সে বললো, আমিও তো মাছ খেতে পারি। শুধু মাছ হলেই চলবে। তার সঙ্গে রুটি মাখন খেয়ে নেবো !

কুমকুমের জন্য অর্ডার দেওয়া হলো ট্রাউট মাছ। সেই মাছের সঙ্গে ফাউ হিসেবে এলো খানিকটা ফুটফুটে সাদা ভাত। ব্যস, মাছ আর ভাত, বাঙালীর আর কী চাই ?

আমাদের জন্য ঝিনুক এলো বেতের বাস্কেটে, বেশ কয়েক ডজন, যেন একটা ঝিনুকের পাহাড়। সেগুলো আস্তই রয়েছে, ছাড়িয়ে খেতে হবে। আরম্ভ করে দিলাম। ওয়াইনে জারিত হয়ে অপূর্ব স্বাদ।

অসীম একটা গল্প শোনালো। একজন আশাবাদী মানুষের গল্প। সেই লোকটি একটা দামী রেস্তোরাঁয় খেতে এসেছে। চার পাঁচ রকম ভালো ভালো ডিশের পর কয়েক ডজন এই ঝিনুকের অর্ডার দিল। খেল খুব তৃপ্তি করে। তারপর বেয়ারা বিল নিয়ে আসতেই সে এক

গাল হেসে বললো, পয়সা তো নেই ! তখন সেখানকার ম্যানেজার এসে বললো, এটা কী ব্যাপার, আপনার কাছে পয়সা নেই তবু আপনি এত টাকা দামের খাবারের অর্ডার দিলেন কেন ? লোকটি বললো, আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, এতগুলো ঝিনুক খেতে খেতে একটা না একটার মধ্যে মুক্তো পেয়ে যাবোই। তখন সেই মুক্তো দিয়েই দাম শোধ হয়ে যাবে !

আমাদের টেবিলে অসীম, বাদল ও স্বাতী একসময় হাত গুটিয়ে নিলেও আমি ছাড়লাম না। একটার পর একটা ঝিনুক খেয়েই চলেছি। স্বাতী বারবার বলতে লাগলো, আর খেও না, অসুখ করবে, তবু আমি কর্ণপাত করছি না। পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস ফেলে দিতে গায়ে লাগে, খেতেও ভালো লাগছে, তাছাড়া সেই আশাবাদী লোকটার মতন মনে হচ্ছে, যদি শেষ ঝিনুকটার মধ্যে একটা মুক্তো জুটে যায় !

রাত্তির ন'টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ। আমাদের রাত দশটার আগে খিদেই পায় না। কিন্তু এসব জায়গায় রাত দশটায় ঢুকলে কোনো রেস্তোরাঁয় খাবারই পাওয়া যাবে না। রাত্তিরের দিকে আরও একবার বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বৃষ্টি থামেনি।

হোটেলের তিনতলায় উঠে একঘরে সবাই বসে আড্ডা মারতে লাগলাম কিছুক্ষণ। হোটেলটি বেশ বড় হলেও অনেক ঘর খালি। নিজেদের গলার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। চতুর্দিক শুনশান করছে এরই মধ্যে।

এক সময় জানলা খুলে বাইরের বৃষ্টি দেখতে গিয়ে হঠাৎ আমার আপোলিনেয়ারের বৃষ্টির কবিতা মনে পড়লো।

বুদ্ধদেব বসু একবার আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, আমার মুশকিল কী জানো, কোথাও বৃষ্টি দেখলে আমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের লাইন মনে পড়ে, রোদ্দুরের মাধুর্য দেখলে মনে পড়ে বোদলেয়ারের কবিতা, সমুদ্র দেখলে মনে পড়ে শেক্সপীয়ারের লাইন, মেঘের গুরুগুরু শুনলে মনে পড়ে কালিদাস। প্রকৃতির যে-কোনো সৌন্দর্য দেখলেই আমার মুগ্ধতার মধ্যে পূর্ববর্তী বড় বড় কবিদের অনুভূতি এসে পড়ে।

আমার অবশ্য এরকম মনে হয় না। বুদ্ধদেব বসুর বিপুল পড়াশুনো ছিল, বিশ্ব সাহিত্য তাঁর নখাগ্রে, সেই তুলনায় আমি নিছক এক গোষ্পদ, পড়াশুনো করিনি কিছুই। তবু যে আপোলিনেয়ারের কবিতাটা হঠাৎ মনে পড়লো, তার কারণ, সমুদ্রের ধারে কোথাও একটা জোরালো ফ্লাড লাইট জ্বলছে, সেই আলোয় বৃষ্টির ধারাগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আর আপোলিনেয়ারের কবিতাটিও বৃষ্টির ধারার মতন ! বৃষ্টির বর্ণনার জন্য নয়, চাক্ষুষ মিল !

আপোলিনেয়ার নানারকম আকারের কবিতা লিখেছেন, হৃৎপিণ্ডের মতন, মুকুটের মতন, ওভাল আয়নার মতন, গীর্জার মতন, আকাশের তারার মতন। সেই কালে বরফির মতন, পিরামিডের মতন অক্ষর সাজিয়েও লিখেছেন কেউ কেউ। কবিতার একটা চাক্ষুষ আবেদনও আছে। এমনিতেই যে কবিতায় কখনো বড় লাইন, কখনো ছোট লাইন লেখা হয়, সেগুলো কেন বড় বা কেন ছোট, তার কোনো যুক্তি নেই। কবি তাঁর কবিতাটিকে যে-রকম ছবির মতন দেখতে চান, সেই রকমই লেখেন। অনেক কবিই এই সব ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর। কারুর বড় লাইন যদি ছাপার সময় ভেঙে দেওয়া হয় কিংবা ছোট লাইন জুড়ে যায় অন্য লাইনের সঙ্গে তা হলে সেই কবি দারুণ চটে যান। পাঠক কিছুই ধরতে না পারলেও কবির মনে হয় কবিতাটার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোনো কোনো কবি ছাপার ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে, কেউ আবার উদাসীন। বুদ্ধদেব বসু নিজের যে-কোনো লেখার প্রুফ দেখতেন তিন চার বার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটা শব্দেরও সামান্য হেরফের হলে মহা ক্রুদ্ধ হতেন, আবার জীবনানন্দ দাশ লাইন ভাঙা নিয়ে আপত্তি জানাতেন না, শক্তি

চট্টোপাধ্যায় প্রুফ দেখার ধার ধারে না ! জয় গোস্বামী তার একটি কবিতার সাতটি কমা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, একটি কমাও এদিক ওদিক হলে যেন তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই কমার তদারকি করতে রানাঘাট থেকে পত্রিকার দফতরে ছুটে এসেছে অনেকবার।

আবার অনেক কবি দাঁড়ি-কমা-কোলন কিছুই ব্যবহার করেন না। কামিংস লাইনের শুরুতেও ইংরিজি বড় হাতের অক্ষর পর্যন্ত ব্যবহার করতেন না। আপোলিনেয়ারের 'আলকুল্' নামে কাব্যগ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে আঁরি মারতিনো লিখেছিলেন, এই দুশো পৃষ্ঠার বইটিতে কেউ একটাও ফুলস্টপ তো দূরের কথা, একটা কমা পর্যন্ত খুঁজে পাবে না !

সেই সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে আপোলিনেয়ার বলেছিলেন, কবিতায় পাংকচুয়েশান একেবারে অপ্রয়োজনীয়, কবিতার ছন্দ এবং যেভাবে লাইনগুলো ভাঙা হয়, সেই তো আসল পাংকচুয়েশান। বৃষ্টি বা হৃৎপিন্ড বা তারার আকৃতির কবিতা লেখার সমর্থনে আপোলিনেয়ার বলেছিলেন, এগুলো হচ্ছে ক্যালিগ্রাফ, মুক্ত ছন্দের কবিতা এবং ছাপার টাইপ সাজাবার যে নিখুঁত পর্যায় এসেছে তারই ভাবরূপ। অক্ষর, টাইপোগ্রাফির আয়ুর শেষ ঘন্টা বেজে গেছে, এরপর থেকে সিনেমা ও গ্রামোফোনই সব প্রকাশ মাধ্যম দখল করে নেবে। আপোলিনেয়ার এ কথা লিখেছিলেন ১৯১৮ সালে, তিনি টেলিভিশন ও ভি সি আর-এর যুগের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। ছাপার অক্ষর এখনো দুর্দান্ত প্রতাপে রাজত্ব করছে।

আপোলিনেয়ার ছিলেন মার্গারিটের প্রিয় কবি। সে আমাকে জোর করে ওঁর কিছু কিছু ছোট কবিতা মুখস্থ করিয়েছিল। অনেক বছর কেটে গেছে, আমি মনে করার চেষ্টা করলাম তার কিছু এখনো মনে আছে কি না। বিসতেয়ার নামে এই কবির একটি বই আছে, যার সবকটি কবিতাই পশু-পাখি-পতঙ্গের নামে। প্রজাপতি বিষয়ক একটি কবিতায় এরকম একটি লাইন ছিল, পভ্‌র পোয়েত, ত্রাভাইয়োঁ ! অর্থাৎ, শুটি পোকারা অনেক খাটাখাটনি করে যেমন একদিন প্রজাপতি হয়, তেমনি গরিব কবিরা, তোমরাও খাটো, খাটো, পরিশ্রম করো !

লাইনটা মনে পড়ামাত্র আমি যেন মার্গারিটের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি কখনো বিছানায় একখানা বই নিয়ে শুয়ে আলস্য করলে মার্গারিট এসে বলতো, এই, এখনো শুয়ে আছো। পভ্‌র পোয়েত ত্রাভাইয়োঁ ! অনেককাল আগে, সেই আয়ওয়া শহরে, কোনো একদিন হয়তো বরফ পড়ছে, রাস্তাগুলো সাদা হয়ে গেছে, আমার একটু একটু মন খারাপ, আমি সারাদিন বাইরে বেরোইনি, রান্নাবান্নাও করিনি, জানলার কাচে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তুষারপাতও দেখছি না, আমি তাকিয়ে আছি কলকাতার দিকে। মার্গারিট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাস নিয়ে ফিরলো, বাইরের পাপোশে একটুক্ষণ ধুপধাপ করে ঝেড়ে ফেলতো পায়ের বরফ, তারপর দরজা খুললো চাবি দিয়ে। আমাকে দেখেই বুঝতে পারলো, জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, সুনীল, মন খারাপ ? তারপরই ঝরঝর করে হেসে ফেলে বললো, তুমি প্রজাপতি হতে চাও না ? পভ্‌র পোয়েত ত্রাভাইয়োঁ !

হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এলাম। বৃষ্টি খুব বেড়েছে, সেই সঙ্গে শনশন করছে ঝড়, লকলকে বিদ্যুতের শিখা চিরে দিচ্ছে আকাশ। এবার আমার অন্য একটি রাতের কথা মনে পড়লো। সেই রাতটাতেও এরকম প্রবল ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত চলছিল। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন !

২৯

"থেমে গেছে সব শব্দ এখন ছায়ায় নিয়েছে বাস
প্রিয় প্যারিসের পতনশব্দ শত্রুর মুখে শোনা
ভুলবো না আমি লিলির শুষ্ক গোলাপের নিঃশ্বাস
এবং আমার দুই ভালোবাসা হারিয়েছি ভুলবো না—"

—লুই আরাগঁ

জাপানে অ্যাটম বোমা পড়ার আগে যে-ঘটনায় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, তা হলো নর্মান্ডি অভিযান। নাৎসী বাহিনী তখন প্রায় গোটা ইওরোপ অধিকার করে বসে আছে, প্যারিসের বড় বড় অট্টালিকাগুলিতে জার্মান সৈন্যরা আমোদ-প্রমোদের বন্যা ছোটাচ্ছে। সেই সময়ে বোঝা গিয়েছিল, সম্মিলিত মিত্র বাহিনী আকাশ-জল ও স্থলপথে জার্মানদের একেবারে মুখোমুখি সম্মুখ সমরে না নামলে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হবার কোনো আশা নেই, হিটলারের কবল থেকে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না।

ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে এই অভিযান শুরু হবে, তা নিয়ে মিত্র পক্ষের রাষ্ট্রনায়ক ও বড় বড় সেনাপতিদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, নর্মান্ডির উপকূলই প্রকৃষ্ট স্থান।

আমরা পাঁচজন এখন ঠিক সেই অঞ্চল দিয়েই ঘুরছি। এ যেন আর এক কুরুক্ষেত্র বা পানিপথ বা ওয়াটার্লু। এতগুলো বছর কেটে গেছে, তবু মুছে যায়নি সেই সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধের চিহ্ন। সমুদ্রের কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ে ভূগর্ভের বাঙ্কার, ভাঙা ট্যাঙ্ক, কামান, আধা ডুবন্ত জাহাজ। কত প্রাণ, কত নিযুত, অর্বুদ টাকা ধ্বংস হয়েছে এখানে অকারণে। হ্যাঁ, অকারণেই তো, নিছক কয়েকটা ক্ষমতা-উন্মাদের খেয়ালে। হিংসা ও মারণাস্ত্রের কী বিপুল বন্দোবস্ত, দেখতে দেখতে আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি অনুভব করি যে আমরা পরস্পর কোনো কথাই বলছি না।

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ফ্রান্সের ভূমিতে জার্মান সমর-সজ্জা। আগেই বলেছি যে, ক্যালে বন্দরের কাছে ইংলিশ চ্যানেল সবচেয়ে সরু, সুতরাং ইংলন্ডের দিক থেকে ঐখানেই মিত্র ফৌজের সমুদ্র পার হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দু'পক্ষই সমান ধুরন্ধর। জার্মানরা ভাববে, শত্রু আসবে ক্যালের কাছে, এই জন্য মিত্র বাহিনী তাদের ধোঁকা দেবার জন্য বেছে নিল নর্মান্ডির উপকূল। আর জার্মানরা ভাবলো, ওরা ভাববে আমরা ক্যালের কাছে অপেক্ষা করবো, সুতরাং ওরা ক্যালের দিক দিয়ে কিছুতেই আসবে না। তাই জার্মানরা নর্মান্ডির তটে ওত পেতে রইলো। শোনা যায়, এই বুদ্ধি স্বয়ং হিটলারের এবং তা সমর্থন করেছিলেন রোমেল।

এখানেই ঘটেছিল মানুষের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সমুদ্র অভিযান। মিত্র পক্ষে ছিল, নৌ এবং বিমানবাহিনী মিলিয়ে সৈন্য সংখ্যা মোট নয় লক্ষ, জাহাজ ভেসেছিল চার হাজার জাহাজ। মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আইসেনহাওয়ার, আর নাৎসী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোমেল। এই রণ-দুর্মদ রোমেলকে সেনাপতি হিসেবে শত্রুপক্ষও সমীহ করে, অত্যন্ত কুশলী অস্ত্রচালক পরিচয় দিয়ে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'মরু শৃগাল'।

দু পক্ষই প্রস্তুত। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের মে মাসেই যে-কোনোদিন চরম লড়াই শুরু হয়ে যাবার কথা। দু'দিকের গুপ্তচরবৃত্তিই সক্রিয়ভাবে সক্রিয়। সঠিক দিনক্ষণটি জানা দুপক্ষের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

কথা ছিল, ব্রিটিশ বেতারে একদিন নানা অনুষ্ঠানের মাঝখানে পল ভেরলেইনের দু' লাইন কবিতা পাঠ হবে, সেই মুহূর্তেই শুরু হবে অভিযান। এটাই কোড। এও যেন এক পরিহাস। এক দুর্বল, অসহায় কবি, প্রায় সারাজীবনই যাঁর কেটেছে দারিদ্রো, যিনি লিখে গেছেন প্রধানত প্রকৃতির কথা, এক বৃষ্টিমুখর শরতের দিন, জ্যোৎস্নামাখা রাত, গাছ থেকে ঝরে পড়া একটা শুকনো পাতা, উদাস নিয়ে হেঁটে যাওয়া দুটি নারী পুরুষ, এই সব সামান্য বিষয় থেকে যিনি খুঁজে নিয়েছেন সৌন্দর্য, সেই কবির রচনা ব্যবহৃত হলো এক প্রবল বিধ্বংসী যুদ্ধে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কবিতা ও ছবির কিছুটা ভূমিকা ছিল। ছবি নিয়ে কম কাড়াকাড়ি হয়নি। আগেকার যুদ্ধে বিজয়ীরা সোনা ও নারী লুটে করতো, এই যুদ্ধে প্রচুর ছবি লুট হয়েছে। জার্মান পক্ষে গোয়েরিং, গোয়েবলসের মতন বাঘের দুষ্কর সাধনা চারোদালে হাজার হাজার ইহুদির প্রাণ হরণ করা হয়েছে, তারাও ছবির সমঝদার ছিল। জ্রাক থেকে ট্রেন বোঝাই করে জার্মানিতে ছবি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং জাতীয় শিল্প রক্ষায় বদ্ধপরিকর ফরাসীদের সেই ট্রেনটাকে ভুল পথে ঘুরিয়ে দেওয়া, এমনকি রাতারাতি সৌন্দর্যের নাম পাল্টে দেওয়া নিয়ে এক মর্মন্তুদ কাহিনী আছে।

জার্মান সেনাপতিরা মানুষ খুন করতে দ্বিধাহীন, কত শহর-বন্দর বোমা মেরে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, অথচ তারা ভালো ছবির মর্ম বুঝতো, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! যারা শিল্পকে ভালোবাসে, তারা কি কখনোও ভালোবাসতে পারে? স্বয়ং হিটলারও ছবি আঁকার বাতিক ছিল। প্রথম যৌবনে হিটলার এক আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েও সুযোগ পায়নি। সেই আর্টস্কুলের পরিচালক যদি অ্যাডলফ হিটলার নামে এক দুর্বল চরিত্র শিল্পীকে শিক্ষার সুযোগ দিতেন, বলা যায় না, তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসটা বোধহয় অন্যরকম হতো!

নর্মান্ডি অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল অপারেশন ওভারলর্ড। মাইলের পর মাইল ইস্পাত-কংক্রিটের দুর্ভেদ্য বাঙ্কার বানিয়ে, সৈন্য সজ্জিত রোমেল বসে ছিলেন অধীর প্রতীক্ষায়। গুপ্তচররা খবর আনালো, জুনের পাঁচ তারিখে আক্রমণ হবেই, কিন্তু সেদিনটা খুব দুর্যোগপূর্ণ, ঝোড়ো বাতাসে সমুদ্রের ঢেউ উত্তাল, সেদিন কোনো জাহাজ দেখা গেল না। জানা গেল যে পরের দিন আবহাওয়া আরও খারাপ হবে, ঝড়-বৃষ্টি এমন প্রবল হবে যে কিছু চোখে দেখা যাবে না। সুতরাং সেই আবহাওয়ায় নৌ-অভিযান অবান্তর। জার্মান সেনানায়করা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। শোনা যায় যে ওই জুন কিছুতেই আক্রমণ হতে পারে না ভেবে রোমেল ছুটি ভোগ করেছিলেন। তিনি গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন প্যারিস, তাঁর বউয়ের জন্মদিনে উপহার দেবার জন্য এক জোড়া জুতো কিনতে। সেই রাতে, সেই চরম দুর্যোগের মধ্যেই নর্মান্ডির উপকূলে ব্রিটিশ-আমেরিকান-কেনেডিয়ান-ফরাসী যৌথ কৌজ নেমে পড়লো। শুরু হয়ে গেল লড়াই।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের মূল কারণ পানজার বিমান বহিনী পাহারে হিটলারের ঘিরা। নর্মান্ডি উপকূলে রোমেলের সেনাপতিত্বে জার্মান প্রতিরোধ শক্তি মোটেই দুর্বল ছিল না। কিন্তু হাতাহাতি যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হবার আগেই মিত্র পক্ষের বিমান বহিনী অনেক দূর পর্যন্ত টহড় দিয়ে জার্মানদের সাপ্লাই লাইন ছিন্ন করে দিল। পূর্ব পরিকল্পনামতে ধ্বংস করে দেওয়া হলো গুরুত্বপূর্ণ সেতু, রেললাইন ও সড়ক। বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে সেনাপতি রোমেল গাড়ি উল্টে আহত হলেন।

আড়াই মাস পরে আইসেনহাওয়ারের বাহিনী মার্চ করে ঢুকলো পারিস শহরে। জার্মান কবল থেকে পারিস মুক্ত হলো পঁচিশে আগস্ট। বিশ্ববিখ্যাত রুশসী এই নগরীতে কখনো বোমাবর্ষণ হয়নি, জার্মানরাও এর কোনো ক্ষতি করেনি।

সেনাপতি রোমেলও এরপর বেশিদিন বাঁচেননি। বোমার আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেও তিনি জড়িয়ে পড়লেন এক হিটলার-বিরোধী ষড়যন্ত্রে। জার্মানির কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ও কয়েকটি সেনানায়ক জার্মানপক্ষে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে হিটলারকে খুন করে বার্লিনে একটা অস্থায়ী সরকার স্থাপনের সংকল্প নিয়েছিল গোপনে। কর্নেল স্টাফেনবার্গ ব্রিফকেসের মধ্যে একটা বোমা লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্রেখে এসেন হিটলারের মেজাজের তলায়। কিন্তু জার্মানির পাপের ভরা পূর্ণ হতে আরও কিছুদিন বাকি ছিল, আরও কিছুদিন হিটলারের উৎপাত সহ্য করা ছিল এই পৃথিবীর নিয়তি। বোমাটা ফাটলো ঠিকই, তবু হিটলারের গায়ে আঁচড় লাগালো না। যুদ্ধের সেই মুহূর্তেও হিটলার প্রতিশোধ নিতে ভিলা করেনি, শত শত অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। রোমেলের প্রতি হিটলার সদয় দেখিয়েছিল অবশ্য। রোমেলের বাড়িতে হিটলারের দুজন দূত গিয়ে জানায় যে, রোমেল যদি স্বেচ্ছায় বিষ খেয়ে রাজি থাকেন, তা হলে কেউ কিছু জানবে না। আর তা না হলে রোমেলকে গুলি করে মারা হবে, তার বউ-ছেলে-মেয়েদের বিশ্বাসঘাতকের পরিবার হিসেবে নিক্ষেপ করা হবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। নিজের বাড়ির বাগানে গিয়ে রোমেল বিষ খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন।

হিটলারের নাৎসীবাহিনীর পতন হতে আর বেশি দিন লাগেনি। প্রকৃতপক্ষে জার্মানির পরাজয় সূচিত হয় এই নর্মান্ডি উপকূলেই।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা এলাম আরোমাঁস নামে একটা জায়গায়। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা সংগ্রহশালা আছে। যুদ্ধের সময়কার বহু ছবি, বহু প্রতীক, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র সাজানো, তবে বর্ণনায় শুধুই মিত্র পক্ষের জয়গাথা, রোমেল কিংবা অন্য কোনো জার্মান সেনানীর উল্লেখমাত্র নেই।

বাদল এক সময় বললো, যথেষ্ট যুদ্ধ দেখা হয়েছে ভাই, আর ভালো লাগছে না।

কুমকুম আর স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালো। সুদূর ইতিহাসের অনেক দুর্গ কিংবা রাজপ্রাসাদ দেখতে আমাদের প্রোগ্রাম হয়, আমরা সব করে নেবার পরই। যদিও সেই সব জায়গাতেও অনেক যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রলীলা চলেছে এক সময়। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বড়ই কাছাকাছি সময়ের, এর বীভৎসতা আমাদের স্মৃতিতে এখনো লেগেই হয়ে আছে। তাছাড়া বিশাল কোনো দুর্গ কিংবা রাজপ্রাসাদের একটা দৃশ্যের মহিমা আছে, বাঙ্কার, সুরঙ্গ, ভাঙা ডেটি ও আধো-ডোবা জাহাজে তা নেই। বেশিক্ষণ এখানে ঘোরাঘুরি করতে ভালো লাগার কথা নয়।

সুতরাং আমরা ঠিক করলাম, এবার যুদ্ধক্ষেত্র ছাড় করে আমরা যাবো একটা পশ্চিম স্থানে। সমুদ্র উপকূল ছেড়ে আমাদের গাড়ি ঘুরলো স্থলভূমির দিকে। সাঁ লো, কুতান,

গ্রাঁভিল, অভরাঁস এই সব ছোট ছোট শহর পেরিয়ে আমরা পৌঁছোলাম মঁ-সাঁ-মিশেল-এর কাছাকাছি। আবার সমুদ্রতীর।

মঁ-সাঁ-মিশেল-এর মানে সন্ত মাইকেলের পাহাড়। সত্যি সেটা একটা পাহাড়, অনেক সময় স্থলভাগের সঙ্গে জুড়ে থাকে, আবার কোনো কোনো সময় সমুদ্র এসে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তখন সেটা হয়ে যায় সমুদ্রের মধ্যে একটা পাহাড়-দ্বীপ, এবং এই গোটা পাহাড়টাই একটা গীর্জা। স্থাপত্যকীর্তি হিসেবে বিশ্বের একটি বিস্ময়।

গাড়ি রাখতে হয় অনেকটা দূরে। মাঝখানের জায়গাটা সমুদ্র তার জিভ দিয়ে হঠাৎ কখন চেটে নেবে, তার কোনো ঠিক নেই। এমনও হয়েছে, সমুদ্রের স্রোতে বেশ কিছু গাড়ি ভেসে গেছে। গাড়ি পার্ক করতে অসীমকে বেশ হিমসিম খেতে হলো। এটা শুধু দর্শনীয় স্থান নয়, তীর্থস্থান। প্রতিদিন বহু মানুষ আসে, তাই গাড়িতে গাড়িতে ধূল পরিমাণ।

এখন ভাটার সময়। জল সরে গেলেও পাহাড়ের সামনের মাটি ভিজে ভিজে। জুতো রেখে আসা হয়েছে গাড়িতে। প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার সময় অসীম বললো, অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে কিন্তু, পারবে তো।

অসীমের ধারণা, আমরা যারা বিদেশে থাকি না, তারা অলস প্রকৃতির। ধারণাটা খুব একটা মিথ্যে নয়, আমরা আলস্য ভালোবাসি তো বটেই। আমাদের তুলনায় এদেশে যারা সচ্ছল অবস্থায় থাকে, তাদের যথেষ্ট খাটতে হয়। কিন্তু বেড়াতে বেরুলে আমরা অকুতোভয়। মহিলা দুটির খুবই উৎসাহ। পাহাড়ে ওঠার সময় আমি মনে মনে ভাবি, ওঃ, নামবার সময় কী আরামই না লাগবে! এই চিন্তা করলেই ওঠার পরিশ্রম বা কষ্ট অনেকটা কমে যায়।

আমাদের দেশে পাহাড়ের মাথায় মন্দির তো আকছার। বিহারে প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়াতেই নৈবেদ্যর ওপর গুজিয়ার মতন একটা করে মন্দির থাকে। বহু সিঁড়ি ভেঙে ওপরের মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া ও পুণ্য অর্জন করা আমাদের তীর্থযাত্রীদের অবশ্যকর্তব্য। নেপালে আছে এরকম সিঁড়ি ভাঙা মন্দির। দক্ষিণ ভারতে আছে শ্রাবণবেলগোলা। কিন্তু আগে যা হয়েছে হয়েছে, গত এক হাজার বছরে আমাদের দেশে আর তেমন বিস্ময়কর, সুন্দর মন্দির তৈরি হয়েছে কৈ? পুণ্য অর্জনের প্রবল স্পৃহা না থাকলে হাজার-দু'হাজার সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের ওপর উঠে মন্দিরগুলো দেখলে মনে হয় পণ্ডশ্রম!

মঁ-সাঁ-মিশেল গড়া হয়েছিল বহু প্রাচীন কালে। শুধু গীর্জা হিসেবে নয়। দু' একবার দুর্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। রাজশক্তির সঙ্গে যাজকদের লড়াইয়ের সময় কোনো রাজা এটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেও পারেননি। বহু শতাব্দী ধরে এটাকে সজানো হয়েছে। যারা একেবারে চূড়ায় উঠতে পারবে না, তাদের জন্যও বিভিন্ন ধাপে দর্শনীয় রয়েছে অনেক কিছু। তীর্থের পুণ্য এবং প্রকৃতি দর্শন এক সঙ্গে হতে পারে। প্রত্যেক ধাপেই গীর্জার একটি অংশ, রঙিন চিত্রিত কাচের দেয়াল, যীশু ও কুমারী মেরীর অনেক রকমের মূর্তি। আর বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় তিন দিকে সমুদ্র, হাজার হাজার পাখির মেলা।

আমাদের দেশের তীর্থ স্থানগুলির মতনই সিঁড়ির দু'পাশে বহু ধরনের দোকান। তীর্থ যাত্রীদের মন সাধারণত দ্রব অবস্থায় থাকে, তাদের যে-কোনো জিনিস গছিয়ে দেওয়া অনেক সহজ। এখানে নানান খাবারের দোকান ও সস্তার খেলনার দোকান রয়েছে। কিছু কিছু অভিনব বস্তুও পাওয়া যায়। কুমকুম বেছে বেছে একটা পাথরের পুতুল কিনে ফেললো, দিনে ও রাতে যেটার রঙ বদলে যায়। সে কিন্তু ঠকেনি, ছাতা মাথায় ইস্কুলযাত্রী

বালকের সেই মূর্তিটি আজও রঙ বদলায়। স্বাতী ওর থেকেও ভালো কিছু কেনবার ইচ্ছেয় তখন কিনলো না, শেষ পর্যন্ত আর কিছু কেনাই হলো না।

মঁ-সাঁ-মিশেল-এর এমন চমৎকার পরিবেশে আমাদের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘটে গেল।

এখানে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে নানা জাতের মানুষ আসে। এরই মধ্যে এক দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা আমাদের দেখে খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর কাছে এসে বললেন, তোমরা ভারতীয়? কলকাতা থেকে এসেছো?

আমরাও অবাক। আমাদের চেহারায় ভারতীয় ছাপ স্পষ্ট হলেও কী করে বোঝা গেল আমরা কলকাতা থেকে এসেছি?

আমরা সম্মতি জানাতেই মহিলাটি হাতের একটা বই তুলে দেখিয়ে কাঁকালো গলায় বললেন, আমি লাপিয়ের-এর লেখা 'দা সিটি অফ জয়' বইখানা পড়ছি। কলকাতা একটা গরিব আর ভিখিরিদের শহর। মাদার টেরিজা সেখানে গরিবদের সেবা করে চলেছেন, তোমরা তাঁকে সাহায্য না করে বিদেশে বেড়াতে এসেছো কেন?

মহিলা এমন জোরে জোরে বললেন যে আশেপাশের অনেকে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি কথা বলছেন ঝড়ের বেগে ফরাসী ভাষায়, তাই তাঁকে কিছু উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। নইলে বলার ছিল অনেক। এই লাপিয়ের-এর মতন সস্তাজাতের লেখকরা কলকাতাকে বিষয়বস্তু বেছে নেয়, এর দারিদ্র্য বিক্রি করার জন্য। ইদানীং দারিদ্র্যের বর্ণনা পড়ে ধনী শ্বেতাঙ্গরা মেসোকিস্টিক আনন্দ পায়। লাপিয়ের-এর বইখানা পড়লে মনে হয় কলকাতায় কুষ্ঠরোগী, রিক্সাওয়ালা ও শ্বেতাঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাদের মধ্যমণি মাদার টেরিজা ছাড়া আর কিছু নেই। মাদার টেরিজা আমাদের সকলেরই পরম শ্রদ্ধেয়া, তিনি মূর্তিমতী করুণা, অনাথ-আতুরদের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর সংস্থাই একমাত্র কলকাতার দুঃস্থদের সেবা করছে, এমন যে একটা রটনা হয়েছে পৃথিবীতে, এরকম মিথ্যে আর হয় না। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি তুচ্ছ? বেশি দিন আগের কথা নয়, গত শতাব্দীতেই লন্ডনে বারবনিতার সংখ্যা ছিল আশি হাজার, রাজা চতুর্থ হেনরি যখন প্যারিস আক্রমণ করে তখন প্যারিসের এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভিখিরির সংখ্যাই ছিল তিরিশ হাজার। আজও নিউ ইয়র্ক শহরে ভিখিরি ও ভবঘুরের সংখ্যা দিল্লির চেয়ে কম নয়। এরকম আরও অনেক পরিসংখ্যান দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা ঐ সব দেশের এরকম শুধু খারাপ দিকটা তো কখনো দেখি না।

আমার ভাষায় না কুলোলেও অসীম এবার মুখ খুললো। অসীম আমাদের কাছে দেশের অনেক সমালোচনা করলেও অন্যদের মুখে দেশের নিন্দে শুনলে চটে ওঠে। কারুকে অপমান করতে গেলে তার মুখের চেহারা হয়ে যায় অত্যন্ত ভদ্র ও বিনীত। প্রতিটি শব্দ বলে মেপে মেপে। লম্বা শরীরটাকে যেন আরও খানিকটা উন্নত করে মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে অসীম বললো, বঁ ঝুর মাদাম, আপনি ফরাসী দেশের কোন্ অঞ্চল থেকে আসছেন? আপনি কলকাতা সম্পর্কে একটা বই পড়ছেন, খুব ভালো কথা। আপনি কি ভারত বিষয়ে আর কোনো বই পড়েছেন? আপনি কি রোমাঁ রলাঁর নাম শুনেছেন?

ভদ্রমহিলার থতোমতো ভাব দেখেই বোঝা গেল, উনি সস্তা সাহিত্য ছাড়া কিছু পড়েন না।

অসীম আমাদের দেখিয়ে বললো, এঁদের মধ্যে একজন বাংলা ভাষার লেখক ও আর

একজন খুব বড় প্রকাশক। আপনার কি ধারণা আছে, বাংলা ভাষায় কত লোক কথা বলে? ফরাসীদের অন্তত দ্বিগুণ। এঁদের তুলনায় ফরাসীদেশের অনেক সামান্য লেখক বা প্রকাশক যখন যেখানে খুশি যায়, তা হলে এঁরা আপনার দেশে আসতে পারবেন না কেন?

ভদ্রমহিলা অসীমের মুখে নির্ভেজাল ফরাসী শুনেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে তো তো করতে করতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

যেন কিছুই হয়নি, এই ভঙ্গিতে অসীম বললো, চলো, এবার একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক।

আমি ভাবলাম, ভাগ্যিস এই সময় ভাস্কর নেই। তা হলে ও নিশ্চয়ই মহিলাটিকে কাঁদিয়ে ছাড়তো। থাক, যতটুকু হয়েছে, তাই-ই যথেষ্ট।

৩০

সোনায় মোড়া একটি বৃদ্ধের সঙ্গে একটি দুঃখিত ঘড়ি
রানী পরিশ্রম করছেন এক ইংরেজের সঙ্গে
আর মাছধরা শান্তির জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রের অভিভাবক
ব্যঙ্গনাট্যের বীরপুরুষ, তার সঙ্গে মৃত্যুর বোকা হাঁস
কফির সাপের সঙ্গে এক চশমা পরা কারখানা
দড়ির খেলার শিকারীর সঙ্গে এক বহুমুখের নর্তকী
ফেনার সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এক অবসরপ্রাপ্ত তামাকের পাইপ
কালো পোশাকে সজ্জিত এক পেছন-নোংরা শিশুর সঙ্গে
একটি নিকার বোকার পরা ভদ্রলোক
ফাঁসিকাঠের গান লেখকের সঙ্গে একটি গায়ক পাখি
বিবেক সংগ্রাহকের সঙ্গে এক সিগারেটের টুকরোর পরিচালক
বাংলা দেশের একটি কচি সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে একটা
ধর্মীয় মঠের বাঘ...

—জাক প্রেভের

ওপরের এই কবিতাটি প্রথমে পড়লে মনে হবে, উদ্ভট, অর্থহীন। কিন্তু যদি মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে কবিতাটির নাম শোভাযাত্রা, কোনো এক জায়গায় জড়ো হয়েছে অসংখ্য মানুষ, বিচিত্র তাদের পোশাক ও চরিত্র, কবি সেগুলিই খানিকটা উল্টে-পাল্টে দিয়েছেন, তা হলে বুঝতে আর খুব অসুবিধে হবার কথা নয়। মূল ভাষায় অনেক রকম শব্দের খেলা থাকে, একই শব্দের প্রয়োগ অনুযায়ী অর্থ বদলে যায়, এসব অন্য ভাষায় আনা প্রায় অসম্ভব। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, 'চশমা পরা কারখানা'টা আবার কী বস্তু? কারখানার মূল শব্দটা হচ্ছে Moulin, মুল্যাঁ, ইংরিজিতে যেমন 'মিল'। প্যারিসের বিখ্যাত নাইট ক্লাবের নাম মুল্যাঁ রুঝ, তার কারণ ঐ লাল রঙের বাড়িটিকে দেখতে একটা উইন্ড মিলের মতন। এই মুল্যাঁ শব্দটার আবার আর একটা মানেও আছে। 'মুল্যাঁ আ পারোল' বললে বোঝায় কোনো বকবকানি মেয়ে। তা হলে চশমাটা আর বেমানান হয় না।

খুবই জনপ্রিয় এই কবি নানারকম ইয়ার্কি-ঠাট্টা ও সূক্ষ্ম বিদ্রূপের কবিতা লিখেছেন অনেক। তাঁর বিদ্রূপের প্রধান লক্ষ্য হল পুরুত, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ, অর্থাৎ যাদের হাতে সাধারণ মানুষ নিয়মিতভাবে অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। এই সব চরিত্রের উল্লেখ তাঁর অনেক কবিতায় আছে, এবং এই কবিতাটিতে রয়েছে একটি বাঙালী মেয়ের কথা! সে আবার সন্ন্যাসিনী!

মঁ-সাঁ-মিশেল-এর পাহাড়-গীর্জা চূড়ায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে বহু রকমের মানুষ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল জাক্ প্রেভের-এর ঐ কবিতাটির সঙ্গে এখানকার এই চরিত্রের

মিছিলের যেন বেশ একটা মিল আছে। নানা জাতের মানুষের মধ্যে কোনো যুবতী বাঙালী সন্ন্যাসিনী নেই বটে, কিন্তু শাড়ি পরা দু'জন বঙ্গ-ললনা তো রয়েছে! অনেকেই ফিরে ফিরে তাকায়। আমি সাহেব বন্ধুদের মুখে শুনেছি, সেলাইবিহীন বারো হাত লম্বা একটা রঙিন কাপড় ভারতীয় মেয়েরা কী করে গায়ে জড়িয়ে রাখে, কখনো হঠাৎ খুলে পড়ে যায় না, এটা তাদের কাছে একটা বিস্ময়।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে এলাম একেবারে চূড়ায়। এখানে রয়েছে একটি গম্ভীর, সুন্দর মনাস্টারি। এর আর একটা নাম লা মারভেই, বা বিস্ময়। পবিত্র স্থানকে, তীর্থ স্থানকেও অতি মনোহরভাবে সাজিয়ে রাখার কৃতিত্ব খ্রিস্টানদেরই বেশি প্রাপ্য। অষ্টম শতাব্দীতে এক বিশপ সন্ত মাইকেলকে দৈব-দর্শনের পর এই মনাস্টারিটি বানিয়ে ছিলেন। তারপর এর অনেক রূপান্তর ঘটেছে অবশাই। ইংরেজ-ফরাসীদের শতবর্ষের যুদ্ধের সময় এটা খানিকটা দুর্গের কাজ করে। ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন গীর্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হচ্ছিল, তখন এই মঠটিও বড়ো দুরবস্থায় পড়েছিল। নেপোলিয়ান এমন চমৎকার জায়গাটাকে বানিয়ে ফেলেছিলেন একটা জেলখানা। মাত্র সওয়াশো বছর আগে ফরাসী সরকার এই জায়গাটিকে একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফ্রান্সে যারা বেড়াতে যায়, তাদের কাছে মঁ-সাঁ-মিশেল অবশ্যদ্রষ্টব্য।

নানান ভাষার টুরিস্ট গাইডরা সব জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। আমরা গাইড নিইনি, বিশাল বিশাল হলগুলি দেখছিলাম ঘুরে ঘুরে। বাঙালীদের স্বভাব অনুযায়ী আমি আর বাদল একটু জোরে জোরে কথা বলছিলাম, একজন এসে আমাদের ধমক দিয়ে গেল। বেশি আওয়াজ করলে এখানকার পবিত্রতা নষ্ট হয়। সন্ত মাইকেলের মূর্তি আমাদের দিকে শান্তভাবে চেয়ে আছেন।

একসময় আমরা এসে দাঁড়ালাম বাইরের পাঁচিলের কাছে। অনেক নিচে সমুদ্র। আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে বড় বড় ঢেউগুলি যেন অতিকায় প্রাণীর মতন ডাঙার দিকে এগোচ্ছে। সরে সরে যাচ্ছে বেলাভূমির পাখির ঝাঁক। এরকম উঁচু জায়গা থেকে আগে কখনো সমুদ্র দেখিনি। সব কিছুর মধ্যে যেন রয়ে গেছে এক কালাতীত মহিমা।

স্বাতী আর কুমকুম নামতে চায় না। তারা আরো অনেকক্ষণ থাকতে চায়। কিন্তু জল বাড়ছে, অসীমের ভয়, তার গাড়িটা না ডুবে যায়। নামার সময় হালকা শরীরে আমরা তরতরিয়ে নিচে চলে এলাম। এই দ্বীপেই সরু সরু রাস্তার দু'পাশে কিছু হোটেল রয়েছে, তার কোনো একটাতে রাত্রি বাস করা যায় কিনা, তার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, সবকটাই তীর্থযাত্রীতে ভর্তি।

দ্বীপটি ছেড়ে যেতে যেতেও আমরা বারবার পেছন ফিরে তাকাই। এক এক জায়গা থেকে এক এক রকম দেখায়। দেখে দেখে আশ মেটে না।

দোভিল-এর কাছে ইংলিশ চ্যানেলের রূপ তেমন দৃষ্টি-নন্দন ছিল না, এদিকে ক্রমশ নীল জলরাশির রূপ খুলছে, আমরা যাচ্ছি আটলান্টিকের দিকে।

পথে কাংকাল নামে আর একটা জায়গায় থামা হল। আবার ঝিনুক!

আমাদের দীঘার আগে জুনপুট নামে একটা জায়গা দেখেছি, যেটাকে বলা যায় একটা মৎস্য-বন্দর। সে রকম কাংকাল-কেও বলা যায় একটা ঝিনুক-বন্দর, এখানে অনেকেই ঝিনুক ধরার কারবার করে। এ ঝিনুকের চেহারা আবার অন্য রকম। সমুদ্র কোথায় যে কী ওগরাবে তার ঠিক নেই। আমরা ছোট-বড় সব কিছুকেই ঝিনুক বলি, কিন্তু সাহেবরা বিভিন্ন আকৃতির ঝিনুকের আলাদা আলাদা নাম দিয়েছে। এ ঝিনুকের নাম ইংরিজিতে অয়েস্টার,

ফরাসীতে বলে উইত্র (Huitre), লম্বায় প্রায় এক বিঘৎ, ওপরটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মতন, ভেতরটা মহার্ঘ আয়নার মতন ঝকঝকে। এই ঝিনুকের খোলা অনেকে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে আর ভেতরের জিনিসটা বেশ মূল্যবান খাদ্য।

রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই, এই ঝিনুক কাঁচা খাওয়ার অতি উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। জ্যান্ত ঝিনুক ধরে বড় বড় জালের খাঁচায় ভরে সেগুলিকে ডুবিয়ে রাখা হয় সমুদ্রের হাঁটুজলে। এ রকম খাঁচা দেখা যায় হাজার হাজার। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী জেলেনীরা সেগুলো বিক্রি করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম আমরা কৌতূহলবশে জলের কিনারায় খাঁচার মধ্যে জিওল মাছের মতন পুরে রাখা জ্যান্ত ঝিনুক দেখতে গেলাম। তারপর আমারই প্রথম সাধ হল একটা চেখে দেখার।

স্বাতী চোখ বড় বড় করে বলল, এই তুমি জ্যান্ত ঝিনুক খাবে?

আমি বললাম, ঝিনুক তো চিংড়িমাছের মতনই এক ধরনের জলের পোকা। চিংড়ির গায়ে খোসা আছে, এদের খোলসটা আরও শক্ত এই যা। চিংড়ি মাছ আমরা সবাই আহ্লাদ করে খাই, ঝিনুক খেতে আপত্তির কী আছে?

স্বাতী বলল, চিংড়ি মাছ কি আমরা জ্যান্ত খাই নাকি?

আমি বললাম, অন্য লোকরা যখন জ্যান্ত খায়, তখন খুব একটা অখাদ্য হবে না নিশ্চয়ই। একটু মুখে দিয়ে টেস্ট করে দেখব, খারাপ লাগলে বাকিটা খাবো না। আমার যে-কোনো নতুন খাবার পরীক্ষা করতে ভালো লাগে।

অসীম বলল, কী করে খেতে হবে বলে দিচ্ছি। ঐ দ্যাখো একটা মেয়ে লেবু বিক্রি করছে। আগে কয়েকটা লেবু কিনে নাও। তারপর ঝিনুক কেনো। তবে বোধহয় একটা দেবে না। এক ডজন কিনতে হবে!

তা শুনেই বাকি সকলে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, অ্যাঁ? এক ডজন? অত কে খাবে? শুধু শুধু পয়সা নষ্ট হবে!

বাদল আমাকে সমর্থন করে বলল, আহা ইচ্ছে হয়েছে যখন, খেয়ে দেখুক না! কতই বা লাগবে!

প্রকাশকের সমর্থন পেলে লেখকের আর ভয় কী! আমি বীরদর্পে এগিয়ে গেলাম।

যে-মেয়েটি লেবু বিক্রি করছে, সে সবচেয়ে সুন্দরী। ঠিক যেন রূপকথার ফুলওয়ালী। আসলে সে রূপসী নয়, তার নাক-ঠোঁট ল্যাপা-পোঁছা যাকে বলে, কিন্তু মুখখানা অদ্ভুত সারল্যমাখা, মাথার চুল একটা গোলাপি রঙের স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা, গভীর বিস্ময়ে সে দেখছে আমাদের। সমুদ্রের ধারে তাকে খুব মানিয়ে গেছে।

ঢাকাই রাজভোগ সাইজের দু'খানা পাতিলেবু কিনলাম চার টাকায়।

এবার গেলাম ঝিনুকের দর করতে। বিভিন্ন খাঁচায় বিভিন্ন সাইজের ঝিনুক। সবচেয়ে বড়গুলোর দামই বেশি। খাবো যখন ঠিক করেছি, সবচেয়ে ভালোটাই খাবো। এক ডজন ছত্রিশ টাকা।

অসীম বললো, দোকানে গিয়ে খেলে এর দশগুণ দাম পড়তো, এখানে জেলেদের কাছ থেকে কেনা বলেই অনেক সস্তা পড়ছে।

জেলেনী একটা ছুরি দিয়ে মাঝখানে চাড় দিয়ে ঝিনুকের মুখ খুলে দিল। ভেতরের প্রাণীটা নড়াচড়া করছে। তার ওপর কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ফেলতেই সেটা মরে যায়।

যেন খুব একটা নিষ্ঠুর কাজ করা হচ্ছে, এই ভঙ্গিতে স্বাতী বলল, ইস্!

আমি বললাম, জ্যান্ত কই মাছ যখন বঁটি দিয়ে কাটা হয়, তখন কি কেউ ইস্ বলে? মরা

কই মাছ কেউ কেনে না কেন ?

জেলেনী একটা কাঠের চামচও দিল। সেটা দিয়ে তুলে খানিকটা মুখে দিলাম। অন্যরা গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে, যেন আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। আমি বললাম, অপূর্ব ! অপূর্ব !

সত্যিই তাই। আসল ঝিনুকটির স্বাদ নোনতা, তার সঙ্গে লেবুর রস মিশেছে। টক নোনতার মিশ্রণ আমার সব সময় প্রিয়। লেবুর আচার, কাঁচা আম মাখা, নুন-তেঁতুল এগুলোর কথা মনে এলেই জিভে জল আসে। একটা শেষ করেই আমি বললাম, আর একটা দাও !

অসীম হাসছে। দু'দশকের বেশি এদেশে থেকে সে প্রায় ফরাসী বনে গেছে, সে তো জানেই এটা অতি উত্তম খাদ্য। আগে অন্যদের কিছু বলেনি। এবার সেও খেতে শুরু করলো।

আমি বাদলকে জিজ্ঞেস করলাম, কী, চলবে না ?

বাদল আমতা আমতা করে একটা নিল বটে, মুখেও দিল, কিন্তু খুব যেন উপভোগ করলো না।

স্বাতী ছোঁবেই না জানিয়ে দিয়েছে। কারণ খোলার ভেতরের জিনিসটাকে দেখতে হড়হড়ে, সিকনির মতন, দেখেই তার ঘেন্না লাগছে।

কুমকুমও খাবেই না ধরে রেখেছিলাম, তবু জিজ্ঞেস করলাম, তুমিও ভয় পাচ্ছো ?

কুমকুম বলল যে মোটেই ভয় পায় না। এত মানুষ খাচ্ছে যখন, তখন ভয় পাবার কী আছে ?

একটা ঝিনুক তুলে দেওয়া হল কুমকুমের হাতে। সে দিব্যি খেয়ে নিল। আর একটা নিতেও তার আপত্তি নেই।

আমি বললাম, এই, তুমি তা হলে আগের দিন ঐ ঝিনুকগুলো খাওনি কেন ?

কুমকুম হেসে বললো, ওগুলো যে ওয়াইন-মোয়াইন দিয়ে সেদ্ধ করা ছিল !

দেখতে দেখতে এক ডজন শেষ। আমি বললাম, লাগাও আরও এক ডজন !

তারপর আরও এক ডজন !

বাদল রণে ভঙ্গ দিয়েছে, কুমকুম, অসীম ও আমি চালিয়ে যাচ্ছি। ময়দানে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়ার মতন, সমুদ্রের ধারে এই ঝিনুক খাওয়ার নেশা লেগে গেল আমার।

আমাদের খাওয়ার পর্ব চলছে, এমন সময় একটা টুরিস্ট বাস এসে থামলো কাছেই। সামনের লেখা দেখে বোঝা যায় বাসটা আসছে ইতালি থেকে। বাস থেকে একদল নারী-পুরুষ নামলো। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে তারা অবাক। ছুরির চাড় দিয়ে এক একটা ঝিনুক খোলা হচ্ছে, তাতে লেবুর রস মিশিয়ে চামচে দিয়ে সুরুত করে খেয়ে ফেলছি। ওদের কয়েকজন এগিয়ে এসে চোখ গোল গোল করে দেখলো, তারপর একজন জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এসব কী করছো ?

বোঝা গেল, ওরা যেখান থেকে এসেছে, ইতালির সেই সমুদ্রে এরকম অয়েস্টার বা উইত্র ওঠে না, ওরা ঝিনুক খেতে জানে না। কিংবা ওরা বোধহয় ভাবছে, শুধু ভারতীয়রাই এ রকম কাঁচা ঝিনুক খায়।

আমি একজনকে বললাম, খেয়ে দ্যাখো না, খুব ভালো !

এরপর মনে হল, ঐ ইতালিয়ানদের দলেও একজন করে স্বাতী- কুমকুম- অসীম- বাদল- সুনীল আছে। কোনো মেয়ে ঠোঁট উল্টে ঘেন্না প্রকাশ করলো, কেউ বললো, একটু চেখে

দেখতে পারি, কেউ মতামতই প্রকাশ করলো না, কেউ বেশি উৎসাহ দেখালো।

প্রথমে একজন দু'জন আরম্ভ করলো। তারপর গুটি গুটি করে এগিয়ে এসে অন্য কয়েকজনও যোগ দিল, আমাদের দিকে মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, ভালো ! ভালো !

ইতালিয়ানদের সেখানে রেখে আমরা ফিরে এলাম গাড়িতে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। পাতলা একটা চাদরের মতন অন্ধকার নেমে আসছে সমুদ্রের জলে। আকাশের এখানে ওখানে রঙের ঝিলিক। এই নিরিবিলি ক্ষুদ্র বন্দরটিতে ক্রমশ শব্দ কমে যাচ্ছে। হোটেল পাওয়া যায় সর্বত্র, আমার ইচ্ছে হলো এখানেই কোথাও থেকে যেতে। স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে বললো, তুমি এখানে থেকে বুঝি আরও ঝিনুক খেতে চাও ? তা চলবে না !

অসীমও একেবারেই রাজি নয়। অন্তত আরও পাঁচ জায়গায় গিয়ে অন্তত পনেরোটা হোটেল না দেখে সে সিদ্ধান্ত নেবে না। অসীমের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এইটি উপরি পাওনা। থাকা হয় একটি হোটেলে, কিন্তু দেখা হয় অনেক।

সমুদ্রের ধারে ধারে পর পর ছোট ছোট শহর, তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত বড় জায়গা সাঁ মালো, সেখানে এমন একটি হোটেল পছন্দ হলো, যেটি সমুদ্রের একেবারে গায়ে। হোটেলের একদিকের দরজা সমুদ্রের দিকে, অন্যদিকের দরজা শহরে। পাশাপাশি এত হোটেল দেখলে বোঝা যায়, এখানে খুবই টুরিস্টের সমাগম হয়, কিন্তু এখন হালকা সময়।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে অসীমের ক্লান্তি ও অবসাদ আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আমরা কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবো না, বাদল ভালো গাড়ি চালায় বটে কিন্তু রাস্তার ডান পাশ দিয়ে গাড়ি চালাবার অভ্যেস তার নেই, সেইজন্য অসীম ভরসা করে তার হাতে স্টিয়ারিং ছাড়বে না। অসীম অবশ্য এতখানি গাড়ি চালাবার পরেও বিরক্তি প্রকাশ করে না, স্নান-টান সেরে আবার ফিটফাট হয়ে আসে। আমাদের হোটেলে রান্নার ব্যবস্থা নেই, আমরা পায়ে হেঁটে রেস্তোরাঁ খুঁজতে বেরোই।

খুব সাজানো-গোছানো, বড় রেস্তোরাঁর বদলে ছোটখাটো কোনো জায়গাই আমাদের পছন্দ হয়। সাধারণত একজোড়া স্বামী-স্ত্রী এইরকম ছোট দোকান চালায়। তারাই রান্না করে, তারাই পরিবেশন করে এবং কাছে এসে গল্পগুজব করে। আমাদের দেশের বড়ো হোটেল রেস্তোরাঁগুলিতে সবাই বেশি গম্ভীর। বেয়ারা-স্টুয়ার্ড থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজার পর্যন্ত সবাইকেই কেউ যেন হাসতে নিষেধ করে দিয়েছে, তাদের বিনয়ের মধ্যেও ভুরু-তোলা ভাব। আমরা যেখানে এলাম, সেই রেস্তোরাঁটা চালায় এক গ্রীক দম্পতি, তারা দু'জনেই আমাদের টেবিলে শাড়ি পরা নারী দুটিকে দেখে নানা রকম গল্প জুড়ে দিল।

খাদ্যতালিকাটি দেখে দেখে অসীম আমাদের বুঝিয়ে দেয় কোন্‌টা কী ব্যাপার। কুমকুম তার নামের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে কুশকুশ নামে একটা খাবার খুব পছন্দ করে ফেলেছে। কুশকুশ পেলে সে আর কিছু খায় না। মধ্যপ্রাচ্যের এই খাবারটি ফ্রান্সে বেশ জনপ্রিয়। নানারকম সবজি-মেশানো ভাতের মতন একটা জিনিস, খুব সম্ভবত সুজির ভাত। বাদল আর আমি এক একদিন এক এক রকম মাছ বা মাংস রান্না অসীমের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ে দেখি। স্বাতী কিন্তু অসীমের নির্দেশ মানে না, সে নিজেরটা নিজেই বেছে নেয় তালিকা দেখে। অসীম সেটা বদলে দেবার চেষ্টা করে বলে, না না, ওটা আপনার ভালো লাগবে না। ওটা টিপিক্যাল একটা ফরাসী রান্না। চিজের গন্ধ লাগবে ! স্বাতী তবু বলে, হ্যাঁ আমি এটাই নেবো ! গ্রীক মালিকানী স্বাতীর পছন্দের তারিফ করে বলে, মাদমোয়াজেল খুব ভালো বেছেছেন, ওটাই সবচেয়ে ভালো, আমাদের ঘরের তৈরি চিজের রান্না, তার সঙ্গে

মাইয়োনেজ।

অসীম তার ভুল ভাঙিয়ে বলে, উনি মাদমোয়াজেল নন, মাদাম, ঐ যে ঐ মহাশয়ের স্ত্রী।

গ্রীক মালিকানী খানিকটা অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকায়। তারপর একটা বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে বলে, আপনার চেয়ে আপনার স্ত্রীর রুচি অনেক উন্নত।

আমি হেসে মনে মনে বললাম, তুমি তো জানো না, এই মেয়েটি আগের জন্মে ফরাসী মেয়ে ছিল!

নিছক খাওয়া-দাওয়াই হয় না, এই সব রেস্তোরাঁর পরিবেশও মনে গেঁথে যায়।

এর পরেও আমরা হোটেলে না ফিরে বেড়াতে লাগলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে। বেলাভূমি থেকে কিনারার রাস্তাটা বেশ উঁচু। যত দূর চোখ যায় সমুদ্রের পাড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। মাঝে মাঝে সিঁড়ি নেমে এসেছে। এতখানি সমুদ্র-উপকূল বাঁধাতে কত খরচ লাগে! আমাদের দেশে কোথাও এরকম নেই। সমুদ্রের ঢেউ রাস্তার ধারে এসে ধাক্কা মারলেও ক্ষতি নেই, অত উঁচু পাথরের বাঁধ ভাঙবে না।

কিছুক্ষণ পর সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের একটা লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেল। বালির ওপর দিয়ে আমরা অনেকটা হেঁটে গিয়েছিলাম, জল ছিল বেশ দূরে, ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগলো ঢেউ, আমরা এক এক জায়গায় বসি, আবার পিছিয়ে যাই। ক্রমে যেন ঢেউ তাড়া করতে লাগলো। আমরা দৌড়োলাম, উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। ছলাত ছলাত শব্দ শুনে মনে হয়, ঢেউগুলো খেলাচ্ছলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইছে। কিন্তু জল কতটা উঠতে পারে তা হিসেব করেই এরা পাথরের বাঁধ বানিয়েছে।

রাত্রি গাঢ় হলে জলের ওপর কুয়াশা কুয়াশা ভাবটা কেটে যায়। তখন চোখে পড়ে সর্বাঙ্গ আলো-ঝলমল জাহাজ। প্রথম জাহাজটি দেখে অদ্ভুত উত্তেজনা হয়। ছেলেবেলায় সন্ধের আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা খুঁজতাম। একটি, দুটি, তিনটি।

বম্বের সমুদ্রতীরে কিংবা ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গায় রাত্রির জাহাজ দেখেছি। দুটি-একটি মাত্র। রাত্রির জাহাজের রূপই আলাদা, কেমন যেন অলীক মনে হয়। এখানে জাহাজ চলাচল অনেক বেশি। এক সময় বহু দূর বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে দশ বারোটি এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকে। যেন জলধির বুকে হীরের গাছ।

সাঁ মালো-তে আমরা থেকে গেলাম দু'তিনদিন। এখানে দর্শনীয় স্থান তেমন নেই। সমুদ্রই বিশেষ দ্রষ্টব্য। এখানে আসবার আগে উত্তর ফ্রান্সের সাঁ মালো নামে কোনো জায়গার নামও জানতাম না, দক্ষিণ ফ্রান্সের নিস, আন্তিব, কান্-এর মতন এর কোনো খ্যাতি নেই, তবু শান্ত, নির্জন স্থানটির ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গেল। সারাদিন প্রায় কিছুই করি না। শুধু আড্ডা। নিরুপদ্রব আড্ডার মতন এমন ভালো জিনিস আর হয় না, মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

ফেরার পথে আমরা অন্য রাস্তা ধরলাম। মাঝখানে শারত্রের বিখ্যাত গীর্জায় একবার উঁকি মেরে সোজা প্যারিস। শারত্রের গীর্জার বর্ণনা দিলাম না, একবারের যাত্রায় মঁ-সাঁ-মিশেল-এর মতন একটিই যথেষ্ট।

৩১

"সব সুন্দরেরই থাকে শুধু
একটিই বসন্ত
এসো, আমরা সময়ের পদচিহ্নগুলিতে
পুঁতে দিই গোলাপ।

—জেরার দ্য নারভাল

অনেক লোক যেমন স্ট্যাম্প জমায়, আমি তেমনি নদী জমাই। নদী আমাকে সব সময় টানে। জন্মেছি নদীমাতৃক দেশে, আমার জন্মস্থানের কাছে ছিল দুর্দান্ত আড়িয়েল খাঁ নদী। ছেলেবেলায় দেখেছি, বিশাল পদ্মানদীর চড়ায় কুমিরদের রোদ পোহাতে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মেঘনা নদীর ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ একবার দেখলে জীবনে ভোলা যায় না। যে-সব নদীর নাম বহুবার পড়েছি, সেগুলি দেখার জন্য মন ছটফট করে। কৃষ্ণা, কাবেরী, ঝিলম, ব্রহ্মপুত্র এই সব নদীগুলি প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। রবীন্দ্রনাথ রূপনারাণের কূলে জেগে উঠেছিলেন, আমি রূপনারাণ নদীর ধারে খোলা আকাশের নীচে অন্ধকার রাত্তিরে ঘুমিয়েছিলাম।

সব নদীই আলাদা, আবার একই নদীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপ। হরিদ্বারের গঙ্গা, কাশীর গঙ্গা, কাকদ্বীপের গঙ্গা। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে ভল্গা নদী দর্শনের পর মনে হয়েছিল, যাক, এতদিনে 'ভল্গা থেকে গঙ্গা' দেখা হল! চীন ভ্রমণে গিয়ে ইয়াংসিকিয়াং নদী দেখার খুবই সাধ ছিল, শাংহাই শহর থেকে কিছুটা দূরে, কিন্তু সে পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল না। ইচ্ছেমতন ঘোরাঘুরির সুবিধে ছিল না, তাই সেই ক্ষোভ আজও রয়ে গেছে।

একবার যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে গিয়েছিলাম এক রাত্রির জন্য। বিমান কম্পানি হোটেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, পরদিন সকালেই আবার অন্যত্র যাত্রার জন্য বিমান ধরতে হবে। সন্ধের পর হোটেলে পৌঁছেছি, সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ, তারপর আর কিছু করবার নেই। অত তাড়াতাড়ি বিছানায় গড়াতে আমার ইচ্ছে করে না। বেলগ্রেডে কারুকে চিনি না, একটা ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বারও নেই। হোটেলটা শহর থেকে বেশ দূরে, ট্যাক্সি নিয়ে শহরে গেলেও রাত্তিরবেলায় আর তো কিছু দেখা হবে না, কিছু হোটেল-রেস্তোরাঁই খোলা থাকবে। তখন মনে হলো, অন্য কিছু দ্রষ্টব্য না থাক, নদী তো আছে। এই শহরের পাশ দিয়ে গেছে ড্যানিয়ুব!

ম্যাপ দেখে নিয়ে আমি হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা চেনার দরকার নেই। নদী তো হারিয়ে যাবে না। সোজাসুজি প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে পাওয়া গেল

ড্যানিয়ুব নদী, আবার সৌভাগ্যবশত কাছেই একটা সেতু। রাত প্রায় দশটা। কাছাকাছি কোনো মানুষজন নেই, দু'চারটে গাড়ি শুধু ছুটে যাচ্ছে তীব্র বেগে।

আমি সেতুর মাঝামাঝি দাঁড়ালাম। ইতিহাস-বিশ্রুত এই নদী কিন্তু তেমন চওড়া কিছু নয়। কত যুদ্ধ, কত মারামারি কাটাকাটি হয়েছে এই নদীর তীরে, বিশেষ করে বেলগ্রেডের এই অঞ্চলটায়, কিন্তু তখন সে সব কথা আমার মনে পড়েনি। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম এক অপূর্ব সঙ্গীত। আমার গায়ে ওভারকোট, দু' হাতে দস্তানা, কিন্তু কান দুটোতে ঝাপটা মারছিল শীতের বাতাস, খুব শীতেও আমি টুপি মাথায় দিতে পারি না। সেখানে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে লাগলাম ব্লু ড্যানিয়ুব সঙ্গীতের মূর্ছনা। এক সময় পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে নদীর জলে ছুঁড়ে দিলাম। নদীকে কিছু উৎসর্গ করাই মুসাফিরদের নিয়ম।

রাত্রির অন্ধকারে ড্যানিয়ুবের জলের রং বোঝা যায়নি!

বছর তিনেক আগে চেকোশ্লোভাকিয়াতে বাতিশ্লাভা নামে একটা শহরে গিয়েছিলাম। কেমন যেন নির্জীব জায়গাটা, মানুষজনের মুখে বিরক্ত বিরক্ত ভাব। তখনো চেকোশ্লোভাকিয়ায় সরকার-বিরোধী প্রবল আন্দোলন শুরু হয়নি। কিন্তু লোকে প্রচণ্ড অসন্তোষ নিয়ে গুমরে গুমরে উঠছে তা বোঝা যাচ্ছিল। গান-বাজনার জন্য এক সময় এই শহরের খুব খ্যাতি ছিল, বালক মোৎসার্ট এখানেই সম্রাটের সামনে পিয়ানো বাজিয়ে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সম্রাট জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কী উপহার চাও? বালক মোৎসার্ট তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, আমি রানীকে বিয়ে করতে চাই! সেই শহরে গান-বাজনার কোনো অনুষ্ঠান শোনা হলো না। একদিন রেস্তোরাঁয় একজন সঙ্গীতশিল্পী নিজে থেকেই আমাদের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগলো।

যাই হোক, সেখানে একদিন গাড়িতে যেতে যেতে শহরের বাইরে একটা নদী পেরুতে হলো। আমি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, আগে খেয়াল করিনি, ব্রিজের শেষ প্রান্তে এসে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী নদী?

আমাদের গাইড মেয়েটি জানালো, এটা ড্যানিয়ুব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, গাড়ি থামাও! আমি এখানে নামবো!

সরকারি আমন্ত্রণে সফর, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে গাড়ি থামানো যায় না। সব কিছু একেবারে মিনিট-মাপা সময়ে বাঁধা। তবু ড্যানিয়ুব নদীর ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছি, ভালো করে দেখবো না?

অন্য কয়েকজন বললো, গাড়িতে বসেই তো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আমি তাতেও রাজি হলাম না। গাড়ি থেকে নেমে, ব্রিজের তলা দিয়ে নেমে গেলাম জলের ধারে। এক আঁজলা জল তুলে ছোঁয়ালাম মাথায়।

এবার দিনের আলোয় দেখলাম, ড্যানিয়ুবের জলের রং নীল নয়। ঘোলাটে ধরনের। কাছাকাছি অনেক কারখানার নোংরা গাদ এসে পড়ছে এই নদীর জলে।

আজকাল নদীগুলো সব দেশেই দূষিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ড্যানিয়ুব নদীকে কি বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত ছিল না। এ যে পবিত্র নদী। স্বপ্নের নদী। ইয়োহান স্ট্রাউস এই নদীর নামে অমর সঙ্গীত রচনা করেছেন। নিশ্চয়ই স্ট্রাউসের আমলে এই নদীর জলের রং পরিষ্কার, ঝকঝকে নীল ছিল।

পৃথিবীর আর একটি পবিত্র নদী আমার একটুর জন্য দেখা হয়নি।

আরব দেশের আম্মান শহরে একবার এক হোটেলে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল, বিমান

বদলাবার কারণে। বাদল বসু ছিলেন সে যাত্রায়। ঘরে বসে ম্যাপ দেখে বুঝতে পারলাম, পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরেই জর্ডন নদী। এই নদীর বুকে দাঁড়িয়ে সেন্ট জন দা ব্যাপটিস্ট যীশুর মাথায় জলের ছিটে দিয়ে তাকে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই থেকে বিশ্বের সমস্ত খ্রিষ্টানদের কাছে এই নদীর জল পবিত্র। প্রত্যেক গীর্জায় এই জল রাখা থাকে। হিন্দুরা জন্ম থেকেই হিন্দু, কিন্তু খ্রিষ্টান পরিবারের ছেলেমেয়েদের ব্যাপটিজম না হলে তারা খ্রিষ্টান হয় না, নবোজাত শিশুদের তাই গীর্জায় নিয়ে গিয়ে মাথায় জর্ডন নদীর জলের ছিটে দিয়ে আনতে হয়।

কিন্তু অত কাছে গিয়েও আমাদের জর্ডন নদী দেখা সম্ভব হলো না, কারণ আমাদের ট্রানজিট ভিসা, এক রাতের বেশি থাকার উপায় নেই, হোটেলের বাইরেই যেতে দেয় না। জানি না, জর্ডন নদীর জলেও কল-কারখানার নোংরা এসে মেশে কি না।

আম্মান বিমান বন্দরে দেখলাম, নানা আকৃতির শিশিতে জর্ডন নদীর জল বিক্রি হচ্ছে। এক সময় আমাদের দেশেও গঙ্গা জলের এরকম চাহিদা ছিল। সমস্ত পুজো-আচ্চায় গঙ্গা জলের প্রয়োজন হতো। ভারতের গঙ্গা বর্জিত অঞ্চলগুলিতে বিক্রি হতো গঙ্গা জল। কলকাতার আদি যুগে বৈষ্ণবচরণ শেঠ নামে এক ব্যবসায়ী শুধু গঙ্গা জল বিক্রি করেই দারুণ বড়লোক হয়েছিলেন। সিল করা কলসীতে তিনি ভারতের সর্বত্র খাঁটি গঙ্গা জল পাঠাতেন। আমাদের ছেলেবেলাতেও দেখেছি, পূর্ব বাংলা থেকে কেউ কলকাতায় এলে তাকে বলে দেওয়া হতো, এক বোতল গঙ্গা জল এনো! এখন গঙ্গা জলের আর সেই মহিমা নেই।

নদী বিখ্যাত হয় তার দু' তীরের সৌন্দর্যের জন্য। দু'পাশে পাহাড় থাকলে সে নদীর শোভা আরও খোলে। এমন নদী তো কম দেখিনি, কোনোটাই অন্যগুলির চেয়ে কম সুন্দর নয়। আমাদের উত্তর বঙ্গেও এমন অনেক চমৎকার নদী আছে। তিস্তা তো বটেই, তা ছাড়া ডায়না নামের নদীটিও আমার খুব পছন্দ।

সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ রায়মঙ্গল নদীর বুকে একবার আমি ডিঙি নৌকোয় সারা রাত কাটিয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম, নৌকো ডুবির চেয়েও ভয়ংকর ঝুঁকি ছিল ডাকাতের হাতে পড়ার। ওসব জায়গায় কেউ সন্ধের পর নৌকোয় যায় না, সীমান্ত পেরিয়ে ডাকাতরা এসে শুধু নৌকোটা লুঠ করার জন্যই মানুষ মেরে জলে ফেলে দেয়। আমি বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলাম। ওসব কথা আমার মনে পড়েনি, ডাকাতদেরও মনে পড়েনি আমার কথা। এখনো সুন্দরবন যাবার পথে রায়মঙ্গল নদীটিকে দেখে সেই রাতটার কথা ভেবে মজা লাগে।

সাসকাচুয়ান নামটি আমার বড় প্রিয়। নামটার মধ্যে একটা ঝংকার আছে, যেমন উত্তর কাছাড়ের জাটিংগা নদীর নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়। এই সাসকাচুয়ান নদীটি আমি দেখেছি এ কথা যেমন ঠিক, আবার দেখিনি, এমনও বলা যেতে পারে; কানাডার এই নদীটির তীরে আমি যখন দাঁড়াই, তখন প্রবল শীতকাল, পুরো নদীটি ধপধপে সাদা। সমস্ত জল জমে কঠিন বরফ হয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে হাঁটা যায়, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করছে। জলের স্রোত থাকলে তবেই তো সেটা নদী, বদ্ধ জলাশয়কে তো আর নদী বলা যাবে না! তা হলে আমি কী দেখলাম?

আয়ওয়াতে থাকার সময় আয়ওয়া নদীর ধার দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে যেতে হতো। খুবই ছোট নদী, কিন্তু বৈশাখ মাসে তার হাঁটু-জল হয় না, ভরা ভরাই থাকে সারা বছর, শীতের কয়েকটা মাস জমে শক্ত হয়ে যায়। অন্য সময় আয়ওয়া নদীর জলের রং কালো, কিন্তু বরফের রং কালো হয় না। এই একটাই নদী যাকে আমি কালো এবং সাদা, স্রোতস্বিনী এবং

স্তব্ধ অবস্থায় দেখেছি। ঐ ছোট নদীকেও কত রকম ভাবে সাজাবার চেষ্টা। ঐ একটা শহরেই নদীর ওপর অন্তত গোটা পাঁচেক সেতু, দুধারে নানা রকম ফুলের কেয়ারি। মাগারিট থাকতো নদীর এক পাড়ে, আমি অন্য পাড়ে, নদী পেরিয়ে প্রতিদিন দেখা হতো দু'জনের। কখনো কখনো সেতু দিয়ে নদী পার না হয়ে আমি অ্যালেক নামে একটি ছেলের নৌকো ধার নিতাম। অ্যালেক ছবি আঁকতো। ভাসমান নৌকোয় বসে ছবি আঁকা ছিল তার খেয়াল। আমি কোনোদিন রোয়িং শিখিনি, পূর্ব বাংলায় কৈশোরে বৈঠা দিয়ে ছোট ডিঙ্গি নৌকো চালিয়েছি কয়েকবার। সেই স্মৃতির ওপর ভরসা করে একলা নৌকো চালাতাম, উল্টে গেলেও বিপত্তির কিছু ছিল না। ঐটুকু নদী সাঁতরে পার হতে আর কতক্ষণ লাগে! মাগারিট সাঁতার জানতো না বলে নৌকোয় চাপতে ভয় পেত। তবু দু'-একদিন তাকে জোর করে চাপিয়েছি। সেই টলমলে নৌকোয় বসে ভয়মাখা হাসি মুখে মাগারিট মঁ দিউ, ও লালা এই সব শব্দ করতো। মাগারিটের চোখে আমেরিকার চেয়ে ফরাসী দেশের সব কিছুই ভালো। সে বলতো, দূর, এটা আবার একটা নদী নাকি? নদী দেখবে আমাদের দেশে গিয়ে, লোয়ার, শের, মাইয়েন্ ...

অনেক বছর পর সেই আয়ওয়া নদীর প্রান্ত দিয়ে স্বাতীর সঙ্গে হেঁটেছি। অনেক কিছুই বদলে গেছে, কিন্তু নদীটার বিশেষ রূপান্তর হয়নি। সব নদীর মধ্যেই যেন একটা চিরন্তন ব্যাপার আছে। স্বাতীও সাঁতার জানে না, তবে সেবারে পরিচিত কারুর নৌকোও পাইনি। ফুলের সমারোহের মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে বেড়াতাম অনেক রাত পর্যন্ত। যখন যেখানেই যাবার দরকার হোক, অন্য রাস্তা দিয়ে না গিয়ে আমরা নদীকে দেখে যেতাম একবার।

শীতে জমে যাওয়া নদীর ওপর দিয়ে ভরসা করে কখনো হাঁটিনি অবশ্য। হঠাৎ বরফ ভেঙে ভেতরে ডুবে গিয়ে কেউ আর উঠতে পারেনি এরকম অ্যাকসিডেন্টের কথা শোনা যায় মাঝে মাঝে। তবু অকুতোভয় দু'-চারটি ছেলেমেয়ে নদীর মাঝখানে গিয়ে লাফালাফি করে, নাচে, বরফ খুঁড়ে জল বার করে।

বিশাল চওড়া নদী মিসিসিপি দেখে প্রথমবার বেশ হতাশ হয়েছিলাম। একটুও নদী নদী ভাব নেই। তীরের মাটি নেই, কাদা নেই, দু'দিকের পাড় বাঁধানো, দুপুরবেলাতেও কেউ সেখানে অলসভাবে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে না, কেউ স্নান করছে না। স্টিমার আর স্পীড বোটের ছড়াছড়ি, পাল তোলা নৌকো দেখা যায় না একটাও। নদীর সঙ্গে কূলের মানুষের একটা একাত্মতা থাকে, তবেই তো নদীর রূপ খোলে। স্টিমারে চেপে মিসিসিপির বুকে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরেছি বটে, কিন্তু মনে তেমন দাগ কাটেনি। এর চেয়ে পদ্মার রূপ অনেক সুন্দর। চীনের ক্যান্টন শহরের পাশে পার্ল নদী দেখে পদ্মার কথা মনে পড়েছে কয়েকবার। সেই পার্ল নদীর বুকেও অজস্র পাল তোলা নৌকো। শহর ছাড়িয়ে গাড়ির রাস্তায় গেছি অনেক দূর, হঠাৎ হঠাৎ পার্ল নদী কাছে এসে পড়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীটি দেখার সৌভাগ্য আমার আজও ঘটেনি। ছবিতে দেখেছি, সিনেমায় দেখেছি, কিন্তু স্বশরীরে, স্পর্শের দূরত্বের মধ্যে না দেখলে কি আর সাধ মেটে! দু'পাশে ভয়াল অরণ্য, তার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়া গর্জমান নদী, আমি মাঝে মাঝে তাকে কল্পনায় দেখতে পাই।

জার্মানির রাইন নদীর জলও দূষিত, কিন্তু দু'দিকের ঢেউ খেলানো পাহাড়, অরণ্য ও টিলার ওপর ছোট ছোট পুরোনো দুর্গ, দৃশ্য হিসেবে বড় সুন্দর।

মিশরের যে নদীটির নাম নাইল, আমরা ছেলেবেলায় ভূগোলে সেটার নাম পড়েছি নীল নদ। কোন্‌টা নদী আর কোন্‌টা যে নদ, তা যে কে ঠিক করে দেয়, কে জানে! এমন সব

চমৎকার চমৎকার নামই বা কারা রেখেছিল! আমাদের দেশের একটা ছোট্ট নদীর নাম চূর্ণী নদী, 'ছলো ছলো করে গ্রাম চূর্ণী নদী তীরে' এই লাইনটা আমি আপন মনে অকারণে বারবার আওড়াই শুধু ঐ নামটার জন্য। কপোতাক্ষ নামটাও তো মাইকেল মধুসূদন রাখেননি! সাগরদাঁড়ি গ্রামে গিয়ে কপোতাক্ষ নদে নৌকোয় চেপে ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে হয়েছিল, মাইকেলের আগেও এখানে একজন বেশ বড় কবি ছিল, যিনি পায়রার চোখের সঙ্গে তুলনা দিয়ে এই নদীর নাম রেখেছিলেন। আগে এই নদ বা নদীটির কেমন রূপ ছিল তা জানি না, আমি যখন দেখেছি, তখন সেটা বেশ ছোট এবং জলের রং ঘোলাটে। তা হলে তো নামদাতার কল্পনাশক্তির আরও প্রশংসা করতে হয়!

ছেলেবেলার স্মৃতি এমনই কাজ করে যে কায়রো শহরে গিয়ে আমি নদী দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাইল-এর বদলে নীল নদ বলে ফেলেছিলাম এবং তখনো আমার ধারণা, এই নদের জলের রং নীল। অবশ্যই তা নয় এবং একে নদ বলারও কোনো কারণ নেই। আমাদের দেশের বাইরে আর কোথাও নদীর লিঙ্গভেদ আছে, এমন শুনিনি। খ্যাতির জন্যই নাইল-এর তীরে দাঁড়িয়ে আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল, নইলে দৃশ্যত এমন কিছু সুন্দর নয়।

সমতলে নদীর জল সাধারণত নীল হয় না, স্বচ্ছও হয় না। নদীর জল ঝকঝক করে পাহাড়ে। পাহাড়ী নদী দেখেছি প্রচুর এবং প্রত্যেকটাই আলাদাভাবে মনোহর। আসামের জাটিংগা নদীটি আমাকে একবার খুব প্রতারিত করেছে। অনেক বছর আগে, ছোট ট্রেনে চেপে দু' পাশের গাঢ় সবুজ অরণ্যানীর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এই দুর্দান্ত নদীটিকে দেখে দারুণ মুগ্ধ হয়েছিলাম। কী সাংঘাতিক তেজী প্রবাহ। মহানাগের ফণার মতন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ঢেউ, যেন হঠাৎ রেল লাইনকেও গ্রাস করে নেবে। তখন আমার ধারণা ছিল নদীটির নাম জাটিংগা নয়, ঝাটিংগা। জ আর ঝ-এর সামান্য তফাতেও ধ্বনিমাধুর্য অনেক বদলে যায়। এখন জাটিংগা নামটা অনেকটা পরিচিত, শুধু নদী নয়, এ নামে একটা জায়গাও আছে। বছরের কয়েকটি মাস সেখানে একটা রহস্যময় ব্যাপার চলে। রাত্তিরবেলা সেখানে আলো জ্বেলে রাখলেই ওপর থেকে ঝপাস ঝপাস করে বড় বড় পাখি এসে পড়ে। সেই পাখি অনেকেই ধরে ধরে মেরে খায়, তাতেও পাখি আসা কমে না। শুধু ঐ জায়গাটাতেই কেন আলো দেখলে অত বড় বড় পাখি আত্মহত্যা করতে আসে, তা এখনো একটা বিস্ময়। পৃথিবীর নানা দেশ থেকেই কৌতূহলীরা আসে 'জাটিংগা বার্ডস' নিয়ে গবেষণা করতে।

আমি যখন প্রথম দেখি তখন জাটিংগার এই পক্ষী-খ্যাতি ছিল না। নামটাও আমি জানতাম ঝাটিংগা। খেলনার মতন ছোট ট্রেন অনেকক্ষণ থেমে ছিল হারাংগাজাও নামে একটা স্টেশনে। নিবিড় গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝাটিংগা ও হারাংগাজাও এই নাম দুটি আমার মাথার মধ্যে টং টং শব্দ করতে থাকে, ব্রহ্মার হাতের বীণার নাদের মতন। মনে হয় যেন আমি আদিম পৃথিবীতে ফিরে গেছি। এই নদী নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলাম এবং পরে অনেকের কাছে ঐ নদী বিষয়ে গল্প করেছি।

বছর দু'-এক আগে হাইলাকান্দি গিয়েছিলাম এক সাহিত্যসভায়। স্বাতী ছিল সঙ্গে। ফেরার সময় স্বাতী বললো, এই দিকেই তো তোমার সেই ঝাটিংগা নদী, একবার দেখা যায় না! সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেল। ধস পড়ে লাইন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ছোট রেল বন্ধ হয়ে আছে, কিন্তু গাড়িতে যাওয়া যেতে পারে হাফলং পর্যন্ত, রাস্তা খুব খারাপ, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

শিলচর ছাড়িয়ে লামডিং-এর পথে এগোতে এগোতে আমি ক্রমশই বিচলিত বোধ করলাম। কোথায় সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য। এ তো দেখছি ছাড়া ছাড়া গাছ, অধিকাংশই পাতা ঝরা। আগেরবার দূর দূর টিলার ওপর জমাট জঙ্গল দেখে মনে হয়েছিল, ওখানে বুঝি কখনো মানুষের পা পড়েনি, এমনকি জরিপকার্যও হয়নি। এখন সে সব জঙ্গল প্রায় সাফ হয়ে গেছে। মানুষ কি পৃথিবী থেকে সমস্ত গাছ ঝাড়েবংশে নির্বংশ করবে ঠিক করেছে?

নদীটাই বা গেল কোথায়? মাঝে মাঝে আমি স্বাতীকে বলছি, এবার নদীটা দেখতে পাবে! স্বাতী আমার দিকে এমন কৌতুকের চোখে তাকাচ্ছে যেন এত কাল আমি সবাইকে গুল মেরেছি, কবিতাটাও বানিয়ে লিখেছি। সত্যিই সেই দুর্ধর্ষ, তেজী নদীটি একেবারে উধাও! এক সময় হারাংগাজাও স্টেশনটি পাওয়া গেল, আগের বার এটা ছিল খুবই নিরিবিলি, ছোট্ট ছিমছাম স্টেশন। এখন বেশ লোকজন, দোকানপাট হয়েছে। যেন ম্যাজিকে অন্য রকম। কাছে সেই নদীর খাতটা রয়েছে বটে, জল নেই এক বিন্দু। অমন চমৎকার নদীটাকে কে খুন করলো? আমার কষ্ট হতে লাগলো রীতিমতন। পৃথিবীতে বহু জায়গাতেই নদীগুলোকে বাঁধ বেঁধে নির্জীব করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের গঙ্গা নদীও তো মুমূর্ষু, বাংলাদেশ এর থেকে যথেষ্ট জল পাচ্ছে না। কলকাতার কাছে মাঝ গঙ্গায় লোকে হেঁটে বেড়ায়।

অবশ্য জাটিংগা নদী আমি প্রথমবার দেখেছিলাম বর্ষাকালে, দ্বিতীয়বার শীতকালে। বর্ষায় অরণ্যের রূপ খোলে, নদীগুলিও স্বাস্থ্যবতী হয়। তা বলে কি বর্ষার পাহাড়ী নদী শীতকালে একেবারে মরে যায়? আর একবার বর্ষায় গিয়ে জাটিংগাকে দেখে আসতে হবে। শুনেছি আমাদের ছেলেবেলার রুদ্ররূপী আড়িয়েল খাঁ নদীরও এখন খুব করুণ অবস্থা।

ফ্রান্সে গিয়ে আমরা সাধারণত শুধু স্যেন নদীটাই দেখি। প্যারিস শহরের মাঝখানের নদীটির চেয়ে তার সেতুগুলির বৈচিত্র্যই আসল দর্শনীয়। শহরের উপকণ্ঠে একবার বিজ্ঞানী ভূপেশ দাসের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর বাড়ির কাছেই একটা ছোট্ট নদী আছে। একেবারে একরত্তি নদী, ইচ্ছে করলে জোরে লাফ দিয়ে পার হওয়া যায়, কিন্তু তার রীতিমতন স্রোত আছে, সেই স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি আছে। নদীটির নাম ইভেৎ। এত ছোট্ট নদী আমি কখনো দেখিনি, তার এত সুন্দর নাম। সেইজন্য তাকে ভোলা যায় না। ঐ অঞ্চলে গেলেই নদীটা একবার দেখতে যাই।

ফ্রান্সের সবচেয়ে বিখ্যাত নদী বোধহয় লোয়ার। ইতিহাস ও ভূগোল, দু'দিক থেকেই এর অনেক গুরুত্ব। এই নদীর দু'ধারে প্রচুর দ্রষ্টব্য স্থান।

মাঝখানের দু'বছর আমি আর ফরাসী দেশে যাইনি। এর মধ্যে একবার বুলগেরিয়া-চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়ে মনে হয়েছিল, টপ করে একবার প্যারিস ছুঁয়ে এলে হয়। প্রাগ শহর থেকে অসীম-ভাস্করকে ফোন করেও লোভ সংবরণ করতে হলো। আগে থেকে ঠিক করা ছিল, সেবার আমি তুরস্কে যাবো। সেখানে কোনো আমন্ত্রণ নেই, চেনাশুনো কারুর বাড়িতে থাকার জায়গাও পাওয়া যাবে না। তা হলেও ইস্তানবুল শহরটা একবার না দেখে মরে যাবার কোনো মানে হয় না। পৃথিবীতে ইস্তানবুলই একমাত্র শহর, যার দুটো অংশ দুটো মহাদেশে। এশিয়া ও ইউরোপ। এককালে এরই নাম ছিল কনস্টান্টিনোপল। তারও আগে এটাই ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার সূতিকাগার। এখানে জন্মেছিলেন মহাকবি হোমার। যীশুর মা ভার্জিন মেরির বাড়ি এখানে খুঁজে পাওয়া গেছে। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে এরই কাছাকাছি ছিল ট্রয় নগরী।

ইস্তানবুলে নদী নেই। একদিকে কৃষ্ণসাগর, মর্মরসাগর। অন্য দিকে ভূমধ্যসাগর।

কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে জুড়েছে বসফরাস প্রণালী, সেটাই গেছে শহরের মাঝখান দিয়ে। সি অফ মারমারা'র নাম বাংলায় কে মর্মরসাগর দিয়েছিল কে জানে, ভালোই দিয়েছিল। সস্তায় হোটেল ভাড়া করে ইস্তানবুলে আমি কয়েকটা দিন কাটালাম সম্পূর্ণ একা, এক একদিন কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলিনি। সেও এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পরের বছর আবার ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা ও লন্ডনে দু'-একটি সভায় যোগদানের উপলক্ষ ঘটলো। তা হলে তো মাঝখানের ফ্রান্সকে উপেক্ষা করার কোনোই মানে হয় না। অসীমকে চিঠি লিখতেই অসীম জানালো ছুটি নিয়ে নিচ্ছি। এবার তা হলে লোয়ার নদীর উপত্যকায় ঘোরাঘুরি করা যাবে, কী বলো?

শুরু হলো আমাদের নতুন অভিযান।

৩২

উঠে বসে, আমি আমার পর্দাগুলোর আড়াল থেকে
ধরলাম অলক্ষ্য প্রজাপতিটাকে, যেন জ্যোৎস্নালোক দিয়ে গড়া
অথবা এক বিন্দু শিশির
আমার আঙুলের বন্দিত্ব থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফটে
প্রজাপতিটা আমাকে দিয়ে গেল সুগন্ধের মুক্তিপণ !

—আলোইসিউস বারত্রাঁ

প্যারিস থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথম লোয়ার নদীর দেখা পেলাম অরলিঅঁ শহরের কাছে এসে। এই শহরটির নাম শুনলেই আমার মনে পড়ে সেই উনিশ বছরের মেয়েটির কথা, যাকে বহু লোকের সামনে একটি খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই যুবতীটি মানব সভ্যতার একটি বিস্ময়।

বাংলায় তার নাম লেখা হয় জোয়ান অফ আর্ক। কেন আমরা জোয়ান বলি কে জানে ! ইংরিজিতে বলে জোন অব আর্ক, বার্নার্ড শ' তাকে নিয়ে যে নাটকটি লিখেছেন তার নাম সেন্ট জোন। ফরাসীতে বলে জান্ দা'র্ক ! বাংলায় জোয়ান কোথা থেকে এলো ? সে যাই হোক, এতকাল বাংলায় জোয়ান চলে আসছে, আমি তা বদলাতে চাই না। শেক্সপীয়ারকে এক সময় বাংলায় লেখা হতো শেক্ষপীয়র, যেমন ম্যাক্সমুলারকে লেখা হতো মোক্ষমুলর, শুনতে বেশ ভালোই লাগতো।

যে-সময় ফ্রান্স ছিল টুকরো টুকরো অঞ্চলে বিভক্ত, ইংরেজরা এদেশের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়ে নানা জায়গা হস্তগত করে নিয়েছে, যুদ্ধ চলছে সর্বক্ষণ, ফরাসী সামন্তরা কে কার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আর কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে তার ঠিক নেই, দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা এই সব ধারণাগুলো ঠিক মতন পরিস্ফুট হয়নি, সেইরকম সময় এক গ্রাম্য বালিকা কী করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক অপদার্থ রাজাকে উজ্জীবিত করলো, সেনা বাহিনীর মধ্যে তীব্র আবেগের সঞ্চার করে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াইতে মাতিয়ে তুললো, তা শুধু দুর্বোধ্য নয়, আজও যেন ব্যাখ্যার অতীত মনে হয়। ডমরেমি গ্রাম থেকে যখন জান্ বা জোয়ান এসে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়িকা হতে চাইলো, তখন তার বয়েস ছিল আঠেরো বছর। আগে কোনোদিন অস্ত্র ধরেনি, সে গ্রামে বসে শিখেছিল সুতো কাটা আর শেলাই-ফোঁড়াই। তবু যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার চিন্তা তার মাথায় এলো কী করে ? পৃথিবীতে আর কোথায়, কবে একটি আঠেরো বছরের মেয়ে স্বেচ্ছায় এত বড় গুরুদায়িত্ব নিয়েছে ? বিচারের সময় জোয়ান বলেছিল, সে ঈশ্বর-আদিষ্ট। ঈশ্বর সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বটে, তবে ঈশ্বরের দূত, সন্ত মাইকেল, সন্ত ক্যাথরিন এবং

সন্ত মার্গারিট তাকে প্রেরণা দিয়েছেন, তাঁরা এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছেন। জোয়ান তাঁদের সশরীরে দেখেছে, স্পর্শ করেছে।

এ যুগে আমরা দেবদূতদের এরকম আগমনের কথা যুক্তি দিয়ে ঠিক মেনে নিতে পারি না। তা ছাড়া, ঈশ্বরের দূতরা ভালোবাসা, সেবা ও শান্তির বাণী নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু তাঁরা শুধু যুদ্ধের উত্তেজনা জোগাতে আসবেন কেন ? রূপকথার কিংবা পৌরাণিক চরিত্র নয় জোয়ান, সে ইতিহাসের নায়িকা, মাত্র সাড়ে পাঁচশো বছর আগেকার ঘটনা, সমসাময়িক অনেক তথ্য এবং তার বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শেষ পর্যন্ত জোয়ান ধরা পড়েছিল বিশ্বাসঘাতক ফরাসীদেরই হাতে, বাগাণ্ডির ডিউক তাকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দেয়। ধুরন্ধর ইংরেজরা তাকে তৎক্ষণাৎ খুন না করে একটি বিচারের প্রহসন করে, যাতে সাধারণ মানুষের মন থেকে তার মহিমার ধারণাটা মুছে যায়। এবং বিচারের ভার দেয় কিছু তাঁবেদার বিশপের হাতে। সেই সব শিক্ষিত ধর্মযাজকরা এই গ্রাম্য বালিকাকে অদ্ভুত সব অভিযোগ এনে জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করবার চেষ্টা করলেও নির্ভীক জোয়ানের উত্তরগুলো ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরা। তবু প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল যে, জোয়ান মোটেই ঈশ্বর-প্রেরিতা নয়, সে মায়াবিনী, ডাকিনী, পিশাচসিদ্ধা। সে গীর্জার কর্তৃত্ব মানে না, সে পুরুষের মতন পোশাক পরে। সে ব্যভিচারিণী, অসতী।

কয়েকজন মহিলা, তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম বিচারকের স্ত্রী, জোয়ানের শরীর পরীক্ষা করে বলেছিলেন, সে সন্দেহাতীতভাবে কুমারী। যুদ্ধের সময় সে পুরুষদের মতন পোশাক পরেছে বটে, সে যুগে সেটাই ছিল চরম অপরাধ। আর কোনো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি, তবু তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল।

এই অরলিঅঁ শহরেই জোয়ান তার সামরিক দক্ষতার প্রথম প্রমাণ দেয়। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে জোয়ান নৌকোয় চেপে লোয়ার নদী পার হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে ইংরেজদের। ফরাসী বাহিনীর কয়েকজন সেনাপতি এই গেঁয়ো মেয়েটির নেতৃত্ব মানতে চাননি, কিন্তু জোয়ান উদ্বুদ্ধ করে সাধারণ সৈন্যদের। যুদ্ধের মাঝখানে জোয়ান একবার সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়, শত্রুরা ধরেই নিয়েছিল যে ঐ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ কুমারীটি মারাই গেছে। কিন্তু পরদিনই জোয়ান কাঁধের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে, পতাকা হাতে নিয়ে সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালো পূর্ণ উদ্যম নিয়ে। তখনই অনেকে মনে করলো, এই মেয়েটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। জোয়ানের নেতৃত্বেই ফরাসীবাহিনী ইংরেজদের কবল থেকে শহরটি উদ্ধার করে। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

আমার খুব ইচ্ছে এই ঐতিহাসিক শহরটি ভালোভাবে ঘুরে দেখার। অরলিঅঁ শহরটিকে ইংরেজরা বলে অরলিয়েন্স (orleans), তার থেকেই আমেরিকায় নিউ অরলিয়েন্স।

অসীম বললো, তুমি কল্পনায় যে শহরটির ছবি এঁকে রেখেছো, তাকে কিন্তু এখানে একদমই দেখতে পাবে না। জান্ দা'র্কের আমলের প্রায় কোনো চিহ্নই এখানে আর নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আঘাতে এই শহরটার অনেকখানিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তারপর নতুন করে গড়া হয়েছে, এটা এখন আধুনিক শহর, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। দেখবার বিশেষ কিছু নেই, থাকবার পক্ষেও ভালো নয়। আজ আমরা এর চেয়ে অনেক ভালো একটা জায়গায় রাত কাটাবো ঠিক করেছি। তা ছাড়া, আমরা আবার এই পথ দিয়েই ফিরবো। ফেরার সময় এখানে কিছুক্ষণ থেমে যাবো না হয় !

শহরটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে এটাকে এখন একটা কেজো, ব্যস্ত জায়গা বলেই মনে

হলো। এক চৌমাথায় লাল আলোতে আমাদের গাড়ি থেমেছে, আমাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হলো একদল যুবতী। তাদের মধ্যে অন্তত তিন-চার জন জিন্‌সের প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা। আজ বেশ গরম পড়েছে, এই পোশাক অত্যন্ত স্বাভাবিক। অথচ এক সময় পুরুষদের মতন পোশাক পরেছিল বলে জোয়ান অফ আর্ককে মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হয়েছিল।

এবার আমরা দলে চারজন। বাদল আর আমি একসঙ্গে এসেছি জার্মানি থেকে। খবর পেয়েই লন্ডন থেকে চলে এসেছে ভাস্কর। বছর তিনেক আগে ভাস্করের সেই যে হেঁচকির অসুখ হয়েছিল, তা আজও সারেনি। দিব্যি আমোদ-আহ্লাদ-মজায় আছে, হঠাৎ হেঁচকি আর ঢেঁকুরের মাঝামাঝি একটা ব্যাপার শুরু হলো, আর কিছুতেই থামে না, শেষের দিকে কথা বলাই দারুণ অসুবিধেজনক হয়ে ওঠে। লন্ডনে ভাস্কর সবরকম চিকিৎসা করিয়েছে। তারপর একবার কলকাতায় এসে দু'তিন মাস থেকে হোমিওপ্যাথি-কবিরাজি কিছুই বাদ রাখেনি, কিন্তু এ রোগ সমস্ত চিকিৎসার অতীত। হেঁচকি কিংবা ঢেঁকুর, শুনতে সামান্য মনে হলেও ঘন্টার পর ঘন্টা যদি চলতে থাকে এবং দিনের পর দিন, তা হলে তা যে কত কষ্টকর তা নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে পারে। এই কারণে ভাস্করের শরীরও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু ভাস্করের আচরণ দেখে সে রকম কিছুই বোঝা যাবে না। আগের মতনই সে উত্তেজনাপ্রবণ, যে-কোনো সামান্য ব্যাপার থেকে মজা খুঁজে নেবার ক্ষমতা আছে ভাস্করের। দা ফ্লেশ ইজ উইক বাট দা স্পিরিট ইজ হাই যাকে বলে।

চারজনে মিলে বেড়ানোই সবচেয়ে সুবিধেজনক। যুগ্ম সংখ্যায় খরচের সাশ্রয় হয়। হোটেলে দু'খানা ঘর নিলেই চলে, রেস্তোরাঁয় একটা টেবিল। অসীমের গাড়িটি চারজনের পক্ষেই আরামদায়ক। ভাস্কর আর বাদল পেছনে, আমি চালক মশাইয়ের সহকারী, আমার ওপর ম্যাপ দেখার ভার। চার-পাঁচখানা মানচিত্র নিয়ে আমি মাঝে মাঝে দিশাহারা হয়ে যাই। এই সব দেশে কত ধরনের ম্যাপ যে পাওয়া যায় তার ঠিক নেই, ছোট ছোট অঞ্চলেরও বড় বড় ম্যাপ। পেট্রোল পাম্প, মুদির দোকানে ম্যাপ বিক্রি হয়। অবশ্য এতরকম রাস্তার গোলকধাঁধায় ম্যাপ ছাড়া গতিও নেই।

আমরা এগোতে লাগলাম লোয়ার নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। নদীটি নেহাত ছোট নয়। আবার বিশাল কিছুও নয়। অনেকটা বিহার কিংবা মধ্যপ্রদেশের নদীগুলোর মতন, পাথুরে তীর, নদীর মধ্যে মধ্যেও বড় বড় পাথরের চাঁই, কোথাও ছোটখাটো দ্বীপের মতন হয়ে গেছে, সেখানে নদীটি দ্বিধারা। এদিকে গভীর বন নেই, হাল্‌কা হাল্‌কা গাছ রয়েছে, পাইন ও উইলোজাতীয়। একটানা ফাঁকা নদীর ধার বেশিক্ষণ পাওয়া যায় না, দু'পাঁচ কিলোমিটার অন্তর অন্তর ছোট ছোট শহর। ইওরোপের এই সব ক্ষুদ্র শহরগুলি বড় নয়নাভিরাম, পরিষ্কার, ঝকঝকে, শান্ত অথচ আধুনিক সব সরঞ্জামই সুলভ।

বিকেল শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে আমরা লোয়ার নদীর ধার ছেড়ে অন্য একটা রাস্তা নিলাম। এদিকটায় গাছপালা বেশি, ছায়া ছায়া পথ। সেই পথ যেখানে শেষ হলো, সেখানে সামনের দৃশ্যটা দেখে মুখ দিয়ে একটিই শব্দ বেরিয়ে আসে, বাঃ!

লোয়ার নদীর দুই পারে অনেকগুলি শাতো রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বিখ্যাতটির নাম শামবর (chambord)। শাতো কথাটার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই, ইংরিজিতে অনেক সময় কাস্‌ল বলা হলেও শাতো আসলে প্রাসাদ ও দুর্গের মাঝামাঝি, মূলত রাজা-রাজড়াদের বিলাস-ভবন, কিছুটা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও থাকে। বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে একে শাতো (chateaux) বলাই ভালো।

অনেক সুন্দর জিনিসকেই একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ মেজাজে দেখলে আরও

সুন্দর দেখায়। সন্ধে হয়ে এসেছে, আলো এখন নরম। আকাশের একপ্রান্ত এখনো লাল। ঠিক এই রকম সময়েই শামবর আসা উচিত। একটা বাড়ি, যতই বিশাল হোক, মানুষের তৈরি বাড়িই তো বটে, তাও যে কত ছন্দময়, কত সুসমঞ্জস হতে পারে, পাথর-কাঠ-লোহার অস্তিত্ব মুছে গিয়ে সব মিলিয়ে একটা শিল্প সৃষ্টির মত মনে হয়, তা ঠিক সন্ধের আগে শামবর এলে বোঝা যায়।

বেশ কিছু বছর আগে ভাস্কর ও আমি এখানে এসেছিলাম অসীম ও ভূপেশ দাশের সঙ্গে। সেটা ছিল দুপুর বেলা, খুব গনগনে রোদ, প্রচুর লোকজনের ভিড়, তখন এই প্রাসাদটিকেই এমন কিছু আহামরি মনে হয়নি। ভাস্কর সেবার বলেছিল, আমাকে বেশি সিঁড়ি ভেঙে এই সব দুর্গ-ফুর্গ দেখতে বলবে না কেউ! গাদা গুচ্ছের হিস্ট্রিও শুনতে চাই না। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ার সময় প্রচুর হিস্ট্রি মুখস্থ করেছি, আর এই সব ফ্রেঞ্চদের হিস্ট্রি জানার কোনো দরকার নেই। আয়, সুনীল!

কাছেই ছিল একটা খুব প্রাচীন চেহারার ট্যাভার্ন। ভেতরটা অন্ধকার মতন, চেয়ার-টেবিলের বদলে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বেঞ্চ করা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের পিপেতে ওয়াইন। ভাস্কর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে, তারপর প্রচুর রেড ওয়াইন পান করা হয়েছিল।

এবারে ভাস্করেরও সেই ট্যাভার্নের কথা মনে পড়লো না, সে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বললো, সেই একই বাড়িটাকে এখন বড় সুন্দর লাগছে তো রে?

আমি কোনারকের মন্দির দেখেছি বেশ কয়েকবার। তার মধ্যে একবার গিয়েছিলাম গাড়িতে চেপে, পৌঁছেছিলাম এরকম সন্ধের সময়। তখন রেলওয়ে স্ট্রাইক চলছিল, তাই টুরিস্টের ভিড় ছিল না একেবারেই, সব মিলিয়ে পাঁচ-সাত জন মানুষ, কোনারকের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য এবং শিল্প-শৈলী সেবারই সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। রাত্রে থেকে গিয়েছিলাম পান্থনিবাসে, তাই সন্ধ্যায়, মাঝরাতে, ভোরবেলা বারবার দেখেছি।

এখানেও একটি হোটেল রয়েছে। শামবর-এর ভেতরে ঢুকে দেখার কোনো ব্যস্ততা নেই আমাদের, আমরা আগে গেলাম থাকার জায়গা ঠিক করতে। এই দায়িত্ব অসীম ও ভাস্করের। ওরা হোটেলের ভেতরে চলে গেল, আমি আর বাদল বিশুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস নিতে নিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কাছেই একটা ছোট্ট নদী, তার ওপারে জঙ্গল, এককালে রাজারা এই জঙ্গলে শিকার করতে আসতেন। এখনো প্রচুর হরিণ আছে, মাঝে মাঝে কিছু হরিণ হোটেলের কাছেও এসে পড়ে।

এক সময় ভাস্কর ফিরে এলো উত্তেজিতভাবে। আমাকে বললো, একটা চুরুট দে তো!

আমি বললাম, কী হলো? এত দেরি হচ্ছে কেন?

ভাস্কর বললো, ব্যাটারা পাত্তা দিচ্ছে না। বলছে ঘর খালি নেই। এমন চমৎকার জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবার কোনো মানে হয়? এখানেই দু'তিনদিন থেকে গেলে ভালো হয় না?

বাদল বললো, ভাস্করদা, ম্যানেজ করুন। জায়গাটা দারুণ!

আমারও তাই মত। যদিও এর চেয়েও ভালো জায়গা যে নেই তাই-ই বা কে বলতে পারে? অবশ্য রাত হয়ে গেছে, এখন আবার গাড়ি চালিয়ে হোটেল খুঁজতে যাওয়া এক বিড়ম্বনা।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসে যে চারজন যুবকের কথা আছে, ভাস্কর তাদের অন্যতম। এমনিতে ও ধূমপান করে না, কিন্তু ওর ব্যক্তিত্ব ফোটাবার জন্য হাতে একটা চুরুট দরকার

হয়। অরণ্যের দিনরাত্রির সময় আমাদের ফরেস্ট ডাকবাংলোতে কোনো রিজার্ভেশন ছিল না। চৌকিদারকে ম্যানেজ করে থাকা হয়েছিল, হঠাৎ সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ডি এফ ও। সেবারে একটা আধপোড়া চুরুট মুখে দিয়ে ভাস্কর সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডি এফ ও সাহেবকে কাবু করে দিয়েছিল।

এবারেও ভাস্কর কিছুক্ষণ পর গর্ব-মেশানো হাসি নিয়ে ফিরে এলো। একটা ব্যবস্থা হয়েছে। কী একটা কনফারেন্সের জন্য এই হোটেলের সব কটি ঘরই বুক্‌ড, সব অতিথিরা এখনো এসে পৌঁছোয়নি, কাল থেকে কনফারেন্স শুরু। সন্ধে হয়ে গেছে, আজ আর কেউ আসবে না, বাকি অতিথিরা আসবে কাল সকালে, এটা ধরে নিয়ে আমাদের দু'খানা ঘর দেওয়া হচ্ছে আজ রাত্তিরের মতন। তবে হঠাৎ কোনো অতিথি এর পরেও এসে গেলে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে, যদিও যে সম্ভাবনা খুবই কম।

অসীম অবশ্য বললো যে, সে-ই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ম্যানেজারকে রাজি করিয়েছে, ভাস্করের বেশি বেশি কথায় সব গুবলেট হয়ে যাচ্ছিল, এবং ভাস্কর যথারীতি এর প্রবল প্রতিবাদ করলো, আমি আর বাদল এই কৃতিত্বটা ওদের দু'জনকেই ভাগ করে দিলাম। খরচ বেশি না, হোটেলের ঘরগুলো খুবই আরামদায়ক এবং পরিবেশের তো তুলনাই হয় না। আমাদের ঘরের একদিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় জ্যোৎস্নাধৌত শামবর শাতো, অন্য একটা জানলা দিয়ে দেখা যায় কসোঁ নদী।

একটুখানি ইতিহাস না বললে শামবর-এর মাহাত্ম্য ঠিক বোঝা যাবে না। এই শাতো'র সঙ্গে জড়িত আছে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নাম!

ফরাসীরা স্থাপত্য বিদ্যায় বেশ কাঁচা ছিল। মধ্য যুগে বিশাল, সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণের খ্যাতি ছিল ইটালিয়ানদের। ফরাসীদেশের রাজা ও ভূম্যধিকারীরা ইটালিতে লড়াই করতে গিয়ে হেরেছে বটে, কিন্তু সেখানকার বিশাল মনোহর অট্টালিকাগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরেছে। তারপর নিজেদের জায়গায় তারা ইটালিয়ানদের অনুকরণে অট্টালিকা বানাতে চেয়েছে।

আগে এখানে ছিল একটা ছোটখাটো দুর্গ। রাজারা শিকার করতে এসে সেখানে দু'এক রাত কাটাতেন। রাজা ফ্রাঁসোয়া প্রমিয়ে, অর্থাৎ প্রথম ফ্রাঁসোয়া নিয়মিত শিকার করতেন এখানে। তিনিই পুরোনো দুর্গটা ভেঙে ফেলে এখানে একটা দর্শনীয় প্রাসাদ বানাবার পরিকল্পনা করলেন। আঁকা হলো নানারকম নক্সা। ইতালিয়ান শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তখন ফরাসী সরকারের অতিথি, থাকেন কিছুটা দূরে। নক্সাগুলো তাঁকে দেখিয়ে তাঁর মতামত নেওয়া হয়েছিল। লিওনার্দো তো শুধু শিল্পী বা ভাস্কর বা কবি নন, তিনি আবিষ্কারক, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, নদী বিশেষজ্ঞ এবং আরও অনেক কিছু। রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া এই প্রাসাদ নির্মাণের ব্যাপারে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে এর জন্য তিনি দু'হাতে অর্থ ব্যয় করেছেন তো বটেই, এমনকি রাজকোষ যখন শূন্য, তখন যে-কোনো উপায়ে টাকা সংগ্রহ করতেন, গীর্জাগুলোর অর্থ সম্পদের ওপর হানা দিতেন, প্রজাদের কাছ থেকে রুপো কেড়ে নিয়ে গলিয়ে ফেলতেন। একবার তাঁর দুই ছেলে বন্দী হয় স্পেনে, তাদের মুক্তিমূল্যস্বরূপ প্রচুর টাকা দিতে হয়, তবু তিনি এই প্রাসাদের খরচের ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি।

এই বিশেষ জায়গাটিই প্রথম ফ্রাঁসোয়ার পছন্দ, অথচ তাঁর শখ ছিল প্রাসাদটি হবে লোয়ার নদীর তীরে। তা কী করে সম্ভব? অসম্ভবই বা হবে কেন? নদীটাকে ঘুরিয়ে এনে এই প্রাসাদের পাশ দিয়ে বইয়ে দিলেই হয়। রাজা সেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন লিওনার্দো

দা ভিঞ্চিকে। লিওনার্দোর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়, এরকম নদীর প্রবাহ বদলাবার কাজ তিনি ইটালিতে করেছেন। কিন্তু অত বড় লোয়ার নদীকে এতখানি দূরে ঘুরিয়ে নেবার বিপুল ব্যয়ের ঝুঁকি নিতে রাজা আর সাহস পেলেন না। সেই স্বপ্নটি পরিত্যক্ত হলেও নদীর জেদ ছাড়লেন না রাজা। কাছাকাছি আর একটি ছোট্ট নদী, কসোঁ-কে টেনে আনা হলো এই পর্যন্ত।

রাত্তিরের দিকে আমরা শাতো-টি একবার দেখতে গেলাম। পুরো টুরিস্ট সিজনে এখানে সন-এ-লুমিয়ে দেখানো হয়, শীতের ভয়ে অক্টোবর থেকে তা বন্ধ। এখন মধ্য অক্টোবর, কিন্তু এবারে একটুও শীত নেই। এদেশের ঋতুগুলোর মতি-গতি বোঝা দায়। একবার অক্টোবর মাসে আমি তেমন গরম জামাকাপড় সঙ্গে না এনে ফ্রান্সে এসেছিলাম, শীতে হি হি করে কেঁপেছি। এবারে সঙ্গে রেইন কোট, ওভারকোট সব এনেছি, শীতের নামগন্ধ নেই, ভারি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া।

সুরকি বিছানো রাস্তা দিয়ে গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে আমরা শাতো-র ধার দিয়ে ঘুরলাম খানিকক্ষণ। অন্ধকার শাতোটির একটি মাত্র ঘরে আলো জ্বলছে।

ভাস্কর এক সময় জিজ্ঞেস করলো, এটা কি ভার্সাই প্রাসাদের চেয়ে বড় নাকি রে।

অসীম বললো, বোধহয় বড়। দেখতে বেশি সুন্দর তো বটেই। এখানে ঘরের সংখ্যা চারশো চল্লিশ।

ভাস্কর বললো, অত ঘর, তার জন্য কত বাথরুম বানাতে হয়েছিল বল তো!

অসীম এবার হা-হা করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, এত বড় বাড়িতে কটা বাথরুম থাকতে পারে, বলো তো ভাস্কর?

আমি বললাম, এটা ভাস্কর আন্দাজ করতে পারবে না।

অসীম বললো, একখানা! এখানকার কেয়ারটেকারের জন্য। ফরাসীরা আবার বাথরুম ব্যবহার করতে জানতো নাকি?

আমি ফরাসীদের স্নানের অভ্যেস বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। মধ্য যুগের ফরাসীদের অত সাজ-পোশাকের বাহার, অত সৌন্দর্য-চর্চার আড়ম্বর, অথচ তাদের শরীর যে কী পরিমাণ নোংরা থাকতো, তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। বহু মেয়ে সারাজীবনে একবারও স্নান করতো না, অর্থাৎ সর্বাঙ্গে জলস্পর্শ বিনাই সেই সব সুন্দরীরা স্বর্গে চলে যেত। অনেক পুরুষ জীবনে একবার অন্তত স্নান করতে বাধ্য হতো, কারণ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার সময় তাদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে জলে চুবিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করে দেখা হতো। অভিজাত ফরাসীরাও সকালবেলার ছোট বাথরুম-বড় বাথরুম সেরে নিত ঘরের মধ্যেই বড় গামলাতে, আর সাধারণ লোক মাঠে-ঘাটে যেত।

সারা বছরই তো শীত থাকে না, কখনো কখনো বেশ গরমও পড়ে এ দেশে। রীতিমতো ঘাম হয়। সারা বছরে একবারও স্নান না করলে সেই ঘামের গন্ধ তো শরীরেই থেকে যাওয়ার কথা। সেইজন্যই ফরাসীদেশে এতরকম পারফিউমের কদর। সুগন্ধ মেখে কি ঘামের গন্ধ চাপা দেওয়া যায়? আঁদ্রে জিদ এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'যৌন আবেদনে ঘামের গন্ধ'। ফরাসী মেয়েরা ঘামের গন্ধে উত্তেজিত হয়। কিছুকাল আগে পুরুষদের জন্য একটা পারফিউম বেরিয়েছিল, যেটা শুধু তীব্র ঘামের গন্ধ। এখন আর পুরুষদের শরীর ঘামাবার মতন সময় নেই, তাই পয়সা দিয়ে ঘামের গন্ধ কেনা!

বাদল বললো, ওরে বাবা, দিনের পর দিন এরা চান না করে থাকতো কী করে? আমার তো মনে হয়, একটা দিনও চান না করলে আমি বাড়ি থেকে বেরুতেই পারবো না।

ভাস্কর বললো, সেইজন্যই তো তুমি ফরাসী দেশে জন্মাওনি ! জন্মেছো মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে, বাড়ির পাশেই পুকুর, যখন ইচ্ছে ঝুপ ঝুপ করে ডুব দিয়ে আসতে পারতে !

বাদল বললো, এই সব ফরাসী সাহেব-মেমদের কথা যা শুনছি, তাতে মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস এ দেশে জন্মাইনি। আমাদের মেদিনীপুর অনেক ভালো।

ভাস্কর বললো, নিঃসন্দেহে ভালো। আমিও চান না করে একদম থাকতে পারি না। সুনীলটাকে দেখেছি, মাঝে মাঝে দু'একদিন চানটা কাট মারে।

আমি বললাম, তার সঙ্গে অবশ্য ফরাসী অভ্যেসের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বর্ষার দিনে স্নান বাদ দিয়ে বৃষ্টি ভিজি, কিংবা কোনো শীতের দিনে দুপুরবেলা জলস্পর্শ না করে রাত্তিরে বেশ গরম জলে স্নান করি। এতে বেশি আরাম। প্রত্যেক দিন এক ধরাবাঁধা সময়ে স্নান করে স্নানের ব্যাপারটাকে আমি নিছক একটা অভ্যেসে পরিণত করতে চাই না।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর মতন সুন্দরী জীবনে একবারও স্নান করেননি, এটা কি ভাবা যায় ? কিন্তু অসীম, অনেক শিল্পী যে স্নানার্থিনী মহিলা এঁকেছেন ? যুবতী মেয়েরা নগ্ন হয়ে নদী কিংবা ঝরনায় স্নান করছে, যেমন রেনোয়া'র ছবি আছে, কিংবা অ্যাঁগ্রে'র সেই বিখ্যাত ছবি, মাথায় তোয়ালে জড়ানো, পেছন ফিরে বসা নারীটি ...

অসীম বললো, ওগুলো অনেকটা নতুনত্ব, তাই ছবিতে এসেছে। তাছাড়া তুমি যাদের কথা বললে, তাঁরা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শিল্পী, তখন একটু একটু করে স্নানের ব্যাপারটা চালু হয়েছিল নিশ্চয়ই। এখন সবাই চান করে। রোজ না হলেও মাঝে মাঝে। আগে অনেক বাড়িতে শুধু টয়লেট থাকতো, এখন স্নানের জায়গাও তৈরি হয়। পাড়ায় পাড়ায় কত সুইমিং পুল।

আড্ডা মারতে মারতে আমরা ছোট্ট নদীটার ধারে গিয়ে বসলাম। দূরে কোথাও ডেকে উঠলো একটা রাত-চরা পাখি। শামবর-এর কাছাকাছি কোনো জনবসতি নেই, বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে পরিবেশের বিশেষ বদল হয়নি, তাই অতীত এখানে পটভূমিকা হিসেবে রয়ে গেছে। এখানে রাজা-রানীরা ঘুরে বেড়াতো, এখানে যুদ্ধ হয়েছে, রাজতন্ত্রের বিদ্রোহীরা এসে লুটপাট করে গেছে, অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষও থেকে গেছেন এখানে। এই নিস্তব্ধ রাতে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলে তা অনুভব করা যায়। পিঠের দিকে কয়েকটা শতাব্দীর সেই উপস্থিতির অনুভবটাই তো মূল্যবান।

৩৩

সব সময় তোমাকে অবশ্যই মাতাল হতে হবে। সবকিছুই তো রয়েছে : এটাই একমাত্র প্রশ্ন। সময়ের বীভৎস বোঝা যাতে অনুভব করতে না হয়, যা তোমার কাঁধ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, নুইয়ে দিচ্ছে মাটির দিকে, তোমাকে মাতাল হতেই হবে, একটুও থামলে চলবে না।

কিসে মাতাল হবে, সুরা, কবিতা অথবা উৎকর্ষ, যেটা তোমার পছন্দ। কিন্তু মাতাল হও।

এবং যদি কোনো সময়ে, কোনো প্রাসাদের সিঁড়িতে, কোনো খানা-খন্দের সবুজ ঘাসের মধ্যে, অথবা তোমার নিজেরই ঘরের নিরানন্দ নির্জনতায় তুমি জেগে ওঠো, তোমার নেশা যখন কমতে শুরু করেছে অথবা কেটেই গেছে, জিজ্ঞেস করো বাতাসকে, ঢেউ, নক্ষত্র, পাখি, ঘড়ি এমন সব কিছুকে, যারা ওড়ে, গুঞ্জন করে, গড়ায়, গান গায়, কথা বলে, তাদের জিজ্ঞেস করো, এখন কিসের সময়, তখন সেই বাতাস, ঢেউ, নক্ষত্র, পাখি, ঘড়ি তোমাকে উত্তর দেবে : 'এখন মাতাল হবার সময় ! সময়ের নিপীড়িত ক্রীতদাস হবার বদলে মাতাল হও, একটুও না থেমে ! সুরা, কবিতা অথবা উৎকর্ষ, যেটা তোমার পছন্দ।'

—শার্ল বোদলেয়ার

এবারের যাত্রায় আমরা বাদলের ওপর একটা ব্যাপারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। সকালের চা। বাদলের বুদ্ধিতে আমাদের সকালটা বেশ অলস বিলাসিতায় কাটে। এর আগের হোটেলগুলিতে চায়ের জন্য বেশ কষ্ট পেয়েছি। এই সব হোটেলে রুম সার্ভিস থাকে না। আমাদের বাঙালী অভ্যেসে দাঁত মাজার আগে চা চাই।

বাদল প্রত্যেক বছর ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলায় আসে। থাকে কোনো প্রাইভেট গেস্ট হাউজে। একা থাকতে হয় বলে ঘরে বসে নিজের চা বানিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে নেয়। সব জায়গাতেই সস্তায় ইমারসান হিটার পাওয়া যায়, প্লাগ পয়েন্টে লাগিয়ে যেটা জলে ডুবিয়ে রাখলে তিন চার মিনিটে জল গরম হয়ে যায়। এক রকম বিশেষ কাচের গেলাসও পাওয়া যায়, ফুটন্ত জলেও যেটা ফাটে না। এ সব দেশের বাথরুমে কল খুললেই গরম জল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা কখনো তেমন গরম হয় না, যাতে চা বানানো যায়। সুতরাং এই ব্যবস্থাই

উত্তম। ঠিক মতন গরম জল পেলে, চা-চিনি-কন্ডেন্সড্ মিল্ক তো কিনে রাখাই যায়। এবং নানা রকম বিস্কুট, মাখন, জ্যাম-জেলি।

যেহেতু হোটেলের ঘরের মধ্যেই নিজস্ব চা বানাবার পরিকল্পনা এবং জিনিসপত্রগুলো বাদলের, তাই পুরো দায়িত্বটাই বাদলের। আমরা শুয়ে শুয়ে আলস্য করি, বাদল গেলাসের পর গেলাস চা বানিয়ে যায়। এ যাত্রায় কুমকুম বা স্বাতী নেই। কুমকুম উপস্থিত থাকলে তার স্বামীর এই অদ্ভুত করিৎকর্মা রূপটি দেখলে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হয়ে যেত। অধিকাংশ বাঙালী পরিবারের কত্তারা বাড়িতে এক গেলাস জলও গড়িয়ে খায় না। অসীম বহুদিন এ দেশে আছে, তাই তার মধ্যে সাহেবী গুণ অনেকটা বর্তেছে, সবাই কাজ ভাগাভাগি করে করছে না দেখে সে আমাদের ধমকায় এবং বাদলকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ভাস্করও বিলেতে সিকি শতাব্দী কাটিয়ে দিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত সেবাপরায়ণা স্ত্রী তার স্বভাবটি বাঙালি করেই রেখেছে। অসীমের ধমক খেয়ে ভাস্কর বিস্কুটে মাখন-জ্যাম মাখাবার কাজটা নেয়। আমার জন্য আর কোনোই কাজ বাকি রইলো না, সুতরাং গেলাসের পর গেলাস চা পান করাটাই আমার একমাত্র কাজ। আমাদের কাপ নেই, সুতরাং হোটেলের গেলাসেই চা তৈরি হয়। একেবারে শেষে, চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমি গেলাসগুলি ধুয়ে দি।

স্নান-টান করে ফিটফাট হয়ে আমরা বেরোলাম শামবর দুর্গ-প্রাসাদ দেখতে। ভেতরে ঢুকতে টিকিট কাটতে হয় এবং টিকিটের দাম বেশ গায়ে লাগবার মতন। ধরা যাক, মাথা পিছু তিরিশ টাকা। আমাদের দেশের তুলনায় খুবই বেশি। কিন্তু টিকিটের দাম এত বেশি রাখার একটা যুক্তি আছে। সেই টাকায় রক্ষণাবেক্ষণ হয়। এত বড় একটা অট্টালিকার ভেতরটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে। কোথাও একবিন্দু ময়লা নেই, কোনো দেয়ালে দাগ নেই, কোনো জিনিসই ছেঁড়া-ফাটা নয়। আমাদের দেশেও অনেক ভালো ভালো সৌধ বা সেতু তৈরি হয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলোর যাচ্ছেতাই চেহারা হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণেশ্বরের কাছে বালি ব্রীজের কথা মনে পড়ছে। এক কালে এই সেতুটি ছিল অতি সুদর্শন, দূর দূর থেকে লোকে ওখানে বেড়াতে যেত, তখন ব্রীজের দু' ধারে টোল নেওয়া হতো। এখন টোল বন্ধ হয়ে গেছে, ব্রীজটার দু' পাশের হাঁটাপথের অতি জরাজীর্ণ অবস্থা, বড় বড় গর্ত, যখন তখন মানুষের পা ভাঙতে পারে! টোল বন্ধ করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল! হাওড়া ব্রীজের গর্ত দিয়ে একটা লোক গঙ্গায় পড়ে মরেই গেল। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে বিজন সেতুটি তৈরি হলো এই সেদিন। এখন দেখলে মনে হয় মহেঞ্জোদারোর আমলের। মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ি হাজার দুয়ারির বয়েস মাত্র শ দেড়েক, কিন্তু এরই মধ্যে কী দৈন্য দশা। দর্শকদের কাছ থেকে বেশি করে দর্শনী নিয়ে কেন সেটাকে অবিকৃত রাখা যাবে না?

শামবর প্রাসাদপুরীর ভেতরের সবটা বর্ণনা দেবার দরকার নেই। মোট চারশোটা ঘরের বর্ণনা লিখতে গেলে আমার তো বটেই, পাঠকদেরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। অতগুলো ঘর সব আমরা দেখিওনি। রক্ষীদের ঘর, অস্ত্রশস্ত্রের ঘর, সভাকক্ষ, পাঠাগার, জলখাবারের ঘর, দুপুরের খাবারের ঘর, বিকেলের হালকা খাবারের ঘর, রাত্তিরের ভোজশালা, এ ছাড়া অমুক রাজা আর অমুক রানীর শয়ন কক্ষ, নানা ভাবে সাজানো হলেও শেষ পর্যন্ত একঘেয়ে লাগে। এত বড় বাড়িতে রাজা-রানীদের খুব হাঁটতে হতো বটে!

একটা ঘরের নাম দেখা গেল, ভারত কক্ষ! কেন যে ভারতের নাম সে ঘরের সঙ্গে যুক্ত তা বোঝা গেল না। তবে দেয়ালের কারুকার্যের সঙ্গে ভারতীয় কল্কার কাজের মিল আছে খানিকটা। ভারত সম্পর্কে ফরাসী দেশে নানা রকম ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। যে কালো

কালিকে আমরা বলি চাইনিজ ইঙ্ক, তাকে ওরা বলে ভারতীয় কালি। এক ধরনের লণ্ঠনকে ওরা বলে 'বাংলা-আলো', সে রকম লণ্ঠন বাংলাদেশে কোথাও নেই। মালার্মের কবিতায় 'বেঙ্গালি' নামে যে পাখির উল্লেখ আছে, সে পাখিটা কী পাখি কে জানে! ভারতের সমস্ত অধিবাসীদের তারা আজও বলে হিন্দু, তারা কি মুসলমানদের অস্তিত্ব জানে না?

এই অট্টালিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য এর এক জোড়া সিঁড়ি। এত বড় বাড়িতে মোট সতেরোটা সিঁড়ি আছে, তার মধ্যে দু' খানা সিঁড়ি অতি অভিনব। মুখোমুখি এই সিঁড়ি। কিন্তু এমনই অপূর্ব কৌশলে তৈরি যে, একটা দিয়ে উঠতে শুরু করলে বোঝাই যায় না যে পাশ দিয়ে আর একটা সিঁড়ি উঠেছে, এবং অন্য সিঁড়ির লোকদেরও দেখা যাবে না। কোনো এক সময় এই প্রাসাদের মালিক হয়েছিল অরলিয়েন্সের সামন্ত গাসতোঁ। লোকটা সুবিধের ছিল না, অনেক ষড়যন্ত্র-টন্ত্র করেছে জীবনে, কিন্তু পিতা হিসেবে সে ছিল খুব স্নেহপ্রবণ। সেই গাসতোঁ এই যুগ্ম সিঁড়িতে তার ছোট মেয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতো।

সেই ছোট মেয়েটির পরে নাম হয়েছিল 'লা গ্রাঁদ মাদমোয়াজেল'। এই প্রাসাদের সঙ্গে তার প্রণয় কাহিনীও জড়িত। লোজুন-এর ডিউক যখন এখানে বেড়াতে আসে, তাকে দেখে সেই যুবতী মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাকে সে নিজের মনের কথা জানাতে পারেনি। এক দিন সে সেই রূপবান তরুণ ডিউককে এই সিঁড়ি দিয়ে ঘোরাত ঘোরাতে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে একটা বড় আয়নার ওপর নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে যে বাষ্পছায়া হয়, তার ওপর আঙুল দিয়ে সে ডিউকের নাম লিখে দেয়।

এই প্রাসাদটি ছিল রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া'র স্বপ্ন। ফরাসী দেশে তাঁর অনেক কীর্তি এখনো জাজ্বল্যমান হয়ে আছে। কিন্তু কিছু একটা গভীর দুঃখ ছিল তাঁর মনে। এই বিশাল ব্যয়বহুল হর্ম্যটির অনেকখানিই নির্মিত হয়েছিল তাঁর সময়ে, তবু তিনি থাকতেন একটি সাধারণ ঘরে। সেই ঘরের একটা জানলার কাচে তিনি এক দিন আপনমনে লিখেছিলেন, 'নারী যখন তখন বদলায়। যে ব্যক্তি কোনো নারীকে বিশ্বাস করে, সে নির্বোধ!'

হাত বদল হতে হতে এই অট্টালিকাটি এক সময় রাজা চতুর্দশ লুই-এর অধিকারে আসে। প্যারিস ছেড়ে রাজা চতুর্দশ লুই প্রায়ই এই শামবর-এ থাকতে আসতেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীত ও নাট্যপ্রেমী। এখানে তিনি নাট্য দল ডাকতেন। একবার এসেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার মলিয়ের তাঁর দল নিয়ে।

মলিয়ের-এর নাম শুনলেই অধিকাংশ পাঠকের মনে পড়ে একটিই ছবি, এই সেই নাট্যকার ও অভিনেতা, যিনি নিজের লেখা নাটকে একটি অসুস্থ ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে হঠাৎ সত্যিকারের অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং সে রাত্রেই মারা যান। কিন্তু এটাই মলিয়ের-এর প্রতিভা সম্পর্কে শেষ কথা নয়। বরং বলা যায়, এটা একটা অতিরঞ্জিত গুজব। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মলিয়ের-এর স্বাস্থ্য আগেই ভেঙে পড়েছিল, তবু তিনি মঞ্চে নেমেছিলেন। হঠাৎ মঞ্চের মধ্যে পড়ে যেতে দেখে দর্শকরা মনে করে তিনি বুঝি অভিনয়ের ঘোরের মধ্যে মঞ্চের মায়াকে বাস্তব করে ফেলেছেন। বস্তুত মলিয়ের-এর প্রতিভা ছিল এর চেয়ে অনেক বড়। তিনি আধুনিক ট্র্যাজি-কমেডির জনক। চার্লি চ্যাপলিনের পূর্বপুরুষ।

সঠিক অর্থে মলিয়ের নাট্যকার ছিলেন না। অর্থাৎ সাহিত্যের একটি অঙ্গ যে নাটক, সে রকম নাটক রচনার দিকে তাঁর কখনো মন ছিল না। তিনি ছিলেন এক থিয়েটার কম্পানির ম্যানেজার। নিজের দলের প্রয়োজনে তিনি অন্যদের নাটক যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি নিজেও তাড়াহুড়ো করে অনেক প্রহসন, ব্যঙ্গ-নাটক রচনা করেছেন। আমাদের দেশে

গিরিশ ঘোষ যেমন নাটক লিখেছেন। চার্লি চ্যাপলিন যেমন নিজের ফিল্মের গল্পগুলি তৈরি করেছেন। জীবদ্দশায় মলিয়ের তার কিছু কিছু নাটক যে ছাপিয়েছিলেন, তাও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নয়। তাঁর নাটক অন্য দল বিনা অনুমতিতে অভিনয় করতো, তাঁকে স্বীকৃতিও দিত না। তাই মলিয়ের নাটক ছাপিয়ে নিজের নামটা দেগে দিতেন।

এক সার্থক আসবাবপত্র ব্যবসায়ীর ছেলে মলিয়ের অল্প বয়েস থেকেই ঝুঁকেছিলেন মঞ্চে অভিনয়ের দিকে। বাবার ব্যবসায়ে গেলেন না, লেখা-পড়া শেষ করার পর বাড়ি ছেড়ে চলে এসে যোগ দিলেন এক থিয়েটারের দলে। মাদলেইন বেজার নামে এক অভিনেত্রীর সহযোগিতায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চালাতে লাগলেন নিয়মিত নাটকের অভিনয়। কিন্তু প্যারিস শহরে তখন আরও দুটি থিয়েটার বেশ চালু (১৬৪৪ সাল, কলকাতা শহরের তখনও জন্ম হয়নি), মলিয়ের প্রতিযোগিতায় টিকতে পারলেন না, ঋণের জালে জড়িয়ে পড়লেন, সে জন্য তাঁকে জেল খাটতেও হলো।

জেল থেকে বেরিয়ে আবার নাটুকে দল গড়লেন মলিয়ের, এবার গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিনয় করতে লাগলেন, তাতে খরচ উঠে যেত, অনেকটা আমাদের যাত্রা দলের মতন। মোট ১৩ বছর এই ভাবে মফস্বলে কাটিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন মলিয়ের, তিনি এখন একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা এবং দক্ষ ম্যানেজার। আবার ফিরে এলেন প্যারিসে। বুদ্ধিজীবী ও উচ্চবিত্ত মহলে মলিয়ের প্রথম পরিচিত হলেন রাজার নেকনজরে আসার পর। লুভ্‌র প্রাসাদের রক্ষীদের হলঘরটিতে একটা অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে মলিয়ের রাজা ও সভাসদদের সমক্ষে দুটি নাটক দেখালেন। দ্বিতীয়টি তাঁর নিজের রচনা, সেটির নাম 'প্রেমিক ডাক্তার'। এই নাটিকাটি গ্রাম্য দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, শহুরে সমাজও বেশ পছন্দ করলো।

এর পর থেকে বড় বড় জমিদারদের বাড়িতে মলিয়ের ডাক পেতে লাগলেন। প্যারিসে হল ভাড়া নিয়ে নিয়মিত নাটকও চললো। নিছক রঙ্গ কৌতুকের নাটক লিখতে লিখতে মলিয়ের হঠাৎ একটি নাটকে রক্ষণশীলদের বেশ একটা ধাক্কা দিয়ে বসলেন। এই নাটকের নাম 'লে' কল দে ফাম্' (বউদের ইস্কুল), সমাজের শিরোমণিরা এই নাটক দেখে গেল গেল রব তুলে দিল্। অনেকে স্বীকার করলো, এই নাট্যকার একটি 'কমিক জিনিয়াস' বটে, কিন্তু কোনো সামাজিক প্রথাকেই এই লোকটা শ্রদ্ধেয় বলে মনে করে না।

মলিয়ের দমলেন না, নতুন নতুন নাটকে দর্শকদের কাঁপাতে লাগলেন। চোদ্দ বছরে মলিয়ের পঁচানব্বইটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন, তার মধ্যে একত্রিশটা তাঁর নিজের রচনা। একটা সিজনেই তিনি নাটক লিখেছিলেন ছ'খানা।

তাড়াহুড়ো করে, দর্শকদের মেজাজ-মর্জি বুঝে নাটক লিখতেন মলিয়ের, সে জন্য অনেকগুলি ঠিক জমেনি, মঞ্চসফল হয়নি। কোনোটা একবার মঞ্চস্থ করার পর দর্শকরা ঠিক নিচ্ছে না দেখে আবার খোল নলচে বদলে ফেলতেন। তিনি তো শুধু নাট্যকার ও অভিনেতা নন, তিনি দলের ম্যানেজার, খরচ চালাবার চিন্তা তাঁকে করতে হতো সব সময়। তবু এরই মধ্যে মলিয়ের-এর কয়েকটি নাটক কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে। মলিয়ের ঠিক বাস্তবকে অনুকরণ করতেন না, শুধু সমসাময়িক জীবনকে ফুটিয়ে তুলতেন না, নিছক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও তাঁর উপজীব্য ছিল না, এই সব কিছুকে মেলাবার পরেও তিনি পরাবাস্তবতার দিকে চলে যেতেন। মঞ্চে মৃত্যু দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে তাঁর সত্যিকারের মৃত্যু যেন একটা রূপক।

মলিয়ের-এর সবচেয়ে বিখ্যাত নাটকের নাম 'তারতুফ্'। এই নাটকের জন্যও তাঁকে

অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। মলিয়ের সমালোচকদের উত্তর দিতেন নাটক লিখে। 'বউদের ইস্কুল' নাটকটি নিয়ে যখন আপত্তির ঝড় ওঠে, তখন তিনি মঞ্চে নামিয়েছিলেন 'বউদের ইস্কুল সম্পর্কে সমালোচনা'। এই নাটকে তিনি একাই অভিনেতা, একা তিনি তাঁর সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তর্জনী দেখিয়েছেন।

এই সমালোচকদের প্রসঙ্গেই মলিয়ের সম্পর্কে এতখানি ভূমিকা করতে হলো।

শামবর প্রাসাদে রাজা চতুর্দশ লুই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মলিয়ের-এর দলকে। নতুন নাটক দেখাতে হবে। এখানে এসে কয়েকদিনের মধ্যে মলিয়ের একটা নাটক লিখে ফেললেন। দ্রুত রিহার্সাল দিয়ে সেটা মঞ্চস্থ করা হলো। রাজা, রানী ও পারিষদরা সবাই উপস্থিত। নাটকের প্রথম দু' অঙ্ক হয়ে গেল, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে হাসির হিল্লোল উঠছে না। রাজা হাসছেন না, তাই অন্য কেউও হাসবে না। মহা মুশকিল। মলিয়ের-এর দলের সঙ্গীত পরিচালকের নাম লালী। সে হঠাৎ একটা কাণ্ড করলো। নাটক চলছে, এর মধ্যে সে এক লাফ দিয়ে পড়লো গান-বাজনার যন্ত্রগুলোর ওপরে, সবগুলো ঝন ঝনাৎ করে উঠলো এক সঙ্গে। তার-ফার সব ছিঁড়ে লালী চিৎপটাং। রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর থেকেই জমে গেল নাটক।

কয়েকদিন সেই নাটকটি চলার পর রাজা হুকুম দিলেন আর একটা নতুন নাটক লিখতে। এটার নাম 'বুর্জোয়া ভদ্রলোক'। এক দল সুযোগসন্ধানী লোক নানা রকম কায়দা-কানুন ও তোষামোদ করে সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে কীভাবে ওপর মহলে ওঠে, তাই নিয়ে কাহিনী। এ কাহিনী চিরকালীন, আজকের দিনেও সত্য। কিন্তু প্রথম দিন অভিনয়ে বিরাট ব্যর্থতা। রাজা চতুর্দশ লুই আগাগোড়া ঠোঁটে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন, তাঁর মুখে কোনো ভাব-বৈকল্য দেখা গেল না, সুতরাং অন্য কেউও হাসলো না। হাসির নাটকে শ্মশানের স্তব্ধতা। চতুর্দশ লুইয়ের মেজাজ-মর্জির এমনিতেই ঠিক-ঠিকানা ছিল না। তিনি কখন হাসবেন, কখন মুখখানা গোমরা করে থাকবেন, তা কেউ জানে না। মলিয়ের অন্যত্র বলেছিলেন, ফ্রান্সের বড়লোকদের মুখে কৌতুকের হাসি ফোটানো অতি শক্ত কাজ।

নাটকের শেষে উপস্থিত সমালোচকরা ছি ছি করতে লাগলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, মলিয়ের-এর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, নাটক দানা বাঁধছে না, সংলাপে ধার নেই, অভিনয়ও বাজে।

মলিয়ের তবু আর একদিন অভিনয়ের অনুমতি চাইলেন।

দ্বিতীয় দিনে প্রায় শুরু থেকেই রাজা বেশ ফুরফুরে মেজাজে, মাঝে মাঝে হেসে উঠছেন, বাঃ বাঃ করছেন। আর বাকি দর্শকরাও হাসিতে ফেটে পড়ছে, মুহুর্মুহু হাততালি দিচ্ছে। যবনিকা পতনের পর আগের দিনের সমালোচকরাই মলিয়েরকে ঘিরে ধরে উচ্ছ্বসিত ভাবে বললো, অহো, কী অপূর্ব নাটক! কী চমৎকার সংলাপ! কী দুর্দান্ত অভিনয়!

এখনকার দিনেও সমালোচনার এই ধারা বিশেষ পাল্টেছে কি? এখন আর রাজতন্ত্র নেই, তবু অধিকাংশ সমালোচকের সামনেই একজন অনুপস্থিত রাজা বসে আছে, এমন মনে হয় না?

যে-হলঘরটিতে মলিয়ের তাঁর নাটক দুটির অভিনয় করেছিলেন, সেখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম। যে-সময়ে মলিয়ের এখানে চতুর্দশ লুইয়ের সামনে অভিনয় করেছিলেন সেই সময়ে আমাদের দিল্লিতেও লালকেল্লা গমগম করছে, শাজাহান-ঔরঙ্গজেবের আমল, মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের চূড়ায়। কিন্তু দিল্লির বাদশাহদের নাট্যপ্রীতির কোনো খবর পাওয়া যায় না। দিল্লিতে পেশাদারি নাটকের নিয়মিত অভিনয়ও

হতো না, মলিয়ের-এর মতো নাট্যকারও জন্মায়নি।

একটু তাড়াহুড়ো করেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হলো, কারণ হোটেলের ঘর ছাড়তে হবে। এমন সুন্দর পরিবেশের হোটেলটি ছাড়তে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু উপায় নেই। লোয়ার উপত্যকায় প্রায় বারো মাসই দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে থাকে। সুতরাং এর পরে কোনো ভালো হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে কি না তার ঠিক নেই। আমরা তো দামী হোটেলে থাকতে পারবো না, আমাদের সস্তাও চাই, পরিবেশটাও মনোরম হওয়া দরকার।

এই হোটেলের রিসেপশানিস্ট মহিলাটি আমাদের প্রতি সদয় হয়ে দূর-দূরান্তের অনেকগুলি হোটেলে ফোন করে খবর নিল, অনেক জায়গাতেই ঘর খালি নেই। শেভার্নি নামের একটা জায়গায় একটি মাঝারি হোটেলে দুটি ঘর পাওয়া যেতে পারে। চলো শেভার্নি!

অনেক ঘুরে ঘুরে, দু' একবার রাস্তা হারিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত শেভার্নির সেই হোটেলে পৌঁছে বেশ নিরাশ হলাম। কাছাকাছি নদী নেই, জঙ্গল নেই, শহরের ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যে একটা পুরোনো আমলের হোটেল। ঘর ভাড়া বেশ বেশি, অথচ ঘরগুলো স্যাঁতসেঁতে, দিনের বেলাতেও রোদ আসে না। যে ঘরে দিনের বেলা আলো জ্বালতে হয়, সে ঘর আমার কিছুতেই পছন্দ হয় না! কিন্তু উপায় নেই, রাতটা তো কাটাতে হবে।

বিকেলের চা বানাতে গিয়ে দেখা গেল ইমারশান হিটারের প্লাগটা প্লাগ-পয়েন্টে ঢুকছে না। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার। প্লাগ পয়েন্টগুলো পৃথিবীর সব দেশে একই মাপের হয়, শুধু এখানে আলাদা! শেষ পর্যন্ত অসীম তার-টার বার করে কিছু একটা কায়দায় বাদলের ডিপার্টমেন্ট চালু করে দিল।

এই হোটেল থেকেই হাঁটা পথের দূরত্বে একটা শাতো রয়েছে। পুরো জায়গাটা উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চা খাবার পর অসীম বললো, চলো বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে শাতোটা দেখে আসি!

আমি সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম, না, ওটা দেখবো না!

অসীম হাসতে হাসতে বললো, কী ব্যাপার, তোমার এই জায়গাটা এমনই অপছন্দ হয়েছে যে এখানকার কোনো কিছুই দেখবে না?

আমি বললাম, শুধু সেজন্য নয়। আজ শামবর-এর মতন এমন অসাধারণ শাতো দেখে এসেছি, আজ আর কিছু দেখবো না। এক দিনে দুটো সহ্য হবে না। কোনো ভালো জিনিস যেমন এক সঙ্গে বেশি খেতে নেই, তেমনি ভালো ভালো জিনিসও খুব বেশিক্ষণ দেখা ঠিক নয়। কোনো কবিতার বই আমি প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত এক টানা পড়ি না, কয়েকটা কবিতা পড়ে রেখে দিই, তাতে মর্মে ঠিক মতন ঢোকে। এক সঙ্গে দু'জন কবির দু'খানা আলাদা বই পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। লুভ্‌র মিউজিয়ামে গিয়ে এক দিনে সব কিছু দেখার চেষ্টা করলে আসলে কিছুই দেখা হয় না। আমি শুধু একটা অংশ দেখে বেরিয়ে আসি।

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সমর্থন করে বললো, না, না, আজ আর কোথাও যাওয়া হবে না। রাজা-ফাজাদের বাড়ি তো সব প্রায় এক রকমই হবে। আজ আসল ভালোটা দেখে এসেছি, তাতেই পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে!

অসীম বাদলের দিকে তাকাতেই বাদল বললো, আমাকে যদি এখন যেতে বলেন, রাজি আছি। আর যদি না যাওয়া হয়, তাতেও আপত্তি নেই। মোজা-টোজা খুলে ফেলেছি, বেরুতে গেলে আবার পরতে হবে।

অর্থাৎ অসীম আধখানা ভোটে হেরে গেল। বিদ্রূপের সুরে বললো, যত সব ফুঁড়ের দল!

লোয়ার নদী এবং তার শাখাপ্রশাখার তীরে তীরে কত যে সুরম্য হর্ম্য রয়েছে তার ঠিক নেই। পৃথিবীর আর কোনো নদীর অববাহিকায় এমনটি নেই। উল্লেখযোগ্য শাতোঁর সংখ্যাই ষাট-বাষট্টিটা। এ ছাড়া ছোট ছোট আরও অনেক। আমরা বেছে বেছে সাত-আটটির বেশি দেখবো না ঠিক করে ফেলেছি। যেহেতু এখানেও প্রচুর টুরিস্ট আসে, তাই কেউ কেউ এখানে শাতো নিয়ে ব্যবসাও শুরু করেছে। পুরোনো আমলের একটা জমিদার বাড়ি কিনে সারিয়ে-টারিয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে দর্শনীয় করে তোলে। বাড়ির একটা অংশে নিজেরা থাকে, অন্য অংশটায় টিকিট কেটে দর্শকরা আসে। সঙ্গে রেস্তোরাঁ ও স্যুভেনিরের দোকান। মন্দ লাভ হয় না।

মাঝারি আকারের শাতোঁর সঙ্গে তুলনা দেবার মতন একটা বাড়ি আমি কলকাতার কাছেই দেখেছি। বারাসত থেকে বসিরহাটের দিকে যেতে যেতে দেগঙ্গা, স্বরূপনগর ছাড়াবার পর রাস্তার বাঁ দিকে একটা প্রাসাদ দেখে চমকে উঠেছিলাম। ঠিক যেন একটা ফরাসী শাতো সেখানে বসানো। সেটা কোন্ জমিদারের বাড়ি ছিল আমি জানি না, নিশ্চিত কোনো বিদেশী নক্সায় তৈরি। সামনে দুই গম্বুজওয়ালা সিংহদ্বার, ভেতরে উদ্যান ও দীঘি, তারপর একটি সুসমঞ্জস অট্টালিকা। শুনেছি, সেখানে এখন একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনাথ আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য এমন একটা সুন্দর বাড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল কি? এই প্রাসাদটিকে মেরামত ও পরিষ্কার করে, কিছু ছবি ও মূর্তি দিয়ে সাজালে পর্যটকদের একটা আকর্ষণীয় কেন্দ্র হতে পারতো। আমাদের পর্যটন দফতরের এই সব দিকে নজর পড়ে না কেন?

কুচবিহারের রাজবাড়িটা তো আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে গেল। অল্প বয়েসে কুচবিহারে বেড়াতে গিয়ে দূর থেকে রূপকথার রাজবাড়ির মতন ঐ অট্টালিকাটিকে দেখে মুগ্ধ হতাম। এখন সেখানকার ঝাড়লণ্ঠন, ছবি, চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত লুঠপাট হয়ে গেছে, জানলা-দরজাগুলোও খুলে নিয়ে গেছে চোরেরা। সেটা এখন ভুতুড়ে বাড়ির মতন দেখায়। পাশের চত্বরটিতে বাস ডিপো।

আমাদের পশ্চিম বাংলায় ঐতিহাসিক দুর্গ কিংবা প্রাসাদ বা স্মৃতিস্তম্ভ প্রায় বিশেষ কিছুই নেই। অনতি অতীতের চিহ্নগুলিও যদি আমরা নষ্ট হতে দিই, তা হলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কী রেখে যাবো?

৩৪

একদিন এই পৃথিবী আর কিছুই থাকবে না
শুধু এক অন্ধ অবস্থান, যেখানে শুধু
বিভ্রান্ত দিন আর রাত্রি ঘোরে
বিশাল আকাশের নীচে যেখানে ছিল অ্যান্ডিজ পর্বতমালা
সেখানে একটি পাহাড়ও নেই, এমনকি একটা গিরিখাতও না

পৃথিবীর সমস্ত প্রাসাদ ও বাড়িগুলির মধ্যে
শুধু টিকে থাকবে একটি মাত্র বারান্দা
এবং এই বিশ্বের মানবজাতির মানচিত্রে
শুধু একটি বিষাদ, যার মাথায় আচ্ছাদন নেই।
ভূতপূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরের চিহ্ন থাকবে
বাতাসের সামান্য লবণাক্ত স্বাদে
একটা মায়াময় উড়ন্ত মাছ জানবে না
সমুদ্র কেমন দেখতে ছিল।

১৯০৫ সালের এক কুপে'তে বসে
(চারটে চাকা আছে, কিন্তু রাস্তা নেই)
অতীত কালের তিনটি যুবতী কন্যা,
তখনো রয়ে গেছে, কিন্তু শরীর নেই, শুধু বাষ্প,
জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকবে বাইরে
আর ভাববে, প্যারিস বেশি দূর নয়
তারা প্রশ্বাসে নেবে বাতাসের দুর্গন্ধ
যাতে গলা বন্ধ হয়ে আসে।

একদা যেখানে অরণ্য ছিল, সেখানে ভেসে উঠবে
একটা পাখির গান, কেউ তাকে
দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না, শুনতেও পাবে না
শুধু ঈশ্বর শুনবেন মন দিয়ে, এবং বলবেন ;
আরে, এ যে একটা বউ কথা কও।

—জুল সুপরভই

আজকাল বায়ুদূষণ, প্রকৃতির সর্বনাশ ও পৃথিবীর সম্ভাব্য ধ্বংসের কথা নিয়ে খুব আলোচনা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে দিকে দিকে আলোচনা চলছে, আমেরিকা থেকে জাপানে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পশ্চিম বাংলায়। এই বিষয়েই একজন কবি বেদনাময়

গাথা রচনা করে গেছেন কতকাল আগে, যখন এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের কোনো চেতনাই জাগেনি।

জুল সুপরভই-এর জন্ম সুদূর উরুগুয়ে'তে মন্টভিডিও শহরে। ঝুল বারান্দার ঝুল আর জুল-জুল করে তাকানোর জুল মিশিয়ে যা হয়, সেই রকম তাঁর নামের উচ্চারণ। আমাদের বাংলায়, জ আর ঝ-এর মাঝামাঝি কোনো অক্ষর নেই। বুদ্ধদেব বসু বরিস পাস্টেরনাকের 'ডক্তর জিভাগো' কিংবা 'ডক্টর ঝিভাগো' উপন্যাসের অনুবাদের সময় মাঝামাঝি একটা অক্ষর তৈরি করিয়েছিলেন, 'জ'-এর তলায় ফুটকি, কিন্তু প্রেসওয়ালারা সেটি আর চালাতে চাইলেন না।

অল্প বয়েসেই বাবা-মা মারা যাওয়ায় জুল সুপরভই চলে আসেন ফ্রান্সে। পরবর্তীকালে আবার ফিরে যান দক্ষিণ আমেরিকায়। ফরাসীদের ভাষা সম্পর্কে এমনই গর্ব যে স্বদেশ থেকে বহু দূরে থাকলেও মাতৃভাষার চর্চা করতে ভোলে না। সে তো আমি মাগারিটকেই দেখেছি, আমেরিকায় থাকলেও সে ফরাসী কবিতাতে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকতো। জুল সুপরভই-এর স্বাস্থ্য বরাবরই রুগ্‌ণ, তবু তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং ছটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এই কবিতাটি পড়লে মনে হয়, তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল, তাঁর সন্তানরা কি সুস্থ পৃথিবীর নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে ?

চমৎকার এক সকালবেলা গাড়ি করে যাচ্ছি আমরা, ঝকঝকে দিন, চারদিকে সুমহান প্রকৃতি। হঠাৎ এই কবিতাটি আমার মনে আসে। এই সুন্দর পৃথিবীটাকে মানুষই ধ্বংস করে দেবে ? মানুষের আরামের জন্যই তৈরি হয়েছে কল-কারখানা, সেখানে উৎপন্ন হয়েছে মটোর গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কণ্ডিশানার, এই সব বিলাসদ্রব্যগুলো আসলে মানুষকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এদের বিষবাষ্পে ভবিষ্যতের বাতাস দারুণ বিষাক্ত হয়ে যাবে। পরমাণু অস্ত্রগুলোর বিস্ফোরণে যে-কোনো দিন চুরমার হয়ে যেতে পারে মানুষের গড়া সভ্যতা। এত কাব্য, এত সঙ্গীত, এত শিল্প, এত ভালোবাসা, ব্যর্থ হয়ে যাবে সব কিছু। এই কবি লিখেছেন, মানুষের সব ঘর বাড়ি ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে। শুধু থাকবে একটি মাত্র বারান্দা। একটি বিদেহী পাখির গান ভাসবে হাওয়ায়, তা শোনার জন্য কেউ থাকবে না। শুধু ঈশ্বর শুনে চিনতে পারবেন !

জুল সুপরভই-এর কথা ভাবতে ভাবতে আর একজন কবির কথা মনে পড়ে। তার নামও জুল। জুল লাফর্গ। নামের মিল তো আছে বটেই, তা ছাড়াও এই ফরাসী কবিরও জন্ম হয়েছিল উরুগুয়ে'তে, মন্টভিডিও শহরে। বিস্ময়কর এই কবি, বেঁচেছিলেন মাত্র সাতাশ বছর। এঁর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আমার খুব প্রিয়। "খুব সংক্ষেপে আমি নিজেকে দিয়ে দিতে চাইছিলাম এই বলে যে, 'আমি তোমায় ভালোবাসি', তখনই এই যন্ত্রণাময় উপলব্ধি হলো, আসলে তো আমি আমার নিজের অধিকারী নই।"

দশটি ভাইবোনের অন্যতম, এই জুল লাফর্গ মাত্র সাতাশ বছর বয়েসের মধ্যেই অনেক রকম কাণ্ড করে গেছেন। ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখেছেন সমস্ত রকম প্রথা ভেঙে, যেগুলি আজও আগ্রহের সঙ্গে লোকে পড়ে ; ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীরা যখন আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তখন লাফর্গ ছিলেন তাঁদের প্রবল সমর্থক, তাঁর কবিতাতেও শিল্পের ঐ ধারাটির যেন ছায়া পড়েছে। জার্মান ভাষা শিখেছিলেন বিশেষ করে জার্মান দর্শন গভীর ভাবে জানার জন্য, জার্মানিতে গিয়ে পাঁচ বছর সম্রাজ্ঞী অগাস্টাকে বই পড়ে শুনিয়েছেন। এদিকে শরীরে বাসা বেঁধেছিল তখনকার দুরারোগ্য টি বি রোগ। মাত্র সাতাশ বছরের জীবনে, অসুস্থ শরীর নিয়ে এত সব কাজ কী করে সম্ভব ? ফরাসী দেশে অতি অল্প বয়েসেই

যেন প্রতিভার স্ফুরণ হয়। জোয়ান অব আর্ক উনিশ বছরের মধ্যেই ইতিহাসে এতখানি স্থান করে নিয়েছেন। আঠেরো বছর বয়েসে র‍্যাঁবো যে কবিতা লিখেছে, তা নিয়ে পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও গবেষণা হয়। কর্সিকা দ্বীপের এক নির্যাতিত পরিবারের সন্তান নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফরাসী দেশের সৈন্যবাহিনীর প্রধান হয়ে উঠেছিলেন নিতান্ত তরুণ বয়েসেই।

ভাস্কর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কবি বোদলেয়ার কতদিন বেঁচে ছিলেন রে?

আমি বললাম, খুব বেশি না। ছেচল্লিশ বছর, তাও শেষের দিকের কয়েকটা বছর খুবই খারাপ অবস্থা ছিল।

ভাস্কর আবার বললো, তুই সেই আগেরবার বলেছিলি, বোদলেয়ার একই দিনে মাকে সাতখানা চিঠি লিখেছিলেন, চিঠি লেখার ওয়ার্লড রেকর্ড! এই বোদলেয়ারেরই একখানা কবিতার বই নিয়ে মামলা হয়েছিল না? বইটার নাম মনে আছে, লেস ফ্লাওয়ারস দু ম্যাল!

অসীম গম্ভীর ভাবে সংশোধন করে দিল, লে ফ্লর দু মাল।

ভাস্কর বললো, ঐ একই হলো। তোমাদের ফরাসীতে যে কখন লে, লা কিংবা লু হবে তা বুঝতে মাথা ফেটে যায়।

আমি হাসতে লাগলাম। লু-টা ভাস্করের আবিষ্কার!

বাদলও হাসিতে যোগ দিল, সে ফরাসী ভাষা সম্পর্কে ভাস্করের এই ধরনের স্পর্ধিত মন্তব্যে বেশ মজা পায়। বাদলও এক বিন্দু ফরাসী জানে না। যদিও দোকান-টোকানে ঢুকে সে বেশ কাজ চালিয়ে দেয়। আমার আবার অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী! যেটুকু শিখেছিলাম তাও চর্চার অভাবে প্রায় ভুলে মেরে দিয়েছি, তবু মাঝে মাঝে বিদ্যে ফলাতে যাই।

অসীম বললো, না-জানাটা দোষের কিছু নয়। শুধু শুধু,ভুল বলবে কেন? ইংরিজিতে বলো। বোদলেয়ারের ঐ কবিতার বইটার নাম ইংরিজিতে, দা ফ্লাওয়ার্স অফ ইভ্‌ল। বাংলায় কে যেন অনুবাদ করেছিলেন, 'অশিব পুষ্প', সেটাও মোটামুটি ঠিকই আছে।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, মামলাটায় কী হয়েছিল?

অসীম বলেছিল, হেরে গিয়েছিল। তারপর বোদলেয়ার ক্ষমা চেয়েছিল। আর কী হবে! কবিরা বড় বড় কথা বলে, অ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্ট, অ্যান্টি গভর্নমেন্ট আরও কত কী। কিন্তু চাপে পড়লেই হাঁটু মুড়ে বসে হাত জোড় করে। কী সুনীল, তাই না?

অসীম কবিতা পড়তে ভালোবাসে, কবিতার বই কেনে, অনেক আধুনিক বাঙালী কবিদের বইও রেখেছে নিজের সংগ্রহে, কবিদের সম্পর্কে তার দুর্বলতা আছে, তবু মাঝে মাঝে খোঁচা মারতে ছাড়ে না। এর প্রতিক্রিয়াটা দেখে সে আনন্দ পায়। নিরীহ কবিদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ।

আমি অসীমের স্বভাব জানি বলেই মিটিমিটি হেসে বললাম, বোদলেয়ার তো ক্ষমা চাননি, দয়া চেয়েছিলেন।

বাদল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, দুটোর মধ্যে তফাত কী হল?

আমি বললাম, বোদলেয়ারের বই নিষিদ্ধ করার হুকুম দিয়েছিলেন এক বিচারক। আর বোদলেয়ার দয়া ভিক্ষা করেছিলেন এক রমণীর কাছে। একজন কবি এক নারীর কাছে দয়া তো চাইতেই পারে। সব কবিরাই তো মেয়েদের কাছ থেকে দয়া পাবার জন্য ব্যাকুল।

এবার অসীমও হাসতে লাগলো। সে ব্যাপারটা জানে, আমার কথার মারপ্যাঁচ সে ধরতে পেরেছে।

ভাস্কর বললো, হেঁয়ালি করিস না। কার কাছে দয়া চেয়েছিল? মেয়েটা কে?

বোদলেয়ারের 'লে ফ্লর দু মাল' কাব্য গ্রন্থটি যখন ছাপা হয় তখন কবির বয়েস ছাব্বিশ। কবি হিসেবে তেমন বিখ্যাত নন যতটা পরিচিত এডগার অ্যালান পো'র রচনার অনুবাদক হিসেবে।

কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর তরুণ সাহিত্যিক ও পরিচিত মহলে খুব আলোড়ন হয় ও অনেক প্রশংসা পায়, কিন্তু বড় বড় পত্র-পত্রিকায় সাঙ্ঘাতিক নিন্দে বেরুতে থাকে। 'ল্য ফিগারো'র মতন প্রভাবশালী পত্রিকায় তীব্র আক্রমণ করা হলো। অন্য একটা পত্রিকায় লেখা হলো যে কবিতাগুলো এমনই জঘন্য যে দু'এক লাইন উদ্ধৃতিও দেওয়া যায় না। বোদলেয়ারের নামে অভিযোগ : ধর্মীয় অবমাননা এবং অশ্লীলতা।

সেই সময়ে ফ্লবেয়ার-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদাম বোভারি' নিয়েও অশ্লীলতার অভিযোগে মামলা উঠেছিল। কিন্তু লেখকের পক্ষের এক দুর্ধর্ষ উকিলের সওয়ালে বিচারক কোনো সাজা দিতে পারেননি। বোদলেয়ারের বইটি নিয়ে যখন প্রচুর নিন্দা-মন্দ বেরুতে লাগলো এবং যথাসময়ে বইটি আদালতে অভিযুক্ত হলো, তখন বোদলেয়ার বেশ খুশিই হয়েছিলেন। বড় বড় কাগজের খুব কড়া সমালোচনাও তো এক ধরনের প্রচার, আদালতে মামলা উঠলে বহু লোকে কবির নাম জেনে যাবে। বোদলেয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আদালতে মামলা শেষ পর্যন্ত টিকবে না, 'মাদাম বোভারি'র মতন তাঁর 'অশিব পুষ্প'ও ছাড়া পেয়ে যাবে।

যে বছর আমাদের দেশে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, সেই বছরে ১৫ই অগাস্ট প্যারিসে বোদলেয়ারের নামে মামলা ওঠে। সেটা ছিল একটা ছুটির দিন, প্রচুর অল্প বয়েসী কবি-লেখক ও ছাত্ররা এসে আদালতে ভিড় করেছিল, মেয়েরাও ছিল অনেকে। সবাই ভেবেছিল, অশ্লীলতার মামলা, নিশ্চয়ই প্রচুর রসালো কথাবার্তা শোনা যাবে। বোদলেয়ারের ঐ কবিতার বইটি ছাপা হয়েছিল এক হাজার কপি, প্রথম বাঁধানো হয়েছিল মাত্র একশো, দাম দু' ফ্রাঙ্ক, তখনকার পক্ষে বেশ বেশি দাম। অর্থাৎ কিছু সমালোচক ও বন্ধু-বান্ধব ছাড়া বইটি তখনও বিশেষ কেউ পড়েনি!

দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পর বোদলেয়ার হেরে গেলেন!

ধর্মীয় অবমাননার দায়ে বোদলেয়ারের কারাদণ্ড হতে পারতো। কিন্তু বিচারক সে দায় থেকে বোদলেয়ারকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু তিনি রায় দিলেন যে ঐ বইয়ের ছটি কবিতা অত্যন্ত অশ্লীল, জনসাধারণের পাঠের অযোগ্য! সম্পূর্ণ বইটাকে বাজেয়াপ্ত করা হলো না, কিন্তু ঐ ছ'খানা কবিতা বাদ দিয়ে আবার ছাপতে হবে। এই অশ্লীল কবিতাগুলি লেখা ও প্রকাশ করার জন্য বোদলেয়ারের জরিমানা হলো তিনশো ফ্রাঙ্ক, আর প্রকাশক ও মুদ্রাকরের জরিমানা একশো ফ্রাঙ্ক করে।

তৎকালীন উত্তপ্ত নীতিবাগিশ আবহাওয়ায় বেশ লঘুদণ্ডই বলতে হবে।

বিচারের পর প্রথম কিছুদিন বোদলেয়ার উত্তেজিত ভাবে বলে বেড়াতে লাগলেন, আমি আদালতের রায় মানি না। আমার বই ঐ ভাবেই বিক্রি হবে, গোপনে গোপনে, তারপর যা হয় হোক দেখা যাবে! আমি যা লিখেছি, বেশ করেছি!

কিন্তু কবির এই সাহসের আড়ম্বর চুপসে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। প্রকাশক তাঁর কথা মানলো না। তাঁর বইয়ের ঐ ছখানা কবিতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিক্রি হতে লাগলো। নিজের কাব্যগ্রন্থের সেই দশা দেখে কবি শিউরে শিউরে উঠতেন। বইটা ছাপার জন্য কত যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তিনি, ছাপার ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে ছিলেন, প্রুফ দেখেছেন পাঁচ মাস ধরে, টাইপ ফেস, কাগজ, বাঁধাই সব দিকে ছিল তাঁর মনোযোগ, সেই বইয়ের

এমন ছিন্নভিন্ন অবস্থা ! প্রকাশকের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে তাঁর আর কোনো বই ছাপার আশাই থাকবে না।

এবার কয়েকজন শুভার্থীর পরামর্শে বোদলেয়ার এক দয়ার আবেদন করলেন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী ইউজেনি'র কাছে। অতি কাতর ও আবেগপূর্ণ সেই আবেদনপত্রের ভাষা।

সম্রাজ্ঞী ইউজেনি সে আবেদন একেবারে উপেক্ষা করেননি। জরিমানার তিনশো ফ্রাঙ্ক কমিয়ে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করে দিলেন। ছ'টি কবিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েই গেল। সেই নিষেধাজ্ঞা তার পরেও প্রায় একশো বছর ধরে জারি ছিল।

সংক্ষেপে আমি এই কাহিনী শোনাবার পর ভাস্কর মন্তব্য করলো, কি কিপ্যুস ছিল রে ঐ রানীটা ! আর মাত্র ঐ পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক কমাতে পারলো না ?

কাল রাত্তিরে ভাস্কর হেঁচকিতে বেশ কষ্ট পেয়েছে। হোটেলের ঘরে আমাদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল, ভাস্কর নিজেই গল্প জমাচ্ছিল, হঠাৎ শুরু হয়ে গেল হেঁচকি। তারপর আর থামেই না। আমি লক্ষ করছিলাম, ঘুমের মধ্যেও ও কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আজ সকাল থেকে ভাস্কর বেশ ভালো আছে। মেজাজ বেশ প্রসন্ন। আমরা হোটেলটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ঠিক হয়েছে, সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সন্ধেবেলা নতুন হোটেল খোঁজা যাবে। গাড়ি চলেছে লোয়ার নদীর ধার ঘেঁষে।

ভাস্কর কিছু একটা দুষ্টুমির জন্য উসখুস করছে মাঝে মাঝে। এক সময় সে বললো, অসীম, গাড়িটা থামাও না একবার। অনেকক্ষণ সাহিত্য আলোচনা হয়েছে, গলা শুকিয়ে গেছে। এক বোতল পেরনো কেনা যাক। ফরাসী দেশের এই একটা ব্যাপার বেশ ভালো, সকালবেলা অনেকে খানিকটা পেরনো খেয়ে নেয়। দু'ঢোঁক পেরনো খেলে শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

পেরনো একরকম মৌরির সুরা। এমনিতে স্বচ্ছ রঙের, কিন্তু তাতে জল মেশালেই দুধের মতন সাদা হয়ে যায়।

অসীম ধমক দিয়ে বললো, সকালবেলাতেই মদের চিন্তা ! কাল শরীর খারাপ হয়েছিল, মনে নেই ? এখন হবে না।

ভাস্করও সমান মেজাজ দেখিয়ে বললো, তুমি কি আমার গার্জেন নাকি ? আমার ইচ্ছে হয়েছে খাবো। তুমি গাড়ি থামাবে কি না !

অসীম বললো, ছেলেমানুষি করো না, ভাস্কর, এখনো দোকান খোলেনি !

আমি আর বাদল নিরপেক্ষ, নীরব শ্রোতা। আমরা দু'জনেই ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ভাস্করের স্বাধীনতা আছে মৌরির সুরা পানের ইচ্ছে প্রকাশ করার, আর অসীমেরও স্বাধীনতা আছে তাতে বাধা দেবার। আসলে এটা ওদের ছদ্ম ঝগড়া। ভাস্কর যদি বলতো, আজ সকালে আমি কিছুতেই পেরনো খাবো না, তাহলে অসীম একটা বোতল জোগাড় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তো।

ভাস্কর মাঝে মাঝে বলতে লাগলো, ওঃ, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল। খানিকটা রেড ওয়াইনও যদি অন্তত পাওয়া যেত।

আর অসীম শহরের দিক সম্পূর্ণ এড়িয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলতে লাগলো, দোকান খোলেনি, দোকান খোলেনি। জল খাও !

আমি জানলা দিয়ে নদী দেখতে লাগলাম।

এক সময় মনে হলো, এখানকার দৃশ্যের সঙ্গে আমাদের দেশের তফাতটা কী ? আমেরিকাতেও আমার এ রকম মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। ওদের শহরগুলোর সঙ্গে

আমাদের দেশের শহরগুলোর ঠিক তুলনা চলে না। কিন্তু শহরের বাইরের ফাঁকা জায়গায়, প্রকৃতির মধ্যে খুব একটা অমিল নেই। ডি এল রায়ের সেই লাইন, বিলেত দেশটাও মাটির, নয়কো সোনা রুপো, খুব খাঁটি সত্যি। লোয়ার নদী আমাদের দেশের যে-কোনো মাঝারি আকারের নদীর মতনই, একদিকে ফসলের খেত, আর এক পারে রাস্তা। দু'পাশে তেমন গাছপালা নেই, তাই বাংলা বলে মনে হয় না, কিন্তু বিহারের কোনো কোনো জায়গা হতে পারে অনায়াসে, বিশেষত নদীর মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই দেখে আরও মনে হয়।

এই গাড়িটা বিহারের কোনো নদীর ধার দিয়েই যাচ্ছে, এমন মনে করা যেতে পারতো, কিন্তু রাস্তাটা দেখলেই মনে হয়, এটা ভারতবর্ষ হতে পারে না। এদেশে সারা দেশজোড়া অসংখ্য মসৃণ রাস্তা। কোনো একটা জায়গারও ট্রাফিক বাতি ভাঙাচোরা কিংবা অকেজো নয়। সব সময় অসংখ্য গাড়ি চলছে, গাড়ির সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তবু যে রাস্তাগুলো ভাঙে না, তার কারণ সারা বছর জুড়েই রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা। এরকম রাস্তার অবস্থায় পৌঁছোতে আমাদের দেশের আরও কত বছর লাগবে ?

আরও একটা লক্ষণীয় বিষয়, ফ্রান্সের ছোট ছোট গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েও আমি এ পর্যন্ত একটাও জরাজীর্ণ, জোড়াতাপ্পি দেওয়া কিংবা খুব গরিবের বাড়ি দেখতে পাইনি। দেশের সাধারণ অবস্থা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে কোনো লোকই হতদরিদ্র নয়। বড় বড় শহরে, এমনকি প্যারিসেও গরিবদের ব্যারাক আছে, নেশাখোর, ভবঘুরে, ভিখিরি আছে, কিন্তু গ্রামে সেরকম কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রামের এই উন্নতি দেখেই দেশের অর্থনীতির জোরটা টের পাওয়া যায়। কোনো বাড়িই অসুন্দর নয়, এটাও একটা সামগ্রিক রুচির ব্যাপার।

প্রকৃতির দিক থেকে ওসব দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বিশেষ তফাত নেই, মানুষের ব্যবস্থাপনারই প্রবল ব্যবধান !

ছোটখাটো পাহাড়ী এলাকা দিয়ে যেতে যেতে ভাস্কর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, থামো, থামো !

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কয়েকটি গুহা। এই জায়গাটা আমাদের চেনা, কয়েক বছর আগে আরেকবার এসেছিলাম। এই গুহাগুলিতে রয়েছে ওয়াইনের ডিপো। এখানে পাইকারি হারে ব্যারেল ব্যারেল লাল কিংবা সাদা ওয়াইন বিক্রি হয়। যে-কেউ ঢুকলেই ওরা চেখে দেখবার জন্য একটা-দুটো বোতল খুলে দেয়, সঙ্গে সসেজ-আলুভাজা। চেখে দেখবার পর পছন্দ না হলে চলে যাও অন্য দোকানে। পয়সা লাগবে না। আগেরবার এসে আমরা কয়েকটা দোকান ঘুরে ঘুরে বেশ খানিকটা করে বিনা পয়সার ওয়াইন চেখেছিলাম, পরে অসীম চক্ষুলজ্জায় কয়েক বোতল কিনেছিল।

এবার অসীমকে থামতেই হলো, কিন্তু একটা গুহার ভেতরে ঢুকে মনে হলো, এই কয়েক বছরেই পরিবেশ বদলে গেছে। আগেরবার দোকানের মালিক-মালিকানীরা আগ্রহ করে ডেকে বসিয়ে নতুন ওয়াইন দিয়েছিল দু'তিন রকম। এখন জায়গাটা টুরিস্ট-অধ্যুষিত। আর টুরিস্টদের মধ্যে আমেরিকানদেরই বেশি আদর। তারা কিছুই বিনা পয়সায় নিতে জানে না। এক গেলাস ওয়াইন চেখেই কয়েক ডলার ফেলে দেয়। টুরিস্টরা অনেকেই রসিক হয় না বলে নিকৃষ্ট জাতীয় ওয়াইনও চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভাস্কর এতক্ষণ তৃষ্ণায় ছটফট করছিল, খুব উৎসাহ নিয়ে এখানে ঢুকলো, তারপর এক গেলাস রেড ওয়াইন নিয়ে খানিকটা চুমুক দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল। মুখ ভিরকুট্টি করে বললো, থার্ড ক্লাস ! এত বাজে ওয়াইন মানুষে খেতে পারে !

যতই তৃষ্ণা থাক, ভাস্কর বনেদিআনা ছাড়বে না, উন্নতমানের জিনিস ছাড়া তার জিভে রুচবে না। আমরা তবু খানিকটা করে খেলাম, তেমন খারাপও লাগলো না, ভাস্কর দূরে দাঁড়িয়ে রইলো।

৩৫

'এসো তবে আমরা ভালোবাসি, এসো ভালোবাসি
ধাবমান প্রহরকে উপভোগ করি দ্রুত
মানুষের কোনো বন্দর নেই
সময়ের কোনো তটরেখা নেই
শুধু বয়ে চলে, আমরাও পার হয়ে যাই!'

—আলফঁস দ্য লামারতিন

পৃথিবীর নানান দেশে এ পর্যন্ত আমি যত বাড়ি দেখেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণযোগ্য হচ্ছে শননসো (Chenonceau) প্রাসাদ। যদি কেউ বলে, নদীর ওপর বাড়ি, তাহলে মনে হবে কোনো নদীর খুব ধার ঘেঁষা বাড়ি, যার ছায়া পড়ে নদীর জলে। শননসো তা নয়। এই প্রাসাদটির স্থাপত্য-পরিকল্পনাই অতি অভিনব। সামনের দরজাটি নদীর এক পারে, পেছনের দরজা দিয়ে বেরুলে দেখা যায় নদীর অন্য পারে পৌঁছে গেছি। এবং এ বাড়ির তলা দিয়ে নৌকো, স্টিমার, গাদাবোট দিব্যি পার হয়ে যায়।

নদীটি অবশ্য লোয়ার নয়। তারই এক শাখা নদী, নাম শের। বাংলা মতে এটা একটা পুরুষ নদী। এর নামের অর্থ প্রিয়। নারী হলে নাম হতো শেরি। মাঝারি আকারের ছিমছাম, শান্ত নদীটি বেশ মনোরম।

দুপুরের একটু আগে আমরা পৌঁছোলাম এই নদীতীরে। নদীর এক দিকে সুসজ্জিত উদ্যান, বড় বেশি সুসজ্জিত, আমার এই ধরনের বাগান পছন্দ হয় না, বরং নদীর ওপারের এলোমেলো গ্রাম্য প্রকৃতি দেখলে চোখ জুড়োয়। শননসো প্রাসাদটিকে দূর থেকে, ডান পাশ ও বাঁ পাশ থেকে এবং কাছাকাছি গিয়ে আলাদা আলাদা রকমের দেখায়।

অন্যান্য প্রাসাদের সঙ্গে এই প্রাসাদটির আর একটি পার্থক্য এই যে এটির নির্মাণ, পরিবর্ধন ও অঙ্গসজ্জার সঙ্গে বেশ কয়েকজন মহিলার নাম জড়িত। স্থপতি ও মিস্তিরিরা অবশ্যই পুরুষ ছিল, তবু প্রাসাদটি যেন কয়েকটি নারীর স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

এর ইতিহাস প্রায় পাঁচ-সাত শো বছরের। আগে ছিল একটা ছোটখাটো দুর্গ, ষোড়শ শতাব্দীতে নর্মাণ্ডির এক ট্যাক্স কালেক্টর সেই দুর্গ এবং তার সংলগ্ন জমিদারিটি কিনে নেয়। তার স্ত্রী ক্যাথরিনের প্রখর সৌন্দর্যবোধ ছিল, তার নির্দেশেই পুরোনো দুর্গটি ভেঙে সেখানে তৈরি হয় এক নতুন হর্ম্য, তখন ইতালির রেনেশাঁস-এর প্রভাব পড়েছে ফ্রান্সে, এর নির্মাণ-পরিকল্পনাও ইতালিয়ানদের কাছ থেকে ধার করা। ক্যাথরিন মনের আনন্দে বাড়িটি সাজাচ্ছিল, স্বামীর কাছ থেকে যখন-তখন দাবি করতো অঢেল টাকা, সেই টাকা যে কোথা থেকে আসছে তার খবর রাখতো না। সুন্দরী স্ত্রীর বিলাস-বাসনা পূরণ করতে গিয়ে ট্যাক্স

ক্যালেক্টরটি দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো, এক সময় ধরাও পড়ে গেল। রাজকোষ তঞ্চকতার দায়ে জড়িয়ে পড়ার পর এই প্রাসাদ ও জমিদারি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলো। কিনে নিলেন রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া। ক্যাথরিনের মনের অবস্থা তখন কীরকম হয়েছিল ইতিহাস তা লিখে রাখেনি।

রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া শামবর প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন, সুরম্য ভবনের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল, লোয়ার নদীর দু' পারের অনেকগুলি শাতো-র সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। তিনি শননসো রক্ষা করেছিলেন কিন্তু তাঁর বংশধর দ্বিতীয় আঁরি (অথবা হেনরি) এটা দান করলেন তাঁর রক্ষিতা দিয়ান দ্য পোয়াতিয়ের-কে। রাজার রক্ষিতা, সুতরাং টাকার অভাব নেই, দিয়ান এই বাড়িটাকে বাড়াতে লাগলেন ইচ্ছেমতন, তাঁর আমলেই বাড়ির এক পাশ থেকে সেতু তৈরি হলো নদীর ওপরে। রাজকোষের অবস্থা তখন তেমন ভালো ছিল না, তাই রাজা দ্বিতীয় আঁরি তাঁর রক্ষিতার মনোরঞ্জনের জন্য নতুন নতুন কর বসাতে লাগলেন, তার মধ্যে গীর্জার ঘণ্টার মতন সব ধরনের ঘণ্টার ওপরও কর। সেকালের প্রখ্যাত লেখক রাবেলে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'এ রাজ্যের সব কটা ঘণ্টা রাজা তাঁর ঘোটকীর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন।' দিয়ানের ছিল খুব গাছপালার শখ, বহু জায়গা থেকে গাছ এনে তিনি সাজিয়েছেন উদ্যানটি।

রাজামশাই মারা যেতেই তাঁর বৈধ পত্নী ক্যাথরিন দ্য মেদিচি তাঁর চক্ষুশূল ঐ রক্ষিতাটিকে বিদায় করে দিলেন শননসো প্রাসাদ থেকে। ক্যাথরিন দ্য মেদিচি অতি দুঁদে মহিলা ছিলেন, তাঁর সমস্ত কীর্তিকাহিনী লিখতে গেলে সাত কাণ্ড হয়ে যাবে, সে দিকে আর যাচ্ছি না। এক দিকে যেমন তিনি প্রাসাদটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার দিকে মন দিলেন, তেমনি তাঁর আমলেই এখানে হয়েছে আড়ম্বর, বিলাসিতা ও বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত। আগে যে সেতুটি তৈরি হয়েছিল, ক্যাথরিন দ্য মেদিচি সেটিকে বানালেন দোতলা, ওপরের তলায় হলো দুশো ষাট ফিট লম্বা এক গ্যালারি, এবারেই প্রাসাদটি নদীর এক তীর থেকে অন্য তীরে বিস্তৃত হলো। মাঝে মাঝে বিশিষ্ট অতিথিরা এলে এখানে সারা রাত ধরে নাচ-গান, হৈ-হল্লা, সুরার স্রোতে অবগাহন এবং ব্যভিচার চলতো। যে-বার মেরি স্টুয়ার্ট এসেছিলেন, সেবার এক হাজার নারী-পুরুষকে বিভিন্ন পোশাকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। বিখ্যাত কবি রঁসার-কে দিয়ে তিনি সেই উপলক্ষে কবিতা রচনা করিয়েছিলেন।

এই প্রাসাদের তলা দিয়ে যে নদী বইছে, তার স্রোতের মতন সময়ও বয়ে যায়। ক্যাথরিন দ্য মেদিচির বিলাস-বৈভবের দিনও ফুরিয়ে গেল এক সময়। তাঁর ছেলে রাজা তৃতীয় আঁরি খুন হলেন হঠাৎ, তিনিও আর বেশি দিন বাঁচলেন না, প্রাসাদটি দিয়ে গেলেন তাঁর বিধবা পুত্রবধূ লুইসকে। হঠাৎ যেন এখানকার আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিধবা হলেই যে রানীরা সব ভোগ বাসনা মুছে, ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যান তা তো নয়, অনেকেই বিলাসিতা ও লাম্পট্য চালিয়ে যান আরও অনেক গুণ, কিন্তু লুইস এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁর স্বভাব তাঁর শাশুড়ির ঠিক উল্টো। তিনি সমস্ত উৎসব আড়ম্বর বন্ধ করে দিলেন। ফরাসী রাজ পরিবারের শোকের পোশাক সাদা, রানী লুইস এর পর বাকি জীবন শ্বেত বসন ছাড়া আর কিছুই পরেননি। স্থানীয় লোকের কাছে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'শ্বেতবসনা রানী'। তাঁর ঘরে ঝুলতো কালো রঙের পর্দা, তাঁর বিছানা, চেয়ার-টেবিল, সমস্ত আসবাব কালো ভেলভেট দিয়ে মোড়া। অবিকল সেই ঘরটিতে সেই শোকসন্তপ্তা রমণীর চিহ্ন রয়ে গেছে। জীবনের অবশিষ্ট এগারো বছর তিনি নির্জনে শুধু প্রার্থনা, সেলাই ও বই পড়ে

কাটিয়েছেন।

হাত ঘুরতে ঘুরতে এই শাতো-টি চলে আসে মাদাম দুপ্যাঁ নামে আর এক মহিলার হাতে। বিলাস-ব্যভিচারের দিকে এই রমণীর ঝোঁক ছিল না, ঐর রুচি ছিল শিল্প সাহিত্যে। মাদাম দুপ্যাঁ এখানে একটি সাঁলো পরিচালনা করতেন। এই সাঁলো নামে ব্যাপারটি আমাদের দেশে অজ্ঞাত। ফরাসী দেশের কোনো কোনো অভিজাত পরিবারের মহিলা নিজের বাড়িতে কবি, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের নিয়মিত আড্ডার ব্যবস্থা করতেন। সেখানে আমন্ত্রিতদের খাদ্য, পানীয় ও সব রকম আতিথ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করা হতো। শিল্প সাহিত্য নিয়ে নানা রকম তর্ক-বিতর্ক ও হাস্য-পরিহাস হতো, সেই বিদগ্ধজনদের মধ্যমণি হয়ে থাকতেন গৃহস্বামিনী। অনেক দুঃস্থ শিল্পী-কবি এই সব রমণীদের কাছে উপকৃত হয়েছেন, কেউ কেউ সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন। আমাদের দেশে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্ন ছিল, রাজা-রাজড়ারা অনেকেই সভাকবি রাখতেন, গত শতাব্দীর বড়লোকরা মোসাহেব পুষতেন, কিন্তু কোনো মহিলা নিজের বাড়িতে শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে আড্ডার আসর বসিয়েছেন, এমন শোনা যায়নি।

মাদাম দুপ্যাঁ এখানে তাঁর ছেলের জন্য একজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন, পরবর্তীকালে যিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। জাঁ জাঁক রুসো! এখানে বসেই রুসো তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব ও একটি উপন্যাস লেখেন। রুসো তাঁর আত্মজীবনী 'কনফেসানস্'-এও শননসো'র দিনগুলির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ঐ চমৎকার জায়গাটিতে আমাদের খুব ভালো সময় কেটেছিল। খাওয়া-দাওয়া হতো দারুণ। খেয়েদেয়ে আমি পাদ্রীদের মতন মোটা হয়ে গিয়েছিলাম।'

মাদাম দুপ্যাঁ আর যে-সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের নেমন্তন্ন করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভলতের, আমরা যাঁকে বলি ভলতেয়ার। রুসো এবং ভলতেয়ার একই সঙ্গে ঐ সাঁলো-তে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা আমি অনেক বই খোঁজাখুঁজি করেও জানতে পারিনি। তা হলে, ওঁদের দু'জনের কথোপকথন নিশ্চিত খুব আকর্ষণীয় হতো। ঐরা ছিলেন পরস্পরের ঘোর শত্রু!

বিখ্যাত শিল্পী ও লেখকদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত কিংবা নিছক ঈর্ষাপ্রসূত ঝগড়া অনেক সময় অন্যদের কাছে মজার লাগে। ফরাসী দেশে ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীগোষ্ঠীর অভ্যুত্থানের আগে দুই প্রধান শিল্পী ছিলেন অ্যাঁগ্রে (Ingre) এবং দেলাক্রোয়া (Delacroix), দু' জনেই পেয়েছিলেন সার্থকতা এবং রাজকীয় সম্মান। প্যারিস শহরেই দু' জনে ছিলেন, অনেক সভা-সমিতিতে ওঁদের দেখাও হয়েছে, কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলতেন না! রুসো আর ভলতেয়ারের ঝগড়ার সঙ্গে তুলনা করা যায় আমাদের দেশের বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগরের বিবাদের। একই সময়ের ঐরা দুই মহীরুহ দু'জনেই শ্রদ্ধেয়, অথচ ঐদের মধ্যে মিল হয়নি। শুধু মতপার্থক্য নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণও হয়েছে, বঙ্কিম প্রকারান্তরে বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলেছেন।

বঙ্কিম ছিলেন রুসোর ভক্ত। ভলতেয়ার আমাদের দেশের কারুকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। ফরাসী বিপ্লবের আগে রুসো এবং ভলতেয়ার দু' জনেই শুধু লেখক হিসেবেই নয়, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসেবে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব; দু' জনেই রাজরোষে পড়েছিলেন, দু' জনেই সাধারণ মানুষের মুক্তি-সন্ধানী। দিদ্‌রো'র নেতৃত্বে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশ ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দু' জনেই কোনো এক সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন, দু' জনেই পরে দূরে সরে যান। রুসো এক সময় ছিলেন ক্যালভিনিস্ট, পরে

তিনি আত্মার অনিশ্চয়তা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসে ফিরে যান। রুসোর মতে, নাস্তিকতা বড়লোকদের বিলাসিতা। গরিব লোকদের নানান রকম ধর্মীয় উপকথা এবং ধর্মসঙ্গীত অবলম্বন করে বাঁচতে হয়। ভলতেয়ার ধর্ম জিনিসটাকে ঘৃণা করতেন, ধর্মের নামে নানাবিধ ব্যবসায়ের দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, তবে তিনি এক ঈশ্বরকে মানতেন, যিনি সমস্ত ধর্মের উর্ধ্বে, যিনি পৃথিবীর জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ঈশ্বর। গীর্জার সঙ্গে বহুবার ঝগড়া করলেও জীবনের একেবারে শেষ বছরে ভলতেয়ার পাদ্রীদের কাছে প্রথাগত ধর্মাচরণের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। না হলে মৃত্যুর পর কোনো কবরখানায় তাঁর স্থান হবে না, তাঁর শরীরটা ফেলে দেওয়া হবে ভাগাড়ে, এই চিন্তায় ভলতেয়ার বিচলিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, ভলতেয়ার ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য একটা ছোট্ট ঘোষণাপত্র রেখে যান। তাতে লিখেছিলেন :

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রেখে, বন্ধুদের ভালোবেসে, শত্রুদের ঘৃণা না করে, কুসংস্কারের প্রতি বিরাগ নিয়ে আমি মারা যাচ্ছি।

রুসো ও ভলতেয়ারের এরকম অনেক মিল থাকলেও তাঁরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারতেন না। রুসো নামে আরও দু'জন লোকের ওপর ভলতেয়ার আগে থেকেই রেগে ছিলেন। জাঁ জাঁক রুসো যে আলাদা, তৃতীয় একজন রুসো, তা জানার পরেও ভলতেয়ার ওঁর রচনার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হননি। রুসো ভলতেয়ারকে তাঁর লেখা "মানুষের মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রস্তাব" বইটি পাঠান মতামতের জন্য। উত্তরে ভলতেয়ারের চিঠিখানা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি লিখেছিলেন :

মহাশয়, মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে আপনার নতুন বইটি আমি পেয়েছি। আমাদের জানোয়ার বানাবার জন্য এতটা ধীশক্তি কেউ আর কখনো ব্যয় করেননি, এবং আপনার পুস্তকটি পড়লে চার পায়ে হাঁটার ইচ্ছে জাগে। তবে কি না, ষাট বছরেরও অধিককাল ধরে অভ্যেসটা না থাকায় আমার পক্ষে তা ফের শুরু করা দুর্ভাগ্যক্রমে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে যারা আপনার এবং আমার চেয়ে যোগ্য, তাদের আমি এই পদ্ধতিতে হাঁটার ভার দিচ্ছি।...

(ফরাসী ভাষাবিদ শ্রী পুষ্কর দাশগুপ্ত ভলতেয়ার সম্পর্কে একটি মূল্যবান বই রচনা করেছেন। 'ভলতের জাদিগ ও অন্যান্য উপাখ্যান' থেকে এই চিঠির অনুবাদ গ্রহণ করেছি আমি।)

ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে জানি। তবে এই দুই লেখক সম্পর্কে আর একটুখানি বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। ভলতেয়ার এবং রুসো এই দুজনেরই সমাধি হয় আলাদা আলাদা দুটি গ্রামে। ফরাসী বিপ্লবের পর বিশেষ সম্মান জানাবার জন্য এঁদের দুজনেরই হাড়গোড় তুলে এনে প্যারিস শহরের বিশিষ্ট সমাধিভবন পঁতেয়োঁ-তে (Pantheon) সুদৃশ্য শবাধারে রাখা হয়। গুজব আছে, রাত্তিরের দিকে পঁতেয়োঁ-তে ঢুকলে এখনো এঁদের ঝগড়া শোনা যায়।

শননসো প্রাসাদটি নদীর ওপর বিস্তৃত হলেও খুব বিশাল নয়। সবগুলি ঘর ঘুরে দেখতে ক্লান্তি আসে না। বিশেষত এখানে কিছু ভালো ছবি আছে। অন্যান্য শাতোগুলোতে বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি প্রায় দেখাই যায় না। আগে যা ছিল, তাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্যারিসে। একটু নামকরা শিল্পীদের ছবিরই এখন অসম্ভব দাম। এখানে দেখা গেল ভ্যান লু'র 'তিন রমণী', একটি ঘরের সিলিং অঙ্কিত করেছেন রুবেনস। এক একটা ঘরের জানলা দিয়ে দেখা

যায় নদী। খুব জাঁকজমকপূর্ণ ঘরগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ বাইরের নিরাভরণ প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরালে চোখের বেশ আরাম হয়।

শুধু দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখাই নয়, একটা জায়গায় কিছুক্ষণ অলসভাবে কাটালে তবে তার সৌন্দর্য ঠিকমতন হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শননসো প্রাসাদের বাইরেও আমরা শুয়ে বসে কাটালাম কিছুক্ষণ। কিছু খাবার কিনে খাওয়া হলো মাঠে বসে। তারপর আমরা বেরুলাম হোটেল খুঁজতে।

প্রায় দু' ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে অসীম যে হোটেলটি পছন্দ করলো, সেটাই যে এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হোটেলটি বেশ অগোছালো অবস্থায় রয়েছে, সম্ভবত মালিক বদল হয়েছে কিছুদিন আগে, বাগানটিতে চূড়ান্ত অযত্নের ছাপ। খাট-বিছানাও ঠিকঠাক নেই বলে মালিকানি প্রথমে আমাদের থাকতে দিতে রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু আমরা এক প্রকার জোর করেই নিলাম। তার কারণ, হোটেলটির অবস্থান অতি চমৎকার জায়গায়। বড় রাস্তার খুব কাছেই একটা টিলার ওপরে হোটেল, রাস্তার ওপারেই লোয়ার নদী। ঘরে শুয়ে দেখা যায়। কাছাকাছি অন্য বাড়ি নেই বলে খুব নিরিবিলি। মনে হয় যেন হোটেল নয়, নদীর ধারে এক বাংলো। ভাড়াও বেশ সস্তা. আমরা এরপর এখানেই তিন চারদিন থেকে যাবো ঠিক করলাম।

একসঙ্গে বেড়াতে বেরুলে দলের সবার মধ্যে একটা মিল থাকা দরকার। একজন কেউ বাতিকগ্রস্ত হলেই অনেক আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। কারুর যদি খাদ্যের ব্যাপারে খুঁতখুঁতুনি থাকে, কেউ যদি হাঁটতে রাজি না হয়, কারুর যদি জিনিসপত্র কেনার বাতিক থাকে, তাহলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমাদের এই দলটির চারজনের চরিত্র একেবারে আলাদা, প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত বেশ উগ্র, তবু আমরা একটা নিখুঁত টিম। ভ্রমণের ব্যাপারে একজন কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করলেই অন্য তিনজন সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়। ভাস্কর যদি একদিন বেশি হাঁটাহাঁটি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তা হলে আমরা ধরেই নিই যে পরের দিন ও দ্বিগুণ উৎসাহ দেখাবে। চলন্ত গাড়িতে যেতে যেতে বাদল যদি একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, আমরা ঐ বাড়িটা দেখতে যাবো না? অসীম সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে গাড়ি ঘোরায়। অসীম হোটেল খোঁজার জন্য বহু সময় ব্যয় করলেও আমরা জেনে গেছি, শেষ পর্যন্ত ওর পছন্দটা অতীব প্রশংসার যোগ্য হবেই।

হোটেলটায় জিনিসপত্র রাখার পর ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, এখানে কাছাকাছি দেখার মতন সবচেয়ে ভালো জিনিস কী আছে রে?

আমি অসীমের দিকে তাকিয়ে বললাম, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বাড়ি, তাই না?

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বললো, চল, এক্ষুনি সেটা দেখে আসি।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, তা হলে জুতো খুলবো না তো?

অসীম বললো, লিওনার্দোর বাড়ি দেখতে অনেকটা সময় লাগবে, ভাস্কর। এখন সন্ধে হয়ে এসেছে। কাল সকালে যাওয়াই ভালো। কাছেই আমবোয়াজ শহর, চলো সেই শহরে গিয়ে এমনি কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াই। সবসময় যে নামকরা কিছু দেখতেই হবে তার কি মানে আছে?

ভাস্কর তাতেই রাজি, উঠে দাঁড়িয়ে বললো, জলি গুড আইডিয়া। চলো!

আমবোয়াজ শহরের প্রান্তে এসে গাড়িটা রাখা হলো নদীর ধারে। তারপর আমরা হাঁটতে লাগলাম। সন্ধে হয়ে এসেছে, ম্লান আলো ছড়িয়ে আছে নদীর ওপরে। এখানে নদীর ধারে মানুষজনকে গুলতানি করতে দেখা যায় না। দু-এক জোড়া নারী-পুরুষ হাঁটছে

হাত-ধরাধরি করে।

নদীপ্রান্ত ছেড়ে আমরা ঢুকে পড়লাম শহরে। আমবোয়াজ আর কী শহর, জনসংখ্যা অতি নগণ্য, আমাদের একটা বড় গ্রামেও এর চেয়ে বেশি লোক থাকে। তবু এখানকার সব পথঘাট বাঁধানো, দু'ধারে অজস্র দোকান। কাফে-রেস্তোরাঁ ছাড়া অন্য সব দোকানই ছটার পর বন্ধ হয়ে যায়, কাচের ভেতর দিয়ে দোকানগুলো দেখতে দেখতে হাঁটতেও ভালো লাগে।

কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ মনে হয়, এই রাস্তা দিয়ে একদিন লিওনার্দো দা ভিঞ্চিও নিশ্চয়ই হেঁটেছিলেন।

৩৬

আমি তোমাকে এত বেশি স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি
তোমার বাস্তবতা হারিয়ে ফেলছো
এখনো কি সময় আছে তোমার জীবন্ত শরীর স্পর্শ করার
এবং যে ওষ্ঠ থেকে আমার অতি প্রিয় স্বর জন্ম নেয় সেখানে চুম্বন দেবার ?—
আমি তোমাকে এত বেশি স্বপ্ন দেখেছি যে হয়তো
আমার পক্ষে আর জাগাই সম্ভব হবে না
আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোই, আমার শরীর সব রকম জীবন ও ভালোবাসার জন্য উন্মুক্ত—
আমি তোমার ভুরু ছুঁতে পারি, ওষ্ঠ ছুঁতে পারি এত কম...
আমি তোমাকে এত বেশি স্বপ্ন দেখেছি, হেঁটেছি, কথা বলেছি।
শুয়েছি তোমার ছায়ার সঙ্গে...

—রোবেয়ার দেসনো

মার্গারিটের কাছ থেকে আমি কত দূরে সরে এসেছি! আমার বয়েস বেড়েছে কিন্তু মার্গারিটের বয়েস একটুও বাড়েনি। শেষবার যখন আমি মার্গারিটকে ওর্লি বিমানবন্দরের বারান্দায় দেখি, তখন তার বয়েস সাতাশ, মাথা ভর্তি না-আঁচড়ানো ঈষৎ লালচে রঙের চুল, ঠোঁটে মাখেনি রং, আঁকেনি ভুরু, মুখে কোনো রকম প্রসাধনের চিহ্ন নেই, একটা গোলাপি রঙের স্কার্ট পরা। মার্গারিটের সেই মূর্তিটাই আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। আমার প্যারিস ছাড়ার ফ্লাইট ছিল ভোরবেলা। সেবারে বিদায় নেবার সময় আমরা হাসাহাসি করবো, কোনোরকম বিচ্ছেদের কথা তুলবো না, পরস্পরের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। মালপত্র চেক-ইন করিয়ে আমরা দুজনেই মজার মজার গল্প মনে করে বলছিলাম আর হাসছিলাম খুব, মার্গারিট তার প্রিয় কবি আপোলোনেয়ারের কাব্যগ্রন্থ 'বিসতেয়ার' থেকে ছোট ছোট কৌতুক-কবিতা শোনাচ্ছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে আমরা কেউই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি। মার্গারিট কান্নায় ভেঙে পড়ে রেলিং টপকে নেমে আসার চেষ্টা করছিল নীচে, দুজন বিমানকর্মী তার হাত ধরে টেনে রাখলো। আমি তখন বিমানের সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকছি, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ঐ দৃশ্য দেখে স্তব্ধ, পেছনের অন্য যাত্রীরা ঠেলছে আমাকে। তখন আর আমার ফেরার কোনো উপায় নেই।

মার্গারিটের সেই কান্না-ভেজানো মুখ, যেন জঙ্গলের কোনো গাছের না-ছেঁড়া, শিশির মাখানো শুভ্র ফুল।

আমার ঠিক পরেই যাঁরা আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, শঙ্খ ঘোষ এবং জ্যোতির্ময় দত্ত, এঁদের দুজনের সঙ্গেই মার্গারিটের যথেষ্ট পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এঁরাও মার্গারিটের শেষ পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানেন না। পল এঙ্গেল আমাকে নরম করে বলেছিলেন, কারা যেন

ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে··· । হয়তো জোর করতেও হয়নি, সরল বিশ্বাসেই মাগারিট তাদের গাড়িতে উঠেছিল । সব মানুষকেই সে বড় বেশি বিশ্বাস করতো, কালো মানুষদের প্রতি তার একাত্মবোধ ছিল । পৃথিবীতে যত রকম অপরাধ আছে, তার মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে কোনো অনিচ্ছুক নারীর প্রতি কোনো পুরুষের নিছক গায়ের জোরে যৌন অত্যাচার ! ইস্, কত কষ্ট পেয়েছিল মেয়েটা !

কাল রাত্রে আমার একেবারেই ঘুম হয়নি । শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ বাদেই হঠাৎ পেট আর বুক জ্বলতে শুরু করে । সাধারণ জ্বলুনি নয়, যেন একটা দাবানল ছুটে বেড়াচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরে । ভাস্করের কাছে নানা রকম অ্যান্টাসিড থাকে । ওকে না জাগিয়ে ওর ব্যাগ খুলে দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নিলাম । তাতে একটুও কমলো না । ডিনারের সময় কোনো রকম একটা খাবার আমার সহ্য হয়নি ? ফুড পয়জ্‌নিং ? অন্য তিনজনের কিছু হয়নি কেন, তারা তো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে । রাত্তিরে কোনো রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে আমরা প্রত্যেকে একই খাবার খাই না, যে-যার পছন্দমতন ডিস নিই, আমি নিয়েছিলাম খরগোশের মাংস, শুধু সেটা বিষাক্ত ছিল ?

খাবারের ব্যাপারে আমার কোনো বাছ-বিচার নেই, নতুন নতুন খাদ্যও পরীক্ষা করে দেখতে বেশ ভালো লাগে । ব্যাঙ, বাদুড় ও জেব্রার মাংস চেখে দেখেছি, চীনে গিয়ে নানা রকম অচেনা রান্নার মধ্যে সাপের মাংসও খেয়ে থাকতে পারি । সব কিছুই তো দিব্যি হজম হয়ে যায় । তা হলে আজ কি হলো ? আগুনের জ্বালাটা ক্রমশ বাড়ছে, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন বুকটা ফেটে যাবে ! বিছানায় শুয়ে থাকতে পারছি না, ছটফট করছি ঘরের মধ্যে । আরও দুবার অ্যান্টাসিড খেয়েও কোনো সুফল পাওয়া গেল না । এটা কি তবে আকস্মিক আলসার ? কোনো কোনো লোকের হঠাৎ অ্যাপেনডিক্স ফেটে মৃত্যু হয় । ফুড পয়েজনিং-এও তো মারা যায় কেউ কেউ । আমার সারা শরীর একবার কেঁপে উঠলো ।

রিল্‌কে বলেছেন, পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের পর যে মানুষের মাঝে মাঝে মৃত্যু চিন্তা আসে না, তার কোনো বোধশক্তিই নেই । মৃত্যুভয় এক ধরনের বিলাসিতাও বটে, যা চূড়ান্ত কল্পনার লোকে নিয়ে যায় । আসল মৃত্যু যখন আসে, তখন এ সব বিলাসিতার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা কে জানে !

আমার মৃত্যুভয় কখনোই পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না । তারপর হাসি পায় । অত কষ্টের মধ্যেও আমাব মনে হলো ফ্রান্সের এক ক্ষুদ্র শহরে, হোটেল ঘরের মধ্যে আচমকা মৃত্যুর মতন নাটকীয় ঘটনা মোটেই আমার পছন্দ নয় । বন্ধুরা তা হলে মহাবিপদে পড়ে যাবে । একসঙ্গে বেড়াতে এসে এটা হবে আমার বিশ্বাসঘাতকতা ! মরে না গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তো ওদের খুবই বিব্রত করা হবে ! ওসব চলবে না ।

যাই হোক, শেষ রাত্তিরের দিকে আমার পর পর দুবার বমি হলো । একেবারে বেসিন ভেসে যাবার উপক্রম । ঋষি অগস্ত্যের মতন আমি যেন এক সমুদ্র বমন করলাম । তাতেই নিভে গেল আগুন । বেরিয়ে গেল খাদ্যের বিষ । এরপর প্রচুর ঠাণ্ডা জল খেয়ে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত ধুয়ে ফেললাম, চমৎকার শান্তি হলো, কিন্তু আর ঘুম এলো না । ভোরের আলো ফোটার পর আমি গায়ে একটা শাল জড়িয়ে চলে এলাম হোটেলের সামনের চত্বরটায় । একটু নীচেই হাইওয়ে, তার ওপাশে লোয়ার নদী । চতুর্দিকের নির্মল নীরবতার মধ্যে নদীটি একমাত্র জেগে আছে ।

মৃত্যুর অনুভূতির সময় পর পর দ্রুত প্রিয়জনের কথা মনে আসে । মা, ভাই-বোন,

স্ত্রী-পুত্র, কলকাতা, অসমাপ্ত লেখা, বন্ধু-বান্ধব, রবিবার দুপুরের আড্ডা । সব কিছুতেই মায়া-জড়ানো । এখন শরীরটা অনেকটা হাল্কা ও সুস্থ লাগছে, এখন আবার মনে হচ্ছে, যথেষ্ট দিন তো বাঁচা হয়েছে, যীশুখ্রিস্ট, শেলী, কীট্‌স, মোপাসাঁ, মাইকেল মধুসূদন, স্বামী বিবেকানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত আমার চেয়ে কম বয়েসে মারা গেছেন, আমি মরে গেলেও ক্ষতি কিছু ছিল না । বেশ এই লোয়ার নদীর তীরে আমাকে কবর দেওয়া হতো, একদিন সেই কবরের মাটির ওপর গজিয়ে উঠতো নাম-না-জানা গাছ । আবার বিলাসিতা !

আমরা অনেকেই বেঁচে আছি, শুধু মাগারিট নেই । অথচ তার হারিয়ে যাওয়া একেবারেই উচিত ছিল না !

এবারের ভ্রমণে এসে বন্ধুদের কাছে আর মাগারিটের কথা উল্লেখ করি না । ওরা বাড়াবাড়ি মনে করতে পারে । শুধু একবার, গাড়িতে আসার সময় এবারেও পোয়াতিয়ে'র পাশ দিয়ে এসেছিলাম, সেখানে একটা রাস্তায় লুদ্যাঁ গ্রামের দিকে তীর আঁকা ছিল । মাগারিটের জন্মস্থান । আমি মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিলাম, অসীম, একবার লুদ্যাঁ ঘুরে গেলে হয় না ! অসীম ধমক দিয়ে বলেছিল, আবার ? একবার তো গিয়েছিলে ? সেখানে কী দেখতে পাবে ? শুধু শুধু ঝামেলা করার কী দরকার ?

অসীম ঠিকই বলেছে । শুধু শুধু লুদ্যাঁ গ্রামে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না । তাছাড়া মাগারিট সম্পর্কে আমার যা অনুভূতি, অন্যদের তো তা হতে পারে না । এখানে ঘুরতে ঘুরতে মাগারিটের কথা আমার বারবার মনে পড়বেই । টুকরো টুকরো ইতিহাস, ছবি, কবিতা, ভাস্কর্য, এই সবের সঙ্গেই মাগারিটের অনুষঙ্গ জড়ানো । মাগারিটের সঙ্গে কবে, কোথায় এই সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, তার কিছুই আমি ভুলিনি । আজ আমরা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শেষ জীবনের বাড়িটি দেখতে যাবো । লিয়োনার্দোর আঁকা বিশ্ববিখ্যাত মোনালিসা ছবিটি আমি প্রথমবার দেখি মাগারিটের সঙ্গে । প্রথম প্রথম মাগারিট আমাকে ঐ ছবিটা দেখতে দিত না । নরম ধমক দিয়ে বলতো, না, ওটা তোমায় দেখতে হবে না, সব টুরিস্টরা ওটা দেখার জন্য ছোটে, এমন কিছু দেখার মতন নয় ছবিটা ! তার চেয়ে আরও কত ভালো ভালো ছবি আছে, দেখা হয় না··· ।

আমরা প্রায়ই যেতাম লুভ্‌র মিউজিয়ামে । দুটো তিনটে ঘর বেছে নিয়ে সেখানকার সব ছবি দেখতাম মন দিয়ে । মাগারিট পুরো শিল্পের ইতিহাস আমাকে টুকরো টুকরো ভাবে বুঝিয়ে দিত । ইতালিয়ান শিল্পীদের অনেক ছবি দেখার পর মাগারিট বলেছিল, এবার আমরা মোনালিসাকে একবার দেখতে পারি । প্যারিস ছাড়ার শেষ দিনটায় লুভ্‌র মিউজিয়ামে দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হলো মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবার সময় এসে গেছে, তা হলে কি মোনালিসা দেখা হবে না ? দুজনে মিলে ছুটতে ছুটতে, অন্যদের হতচকিত করে, একটার পর একটা কক্ষ পার হয়ে আমরা মোনালিসার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম । আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, ও এই ! মাগারিট হাসিতে ভেঙে পড়েছিল । এত বিখ্যাত ছবিটি প্রথম দর্শনে হতাশ হতেই হয় !

সকলের ঘুম ভাঙবার পর বাদলের তৈরি চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম । আমবোয়াজ-এর দুর্গ-প্রাসাদটি এমন কিছু দেখবার মতন নয় । এককালে খুবই বিশাল ছিল, এর সঙ্গে অনেক রোমহর্ষক ইতিহাসও জড়িত, কিন্তু এখন বলতে গেলে একটি ভগ্নস্তূপ । দু' দিকের প্রাচীর ও প্রাসাদের সামান্য কিছু অংশ কোনোক্রমে টিকিয়ে রাখা হয়েছে ।

একেই তো এই অবস্থা, তার ওপরে আবার গাইডের উৎপাত । প্রত্যেক শাতো-তেই ঢুকতে পয়সা লাগে, এখানে ভেতরে এসে জানা গেল যে রাজা-রানীদের ঘরগুলো দেখবার

জন্য গাইড নিতে হবে, না হলে যাওয়া যাবে না। অর্থাৎ আবার পয়সা খরচ। একজন গাইড আমাদের পাশে এসে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। রাজা-রানীদের ঘর আমরা অন্য জায়গায় যথেষ্ট দেখেছি, আর না দেখলেও চলবে। সর্বসম্মতিক্রমে গাইডটিকে বিদায় করে দেওয়া হলো। আমরা নিজেরাই দুর্গের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম। এত উঁচু থেকে লোয়ার নদীর একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। শুধু সেইটা দেখাই তো যথেষ্ট।

প্রাচীরের পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়লো একটা প্রাচীন ভাঙা গীর্জা। সেখানে রয়েছে লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির একটি আবক্ষ মূর্তি। তার নীচেই ঐ মহান শিল্পীর মরদেহ সমাহিত।

আমবোয়াজের ভেতরের বাগানটি এখনো খুবই সুদৃশ্য। হাজার রকম ফুলের সমারোহ। এখানকার বাগানের খ্যাতি কয়েক শতাব্দী ধরে। রাজা অষ্টম শার্ল এই বাগান বানিয়েছিলেন। তিনি ইতালিতে গিয়ে সেখানকার বাগান দেখে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, বলেছিলেন, আহা, যদি একটি আদম ও ইভ থাকতো, তা হলেই এ যে স্বর্গোদ্যান হয়ে যেত! ইতালিয়ানদের অনুকরণেই তিনি এখানে বাগান শুরু করেন। এই শাতো-টির জাঁকজমক শুরু হয় তাঁর আমলেই। অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে তাঁর এখানেই মৃত্যু হয়েছিল। একদিন রানীর সঙ্গে তিনি এখানকার চত্বরে টেনিস খেলা দেখতে আসছিলেন। একটা নিচু দরজা পার হবার সময় মাথায় গুঁতো খান খুব জোরে। কিছু হয়নি, কিছু হয়নি বলে তিনি এগিয়ে গেলেন, খেলা দেখতে দেখতে হাসি-গল্প করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হলো খেলার মাঠের পাশেই একটা ছোট্ট ঘরে, খড়ের বিছানায়। লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটতে লাগলো বটে, কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি যে রাজা কতটা অসুস্থ। ফ্রান্সের রাজা অষ্টম শার্ল বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন সেখানেই।

এই অঞ্চলের অনেকগুলি শাতোর সঙ্গেই রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া'র নাম সংযুক্ত। ফরাসী দেশের ইতিহাসেও যেমন তাঁর বিশিষ্ট স্থান, তেমনি এই রকম বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ ও পরিবর্ধনে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ। তিনি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রাসাদে থাকতেন। প্রথম ফ্রাঁসোয়া যখন তরুণ যুবক ও যুবরাজ, সেই সময় তিনি আমবোয়াজ-এ এসে প্রাসাদটি আরও সুসজ্জিত করেন। যুদ্ধবিদ্যা, নাচ-গান এবং আমোদ-প্রমোদ সব দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল এবং তাঁর শিল্প-রুচিও ছিল খুব উন্নত। এই প্রথম ফ্রাঁসোয়া'ই ইতালি থেকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে সসম্মানে এখানে নিয়ে আসেন। রনেশাঁস আমলের সেই পুরোধা শিল্পীকে তিনি একটি অতি উত্তম বাড়ি দিয়েছিলেন, ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন প্রচুর টাকা মাসোহারার। লিওনার্দো এখানে নিজস্ব কাজ বা লেখাপড়া যা খুশি করবেন, শর্ত শুধু একটাই, মাঝে মাঝে রাজা এই শিল্পীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার সময় চাইবেন।

ফ্লরেন্স তখন পশ্চিমী শিল্পের রাজধানী। সেই নগর ছেড়ে লিওনার্দো এই আমবোয়াজ-এর মতন এক অখ্যাত জায়গায় আসতে রাজি হলেন কেন, তা অবশ্য জানা যায় না। হয়তো শেষ জীবনটা নিরিবিলিতে কাটাবারই ইচ্ছে ছিল তাঁর। এখানে তিনি বেঁচে ছিলেন চার বছর। নদী-নালা ও স্থাপত্য বিষয়ে রাজাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৫১৯ সালের ২রা মে, ৬৭ বছর বয়েসে লিওনার্দোর মৃত্যু হয়। রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া লিওনার্দোর এমনই ভক্ত ছিলেন যে এই শিল্পীর মৃত্যুর পর তাঁরও আর এখানে মন টেকেনি, তিনিও আমবোয়াজ ছেড়ে চলে যান। পরে এখানে এসেছেন কদাচিৎ।

রনেশাঁস বা রেনেশাঁস শব্দটি ফরাসী হলেও সকলেই জানেন যে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ও

চিন্তার ক্ষেত্রে এই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় ইতালিতে। ইতালিয়ান ভাষায় একে বলে রিনাসেনৎসা বা পুনরুত্থান। এখান থেকেই পশ্চিমী সভ্যতায় মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিককালের শুরু। আমাদের প্রাচ্যে এই মধ্যযুগ আরো দীর্ঘায়িত হয়েছে, আমরা আধুনিককালে উপনীত হয়েছি আরও অনেক পরে।

ইতালির কবি পেত্রার্ক-কে অনেকেই এখন মনে রেখেছেন তাঁর পত্নী লরার উদ্দেশে রচিত সনেটগুলির জন্য, কিন্তু এই পেত্রার্ক-ই বলতে গেলে প্রথম রনেশাঁসের মূল সূত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে পেত্রার্ক বললেন যে, প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী যে মধ্যযুগ, তা প্রায় একটা অন্ধকার যুগ, এর আগেকার যে গৌরবময় ক্লাসিকাল যুগ, তার কথা আমরা ভুলে গেছি। ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক সুনীতির পুনরুদ্ধার করতে হবে, এবং শুধু সেগুলির অনুকরণ নয়, তাদের উৎকর্ষের বিশ্লেষণ করে এগোতে হবে সামনে, নইলে একালের বর্বরতার অবসান হবে না। তরুণ সমাজকে তিনি ডাকলেন 'বিস্মরণের ঘুম' ভেঙে জাগতে। এই সময় এক নতুন মানবতাবাদেরও জন্ম হলো, এতদিন ইওরোপে পাপবোধ এবং ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রবল ছিল (আমাদের নিয়তিবাদের মতন), এই সময় থেকে একটা চেতনা জাগ্রত হলো যে মানুষ নিজেই নিজের নিয়ন্তা এবং কর্মফলের প্রভু। মৃত্যুর পরে আত্মাকে রক্ষা করার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ জীবনের চিন্তায় মগ্ন হলো। এই চিন্তার প্রতিফলন হলো শিল্পে, সাহিত্যে।

বহু শত বর্ষ ধরে রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ইতালি ছেড়ে চলে গিয়েছিল কনস্টান্টিনোপল। বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা বাসা বেঁধেছিলেন সেখানে। মধ্যযুগের সায়াহ্নে সেই কনস্টান্টিনোপলের গৌরবও প্রায় অস্তমিত, তরুণ তুর্কীরা সেখানে বার বার হানা দিচ্ছে, রোমান সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে সেখানে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আসন্ন। তাই দেখে বড় গ্রীক পণ্ডিত-দার্শনিকরা চলে এলেন রোমে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইতালি আবার উন্নত হয়ে উঠলো। খ্রিস্টান জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি পোপের আধিপত্য খর্ব হলো অনেকটা, ভ্যাটিকানের ঐ সর্বোচ্চ পদের জন্য দুই পোপ সাধারণ স্বার্থসম্পন্ন মানুষের মতন এমন লড়ালড়ি শুরু করে দিল যে, ঈশ্বরের এই প্রতিনিধি সম্পর্কে অনেকের ভক্তিশ্রদ্ধা চলে গেল। বিজ্ঞানেও এলো নতুন আলো। এতদিন ধরে পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়েই শুধু আলোচনা করতেন এবং বই লিখতেন, এখন শুরু হলো হাতে-কলমে পরীক্ষা, জন্ম হলো আধুনিক বিজ্ঞানের। কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিও সত্যি সত্যি দেখতে পেলেন মহাকাশ। এই প্রথম শ্বেতাঙ্গ জাতি জানলো যে, সূর্য আকাশ জুড়ে চলাফেরা করছে না, পৃথিবীটাই তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

মানবতাবাদের আন্দোলন ছড়িয়ে গেল অন্যান্য দেশেও। দুর্ধর্ষ স্প্যানিয়ার্ড ও পোর্তুগীজ নাবিকেরা অকূলে জাহাজ ভাসিয়ে ঘুরে গেল আফ্রিকা, ছুঁয়ে গেল ভারত। পৃথিবীর নতুন নতুন অংশ যেমন আবিষ্কৃত হলো, তেমনি আবিষ্কৃত হতে লাগলো মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা। হল্যান্ডে ইরাসমুস হলেন মুক্তচিন্তার প্রবক্তা। জার্মানিতে শিল্পী ডুরের-এর সৃষ্টিতে ফুটে উঠলো এই নবজাগরণের চেতনা। ফ্রান্সে তখনও বড় শিল্পী বিশেষ কেউ ছিল না, কিন্তু মনতেইন ও রাবেলে'র রচনায় দেবতাদের ছাড়িয়ে মানুষই প্রধান হয়ে উঠলো। ইংরেজরা তখনো ছবি আঁকতে শেখেইনি বলতে গেলে, গান-বাজনায় তাদের অবদান শূন্য, কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই তারা বিশ্বকে দিল এক বিস্ময়কর উপহার, উইলিয়াম শেক্সপীয়ার!

ইতালিতে তখন এক অভূতপূর্ব শিল্পী-সমাবেশ ঘটেছে। ফ্লরেন্স শহরেই এক সময় ধনাঢ্য মেদিচি পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় একসঙ্গে ছবি আঁকা ও ভাস্কর্যে নিমগ্ন থেকেছেন

মিকেলাঞ্জেলো, বত্তিচেল্লি এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতন বিরাট প্রতিভাবান শিল্পীরা। আর একজন শিল্পী, যিনি শিল্পের ইতিহাসের একটি স্তম্ভস্বরূপ, সেই রাফায়েল তখনও অতি তরুণ।

রনেশাঁস আমলের এই সব শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য হলো, এঁরা শুধু ছবি আঁকেননি কিংবা মূর্তি বানাননি। এঁরা সমসাময়িক কালের প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানেও এঁদের ছিল সমান যোগ্যতায় বিচরণ। মিকেলাঞ্জেলো ভ্যাটিকানের সিস্‌তিন চ্যাপেলে যে চিত্রমালা রচনা করে গেছেন, সেটাই তাঁর অমরত্বের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এক সময় আঁকা ও মূর্তিগড়া ছেড়ে তিনি যুদ্ধনীতি নির্ধারণে মন দিয়েছিলেন এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। সত্তর বছর বয়েসে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন, তাঁর কিছু কিছু সনেট আজও বিখ্যাত। শিল্পী রাফায়েল ছিলেন এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক, দলবল নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে তিনি প্রাচীনকালের প্রচুর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন।

রনেশাঁস-চরিত্রের প্রতিভূ বলা যায় লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি নিঃসন্দেহে মোনালিসা। এর প্রিন্ট দেখেনি, শিক্ষিত সমাজে এমন মানুষ বিরল। তাঁর 'দা লাস্ট সাপার' প্রায় একই রকম স্মরণীয়। কিন্তু এই ছবি দুটির খ্যাতি তাঁর অন্যান্য কীর্তিকে অনেকটা ঢেকে দিয়েছে। তাঁর কালে তিনি ছিলেন প্রধান স্থাপত্যবিদ ও নদী-বিশেষজ্ঞ ; কবিতা লিখেছেন এবং সঙ্গীত রচনা করেছেন ; মনুষ্য শরীর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল সেকালের অনেক চিকিৎসকের চেয়েও বেশি। এবং শিল্পী হিসেবে তিনি বেশি বড় ছিলেন, না বিজ্ঞানী হিসেবে, সে সম্পর্কে তর্ক তোলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বৈজ্ঞানিক, বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে। অনেকের মতে, তিনি তাঁর যোগ্য সময়ের চারশো বছর আগে জন্মে গেছেন ! অত কাল আগে, যখন মানুষ আকাশে ওড়ার কথা চিন্তাই করেনি, তিনি তখন হেলিকপ্টারের নিখুঁত ডিজাইন করে ফেলেছিলেন।

আমবোয়াজ প্রাসাদ-দুর্গ ছেড়ে আমরা এগোলাম লিওনার্দোর বাড়ির দিকে। পুরনো শহরের পাথর বাঁধানো সরু পথ, সবটা গাড়ি যায় না। উঁচুনিচু রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। কোনো এক সময় লিওনার্দোর বাড়ি থেকে একটা ভূগর্ভ সুড়ঙ্গ ছিল রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত, প্রবীণ শিল্পী সেই পথে যেতেন তরুণ রাজার সঙ্গে দেখা করতে। রাজাও গোপনে আসতেন শিল্পীর কাছে।

এক সময় বাড়িটার মস্ত বড় কাঠের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। বাড়িটির নাম 'ল্য ক্লো-লুসে'। এই ধরনের বাড়িকে বলে ম্যানর হাউজ, এর সংলগ্ন রয়েছে একটা চ্যাপেল। এক সময় রাজা-রানীরাও এই বাড়িতে থেকেছেন। প্রাচীন বাড়িটি প্রায় অবিকৃত রয়েছে, এটাই এর বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যে পা দিলেই চারশো বছর আগেকার হাওয়া যেন এখনো গায়ে লাগে।

একটাই মুশকিল, প্রচুর লোকজনের ভিড়। নিরিবিলিতে এই সব জায়গা ঘুরে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু উপায় তো নেই। অবশ্য এখানে কেউ চ্যাঁচামেচি করে না। সারিবদ্ধভাবে সবাই নিঃশব্দে এগোয়।

রোম থেকে এখানে আসবার সময় খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে লিওনার্দো যে সব মালপত্র এনেছিলেন, তার মধ্যে ছিল তাঁর প্রিয় তিনটি ছবির ক্যানভাস। তার একটি হচ্ছে মোনালিসা। এখানে এসে বাড়িটি নিজের মতন করে সাজিয়েছিলেন। খেতে ভালো বাসতেন। তাই রান্নাঘরটি বেশ বিরাট। তাঁর বিছানাটি রাজা-রাজড়াদের যোগ্য। রাজা

প্রথম ফ্রাঁসোয়া এই শিল্পীকে যে খুবই খাতির করতেন, তার প্রমাণ আছে অনেক। যে ঘরে লিওনার্দো শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, সেটি রাখা আছে হুবহু অবস্থায়। শিল্পী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন রাজা তাঁর শিয়রের পাশে এসে বসেছিলেন।

বিভিন্ন ঘরের দেওয়ালে যে-সব ছবি, তার অধিকাংশই কপি, আসলগুলি অন্যত্র চালান হয়ে গেছে। একটি ছবি দেখে আমার চোখ আটকে গেল। এক নারী, তার মুখখানা অবিকল মোনালিসার মতন, কিন্তু সমগ্র মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া ! আসল মোনালিসার ছবির হাসিটিই সুপ্রসিদ্ধ। ঐ মহিলার মুখে হাসিটি ফুটিয়ে রাখার জন্য লিওনার্দো চেয়েছিলেন যাতে ওর মেজাজ সব সময় প্রসন্ন থাকে। মহিলাকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকার সময় পেছন থেকে নানা রকম সঙ্গীতের ঝঙ্কার আসার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে লিওনার্দো এক দুঃখী মোনালিসার ছবি আঁকার কথাও ভেবেছিলেন ? এ ছবিটির কথা আমি আগে কোথাও পড়িনি।

নীচের তলায় একটি ঘরে সাজিয়ে রাখা রয়েছে লিওনার্দো আবিষ্কৃত এবং পরিকল্পিত নানা রকমের যন্ত্রপাতি। লিওনার্দো কিছু মডেল বানিয়েছিলেন, কিছু কিছু নিখুঁত স্কেচ করে গিয়েছিলেন, সেই সব দেখে IBM কম্পানি সবগুলির নতুন করে মডেল বানিয়ে দিয়েছে। সে সব দেখলে সত্যি তাজ্জব হতে হয়। পেট্রোলিয়াম কিংবা বিদ্যুৎ আবিষ্কারের কয়েক শো বছর আগে এই সব যন্ত্রের আকার-প্রকারের চিন্তা একজন মানুষের মাথায় এসেছিল কী করে ?

মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে, আর্মার্ড ট্যাঙ্ক, প্লেন, হেলিকপ্টার, প্যারাসুট, ট্রিপল ফায়ার মেশিনগান, হাইড্রলিক টারবাইন, ক্যাটাপল্ট, অনেক রকমের কামান এবং বিভিন্ন ধরনের সেতু। আমাদের মধ্যে অসীমই একমাত্র বিজ্ঞানের ছাত্র, সে উৎসাহের সঙ্গে জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলো। ভাস্কর এক সময় বলল, ওফ্ ! একটা লোক এক জীবনে এত কিছু করেছে, আর পারা যাচ্ছে না !

আমি বাদলকে বললাম, ম্যানেজার সাহেব, খিদে পেয়ে গেছে। এখন কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলে হয় না ?

বাদল বলল, খিদে তো আমারও পেয়েছে খুব, মুখ ফুটে বলছিলুম না !

আগের রাত্রে পেট-জ্বালার জন্য ভয়ে আমি সকালে ব্রেকফাস্টে কিছুই খাইনি। এখন খিদে পাওয়ায় মনে হলো, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি। এত কিছু দেখে আমাদের মন ভরে গেছে, এবার পেটের জন্য কিছু চাই।

বাইরে বাগানের উজ্জ্বল আলোয় এসে লিওনার্দের রচনার তিনটি লাইন মনে পড়লো। 'আলোর দিকে তাকাও, ভোগ করো এর রূপ। চক্ষু বোজো এবং আবার দ্যাখো। প্রথমেই তুমি যা দেখেছিলে তা আর নেই, এর পর তুমি যা দেখবে, তা এখনো হয়ে ওঠেনি।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া রাস্তার ধারে এক মাঠে বসে সেরে নিয়ে আমরা আবার চলিষ্ণু হলাম পরবর্তী অভিযানে। পরের দুটো দিন আমরা আরও বেশ কয়েকটি শাতো দেখলাম, যেমন ব্লোয়া, অঁজে-ল্য-রিদো, শিনো, অঁজে, শোমৌ-সুর লোয়ার, তুর ; একটুখানি দেখে বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরে গেলাম তালমি, সোমুর, পিথিভিয়ের, ল্য মান, বোজেন্‌সি প্রভৃতি স্বল্পখ্যাত জায়গাগুলি। সবগুলির বর্ণনা দেবার কোনো মানে হয় না। এর মধ্যে ব্লোয়া এবং অঁজে বেশ বিরাট, ইতিহাস ও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু ততদিনে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অঁজে-তে ট্যাপেস্ট্রির দারুণ সংগ্রহ রয়েছে। বড় বড় কার্পেটের ওপর ফুটিয়ে তোলা ধারাবাহিক চিত্র। সেগুলি মূল্যবান ঠিকই কিন্তু ট্যাপেস্ট্রি দেখে আমি বিশেষ সুখ পাই না।

একঘেয়ে লাগে।

ছোট ছোট শহরগুলিতে শুধু শাতো নয়, ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করার জন্য নানারকম মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালাও থাকে। ওয়াইন মিউজিয়াম প্রায় সর্বত্র, তা ছাড়া আর কত রকমের যে সংগ্রহশালা। যেমন মাসরুম মিউজিয়াম, রেল মিউজিয়াম, সমরাস্ত্রের মিউজিয়াম, পোশাক মিউজিয়াম ইত্যাদি। আমরা সময় বাঁচাবার জন্য দুটো একটা দেখি মাত্র।

একটা জায়গায় বেশ মজা হয়েছিল, সেটা বলে প্রসঙ্গটা শেষ করি।

একটা দুপুর আমরা কাটালাম শিনোঁ (Chinon) শহরে। মধ্যযুগীয় ক্ষুদ্র শহর, এক সময় পুরোটাই প্রাচীর ঘেরা ছিল, এখনো সেই প্রাচীর কিছু কিছু রয়ে গেছে। লোয়ার নদীর এক শাখা নদী ভিয়েন, তার তীরেই দুর্গ ও অনেক পুরোনো বাড়ি, অদূরেই গভীর জঙ্গল। ভারি সুন্দর জায়গাটি। এক কালে এই নগর ও দুর্গ ইংরেজ রাজাদের অধীনে ছিল।

শাতোটি দেখতে বেশি সময় লাগলো না। কিন্তু এখানকার একটি মিউজিয়াম দেখবো বলে আগেই ভেবে রেখেছিলাম। সেটার নাম পুরোনো শিনোঁ এবং রিভার ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়াম। কথিত আছে, ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরির পুত্র রিচার্ড দা লায়নহার্ট এখানে যুদ্ধ করতে করতে মারা যান এবং ঐ বাড়িটিতে সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। ছোটবেলা থেকে ইতিহাসে সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের কাহিনী পড়ে রোমাঞ্চিত হয়েছি, ইনি ক্রুশেড লড়তে গিয়েছিলেন, শেরউডের জঙ্গলে দস্যু রবিনহুডের দলবলের মাঝখানে ইনি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। 'দা লায়ন ইন উইন্টার' নামে একটা দুর্দান্ত নাটকও আছে। সেই বীরকেশরীর সমাধিটা একবার দেখবো না!'

অনেক ঘুরে ঘুরেও সেই মিউজিয়ামটির সন্ধান পাওয়া গেল না। অসীম রাস্তার নানা ধরনের লোকজন, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কেউ কিছু বলতে পারে না। কেউ যেন ঐ মিউজিয়ামের নামই শোনেনি। অনেকেই বললো, এখানে একটা বিখ্যাত ওয়াইন মিউজিয়াম আছে বটে, কিন্তু ঐ রকম ইতিহাসের কিছু মিউজিয়াম আছে বুঝি!

আশ্চর্য দেশ! এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যন্ত ওয়াইন মিউজিয়ামের খবর রাখে, অথচ একটা ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের কথা জানে না?

শিনোঁ অঞ্চলের ওয়াইন অবশ্য বিখ্যাত। প্রতি বছর এখানে মদের উৎসব হয়। প্রখ্যাত লেখক রাবেলে'র শহর এই শিনোঁ। গারগানতুয়া ও পান্তাগ্রুয়েল নামে দুই ভালো-মানুষ দৈত্যের কাহিনী লিখেছিলেন তিনি। গারগানতুয়া জন্মের পরেই ড্রিংক, ড্রিংক বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। এখানে পাহাড়ের গুহায় বড় বড় ওয়াইনের বোতল সাজানো থাকে। সে যাই হোক, ওয়াইন মিউজিয়াম দেখার কোনো আগ্রহ আমাদের নেই।

ইতিহাসের মিউজিয়ামটা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে আমার বন্ধুদেরও সন্দেহ দেখা দিল। ভাস্কর বললো, কি রে, তুই ঠিক জানিস তো ওরকম কিছু আছে এখানে?

আমার তখন জেদ চেপে গেছে। ওটা দেখতেই হবে। বললাম, আমার কাছে ঠিকানা লেখা আছে, পায়ে হেঁটে খুঁজে দেখবো।

গাড়িটা পার্ক করা হলো শহরের মাঝখানে। তারপর আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেশ সরু সরু রাস্তা, অনেকটা কাশীর গলির মতন। খোলা দরজা দিয়ে অনেক বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত দেখা যায়। ঠেলাগাড়িতে বিক্রি হচ্ছে খাবার।

পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত, প্রায় আটশো বছরের পুরোনো অট্টালিকাটির সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের নৈরাশ্যের নিঃশ্বাস ফেলতে হলো। দরজা বন্ধ। বাইরে প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। আজ ছুটিছাটার দিন নয়, তবু বন্ধ কেন? একজন দারোয়ান শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে জানা গেল যে মিউজিয়ামের কিউরেটর হঠাৎ ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে বলে দরজা খোলা যাচ্ছে না। চাবি তার কাছে।

একজন কিউরেটর ছুটি নিয়েছে বলে সরকারি মিউজিয়ামের দরজা খুলবে না? এরকম ব্যাপার তো শুধু আমাদের দেশেই হয় বলে জানতাম। আমাদের দেশের কোনো কিছুর সঙ্গে সাহেবদের দেশের কোনো কিছুর পুরোপুরি মিল দেখলে আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। কলকাতা কিংবা ভারতের নিন্দে করে যারা বই লেখে, তাদের ঘাড় ধরে এনে এই ঘটনাটা দেখাতে পারলে আরও মজা হতো।

মিউজিয়ামটির বাইরেই একটা ট্যাবলেটে লেখা আছে, রিচার্ড দা লায়নহার্টের এখানে মৃত্যু হয়েছিল ১১৯৯ সালে।

৩৭

“

অ্যালবাট্রস, সমুদ্রের বিশাল বিহঙ্গ, যেন অলস
ভ্রমণ-সঙ্গী, জাহাজের পিছু পিছু ওড়ে
গভীর থেকে গভীরে যায় জাহাজ, তারাও সঙ্গে সঙ্গে যায়
নাবিকেরা এক একসময় তাদের বন্দী করে খেলাচ্ছলে।

ডেকের ওপর তাদের নামিয়ে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে
নীল আকাশের রাজা, এই পাখিরা বিভ্রান্ত, এবং লজ্জা মাখা মুখে
তাদের মস্ত বড় দুটি শাদা ডানা ছড়িয়ে দেয় দু'পাশে
যেন করুণ ভাবে ঝুলতে থাকা দুটি দাঁড়

কিছুক্ষণ আগেই যে ছিল দুর্দান্ত সুন্দর, এখন সে কেমন
দুর্বল আর জেবড়া-জোবড়া, সেই উড়ন্ত পর্যটককে
এখন দেখাচ্ছে কী কুৎসিত আর কিম্ভূত
একজন খোঁচাচ্ছে তার চঞ্চু, অন্য কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নকল করছে তাকে।

কবিও ঠিক যেন এই মেঘের যুবরাজের মতন
ঝড়ের সঙ্গে অনবরত ঘোরে, তীরন্দাজদের উপহাস করে
নির্বাসিত হয়ে আসে পৃথিবীতে, চতুর্দিকে ধিক্কার-বিদ্রূপ
প্রকাণ্ড দুটি ছড়ানো ডানার জন্য সে হাঁটতে পারে না।

—শার্ল বোদলেয়ার

”

আড্ডা আমাদের বাঙালী জীবনের একটা অঙ্গ, ফরাসীরাও কম আড্ডা মারে না। আমাদের আড্ডা যেখানে সেখানে জমতে পারে। ওদের আড্ডা বসে কাফে রেস্তোরাঁয় এবং ওদের অধিকাংশ কাফে-রেস্তোরাঁ পানশালাও বটে। কোনো কোনো আড্ডা পরে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়ে যায়।

সেই রকমই একটা আড্ডা ছিল প্যারিসের কাফে গেরবোয়া-তে, গত শতাব্দীতে। আভিনু দ্য ক্লিশি'র ওপরে এই কাফেটি বেশ প্রশস্ত। এখানকার আড্ডাটির বিশেষত্ব এই যে

এখানে প্রথম শিল্পীদের সঙ্গে কবি ও লেখকদের মিলন ঘটে। এই কাফের আড্ডাধারীদের মধ্যে দুজন, ফরাসী দেশে তো বটেই, এমনকি বিশ্বেরও আধুনিক শিল্প ও কাব্যের প্রধান পথিকৃৎ। এদুয়ার মানে এবং শার্ল বোদলেয়ার। দুজনেই সমকালে দারুণ নিন্দিত।

এদুয়ার মানে এই আড্ডার মধ্যমণি। অন্যান্য সমসাময়িক শিল্পীদের সঙ্গে মানের একটা বিরাট তফাত এই যে, তাঁকে কখনো দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, স্বভাবে বুর্জোয়া, ভালো পোশাক পরতে ভালোবাসতেন, ভালো খাবার ও পানীয়, ভালো রেস্তোরাঁ, নারীদের সঙ্গ, নাচ-গান পছন্দ করতেন। গোড়ার দিকে ছবি আঁকার ব্যাপারে বাবার আপত্তি থাকলেও মায়ের প্রশ্রয়ে পরে আর কোনো অসুবিধে হয়নি। নিজস্ব স্টুডিওতে নিশ্চিন্তে ছবি আঁকতে পারতেন। শিল্পের জগতে কোনো বিপ্লব ঘটাতেও চাননি মানে, ভেবেছিলেন ভদ্দরলোকদের মতন প্রথাসম্মত ছবি আঁকবেন, ভালো জায়গায় প্রদর্শনী হবে, লোকে প্রশংসা করবে, কিনবে, তিনি স্বাভাবিক ভাবে খ্যাতি অর্জন করবেন। কিন্তু বাস্তবে হয়েছিল এর ঠিক বিপরীত! বাহ্যত যিনি বুর্জোয়া এবং বিলাসী তাঁর ভেতরের এক সাঙ্ঘাতিক প্রতিভা যেন জোর করে তাঁকে দিয়ে যুগান্তকারী সব ছবি আঁকাচ্ছিল। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, মানে যেন একই অঙ্গে ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড!

বোদলেয়ার শুধু কবি নন, তিনি তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ শিল্প সমালোচক এবং এখনো সমালোচকদের কাছে আদর্শস্বরূপ। যখন আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীকে বড় বড় সমালোচকরা তুলোধোনা করছেন, গালাগালির চোটে ভূত ভাগাচ্ছেন, পত্র-পত্রিকায় তাঁদের নিয়ে শুধু ঠাট্টাবিদ্রূপ চলছে, সেই সময় বোদলেয়ার জোরালো ভাবে সমর্থন করছেন এই নতুন শিল্প আন্দোলনকে। মানের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে বোদলেয়ারের নিজেরও খানিকটা উপকার হয়েছিল, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া, অর্থকষ্ট, কাব্যগ্রন্থ নিয়ে মামলায় হেরে যাওয়া, ফরাসী আকাদেমির সদস্য হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়া, এই সব মিলিয়ে বোদলেয়ার নৈরাশ্যে ভুগছিলেন, আত্মহত্যার ইচ্ছে জাগতো মাঝে মাঝে। কিন্তু তীব্র জীবনবোধসম্পন্ন মানের সঙ্গে মিশে তিনি কিছুদিনের জন্য সঞ্জীবিত হয়েছেন, মানে যখন ক্যানভাস-তুলি নিয়ে আঁকতে যেতেন মাঝে মাঝে, তখন বোদলেয়ারও তাঁর সঙ্গে যেতেন। 'তুইলারির বাগানে কনসার্ট' নামে মানের যে একখানা বড় ছবি আছে, সেই ছবিতে অনেক মানুষের মধ্যে বোদলেয়ারকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ ছাড়া বোদলেয়ারের একটা চমৎকার এচিং করেছিলেন মানে।

এমিল জোলা তখনও বড় উপন্যাসগুলি লিখতে শুরু করেননি, খবরের কাগজে ফিচার লিখে জীবিকা অর্জন করতেন। তিনি ঐ আড্ডার নিয়মিত সদস্য। সুযোগ পেলেই তিনি পত্র-পত্রিকায় শিল্পী বন্ধুদের পক্ষ সমর্থন করে লিখতেন। লেখকদের মধ্যে আরও আসতেন এডমন্দ দুরান্তি, পরে তাঁর খুব খ্যাতি হয়েছিল, সে সময় তিনি ছিলেন বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি, অধিকাংশ সময়েই বসে থাকতেন চুপ করে। ঠোঁটে পাইপ কিন্তু জ্বালাবার কথা মনে থাকতো না। তা হলেও তিনি এই শিল্পী গোষ্ঠী নিয়ে প্রথম একটি পুস্তিকা রচনা করেন, "নতুন শিল্প" নামে। জাকারি আসত্রুক নামে আর একজন মাঝারি কবি একদিন মানের 'অলিমপিয়া' ছবিটি দেখে হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা বানিয়ে ফেলেছিলেন।

এই আড্ডার একেবারে শেষের দিকে কয়েকবার এসেছেন আর এক প্রখ্যাত কবি, স্তেপান মালার্মে।

শিল্পীদের মধ্যে আসতেন পিসারো, রেনোয়া, ক্লদ মোনে। মানে আর মোনে, প্রায় একই

রকম নাম, গোড়ার দিকে অনেকে গুলিয়ে ফেলতো। পরে দুজনেই আলাদা ধরনের শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত হন, এবং দু' জনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

মোনেকে অসম্ভব দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে একসময়। খেতে-না-পাওয়ার স্তরেও নেমে আসতে হয়েছিল। মোনের মিস্ট্রেস (পরে স্ত্রী) কামিল যখন একটি সন্তানের জন্ম দেয়, মোনে তখন বাধ্য হয়ে একা মফস্বলে পিসির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, খবর পেয়ে পুত্রমুখ দর্শন করার জন্য প্যারিসে আসার ট্রেনভাড়াও তাঁর জোটেনি। এই দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করতে হলো এই জন্য যে, এখন মোনের একটি ছবি পঞ্চাশ লাখ টাকায় বিক্রি হলেও বেশ সস্তা বলতে হবে। মোনে অবশ্য দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন, ছিয়াশি বছরের জীবনে তিনি তিন হাজারেরও বেশি ক্যানভাসে ছবি রেখে গেছেন। মোনে সম্পর্কে সেজান্ বলেছিলেন, 'ওর তো শুধু চোখ—কিন্তু কী অসাধারণ চোখ!'

এঁদের তুলনায় বয়েসে কিছুটা ছোট হলেও সেজান্ আসতেন এই আড্ডায়। আসতেন সিসলে, এদগার দেগা, আমেরিকান শিল্পী হুইশলার। এবং নাদার। নাদার ঠিক লেখকও নন, শিল্পীও নন, এক আধুনিক রূপকথার নায়ক। তাঁর উপস্থিতি একটা ঝড়ের মতন, অসাধারণ তাঁর প্রাণশক্তি। শিল্পী, লেখক সবারই তিনি প্রিয়। বোদলেয়ার এই নাদার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, সাধারণ মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদি রয়েছে এই মানুষটার। বোদলেয়ার এঁকে একটি কবিতা উৎসর্গ করেছেন, মানে উৎসর্গ করেছেন ছবি। জুল ভার্ন তাঁর 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' নামে বইতে একটি চরিত্র গড়েছেন নাদার-এর আদলে, তার নাম আরদাঁ (Nadar ওল্টালে অনেকটা Ardan হয়ে যায়)। নাদার কার্টুনিস্ট, সাংবাদিক, আবিষ্কারক। দু'একটা উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু এসবের চেয়েও বড় পরিচয় তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানস্পৃহা, প্রায়ই বেলুনে চেপে আকাশে উড়তেন। এবং তিনি সেকালের সবচেয়ে বিখ্যাত ফটোগ্রাফার।

আড্ডাধারীদের বিচিত্র পোশাক, বিভিন্ন ধরনের মেজাজ। কামিল পিসারোকেও প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে বহু বছর কাটাতে হয়েছে, তবু বরাবরই তিনি শান্ত, ধীরস্থির। সমসাময়িক শিল্পীদের নিয়ে একসঙ্গে চলার চেষ্টা তিনি করে গেছেন সারাজীবন। ভাইয়ের মতন, বন্ধুর মতন অন্যদের পরামর্শ দিয়েছেন, নিজের দুঃসময়েও অন্য বিপদাপন্ন শিল্পীদের আশ্রয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে যিনি হয়ে ওঠেন আর এক শিল্প আন্দোলনের নেতা, সেই পল সেজান্‌কে একসময় পিসারো নিজের পাশে বসিয়ে আঁকায় সাহায্য করেছেন। যদিও দুজনের চরিত্রের একটুও মিল ছিল না। তরুণ বয়েসে সেজান্ ছিলেন অতিশয় দুর্মুখ, যেমন ছিলেন দেগা। নিষ্ঠুর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করায় এঁদের জুড়ি ছিল না। দেগা একবার এক সমালোচক সম্পর্কে বলেছিলেন, (সেই সমালোচকটি জাতে ফরাসী হলেও জন্ম হয়েছিল জার্মানিতে) 'ঐ লোকটা জার্মানি থেকে গাছে গাছে লাফিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে।' পল সেজান্ অন্যদের সঙ্গে কটু-কাটব্য করলেও সমীহ করতেন এদুয়ার মানে-কে। নোংরা, ছেঁড়া ঝুলিঝুলি পোশাক, চুল আঁচড়ানো নেই। সেই অবস্থায় কাফেতে এসে অন্যদের সঙ্গে হাত ঝাঁকুনি দিতে দিতে এগোলেও তিনি শৌখিনবাবু এদুয়ার মানের সামনে থমকে দাঁড়াতেন। তারপর বলতেন, 'মঁসিউ মানে, আমি আপনার সঙ্গে করমর্দন করবো না। কারণ আমি সাতদিন স্নান করিনি!'

এই আড্ডায় কোনো মহিলা শিল্পী ছিল না। কারণ, তখনও ভদ্রঘরের মেয়েদের কাফে-রেস্তোরাঁয় আড্ডায় যোগ দেওয়াটা চালু হয়নি। নচেৎ, এঁদের অনেকের বান্ধবী অতীব রূপসী বার্থ মরিসো, যাঁকে মডেল করে মানে বেশ কয়েকটা ছবি এঁকেছেন, এবং যিনি

নিজেও ছিলেন প্রতিভাময়ী শিল্পী, তিনি নিজের যোগ্যতাতেই এখানে স্থান করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি থাকতেন আড়ালে। এই নারীবর্জিত আড্ডায় নিশ্চিত সবচেয়ে বেশি অস্বস্তি বোধ করতেন অগুস্ত রেনোয়া। নারী-চিন্তায় বিভোর এই শিল্পী প্রকৃতির মধ্যেও নারীকে দেখতে পেতেন। রেনোয়া একবার বলেছিলেন, "ঈশ্বর যদি নারীদের সৃষ্টি না করতেন, তা হলে বোধহয় আমি শিল্পীই হতাম না।"

কাফে গেরবোয়ার টেবলগুলো শ্বেত পাথরের, তার ওপর সবসময় ওয়াইন ও বীয়ারের ফেনা। সবাই গুটি গুটি এখানে এসে জমায়েত হতেন বিকেল পাঁচটায়, এঁরা অনেকেই উন্মুক্ত স্থানে ছবি আঁকতেন বলে রোদ পড়ে গেলে ক্যানভাস গুটিয়ে ফেলতেন, অন্যান্য দু' একটা দিন কারুর বাদ পড়ে গেলেও বেস্পতিবার দিনটায় সবার আসা চাই-ই, আড্ডা চলতো অনেক রাত পর্যন্ত। পয়সা ফুরিয়ে গেলে কাফে ছেড়ে সবাই চলে যেত কাছেই এদুয়ার মানের স্টুডিয়োতে। বন্ধুদের খাদ্য ও সুরা দিয়ে আপ্যায়ন করতে মানের কখনো কার্পণ্য ছিল না।

আড্ডার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় থাকে না, শিল্পী এবং লেখকরা যে সবসময় শিল্প কিংবা সাহিত্য নিয়েই কথা বলবেন তার কোনো মানে নেই, পরচর্চা, কেচ্ছা-কাহিনী থেকে রাজনীতি, অনেক কিছুই চলে আসতে পারে। ফরাসী দেশের রাজনীতিও তখন বেশ সরগরম। ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেলেও গণতন্ত্রের ধারণা অনেকের মনে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে, এদিকে তখন তৃতীয় নেপোলিয়ান সিংহাসনে বসে রাজতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছেন, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকে।

কিন্তু একটি বিষয় আড্ডার মধ্যে প্রায়ই ঘুরে ফিরে আসে। রিয়েলিজম বা বাস্তববাদ। এই শব্দটিই তখন সদ্য তৈরি হয়েছে, এই ধারণাটি বেশ কিছুদিন ধরে শিল্পী-সাহিত্যিকদের পীড়িত করছে। রনেশাঁসের সময় সকলের দৃষ্টি ফিরে গিয়েছিল ক্লাসিকাল যুগের দিকে। তারপরেও তো আবার কয়েকশো বছর কেটে গেল। এখন শিল্পীদের মনে হচ্ছে, সমসাময়িক কালকে বাদ দিলে শিল্প হয় না। চোখের সামনে যা দেখছি, তার থেকে চোখ ফিরিয়ে অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে থাকাটা একঘেয়েমির পর্যায়ে এসে গেছে। সৌন্দর্যনির্মাণই শিল্পের শেষ কথা, কিন্তু আধুনিক জীবন, বাস্তব জীবনে কি সৌন্দর্য নেই?

কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা হবে সেই বাস্তব? সেটা খুঁজে পাওয়াই তো শক্ত। বাস্তব মানে কি হুবহু বাস্তব? আমরা চোখের সামনে যা দেখি, সব সময় কি তার সামগ্রিক গভীরতা দেখতে পাই? সাহিত্য, শিল্প কি শুধু আয়না? কিংবা সেই আয়নার প্রতিফলনের ওপর একটা বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়াই কি বাস্তবতা? অনেকেই তখন বলতে লাগলেন, চাক্ষুষ দৃশ্যই আসল সত্য, তার বাইরে আর কিছু শিল্প হতে পারে না। পরীদের আর আঁকা যাবে না। কারণ, পরীদের কেউ দেখতে পায় না। কুরবে নামে একজন শিল্পী যেমন জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'শিল্প হচ্ছে একটা বস্তুগত ভাষা, যার শব্দগুলি দৃশ্যমান জিনিস।' অনেকে সেই ভাবেই আঁকতে লাগলেন। কবিতা থেকে রোমান্টিক যুগের অবসান হয়ে গেল, গদ্যও হয়ে উঠলো সমসাময়িক।

বোদলেয়ার এবং মানে এই দুজনই শিল্পে সমসাময়িকতার প্রভাব থাকা উচিত এটা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু শিল্প মানেই বাস্তবের প্রতিচ্ছবি, এটা মেনে নিতে পারেননি। নতুন শিল্পরীতি ঠিক কী হবে, সে বিষয়েও নিঃসংশয় হওয়া সেই সময় সহজ ছিল না। বোদলেয়ার বলেছিলেন, 'পুরোনো ধারা বাতিল হয়ে গেছে, নতুন ধারার এখনো সৃষ্টি হয়নি। সত্যিকারের অভিযাত্রীরা আগামী বছরেই আমাদের সেই দুর্লভ আনন্দের স্বাদ দিক, যাতে

আমরা নবীনকে স্বাগত জানাতে পারি।'

হুবহু বাস্তবতার সমর্থকরা যখন দলে বেশ ভারি, সেই সময়েই আর একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

১৮৩৯ সালে এল জে এম ড্যাগের নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎ এক গোপন খবর জানিয়ে দিলেন। সিলভার নাইট্রেট মাখানো তামার পাতের ওপর সূর্যের আলো নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে তিনি যে কোনো জিনিসের ছবি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কালি, কলম, রং দিয়ে আঁকা নয়, তবু ছবি! এ যেন ম্যাজিক। তামার পাতের ওপর যে-কোনো জিনিস, যে-কোনো মানুষের প্রতিচ্ছায়া স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটার নাম প্রথম দিকে ছিল ডাগেরোটাইপ, কিছুদিনের মধ্যেই তা ফটোগ্রাফি নামে পরিচিত হয়। এই আবিষ্কার শুধু বিজ্ঞানের জগতে নয়, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসেও একটা বিস্ফোরণের মতন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বিস্ময়ের মধ্যে ফটোগ্রাফি যে অন্যতম প্রধান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিল্পের ইতিহাসেও এর গুরুত্ব অসাধারণ। যারা বাস্তবতার দাবি তুলেছিল তাদের তখন অনায়াসে বলা যেতে পারতো, এবার নাও, কত হুবহু বাস্তব চাও! ফটোগ্রাফ মিথ্যে বলে না। চোখের সামনে যা দেখছো, তা সবই ফুটে উঠছে। তা হলে রং-তুলি নিয়ে আঁকবেটা কী? যাঁরা শুধু পোর্ট্রেট এঁকে দুচার পয়সা রোজগার করতো তাদের ভাত মারা যাবার উপক্রম হলো। সাধারণ মানুষ ফটোগ্রাফির অভিনবত্বই লুফে নিল।

প্রথম যুগে কেউ কেউ অবশ্য ফটোগ্রাফিকে 'প্রকৃতির ওপর জোচ্চুরি' বলে আখ্যা দিয়েছে। আবার অনেক শিল্পীও ফটোগ্রাফির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কাফে গেরবোয়ার অন্যতম আড্ডাধারী যে নাদার, সে যেমন সাহসী অ্যাডভেঞ্চারার, তেমনই ভালো ফটোগ্রাফার, বেলুনে চড়ে সে আকাশ থেকে প্যারিস শহরের ছবি তুলেছে, এরকম দৃশ্য কেউ আগে দেখেনি, তাই নাদারের অত খাতির ছিল। এই নতুন জিনিসটার প্রতি কৌতূহল রইলো বটে, কিন্তু অনেক শিল্পী ও কবি নিছক বাস্তবতার দায়িত্ব ফটোগ্রাফির কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। বর্ণনার বদলে এলো প্রতীক ও রূপকল্প, দর্পণের ছবির বদলে এলো বিমূর্ত রূপ। সাহিত্য-শিল্পে ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে গেল বলা যায়।

সাধারণ মানুষ প্রথমেই এই সম্পূর্ণ দিক বদল মেনে নিতে পারবে না, এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা বিশেষজ্ঞ, যাঁরা সমাজের হর্তাকর্তা, ওঁরাও দারুণ ক্ষেপে উঠলেন, তাঁদের মনে হলো, এ যেন শিল্প-সাহিত্যের ব্যভিচার। যে ছবি সুন্দর, নিখুঁত করে আঁকা নয়, তা কী করে শিল্প হবে? যে কবিতা পড়া মাত্র বোঝা যায় না, তা আবার কী কবিতা? মানে এবং বোদলেয়ারকে এই নব্য রীতির ধ্বজাধারী হিসেবে প্রচুর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

মানের থেকে বয়েসে বেশ কিছু বড় ছিলেন বোদলেয়ার, ওঁদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়েসে সিফিলিস রোগে, অর্ধ উন্মাদ অবস্থায় বোদলেয়ার মারা যান।

প্রথাসিদ্ধ ধারায়, নিশ্চিন্তে ভালোমানুষের মতন ছবি আঁকবেন ভেবেছিলেন মানে। কিন্তু ভেতরের কোনো রহস্যময় তাড়নায় তিনি একত্রিশ বছর বয়েসে এঁকে ফেললেন, 'ঘাসের ওপর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া'র মতন ছবি। সে ছবি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করলো, অজস্র নিন্দা-মন্দ গালাগাল বর্ষিত হলো তাঁর ওপর। কিন্তু শিল্পকলার নতুন ইতিহাসও যে শুরু হলো সেই সময় থেকে, তা অনেকেই বুঝতে পারেনি। বোদলেয়ারের কাব্যগ্রন্থ 'অশিব

পুষ্প' এবং মানের পূর্বোক্ত ছবি এবং 'অলিমপিয়া' তুল্যমূল্য বলা যায়। মানে বেঁচেছিলেন একান্ন বছর, ততদিনে তাঁর অনুজ ও অনুগামী শিল্পীরা ইমপ্রেশানিস্ট ছবির আন্দোলন অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, জীবদ্দশায় কিছুটা সমাদর পেয়ে গেছেন এদুয়ার মানে। কিন্তু বোদলেয়ার যে কবিতায় একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়ে গেলেন, তাঁকে দিয়েই আধুনিক কবিতার শুরু, সেটা বোদলেয়ার জেনে বা বুঝে যেতে পারলেন না।

কাফে গেরবোয়া'র আড্ডা ভেঙে যায় ১৮৭০ সালের যুদ্ধের সময়। বিসমার্কের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান। আসল নেপোলিয়ানের ভাইয়ের এই ছেলেটির যুদ্ধ-কৃতিত্বের তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই এক লক্ষ সৈন্যসমেত তৃতীয় নেপোলিয়ান বন্দী হলেন। প্রাশিয়ান সৈন্য ফ্রান্সের একটার পর একটা জেলা দখল করে ঘিরে রাখলো প্যারিস। হোটেল-রেস্তোরাঁ সব তো বন্ধ হয়ে গেল বটেই, সাধারণ মানুষদেরও খাদ্য জোটে না। শিল্পী-সাহিত্যিকরা কেউ কেউ রেজিসটান্স বাহিনীতে যোগ দিল। কেউ কেউ প্যারিস ছেড়ে পালালো। মানে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর লেফটেনান্ট হলেন, মা ও স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বাইরে। নাদারের বেলুনে চিঠি পাঠাতেন। একটা চিঠিতে মাকে লিখলেন, "এখন আমরা ঘোড়ার মাংস খাচ্ছি। গাধার মাংস তো রাজপুত্রদের খাদ্য।" ভিক্টর হুগো তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "এখন আমরা যা খাচ্ছি, তা বোধহয় ঘোড়ার মাংসও নয়। হয়তো কুকুরের মাংস। কিংবা ইঁদুরের মাংস নাকি? মাঝে মাঝে আমার পেট ব্যথা হচ্ছে। আমরা কী খাচ্ছি তা নিজেরাই জানি না।... চিড়িয়াখানার একটা হাতিকে মারা হয়েছে। সে কাঁদছিল। ওকেও খাওয়া হবে!"

যুদ্ধ, আত্মসমর্পণ, আবার গৃহযুদ্ধ, প্রচুর রক্তপাতের পর প্যারিস অনেকটা শান্ত হলো প্রায় দু'বছর পর। শিল্পী-সাহিত্যিকরা সকলেই ফিরে এলো বটে, কিন্তু সেই আড্ডা আর জোড়া লাগলো না।

শিল্পী কবি লেখকদের এরকম এক জায়গায় খোলামেলা মেলামেশার, পরস্পর ভাব-বিনিময়, তর্কাতর্কি ও সমমর্মিতায় শিল্প ও সাহিত্য একই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে। শিল্প ও সাহিত্য পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে, একটা পেছনে পড়ে থাকলে অন্যটাও বেশি দূর এগোতে পারে না।

এই রকম আড্ডার কথা অবশ্য আর বিশেষ শোনা যায় না।

ফটোগ্রাফি জনপ্রিয় হতে লাগলো দিন দিন। বাস্তবতা ও বিমূর্ততার লড়াই চলতেই থাকলো। একদল ধরে রইলো যে বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকে শিল্প-সাহিত্যে কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। আর একদল লেখক-শিল্পী বাস্তবের কোনো রকম অনুকরণকেই শিল্প বলতে রাজি নয়। চাক্ষুষ দৃশ্যের চেয়ে অবচেতনের অনুভূতিই তাঁদের কাছে মুখ্য।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতার এই যে আধুনিক রূপচিন্তা তারও অনেক বিবর্তন ঘটে যায়। নিখুঁত শিল্প সুন্দর শিল্প এবং ফটোগ্রাফির বাস্তবতা থেকে সরতে সরতে শিল্পসৃষ্টি এত বেশি বিমূর্ততায় চলে যায় যে তা চূড়ান্ত দুর্বোধ্যতায় পৌঁছে যায়। ছবির মধ্যে কোনো কাহিনী থাকবে না, চরিত্র থাকবে না, এই নীতি মানতে মানতে ছবি হয়ে যায় একটা আয়তনের মধ্যে কিছু রঙের ছোপ। বিশেষ এক শ্রেণীর শিল্পবোদ্ধা ছাড়া সে সব ছবির রস গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত হয়ে গেল। ছবিটা উল্টো না সোজা করে টাঙানো, সেটাই হয়ে গেল একটা ধাঁধা।

ফ্রান্সের যাঁরা সমাজতান্ত্রিক, যাঁরা বাস্তবতার দর্শনে বিশ্বাসী, তাঁরা এক সময় উচ্চ গলায় বলেছিলেন, এত কাল ছবি আঁকা হতো দেবতা এবং রাজা-রাজড়ার জন্য। কিন্তু এখন সময়

এসেছে, শিল্প হবে সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু এই সম্পূর্ণ বিমূর্ত চিত্রকলার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ কোথায়, এসব ছবিকে কিছু মুষ্টিমেয় শিল্পবোদ্ধা সার্টিফিকেট দেয় আর রাজা-রাজড়াদের বদলে বর্তমানের ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণী সেগুলি কিনে জমা করে রাখে। অন্যদিকে বাস্তববাদীদের মতবাদ আঁকড়ে রইলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের নীতি-নির্ধারকেরা। সেখানে এর নাম হলো সোসালিস্ট রিয়েলিজম, যার মধ্যে আবার বিমূর্ততার কোনো স্থানই নেই, কল্পনার খেলা নিষিদ্ধ। সেখানেও বাস্তবতার নামে যেসব রাশি রাশি ছবি আঁকা হতে লাগলো, তা গতানুগতিকতারই নামান্তর ! তার দুচারখানা দেখার পরেই মনে হয়, এর বদলে রঙিন ফটোগ্রাফই বা মন্দ কী !

সাহিত্যেও আধুনিকতার বিবর্তন এলো অন্যভাবে।

বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান এই সব কিছুর ওপরেই আধিপত্য করেছে সাহিত্য। হঠাৎ বিজ্ঞান অনেক কদম এগিয়ে এলো। তাত্ত্বিক আলোচনা ছেড়ে বিজ্ঞান যেই হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলো, অমনি সে ফুলে ফেঁপে বিশাল আকার ধারণ করলো। তখন আর তার সাহিত্যকে তোয়াক্কা করার দরকার নেই। এই সময় ভলতেয়ার একটা দারুণ উক্তি করেছিলেন, যা আজও প্রণিধানযোগ্য। "I love Physics so long it did not try to take precedence over poetry, now that it is crushing all the arts, I no longer wish to regard it as anything but a tyrant.

এখন মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের যা ভূমিকা, সেই তুলনায় সাহিত্য-শিল্প কিছুই না। তবে এখনো বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষকে আটকে রাখার ক্ষমতা রাখে ধর্ম কিংবা ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই যে সে চেষ্টা প্রবলভাবে চলছে, তা বলাই বাহুল্য।

পৃথিবীর লেখকসমাজ ধর্মকে পরিহার করেছে মোটামুটি একশো বছর আগে থেকে। অনেকের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু ধর্মকে অবলম্বন করে এখন আর সাহিত্য রচিত হয় না। পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করার অন্য কোনো অস্ত্রও হাতে না পেয়ে সাহিত্য খানিকটা অসহায় হয়ে পড়লো। ছাপাখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের যতখানি সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা ছিল, তা হয়নি। শিক্ষিতের হার অনেক বেড়ে গেল বটে, তারা ছাপার অক্ষর পড়ে, কিন্তু অনেকেই সাহিত্য পড়ে না।

শ'দুয়েক বছর আগেও কবিতার স্থান ছিল সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত। হঠাৎ গদ্য হুড়মুড়িয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করতে থাকে। সাহিত্যে স্পষ্ট দুটি ভাগ এসে যায়। আধুনিক মননে কবিতা হয়ে ওঠে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, বেশি লোক পড়বে না জেনে গিয়ে অল্পসংখ্যক রসিকদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে লাগলো কবিরা। বিমূর্ত চিত্রকলার মতনই, কবিতাও হয়ে উঠলো ধ্বনিসর্বস্ব, আকারে ছোট হতে লাগলো। পৌঁছে গেল দুর্বোধ্যতার চরম সীমায়, মোটামুটি শিক্ষিত পাঠকও কবিতার প্রতি বিমুখ হলো। গদ্য এতটা ঝুঁকি নিল না। পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায় মেনে নিলেন গদ্য লেখকরা, গল্প উপন্যাস নিল অনেকটাই মনোরঞ্জনের ভূমিকা। দু-চারজন ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন, যাঁরা গদ্যভাষা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কবিতারই মতন। কিন্তু অধিকাংশ গদ্য লেখকই বাস্তবধর্মী বর্ণনা, ন্যারেটিভ স্টাইলের সঙ্গে কখনো-সখনো পরাবাস্তব ও কল্পনার উদ্দামতা মিলিয়ে পাঠকদের নিজেদের জীবন ও আকাঙ্ক্ষার ছবিই দেখাতে চাইলেন। কবিতার এরকম কোণঠাসা অবস্থা দেখে টি এস এলিয়ট যদিও বললেন, কবিতাও এক ধরনের

এন্টারটেইনমেন্ট, সুপিরিয়র এন্টারটেইনমেন্ট, কিন্তু সে কথায় অনেকেই কান দেয়নি। অতিশয় ব্যক্তিগত কবিতা, পাঠকরা বুঝুক বা না বুঝুক তাতে কিছু যায় আসে না, এরকম মনোভাব নিয়ে লিখে যেতে লাগলেন কবিরা। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পুরোপুরি বিমূর্ত চিত্রকলা দেখে লোকে যেমন বলতে শুরু করলো, উল্টো-সোজা বোঝা যায় না, তেমনি কবিতা সম্পর্কেও অনেকে বলাবলি শুরু করলো, ডান দিক থেকে বা বাঁ দিক থেকে পড়লেও তো একই রকম অবোধ্য। তবে ধনী শ্রেণীর মধ্যে যেহেতু ছবি সংগ্রহ করা ফ্যাশানের অন্তর্গত হয়ে গেছে বা ইদানীং গুপ্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য, তাই বিমূর্ত শিল্পেরও গ্রাহকদের অভাব হলো না। তিন ফুট বাই দু ফুট একটা ক্যানভাসের ওপর একজন শিল্পী না খেয়ে না দেয়ে কিছু রঙ দিয়ে যে একখানা ছবি এঁকেছেন, শিল্পবোদ্ধাদের সার্টিফিকেট থাকলে সেই ছবির দাম এখন হেসে-খেলে কয়েক কোটি টাকা। সেই তুলনায় কবিরা কারুর পৃষ্ঠপোষকতাও পায়নি, জনপ্রিয়তাও হারিয়েছে।

এখন অবশ্য আবার একটা পরিবর্তনের পালা এসেছে। ছবি এবং কবিতা দুটোই দুর্বোধ্যতা থেকে সরে আসছে আস্তে আস্তে। সে আলোচনায় আর আমি যেতে চাই না।

আমার মতে, গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত ফরাসী দেশে যে সব ছবি আঁকা হয়েছে, যে সব কবিতা রচিত হয়েছে, তা এখনো বিশ্বসেরা। আমি সেই সব শিল্পীদেরই কিছু কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি, সেই সময়কার কবিদের রচনার অংশবিশেষ অনুবাদ করে দিয়েছি। খুব সাম্প্রতিক কালের শিল্প সাহিত্যের কথা বলতে পারিনি। কারণ, বিশেষ কিছু জানি না।

এক সময় বিশ্বের শিল্পের কেন্দ্রভূমি ছিল ফ্রান্স, নানা দেশ থেকে শিল্পীরা গিয়ে সেখানে জড়ো হতো, এখন সেই কেন্দ্রটা সরে গেছে। এখন নিউ ইয়র্কে শত শত আর্ট গ্যালারি, সেখানে কারুর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলে ভাগ্য খুলে যায়। তরুণ, গরিব শিল্পীরাও কোনোক্রমে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে যাবার চেষ্টা করে। সেখানে জীবনযাত্রার খরচও প্যারিসের চেয়ে অনেক কম। ফরাসী কবিতাও আর তেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, ইভ বনফোয়ার পর কোনো বড় কবির সন্ধান আমি পাইনি। বিজ্ঞানের দাপটে পশ্চিমী দেশগুলিতে কবিতা এখন ম্রিয়মাণ। যত ধনী দেশ, তত কবিতার প্রতি অনীহা। ও সব দেশে কবিতা পাঠের আসরে দুশো আড়াইশো শ্রোতা এলেই মনে করা হয় যথেষ্ট। ডেনমার্কের একজন প্রধান কবি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর কবিতার বই দুশো কপি বিক্রি হওয়া মানে বিরাট সার্থকতা, যদিও সে দেশে শতকরা একশোজনই শিক্ষিত। কবিতা বুঝি এখন শুধু গরিবদের খাদ্য। ভারত ও বাংলাদেশে কবিতা নিয়ে আজও মাতামাতি দেখে সাহেবরা অবাক হয়।

অতি আকস্মিকভাবে আমার প্রথমবার বিদেশযাত্রা ঘটে গিয়েছিল। প্রায় সেই রকমই আকস্মিকভাবে মার্গারিট ম্যাতিউ নামে একটি শিল্পসাহিত্য পাগলিনী ফরাসী যুবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়। তার সঙ্গেই আমি প্রথম ফরাসী দেশে যাই। সে আমাকে ইমপ্রেশানিস্ট ও এক্সপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের ছবিগুলি চিনিয়েছিল, সে তার প্রিয় কবিদের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতো। সেই সব ছবি, সেই সব কবিতা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। সেগুলিই আজও আমার সবচেয়ে প্রিয়।

তারপরেও আমি বেশ কয়েকবার ফরাসী দেশে গেছি, কোনোবারই কোনো সরকারি বা বেসরকারি আমন্ত্রণে নয়, কোনো পূর্ব নির্ধারিত কারণেও নয়। হঠাৎ হঠাৎ। অন্য কোনো দেশে আচমকা নেমন্তন্ন পেয়ে গেছি, তখনই মনে হয়েছে ফরাসী দেশ ছুঁয়ে যাবো না কেন ? সেখানে অসীম রায় রয়েছে, একবার কোনোক্রমে পৌঁছে গেলে আর কোনো চিন্তা নেই।

মার্গারিট বেঁচে থাকলে এতদিনে তার সঙ্গে আমার কী রকম সম্পর্ক হতো, তা জানি না। তবে ফরাসী দেশের মাটিতে পা দিলেই আমি যেন শুনতে পাই তার যৌবনময় কণ্ঠস্বর। তার উচ্ছলিত হাসির শব্দ, তার চোখ দিয়েই এখনো অনেক কিছু দেখি।

অসীম আমাদের বিদায় দিতে আসে এয়ারপোর্টে। ভাস্কর চলে যায় লন্ডনে। আমি আর বাদল ভারতমুখী বিমানের দিকে এগোই। প্রত্যেকবারই আমার মনে হয়, এবারই শেষ, আর কি আসা হবে এদেশে? তবু মনে মনে বলি, আবার দেখা হবে! আবার দেখা হবে!

কয়েক মাস পরেই অসীম চিঠি লেখে, আবার কবে আসছো এদিকে? ভাস্কর লেখে, কী রে, আবার একটা বেড়াবার প্ল্যান করে ফ্যাল। প্রতি বছর পুজোর আগে বাদল তল্পিতল্পা গুছিয়ে চলে যায় ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলায়। আমার যাওয়া হয় না, আমি যাই তখন সাঁওতাল পরগনায় কিংবা ওড়িশার জঙ্গলে। আবার পরের বছরই হয়তো আচমকা একটা ডাক আসে সুইডেনে যাবার। অমনি রক্ত চলকে ওঠে। হ্যাঁ, সুইডেন অদেখা দেশ, সেখানে যেতে ভালো লাগবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তা বলে আকাশপথ কিছুটা বাঁকিয়ে ফরাসী দেশে কি থাকবো না কয়েকটা দিন?

সেখানে গেলেই পাই বন্ধুদের সাহচর্যের উত্তাপ, জেগে ওঠে প্রথম যৌবনের স্মৃতি, চারপাশে টের পাই এককালের মহান শিল্পী-কবিদের পরিমণ্ডল। তাই তৃপ্তি হয় না, বার বার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।

॥ সমাপ্ত ॥